শয়তান যেভাবে ধোঁকা দেয়

তালবিসে ইবলিস

ইবনুল জাওযী রহ.

ভাষান্তর : মুফতি আবু সাআদ



DARUL ARQAM

শয়তান যেভাবে ধোঁকা দেয়

তালবিসে ইবলিস

শয়তান যেভাবে ধোঁকা দেয়

তালবিসে ইবলিস

মূল : ইমাম ইবনুল জাওযি

অনুবাদ : মুফতি আবু সাআদ

দাওরায়ে হাদিস : জামিয়া ইসলামিয়া পটিয়া

তাখাসসুস ফিল ফিকহ : জামিয়া ফারুকিয়া করাচি

সাবেক শিক্ষক : জামিয়া আরাবিয়া নাজিরহাট চট্টগ্রাম

নির্বাহী সম্পাদক : মাসিক দাওয়াতুল হক

সম্পাদক : সুচিন্তা

দারুল আরকাম

প্রথম প্রকাশ : জানুয়ারি ২০১৯
দ্বিতীয় মুদ্রণ : নভেম্বর ২০১৯
© প্রকাশক কর্তৃক সংরক্ষিত

দারুল আরকাম-এর পক্ষে প্রকাশক মোহাম্মদ রহমতুল্লাহ কর্তৃক
ইসলামি টাওয়ার (দোকান নং ১০), গ্রাউন্ড ফ্লোর, বাংলাবাজার
ঢাকা থেকে প্রকাশিত ও পরিবেশিত।
ফোন : ০১৯৭৭ ৬৪ ৮১ ৮৫

প্রচ্ছদ : আবুল ফাতাহ মুন্না
প্রুফ সমন্বয় : উমেদ

মূল্য : ৫৬০.০০

SOYTAN JEVABE DHUKA DEY
by Imam ibnul jauji, Translet by Mufti Abu saad
Published by DARUL ARKAM
Islami Tower, Banglabazar, Dhaka.
Price : BDT 560.00

অনলাইন পরিবেশক
রকমারি, ওয়াফি লাইফ, কিতাব ঘর,
তারিক জোন, খিদমাহ শপ, পথিক শপ

সূচিপত্র

গ্রন্থকার আল্লামা আবুল ফারাজ ইবনুল জাওযি রহ.
এর সংক্ষিপ্ত জীবনী ১১
গ্রন্থকারের খুতবা ১৭
রাসুল প্রেরণের নেপথ্যে ১৯

প্রথম অধ্যায় [২১-২৮]
সুন্নত ও জামাতের আবশ্যিকতা

দ্বিতীয় অধ্যায় [২৯-৬৯]
বিদয়াত ও বিদয়াতিদের নিন্দার বর্ণনা
সুন্নত ও বিদয়াতের সংজ্ঞা ৩৫
আহলে সুন্নাতের অপরিহার্যতা ৩৭
আহলে বিদয়াতের প্রকারভেদ ৩৮

তৃতীয় অধ্যায় [৪৭-৭০]
ইবলিসের ফিতনা ও ধোঁকার ব্যাপারে হুঁশিয়ারি
ইবলিসের ফিতনা ও ধোঁকার ব্যাপারে হুঁশিয়ারি ৫০
সকল মানুষের সাথে শয়তান রয়েছে মর্মে আলোচনা ৬৪
মানুষের শিরায় শয়তানের বিচরণ মর্মে আলোচনা ৬৬
শয়তান থেকে পানাহ চাওয়ার আলোচনা ৬৭

চতুর্থ অধ্যায় [৭১-৭২]
'তালবিস' ও 'গুরুর' অর্থের বর্ণনা

পঞ্চম অধ্যায় [৭৫-১৮৬]
আকিদা-বিশ্বাসের ক্ষেত্রে শয়তানের ধোঁকা
সুফিসতায়িদের ওপর শয়তানের ধোঁকার বর্ণনা ৭৬
দার্শনিকদের ওপর শয়তানের ধোঁকা ৭৮
দাহরিয়াদের ওপর শয়তানের ধোঁকা ৭৯

প্রকৃতিবাদীদের ওপর শয়তানের ধোঁকার বর্ণনা ৮১
দ্বিত্তবাদী (সানুভিয়া)-দের ওপর শয়তানের ধোঁকা ৮৩
দার্শনিক ও তাদের অনুসারীদের ওপর শয়তানের ধোঁকা ৮৪
দার্শনিকদের মতবাদ ৯০
গ্রহপূজারিদের ওপর শয়তানের অভিনব ধোঁকা ৯২
মূর্তিপূজারিদের ওপর শয়তানের ফাঁদ ৯৪
মূর্তিপূজারি ওপর ইবলিসের ফাঁদের সূচনা ৯৫
অগ্নি, সূর্য ও চন্দ্রপূজারিদের ওপর ইবলিসের ফাঁদ ১০৬
প্রাক ইসলামিক যুগে জাহেলদের ওপর শয়তানের কুমন্ত্রণা ১০৮
নবুওয়ত অস্বীকারকারীদের ওপর শয়তানের ফাঁদ ১১১
নবুওয়ত অস্বীকারকারীদের ব্যাপারে কিছু কথা ১১৮
ইহুদিদের ওপর শয়তানের চক্রান্ত ১২০
খ্রিষ্টানদের ওপর ইবলিসের চক্রান্ত ১২৪
ইহুদি ও খ্রিষ্টানদের ওপর ইবলিসের চক্রান্তের আরও কিছু নমুনা ১২৫
সাবেয়ি সম্প্রদায়ের ওপর শয়তানের নেক সুরতে ধোঁকা ১২৬
অগ্নিপূজারিদের ওপর শয়তানের চক্রান্ত ১২৮
গ্রহ ও জ্যোতিষ্কপূজারিদের ওপর ইবলিসের ধোঁকা ১৩১
মৃত্যুর পর পুনরুত্থান অস্বীকারকারীদের ওপর শয়তানের ফাঁদ ১৩২
আত্মা দেহান্তরে বিশ্বাসীদের ওপর ইবলিসের ধোঁকা ১৩৫
মুসলিম উম্মাহর আকিদা ও ধর্মবিশ্বাসে ইবলিসের ধোঁকা ১৩৭
উম্মতে মুহাম্মদির আকিদা-বিশ্বাসে শয়তানের ধোঁকা ১৪৪
খারেজিদের ওপর ইবলিসের ফাঁদ ১৫১
খারেজিদের মতামত ১৬২
রাফেজিদের ওপর শয়তানের ধোঁকা ১৬৩
বাতেনিয়া সম্প্রদায়ের ওপর ইবলিসের ধোঁকা ১৭২
বাতেনিয়া সম্প্রদায় উদ্ভাবন ও এতে অংশগ্রহণের নেপথ্যে ১৭৮
কুলাঙ্গার বাতেনিয়াদের কিছু ভ্রান্ত বিশ্বাসের বিবরণ ১৮০

ষষ্ঠ অধ্যায় [১৮৭-২১৬]

ইলমী বিষয়ে আলেমদের ওপর শয়তানের চক্রান্ত

কারীদের ওপর শয়তানের চক্রান্ত ১৮৮
মুহাদ্দিসদের ওপর শয়তানের চক্রান্ত ১৯১

ফকিহ ও মুফতীদের ওপর শয়তানের চক্রান্ত ১৯৫
ওয়ায়েজ ও বক্তাদের ওপর শয়তানের চক্রান্ত ২০১
সাহিত্যিক ও ভাষাবিদদের ওপর শয়তানের চক্রান্ত ২০৪
কবিদের ওপর শয়তানের চক্রান্ত ২০৯
দক্ষ আলেমদের ওপর শয়তানের চক্রান্ত ২১০
শয়তানের ধোঁকার ক্ষেত্রে আলেমদের শ্রেণি ২১২
আলেম লেখক ও গ্রন্থকারদের ওপর শয়তানের চক্রান্ত ২১৩

সপ্তম অধ্যায় [২১৭-২২৪]

শাসক ও রাজা-বাদশাহদের ওপর শয়তানের চক্রান্ত

অষ্টম অধ্যায় [২২৫-২৫৪]

ইবাদতের ক্ষেত্রে আবেদদের ওপর শয়তানের চক্রান্ত

প্রস্রাব-পায়খানার ক্ষেত্রে আবেদদের ওপর শয়তানের ধোঁকা ২২৭
আবেদদের অযুতে শয়তানের ধোঁকাদানের বিবরণ ২২৮
আযানের ক্ষেত্রে শয়তানের চক্রান্ত ২৩০
নামাযে শয়তানের বিভ্রান্তি ও ধোঁকা ২৩১
সুন্নত ছেড়ে দেয়ার ব্যাপারে শয়তানের চক্রান্ত ২৩৪
মাখরাজের ব্যাপারে নামাযির ওপর শয়তানের ধোঁকা ২৩৫
রাতের বেলা দীর্ঘ নামায পড়া ২৩৮
কোরআন তেলাওয়াতের ব্যাপারে শয়তানের ধোঁকা ২৪১
রোযার ব্যাপারে শয়তানের ধোঁকা ২৪৩
হজের ব্যাপারে শয়তানের চক্রান্ত ২৪৫
তাওয়াক্কুলের ব্যাপারে শয়তানের চক্রান্ত ২৪৭
জিহাদের ক্ষেত্রে মুজাহিদদের ওপর শয়তানের চক্রান্ত ২৪৭
গনীমতের মালের ব্যাপারে মুজাহিদদের ওপর শয়তানের ধোঁকা ২৫০
সৎকাজে আদেশ ও অসৎকাজে
বাধাদানকারীদের ওপর শয়তানের চক্রান্ত ২৫১

নবম অধ্যায় [২৫৫-২৭৪]

সংসারত্যাগীদের ওপর শয়তানের চক্রান্ত

সংসারবিরাগীদের ওপর শয়তানের ধোঁকা ২৫৭

ইবাদতকারীদের ওপর শয়তানের ধোঁকা ২৬০
যাহেদদের কিছু মতাদর্শ ২৬৪
আলেমদের নিন্দা ও কুৎসা ২৭০
আলেমদের যে সব বিষয়ে যাহেদদের আপত্তি ২৭০

দশম অধ্যায় [২৭৫-৪৪৬]

সুফিদের ওপর শয়তানের ধোঁকা

ধন-সম্পদ বর্জনের ক্ষেত্রে সুফিদের ওপর শয়তানের চক্রান্ত ২৮২
ধন-সম্পদবিরোধী এ মতবাদের প্রমাণভিত্তিক অসারতা ২৮৬
দারিদ্রতা ও অসুস্থতায় ধৈর্যধারণ ২৯৪
সম্পদ ত্যাগের ব্যাপারে সুফিদের মতবাদ ২৯৯
পোশাকের ব্যাপারে সুফিদের ওপর শয়তানের চক্রান্ত ৩০২
পোশাকের ক্ষেত্রে যুহদ ৩০৩
পানাহারের ব্যাপারে সুফিদের ওপর শয়তানের চক্রান্ত ৩০৬
পানাহারের ব্যাপারে প্রথম যুগের
সুফিদের কিছু কর্মকাণ্ড ও তার জবাব ৩০৬
পানি পান ও গোশত ভক্ষণের ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা ৩১০
উল্লেখিত কর্মকাণ্ডের অসারতা বিষয়ক প্রমাণপঞ্জি ৩১১
সুফিবাদ ও ক্ষুধা ৩১৫
পানি পানের ব্যাপারে প্রমাণপঞ্জি ৩১৭
সুফিদের কর্মকাণ্ডের অসারতা প্রমাণে হাদিসসমূহ ৩২০
ছেমা-গান, বাদ্য ও নৃত্যের ব্যাপারে
সুফিদের ওপর শয়তানের ধোঁকা ৩২৪
গানের ব্যাপারে সুফিদের অভিমত ৩২৬
গান-বাজনা নিষিদ্ধ হওয়ার ব্যাপারে প্রমাণাদি ৩৩২
গানের ব্যাপারে চার ইমামের অভিমত ৩৩৫
গান-বাজনা ও ছেমার ব্যাপারে সুফিদের মতবাদ ৩৩৬
সুফিদের গান-বাজনার বিধান ৩৩৮
ছেমা ও গানের মাধ্যমে আল্লাহর নৈকট্যলাভের দাবির অসারতা ৩৩৯
'ওয়াজদ' এর ব্যাপারে সুফিদের ওপর শয়তানের ধোঁকা ৩৪০
'ওয়াজদ' এর ক্ষেত্রে সুফিদের মতবাদ ৩৪৩
'ওয়াজদ'-এর নিয়ন্ত্রণ ৩৪৪

গান শুনে পরিতৃপ্ত হয়ে তালি দেয়া ও নাচা	৩৪৫
আনন্দের আতিশয্যে পোশাক নিক্ষেপ করা ও ছিঁড়ে ফেলা	৩৪৭
অধিকাংশ সুফির ওপর বালকদের ব্যাপারে শয়তানের চক্রান্ত	৩৪৮
আত্মশুদ্ধি	৩৫৮
তাওবাহ ও দীর্ঘ ক্রন্দন	৩৫৮
অধিক মহব্বতের ব্যাধি	৩৫৯
ব্যভিচারের উপক্রম হলে আত্মহনন	৩৬১
ফিতনার নিকটবর্তী ও এতে পতিত হওয়ার উপক্রম	৩৬৩
ইলমের অনিবার্যতা	৩৬৫
অল্প বয়স্ক যুবকদের থেকে দূরে থাকা	৩৬৭
সুন্দর বালকদের সাথে মেলামেশা	৩৬৯
সুদর্শন বালকদের প্রতি দৃষ্টিপাতের শাস্তি	৩৬৯
তাওয়াক্কুলের দাবি করা ও ধন-সম্পদের ব্যাপারে সুফিদের ওপর	৩৭১
চিকিৎসা গ্রহণের ব্যাপারে সুফিদের ওপর শয়তানের কুমন্ত্রণা	৩৮১
নির্জনতা ও জুমা ছেড়ে দেয়ার ব্যাপারে সুফিদের ওপর ...	৩৮২
নির্জনতার ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা	৩৮৩
সুফিদের ওপর অতি নম্রতা ও মাথা অবনত রাখার ব্যাপারে ...	৩৮৪
বিয়েতে অনাগ্রহী করার ব্যাপারে সুফিদের ওপর শয়তানের ধোঁকা	৩৮৮
বিয়ে বিতৃষ্ণায় সুফি মতদর্শের খণ্ডন	৩৯১
বিয়ে বিতৃষ্ণার নেপথ্যে	৩৯৩
সন্তানে অনাগ্রহীর ব্যাপারে সুফিদের ওপর ইবলিসের ধোঁকা	৩৯৫
সফর ও বৈরাগ্যের ব্যাপারে সুফিদের ওপর শয়তানের ধোঁকা	৩৯৬
রাতের বেলা একাকী চলাফেরা	৩৯৮
পাথেয় ছাড়া বেরিয়ে পড়ার ব্যাপারে সুফিদের ওপর ইবলিসের ধোঁকা	৩৯৯
সফর ও সাধনাকালে সুফিদের শরিয়তবিরোধী কার্যকলাপ	৪০৪
সফর থেকে ফেরার সময় সুফিদের ওপর শয়তানের ধোঁকা	৪২১
সুফিদের কেউ মারা গেলে তখনকার শয়তানের ধোঁকার নমুনা	৪২৩
জ্ঞানান্বেষণ পরিহারে সুফিদের ওপর শয়তানের ধোঁকা	৪২৬
শরিয়ত ও হাকিকতের ব্যাপারে সুফিদের মতবাদ	৪৩০
জ্ঞানগ্রন্থ দাফন ও সাগরে নিক্ষেপ বিষয়ে সুফিদের ওপর ...	৪৩১
পবিত্র কুরআনের ব্যাপারে সুফিদের মন্তব্যের কিঞ্চিত আলোচনা	৪৩৫

ইলমী মাসায়েলে ক্ষেত্রে সুফিদের ওপর শয়তানের চক্রান্ত ৪৩৫
ভিত্তিহীন দাবি ও উপাধীর ব্যাপারে শয়তানের ধোঁকা ৪৩৯
সুফিদের আরও কিছু আপত্তিজনক কাজের বিবরণ ৪৪২

একাদশ অধ্যায় [৪৪৭-৪৫০]

কারামত সদৃশ বিষয়াবলির ওপর শয়তানের ধোঁকা

কারামত সদৃশ বিষয়ে আক্রান্ত ব্যক্তির অবস্থা ৪৪৯

দ্বাদশ অধ্যায় [৪৫১-৪৭৪]

সাধারণ মানুষের ওপর শয়তানের চক্রান্ত

আলেমদেরকে অবজ্ঞার ব্যাপারে শয়তানের ধোঁকা ৪৫৩
পাপে সম্পৃক্ততার ব্যাপারে শয়তানের ধোঁকা ৪৫৪
বংশের দোহাই দিয়ে মুক্তির প্রত্যাশা ৪৫৭
ফরযের ওপর নফলকে প্রাধান্য ৪৫৮
ধনীদের ওপর শয়তানের ধোঁকা ৪৬০
দরিদ্রদের ওপর শয়তানের ধোঁকা ৪৬৭
নারীদের ওপর শয়তানের ধোঁকা ৪৬৯
উচ্চাশা পোষণে সবার প্রতি শয়তানের ধোঁকা ৪৭৪

লেখকের সংক্ষিপ্ত জীবনী

ইবনুল জাওযি [৫০৮ হিজরি-৫৯৭ হিজরি]

বংশ পরিক্রমা : আবদুর রহমান ইবনে আলী ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে আলী ইবনে ওবাইদুল্লাহ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে হাম্মাদী ইবনে আহমদ ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে জাফর ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে কাসেম ইবনে নাযার ইবনে কাসেম ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে আবদুর রহমান ইবনে কাসেম ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে আবু বকর রা.। আল্লামা ইবনুল জাওযি রহ. আরবিভাষী ছিলেন এবং তিনি কুরাইশ বংশের তামিমি গোত্রের উত্তরসূরি। তাঁর নাম—আবদুর রহমান, উপাধি—জামালুদ্দিন, উপনাম—আবুল ফারাজ। তবে ইবনুল জাওযি নামেই সমধিক প্রসিদ্ধ।

তিনি তিন পুত্র ও চার কন্যাসন্তান রেখে যান। পুত্ররা যথাক্রমে—১. আবদুল আজিজ, ২. আবুল কাসেম আলী ও ৩. মুহিউদ্দিন ইউসুফ। মেয়েদের নামের সূত্র পাওয়া যায়নি।

'ইবনুল জাওযি' নামের নেপথ্যে : তাঁর পূর্বপুরুষ জাফর ইরাকের বসরা নগরীর যে এলাকায় বসবাস করতেন, সে এলাকাটি জাওযি নামে পরিচিত ছিল। সেখানকার অধিবাসীদের জাওযি নামে আখ্যায়িত করা হতো। স্মর্তব্য, এলাকাটি ছিল নদীর পাড়ে।

ইতিহাসবেত্তা ও বিদগ্ধ আলেমগণের মতে, আল্লামা ইবনুল জাওযি রহ. ছিলেন সে যুগের বিখ্যাত ইতিহাসবিদ ও মুহাদ্দিস। ইমাম কাত্তানি তাঁর গ্রন্থের নির্বাচিত অধ্যায়ে লেখেন, ইবনুল জাওযি কুরাইশি তামিমি বকরি সিদ্দিকি বাগদাদি হাম্বলি একজন প্রসিদ্ধ বক্তা। তিনি বিভিন্ন শাস্ত্রে বহু গ্রন্থ রচনা করেন। তাঁর লিখিত গ্রন্থের সংখ্যা প্রায় আড়াই শত। 'আররিসালাতুল মুসতাত্‌রিফা' গ্রন্থেও তিনি এমন অভিমত প্রকাশ করেছেন।

জ্ঞানার্জন : ইবনুল জাওযির তিন বছর বয়সে তাঁর পিতা ইন্তেকাল করেন। পিতার মৃত্যুর পর তিনি কেবল বিশ দিনার ও দু'টি ঘর মিরাস হিসেবে প্রাপ্ত হন। এছাড়া মিরাস হিসেবে তিনি আর কিছুই পাননি। পিতার মৃত্যুর পর তিনি স্বীয় মাতা ও ফুফুর কাছে লালিত-পালিত হতে থাকেন। কিছুটা বয়স হলে তাকে হাফেজ মুহাম্মাদ ইবনে নাসিরের মজলিসে নিয়ে যাওয়া হয়।

তাঁর হাতেই তিনি কুরআনুল কারিম হিফজ করেন। ত্রিশ বছর বয়স পর্যন্ত হাদিসসহ অন্যান্য প্রয়োজনীয় ইলম তাঁর কাছেই অর্জন করেন।

শিক্ষক ও শায়খবৃন্দ : অল্প বয়সেই তিনি সে সময়কার সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত ও বুযুর্গ আলেম আবুল হাসান ইবনে যাগুনির সাহচর্যে ধন্য হন। এরপর আবু বকর দিনুরি ও কাজী আবু ইয়ালার কাছে ফিকাহ, মতানৈক্যপূর্ণ মাসআলায় ব্যুৎপত্তি, তর্কশাস্ত্র ও উসূলে হাদিসের জ্ঞান লাভ করেন। তাঁদের কাছে ইবনুল হোসাইন ও বারি' এবং তাঁদের তবকাত অধ্যয়ন করেন। মাদরাসা নিযামিয়া বাগদাদের প্রসিদ্ধ উস্তাদ আলী ইবনে মুযরাকির কাছেও জ্ঞানার্জন করেন। তিনি ৮৭ জন শায়খ ও শিক্ষকের কাছে জ্ঞান লাভ করেছেন বলে বিশেষভাবে উল্লেখ করেছেন। তন্মধ্যে :

১. আবুল ফযল মুহাম্মাদ ইবনে নাসির—তাঁর মামা এবং প্রথম শিক্ষক
২. আবু মানসূর আল জুয়ালিকি—তাঁর কাছে ব্যাকরণ ও ভাষাসাহিত্য শেখেন
৩. ইবনুততিবির আল হারিরি—তাঁর কাছে হাদিস অধ্যয়ন করেন। এবং
৪. আবু মানসুর ইবনে খায়রুন—তাঁর কাছে কেরাত শেখেন।

এভাবে তাঁর শিক্ষকতালিকায় ইরাকের বিখ্যাত অনেক শায়খ ও বিদ্বানের নাম রয়েছে।

ওয়াজের ময়দানে : মুয়াফ্ফিকুদ্দিন আবদুল লতিফ বাগদাদি রহ. বলেন, আল্লামা ইবনুল জাওযি রহ. খুবই সুললিত কণ্ঠের অধিকারী ছিলেন। তাঁর চরিত্রমাধুরী ছিল অনুপম ও সুমিষ্ট। যথেষ্ট ব্যক্তিত্বসম্পন্ন এবং যে কোনো লোককে প্রভাবিত করার এক আশ্চর্য গুণ ছিল তাঁর। লক্ষ লক্ষ লোকের সমাগম হতো তাঁর মাহফিলে। গাফেল লোকেরা তাতে নসিহত পেত। অজ্ঞরা শিখত দীন। পাপিষ্ঠরা তাওবা করত এবং মুশরিকরা দলে দলে যোগ দিত ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে। তিনি তাঁর *আলকাসাস* গ্রন্থে লেখেন, 'এক লাখেরও অধিক লোক আমার হাতে তাওবা করে সঠিক পথে ফিরে এসেছেন এবং এক লাখ লোক আমার হাতে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন।'

মোটকথা, আল্লামা ইবনুল জাওযি রহ. এর জীবনের অন্যতম আলোচিত দিক হচ্ছে তাঁর আধ্যাত্মিক ও বিপ্লবাত্মক ওয়াজ এবং দারসি মজলিস। তাঁর ওয়াজের মজলিস বাগদাদের আনাচে-কানাচে ছড়িয়ে পড়েছিল। খলিফা, রাজা-বাদশা, মন্ত্রী ও বিশিষ্ট আলেমগণ যথেষ্ট আগ্রহ ও গুরুত্বসহকারে তাঁর মসলিসে উপস্থিত হতেন। আল্লামা ইবনুল জাওযি রহ.

যাবতীয় বিদয়াত ও বিধ্বংসী আকিদা-বিশ্বাস ব্যাখ্যা দিয়ে বুঝিয়ে বুঝিয়ে খণ্ডন করতেন এবং সহিহ আকিদা ও সুন্নাতের সবিস্তার আলোচনা করতেন। স্বীয় অতুলনীয় বর্ণনাভঙ্গি ও অকাট্য যুক্তি-প্রমাণের কারণে বিদয়াতিরা তা খণ্ডন করতে পারত না।

অনুপম চরিত্র : আল্লামা ইবনুল জাওযি রহ. প্রতি সপ্তাহে একবার কুরআন মাজিদ খতম করতেন। মসজিদ এবং ওয়াজের মজলিসের প্রয়োজন ছাড়া ঘর হতে বের হতেন না। শুধু তাই নয়; বাল্যকালেও কখনো কেউ তাকে ছোটদের সাথে খেলাধুলা করতে দেখেনি। হালাল হওয়ার ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়া পর্যন্ত কিছু আহার করতেন না। এ অভ্যাস তাঁর মৃত্যু অবধি অব্যাহত ছিল। তিনি স্বীয় *সাইদুল খাতির* গ্রন্থে উল্লেখ করেন, 'দীনি ইলমের সাথে আমার ভালোবাসা সেই ছোটবেলা থেকে। এ ছাড়া অন্য কোনো শাস্ত্র বা পেশায় আমি কোনো আগ্রহ দেখতে পাই না। স্বল্প জীবন, অল্প ক্ষমতা আর এই ক্ষুদ্র সাহস নিয়ে দীনি ইলমের খেদমত করে যেতে চাই। এ ছাড়া অন্যদিকে মনোযোগ দেয়ার আর কোনো সুযোগ রয়েছে কি?'

গ্রন্থ রচনার বিস্ময় : আল্লামা ইবনুল জাওযি রহ. কেবল জবান দ্বারা ওয়াজ-নসিহতের মাধ্যমেই দীন ও ইলমি খেদমত আঞ্জাম দেননি; লেখালেখি ও গ্রন্থ রচনায় তাঁর অবদান আরও বিস্ময়কর। আল্লামা ইবনে কাসির রহ. বলেন, 'আল্লামা ইবনুল জাওযি রহ. এমন একজন বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী ব্যক্তিত্ব ছিলেন, যিনি ছোট-বড় সর্বমোট তিনশ'টি গ্রন্থ রচনা করেছেন। তাফসির, হাদিস, ইতিহাস, গণিত, চিকিৎসা, ভাষা, সাহিত্য ও ব্যাকরণ-শাস্ত্রে তাঁর গ্রন্থগুলো যুগান্তকারী ও স্বতন্ত্র ভূমিকা রেখেছে।'

তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বাধিক উপকারী গ্রন্থ হচ্ছে পঠিতব্য *তালবিসে ইবলিস* এবং সর্বশেষ লিখিত কিতাব হচ্ছে *সাইদুল খাতির*। তাঁর রচিত অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ কিতাবের উল্লেখযোগ্য কয়েকটি :

১. আখবারু আহলির রুসূখ ফিল ফিকহি ওয়াত্ তাহদীস বিমিকদারিল মানসূখ মিনাল হাদিস
২. আখবারুল হুমাকা ওয়াল মুগাফ্ফিলীন
৩. আখবারুয্ যারাফ ওয়াল মুতামাজ্জিনীন
৪. আখবারুন নিসা
৫. আল আযকিয়া
৬. বুস্তানুল ওয়ায়েযীন ওয়া রিয়াযুস্ সামেয়ীন

৭. তারীখে উমর ইবনুল খাত্তাব রা.
৮. আত্তারীখ ওয়াল মাওয়ায়িয
৯. তাবসারাতুল আখইয়ার ফী যিকরি নাইলি মিসরিন ওয়া ইখওয়ানিহী মিনাল আনহার
১০. তুহফাতুল ওয়ায়িয ওয়া নুযহাতুল মালাহিয
১১. আত্তাহকীক ফী আহাদীসিল খিলাফ
১২. তাকভীমুল লিসান
১৩. তালবীসে ইসলিস (আলোচ্য গ্রন্থ)
১৪. তালকীহ্ ফুহূমিল আসার
১৫. তাম্বীহুন নায়িমিল গুমার আলা হিফযি মাওয়াসিমিল উমার
১৬. দাফউ শুবহাতিশ তাসবিহ ওয়ার্‌রাদ্দু আলাল মুজাসসিমা
১৭. যাম্মুল হাওয়া
১৮. আয্‌যাহবুল মাসবূক ফী সিয়ারিল মুলূক
১৯. রূহুল আরওয়াহ
২০. রুউসুল কাওয়ারীর ফিল খুতাবি ওয়াল মুহাযারাত ওয়াল ওয়ায ওয়াত তাযকীর
২১. যাদুল মাসীর ফী ইলমিত্ তাফসির
২২. সালওয়াতুল আহযান
২৩. মানাকিবু ইমীরিল মুমিনীন উমর ইবনি আবদিল আযিয
২৪. সিফাতুস্ সাফওয়া বা সাফওয়াতুস্ সাফওয়া
২৫. সাইদুল খাতির
২৬. আত্তিব্বুর রুহানী
২৭. আল কারামিতা
২৮. আল কিসাস ওয়াল মুযাক্কিরূন
২৯. লুফতাতুল কাবাদ ইলা নাসীহাতিল ওয়ালাদ
৩০. আল মুদাহহিস ফী উলূমিল কুরআনি ওয়াল হাদিস
৩১. মুলতিকাতুল হিকায়াত
৩২. মানাকিবুল ইমাম আহমাদ
৩৩. মানাকিবু বাগদাদ
৩৪. মানাকিবুল হাসান আলবসরি
৩৫. আল মুনতাযাম ফী তারীখিল মুলূকি ওয়াল উমাম
৩৬. মাওলিদিন নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম

৩৭. আল ওয়াফা বিআহওয়ালিল মুস্তাফা
৩৮. ইয়াকূতাতুল মাওয়ায়িয

আল্লামা ইবনুল জাওযি প্রণীত তাফসির-গ্রন্থসমূহ :

৩৯. আল মুগনী ফিত্তাফসির
৪০. যাদুল মাসীর ফী ইলমিত্তাফসির
৪১. কিতাবুত তালখীস
৪২. তাযকারাতুল আরীব ফী ইলমিল গারিব
৪৩. তাইসীরুল বায়ান ফী ইলমিল কুরআন
৪৪. ফুনূনুল আফনান ফী উলূমিল কুরআন
৪৫. আল উজূহ্ ওয়ান নাযায়ির = নুযহাতুল উয়ূনিন নাযায়ির ফিল উজূহ ওয়ান নাযায়ির
৪৬. মুখতাসারুল উজূহ ওয়ান নাযায়ির
৪৭. নাসিখুল কুরআন ওয়া মানসূখুহু
৪৮. আল মুসাফ্ফা বিআকফি আহলির রুসূখি মিন ইলমিন নাসিখি ওয়াল মানসূখ
৪৯. আল ইশারাহ্ ইলা কিরাআতিল মুখতারাহ্
৫০. আল মুনতাবিহ ফী উইয়ুলি মুশতাবাহ্
৫১. আস্সাবআহ্ ফিল কিরাআতিস সাবআহ্
৫২. ওয়ারদুল আগসান ফী ফুনূনিল আফনান
৫৩. গারিবুল হাদিস

গায়রে উলুমে কুরআনবিষয়ক গ্রন্থাবলি :

৫৪. সুযূযুল উকূদ
৫৫. আজীবুল খাতাব

ভাষাজ্ঞানবিষয়ক গ্রন্থাবলি :

৫৬. তাকভীমুল লিসান
৫৭. মুশকিলুস সিহাহ্
৫৮. আল মাকামাতুল জাওযিয়া ফিল মাআনিল ওয়াযিয়া

তাঁর কিছু কিতাব সংক্ষিপ্তাকারে গ্রন্থিত করা হয়েছে। তন্মধ্যে–

৫৯. মুখতাসারু মানাকিবি উমর ইবনে আবদিল আযিয
৬০. মুখতাসারু মানাকিবি বাগদাদ
৬১. তালকীসুত তাবসারাহ্
৬২. মুখতাসারু লাকতুল মানাফি

৬৩. আশ্‌শিফা ফী মাওয়ায়িযিল মুলূকি ওয়াল খুলাফা

কবি :

ইতিহাসবিদেরা বলেন, আল্লামা ইবনুল জাওযি রহ. বৈচিত্র্যময় গুণে গুণী ও বহুমুখী প্রতিভার পাশাপাশি একজন বিদগ্ধ কবিও ছিলেন। তাঁর কবিতার এক বিশাল পাণ্ডুলিপি রয়েছে বলে তাঁরা অভিমত ব্যক্ত করেছেন। কিন্তু আমাদের কাছে তাঁর কবিতার কোনো বই পৌঁছেনি। তথাপি আলোচ্য গ্রন্থসহ তাঁর অধিকাংশ গ্রন্থে উদ্ধৃত ও উল্লিখিত চমৎকার কবিতামালা দেখে তাঁর কবিপ্রতিভা সম্পর্কে সম্যক ধারণা লাভ করা যায়। এছাড়া আল্লামা ইবনে কাসির রহ. তাঁর বিখ্যাত *আলবিদায়া ওয়ান নিহায়া* গ্রন্থে ইবনুল জাওযি রহ. এর কবিতাগুচ্ছের বেশ কিছু পঙ্‌ক্তি উল্লেখ করেছেন।

পরিশেষে আল্লামা ইবনুল জাওযি রহ. এর জন্য আমরা আল্লাহ তায়ালার কাছে অফুরন্ত রহমত কামনা করি। তাঁর জ্ঞান দ্বারা সকলে যেন উপকৃত হতে পারি সেই প্রার্থনা করছি। মানুষ মৃত্যুবরণ করলে তার আমল বন্ধ হয়ে যায়। কিন্তু তিনটি আমল জারি ও বহমান থাকে। যথা—১. সদকায়ে জারিয়া, ২. ইলম—যা দ্বারা অন্যরা উপকৃত হয় ও ৩. নেককার সন্তান—যারা তাঁর জন্য দোয়া করতে থাকে। আমাদের প্রত্যাশা—আমাদের লেখক অত্র তিনটি মাধ্যমেই সাওয়াব পেতে থাকবেন।

গ্রন্থকারের খুতবা

الحمد لله الذي سلم ميزان العدل إلى أكف ذوي الألباب وأرسل الرسل مبشرين ومنذرين بالثواب والعقاب وأنزل عليهم الكتب مبينة للخطأ والصواب وجعل الشرائع كاملة لا نقص فيها ولا عاب أحمده حمد من يعلم أنه مسبب الأسباب وأشهد بوحدانيته شهادة مخلص في نيته غير مرتاب وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله وقد سدل الكفر على وجه الإيمان والحجاب فنسخ الظلام بنور الهدى وكشف النقاب وبين للناس ما أنزل إليهم وأوضح مشكلات الكتاب وتركهم على المحجة البيضاء لا سرب فيها ولا سراب فصلى الله عليه وعلى جميع الآل وكل الأصحاب وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الحشر والحساب وسلم تسليما كثيرا

অর্থ : সমস্ত প্রশংসা একমাত্র আল্লাহ তায়ালার জন্য, যিনি ন্যায়ের মানদণ্ড জ্ঞানীদের হাতে সোপর্দ করেছেন এবং নির্বাচিত রাসুল প্রেরণ করেছেন; যাঁরা অনুগতদেরকে উত্তম প্রতিদানের সুসংবাদ দিয়েছেন, অন্যদিকে অস্বীকারকারীদেরকে শাস্তির ভয় দেখিয়েছেন। তাঁদের সাথে সুস্পষ্ট ঐশী গ্রন্থ অবতীর্ণ করেছেন এবং সকল প্রকার ত্রুটি-বিচ্যুতিমুক্ত পরিপূর্ণ শরিয়ত প্রদান করেছেন। আমি এমন ব্যক্তির ন্যায় সেই মহান সত্তার প্রশংসা করছি, যিনি দৃঢ় বিশ্বাস করেন যে, একমাত্র তিনিই 'মুসাব্বিবুল আসবাব' বা সর্বার্থ সাধক। আমি তাঁর একত্ববাদের সাক্ষ্য দিচ্ছি ওই নিরেট ব্যক্তির মতো, যার অন্তরে বিন্দু পরিমাণ সন্দেহ নেই, নেই অভিযোগের লেশ। আমি আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি, হজরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ তায়ালার বান্দা ও রাসুল। যাঁকে এমন সময়ে এই ধরার বুকে প্রেরণ করা হয়েছে, যখন ঈমানের চেহারায় পড়েছিল কুফরীর পর্দা ও প্রলেপ। তাঁর রিসালাতের আলোকরশ্মিতে দূরীভূত হতে থাকে সমুদয় আঁধার-কালিমা। সত্যপথের চেহারা থেকে যিনি বাতিল-ভ্রান্তের পর্দা উপড়ে ফেলেন। বান্দার জন্য আল্লাহ যে সব বিধি-বিধান প্রেরণ করেছেন তা তিনি যথাযথভাবে বর্ণনা করে গেছেন এবং কুরআনের সকল জটিল বিষয় বুঝিয়ে দিয়েছেন। তিনি জগদ্বাসীর জন্য সুস্পষ্টভাবে সঠিক পথের সন্ধান দিয়ে গেছেন। আল্লাহ তায়ালা তাঁর ওপর, তাঁর সকল পরিবারবর্গ, সকল সাহাবায়ে কেরাম এবং কিয়ামত অবধি তাঁদের অনুসরণকারীদের ওপর রহমত বর্ষণ করুন।

আকল তথা বুদ্ধি-জ্ঞান মানুষের জন্য বিরাট একটি নেয়ামত। কেননা এর মাধ্যমে আল্লাহ তায়ালার মারেফত ও পরিচয় লাভ এবং রাসুলকে সত্যরূপে

চেনা ও বিশ্বাস করা সম্ভব হয়। কিন্তু বান্দার পক্ষে তার প্রতিপালকের সাথে সম্পর্ক গড়ার ক্ষেত্রে আকল দ্বারা যখন পুরোপুরিভাবে কাজ নেয়া দুষ্কর হয়ে দাঁড়ায়, তখন রাসুল পাঠানো হয় এবং কিতাব তথা আসমানী গ্রন্থ অবতীর্ণ করা হয়। অতএব বিবেক হচ্ছে চক্ষুসদৃশ আর শরিয়ত হচ্ছে সূর্যসদৃশ। চক্ষু দোষমুক্ত থাকলে সে অবশ্যই সূর্যের আলো দেখতে পাবে; অন্যথায় নয়। এদিকে আকল-বিবেক নবীদের মুজিযাসমেত প্রমাণাদি দেখে এ ব্যাপারে নিশ্চিত হয়ে যায় যে, নবীরা যা বলেন তা ধ্রুব সত্য। বিবেক তখন তা নির্দ্বিধায় গ্রহণ করতে বাধ্য হয় এবং অদৃশ্য বিষয়াবলির ওপর দৃঢ়বিশ্বাস পোষণ করে।

আল্লাহ তায়ালা মানবজাতিকে আকল বা বিবেক দ্বারা পুরস্কৃত করতে চাইলে সর্বপ্রথম আমাদের আদি পিতা হজরত আদম আলাইহিস সালাম এর মাধ্যমে তার সূচনা করেন। তিনি মানুষকে আল্লাহর পক্ষ থেকে আগত অহীর মাধ্যমে শিক্ষাদান করতেন। সবাই ছিল সঠিক পথে। কিন্তু কিছুকাল পর কাবিল স্বীয় প্রবৃত্তির আনুগত্য করতে গিয়ে আপন ভাই হাবিলকে হত্যা করে বসে। এরপর চলতে থাকে পদস্খলনের ও পথভ্রষ্টতার ধারাবাহিকতা। এভাবে অধঃপতিত হয়ে একসময় তারা মূর্তিপূজা করতে থাকে। পাশাপাশি এমন এমন আকিদা-বিশ্বাস অন্তরে লালন করে, যা রাসুলের পয়গামবিরোধী ও বিবেকের চাহিদাবিবর্জিত। তারা মনমতো যাচ্ছেতাই কৃষ্টি-কালচারের আবিষ্কার করতে থাকে এবং তাদের পূর্বসূরিরাও হয়ে পড়ে বাপ-দাদার পদাঙ্ক অনুসারী। আল্লাহ তায়ালা বলেন,

وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ فَاتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ

> আর নিশ্চয় তাদের ব্যাপারে ইবলিস তার ধারণা সত্য প্রমাণ করল, ফলে মুমিনদের একটি দল ছাড়া সবাই তার অনুসরণ করল।[১]

---

১ সুরা সাবা : আয়াত ২০।

রাসুল প্রেরণের নেপথ্যে

জেনে রাখা উচিত—নবীগণ যথেষ্ট বয়ান করেছেন এবং সকল ব্যাধির উপশমযোগ্য ঔষধ ও ব্যবস্থাপত্র দিয়েছেন। সকল নবী তাওহিদের সরল ও সঠিক পথের ব্যাপারে একমত ছিলেন। এতে বিন্দুমাত্র মতানৈক্যের ছিটেফোঁটাও ছিল না। কিন্তু ইবলিস শয়তান এসে নবীদের সেই পূর্ণাঙ্গ ও যথেষ্ট বিবরণের সাথে কিছু বিভ্রান্তি ও সন্দেহযুক্ত কথাবার্তা ছড়ায়। বিশুদ্ধ ঔষধ ও ব্যবস্থাপত্রের সাথে বিষ মিশ্রণ করে এবং সুস্পষ্ট পথের দু'ধারে বিভ্রান্তকারী ফুটপাথ সংযুক্ত করে দেয়। এভাবে সে মানুষের বিবেক-বুদ্ধির সাথে মেতে ওঠে উন্মত্ত খেলায়। এরই ধারাবাহিকতায় সে প্রাক ইসলামিক যুগে অর্থাৎ জাহিলিয়াতের যুগে তাদেকে নির্বুদ্ধিতার নিকৃষ্ট ও নিন্দনীয় বিভিন্ন ধর্ম ও মতবাদে বিভ্রান্ত করার প্রয়াস পায়। ফলে পবিত্র কাবা শরিফে পর্যন্ত এরা মূর্তিপূজা করতে থাকে। বাহিরা, সায়েবা, হাম ও উসিলাকে[১] হারাম সাব্যস্ত করে। সদ্যভূমিষ্ট কন্যাসন্তানকে জীবিত কবরস্থ করতে ভালোবাসে এবং তাদের মতো দুর্বলদেরকে উত্তরাধিকার সম্পত্তির অধিকার হতে বঞ্চিত করে। এ জাতীয় বহু ভ্রান্তি ও কুসংস্কারের ব্যাপারে ইবলিস তাদের নজরে সুশোভিত করে তোলে।

ঠিক এমন সময়ে আল্লাহ তায়ালা হজরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে এ ধরায় প্রেরণ করেন। তিনি এসেই এমন ভ্রান্তি ও কুসংস্কার দূরীকরণে সচেষ্ট হন। অন্যদিকে ভালো, উত্তম ও উন্নত বিষয়গুলো শরিয়ত হিসেবে সাব্যস্ত করেন। সে মতে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, তাঁর সাহাবায়ে কেরাম রা. ও তৎপরবর্তীরা শরিয়তের আলোয় আলোকিত হয়ে চিরশত্রু শয়তানের ফাঁদ ও ধোঁকা হতে সুরক্ষিত থেকে সঠিক পথে চলতে থাকেন। দিনের আলোর মতো উজ্জ্বল এসব ব্যক্তিরা এই নশ্বর পৃথিবী থেকে বিদায় নিলে বিশ্বজুড়ে ধেয়ে আসে নিকষ কালো অন্ধকার। আবারও মানুষ মনের খেয়াল-খুশিমতো জীবনযাপন করতে থাকে। শরিয়তের সেই সুরক্ষিত সরল ও সঠিক পথ হারিয়ে বক্র ও ভয়াল পথে পা বাড়ায়। ফলে বহু লোক সঠিক দীন থেকে বিচ্যুত হয়ে পৃথক পৃথক সম্প্রদায়ের উন্মেষ ঘটায়। এটা জানা কথা যে, অজ্ঞতা ও

---

১ ১. 'বাহীরা' ওই উট, যার কান কেটে প্রতিমার নামে ছেড়ে দেয়া হতো। ২. 'সায়েবা' ওই উট, যাকে প্রতিমার নামে ছেড়ে দেয়া হতো। ৩. 'হাম' ওই উট, যাকে কয়েকবার সংগমের পর সাওয়ারী এবং বোঝা বহন থেকে মুক্ত করে দেয়া হতো এবং ৪. 'উসীলা' ওই উটনী, যাকে কয়েকবার মাদী বাচ্চা প্রসবের পর মূর্তির নামে মুক্ত করে দিত।

নিকষ অন্ধকারে চতুর্দিক ছেয়ে গেলে ইবলিস মানুষের মনে আস্তানা গেড়ে নানাবিধ ফন্দি-ফাটল ও ধোঁকা দিতে শুরু করে। কিন্তু যখনই ইলমের আলোকরশ্মি ঝলমল করে ভেসে ওঠে সে তখন প্রচণ্ড মনক্ষুণ্ন হয়।

এসব কারণে আমি ইবলিসের ফাঁদ-ফন্দির জাল ও ধোঁকার ক্ষেত্রগুলো দেখিয়ে দেয়ার প্রয়োজন অনুভব করি। কেননা মন্দের উৎপত্তির বর্ণনা দেয়া, মন্দ থেকে বাঁচানোর নামান্তর। যেমন সহিহ বুখারি ও সহিহ মুসলিমে হজরত হোযাইফা রা. এর একটি হাদিস বর্ণিত আছে। সেখানে তিনি বলেন,

'মানুষ রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে ভালো ভালো বিষয় সম্পর্কে জানতে চাইত, আর আমি জানতে চাইতাম মন্দ বিষয় সম্পর্কে। যাতে মন্দ বিষয়ে পতিত হওয়া থেকে বেঁচে থাকতে পারি।'[২]

'হজরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. বলেন, আল্লাহর শপথ! আজ ধরাপৃষ্ঠে শয়তানের কাছে আমার মৃত্যুর চেয়ে কারও মৃত্যু অধিক পছন্দনীয় নয়। তাঁকে এর কারণ জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বললেন, শয়তান পূর্ব বা পশ্চিমে সর্বত্র নিত্যনতুন বিদয়াত আবিষ্কার করে বেড়ায়। সে ব্যাপারে আমার কাছে কোনো মুসলমান জানতে চাইলে আমি তাকে বিদয়াত থেকে ফিরিয়ে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সুন্নাতের ওপর তুলে দিই। অতএব শয়তানের আবিষ্কৃত বিদয়াত যেখান থেকে ওঠে আসে সেখানেই নিক্ষেপ করা হয়।'

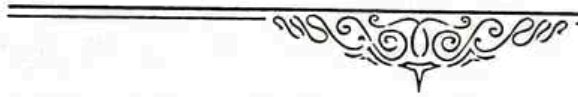
আমার এই কিতাবের আলোচ্য বিষয় হলো, ইবলিসের ফিতনাসমূহ থেকে সতর্ক করা, নিকৃষ্ট ও অনর্থক কুকর্ম সম্পর্কে ভীতি প্রদর্শন করা, তার সূক্ষ্ম ও গোপন ফাঁদগুলো উন্মুক্ত করা এবং তার অদৃশ্য চক্রান্তকে প্রকাশ করে দেয়া। আল্লাহ তায়ালা প্রত্যেক সত্যবাদীর বাসনা পূরণকারী। আলোচ্য গ্রন্থটিকে আমি তেরোটি অধ্যায়ে বিভক্ত করেছি। এগুলো দ্বারা শয়তানের ফাঁদ খুলে যাবে এবং বুদ্ধিমানদের জন্য তার ধোঁকা সম্পর্কে অবহিত হওয়া সহজতর হবে। আল্লাহ তায়ালার যে সকল বান্দা এসবের ওপর আমলের দৃঢ় অঙ্গীকার করবে, শয়তান তার কাছে পরাজিত হয়ে দূরে পালাতে বাধ্য হবে। আল্লাহ তায়ালা আমাকে অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছার ব্যাপারে তাওফিকদাতা ও সাহায্যকারী এবং সঠিক কথা আমার অন্তরে প্রবিষ্ট করাবেন তিনিই।

---

২ সহিহ বুখারি : হাদিস নং ৩৬০৬-৭০৮৪; সহিহ মুসলিম : হাদিস নং ১৮৪৭

প্রথম অধ্যায়

সুন্নত ও জামাতের আবশ্যিকতা



হাদিস শরিফে এসেছে :

عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ عُمَر بْن الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، خَطَبَ بِالْجَابِيَةِ، فَقَالَ قَامَ فِينَا رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: " مَنْ أَرَادَ مِنْكُمْ بَحْبُوحَةَ الْجَنَّةِ، فَلْيَلْزَمِ الْجَمَاعَةَ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ مَعَ الْوَاحِدِ، وَهُوَ مِنَ الاثْنَيْنِ أَبْعَدُ

আবদুল্লাহ ইবনে উমর রা. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'জাবিয়া' (সিরিয়ার অন্তর্গত) নামক জায়গায় উমর রা. আমাদের সামনে খুতবা দেয়ার উদ্দেশ্যে দাঁড়িয়ে বলেন, হে উপস্থিত জনতা! যেভাবে আমাদের মাঝে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দাঁড়াতেন, সেভাবে তোমাদের মাঝে আমিও দাঁড়িয়েছি। তারপর তিনি [রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)] বলেন, যে লোক জান্নাতের মধ্যে সবচাইতে উত্তম জায়গার ইচ্ছা পোষণ করে সে যেন ঐক্যবদ্ধ হয়ে থাকে। কেননা শয়তান বিচ্ছিন্নজনের সাথে থাকে এবং সে দুজন হতে অনেক দূরে অবস্থান করে।'[১]

চারটি সূত্রে উক্ত হাদিসটি বর্ণনা করা হয়েছে—১. উল্লেখিত হাদিসটি ইমাম তিরমিযি তাঁর *সুনানে* বর্ণনা করেছন এবং এটিকে সহিহ বলেছেন। ২. জাবির ইবনে সামুরা রা. হতে বর্ণিত, প্রাগুক্ত,[২] ৩. ইবনে আবি আসেম 'আস্‌সুন্নাহ' গ্রন্থে ৮৭ নম্বরে হাদিসটি বর্ণনা করেছেন।[৩] ৪. প্রাগুক্ত। হাদিসগুলোর প্রেক্ষাপট ভিন্ন ভিন্ন হলেও শেষাংশের বক্তব্য অভিন্ন—যে লোক জান্নাতের মধ্যে সবচাইতে উত্তম জায়গার ইচ্ছা পোষণ করে সে যেন ঐক্যবদ্ধ হয়ে থাকে। কেননা, শয়তান বিচ্ছিন্নজনের সাথে থাকে এবং সে দুজন হতে অনেক দূরে পালায়।

হজরত আরফাজাহ রা. বলেন, আমি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন,

'জামাতের ওপর আল্লাহর হাত রয়েছে। অন্যথায় যে ব্যক্তি জামাতের বিরোধিতা করবে শয়তান তার সঙ্গী হয়ে যায়।'[৪]

---

১ [সনদ সহিহ] সুনানে তিরমিযি : হাদিস নং ২১৬৬; মুসনাদে আহমাদ : ১১৪; মুসতাদরাকে হাকিম : ১/১৪১।

২ [সনদ সহিহ] মুসনাদে আহমাদ : ১৭৭।

৩ [সনদ হাসান] তালিকে আলবানি আলাস সুন্নাতি লিইবনি আবি আসিম : ৮৭, ৮৯।

৪ সুনানে নাসায়ী : ৭/৯২ (আলবানি এটাকে সহিহ বলেছেন।) দ্র. সহিহ নাসায়ী হাদিস নং ৩৭৫৩

হজরত উসামা ইবনে শারীক রা. বলেন, আমি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন,

জামাতের ওপর আল্লাহর হাত রয়েছে। যারা জামাত ছেড়ে পৃথক হয়ে যাবে, শয়তান তাকে ছিনিয়ে নিয়ে যাবে। যেমন বাঘ ছাগলের পাল থেকে বিচ্ছিন্ন ছাগলকে ছিনিয়ে নেয়।[১]

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ : خَطَّ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم خَطًّا بِيَدِهِ، ثُمَّ قَالَ: " هَذَا سَبِيلُ اللَّهِ مُسْتَقِيمًا "، قَالَ: ثُمَّ خَطَّ عَنْ يَمِينِهِ وَشِمَالِهِ، ثُمَّ قَالَ: " هَذِهِ السُّبُلُ لَيْسَ مِنْهَا سَبِيلٌ إِلا عَلَيْهِ شَيْطَانٌ يَدْعُو إِلَيْهِ "، ثُمَّ قَرَأَ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ

হজরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. বলেন, রাসুলুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর হাত দিয়ে সোজা একটি রেখা এঁকে বললেন, এটা আল্লাহ তায়ালার সরল ও সঠিক পথ। তারপর সেই রেখার ডানে বাঁয়ে আরও কয়েকটি রেখা আঁকলেন। অতঃপর বললেন, এগুলো এমন পথ, যার প্রত্যেকটিতেই শয়তান রয়েছে। সে সবাইকে তার পথে আহ্বান করে। পরে তিনি এ আয়াত পড়লেন— إِنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ "নিশ্চয় এটাই আমার সরল পথ। সুতরাং তোমরা এরই অনুসরণ করো এবং অন্যান্য পথ অনুসরণ কোরো না।"[২]

হজরত মুয়াজ ইবনে জাবাল রা. হতে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

" إِنَّ الشَّيْطَانَ ذِئْبُ الإِنْسَانِ كَذِئْبِ الْغَنَمِ يَأْخُذُ الشَّاةَ الْقَاصِيَةَ وَالنَّاحِيَةَ، فَإِيَّاكُمْ وَالشِّعَابَ وَعَلَيْكُم بِالْجَمَاعَةِ وَالْعَامَّةِ وَالْمَسْجِدِ

'শয়তান মানুষের জন্য নেকড়ে বাঘস্বরূপ। যেমনই ছাগলের পাল থেকে বিচ্ছিন্ন ছানাকে একা পেলে নেকড়ে বাঘ আক্রমণ করে বসে। অতএব সাবধান! তোমরা বিচ্ছিন্ন হয়ে বিভিন্ন পথে চলা থেকে বেঁচে থাক।

---

১ হাইশামী রহ. তাঁর 'মাজমা' গ্রন্থে হাদিসটি উল্লেখ করেছেন। ৫/২১৮

২ মুসনাদে আহমাদ, ইবনে মাজাহ ও মুসতাদরাকে হাকিম

তোমাদের জন্য জামাত, সর্বসাধারণ মুমিন ও মসজিদ অবলম্বন করা আবশ্যক।'[৩]

হজরত আবু যর রা. হতে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,

" اثْنَانِ خَيْرٌ مِنْ وَاحِدٍ وَثَلاثَةٌ خَيْرٌ مِنَ اثْنَيْنِ، وَأَرْبَعَةٌ خَيْرٌ مِنْ ثَلاثَةٍ، فَعَلَيْكُمْ بِالْجَمَاعَةِ، فَإِنَّ اللَّهَ لَمْ يَجْمَعْ أُمَّتِي إِلا عَلَى الْهُدَى

'একজন থেকে দু'জন উত্তম, দু'জন থেকে তিনজন এবং তিনজন থেকে চারজন উত্তম। সুতরাং তোমাদের জন্য জামাতে অবস্থান করা অপরিহার্য। কেননা আল্লাহ তায়ালা আমার উম্মতকে হেদায়েত ছাড়া সমবেত করেন না।'[৪]

হজরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর রা. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,

لَيَأْتِيَنَّ عَلَى أُمَّتِي كَمَا أَتَى عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ حَذْوَ النَّعْلِ بِالنَّعْلِ حَتَّى إِنْ كَانَ مِنْهُمْ مَنْ أَتَى أُمَّهُ عَلانِيَةً لَكَانَ فِي أُمَّتِي مَنْ يَصْنَعُ ذَلِكَ، وَإِنَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ تَفَرَّقَتْ عَلَى ثِنْتَيْنِ وَسَبْعِينَ مِلَّةً، وَتَفْتَرِقُ أُمَّتِي عَلَى ثَلاثٍ وَسَبْعِينَ مِلَّةً كُلُّهُمْ فِي النَّارِ، إِلا مِلَّةً وَاحِدَةً "، قَالُوا: مَنْ هِيَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: " مَا أَنَا عَلَيْهِ وَأَصْحَابِي

'বনী ইসরাইল যে অবস্থায় পতিত হয়েছিল, নিঃসন্দেহে আমার উম্মতও সেই অবস্থার সম্মুখীন হবে, যেমন একজোড়া জুতার একটি আরেকটির মতো হয়ে থাকে। এমনকি তাদের মধ্যে কেউ যদি প্রকাশ্যে তার মায়ের সাথে ব্যভিচার করে থাকে, তবে আমার উম্মতের মধ্যেও কেউ তা-ই করবে। আর বনি ইসরাইল বাহাত্তর দলে বিভক্ত হয়েছিল। আমার উম্মত তিয়াত্তর দলে বিভক্ত হবে। শুধু একটি দল ছাড়া তাদের সবাই জাহান্নামি

---

৩ মুসনাদে আহমাদ ও তবরানী : ৫/২১৯

৪ (মাউযু) হাদিসটি আল্লামা আলবানি রহ. তাঁর 'যাঈফুল জামে' গ্রন্থের ১৩৬ নম্বরে এবং 'আয্যঈফা' গ্রন্থের ১৭৯৭ নম্বরে উল্লেখ করেছেন।

হবে। সাহাবিগণ বললেন, হে আল্লাহর রাসুল! সে দল কোনটি? তিনি বললেন, আমি ও আমার সাহাবিগণ যার উপর প্রতিষ্ঠিত।'[১]

উক্ত হাদিসটিকে ইমাম তিরমিযি রহ. 'হাসান' ও 'গারিব' বলেছেন। এর সূত্র হতে মাত্র একটি হাদিসই পাওয়া গেছে বলে তিনি এই অভিমত পেশ করেছেন। ইমাম আবু দাউদ রহ. তাঁর *সুনান* গ্রন্থে হজরত মুয়াবিয়া ইবনে আবি সুফিয়ান রা. এর হাদিস বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের সামনে দাঁড়িয়ে বললেন, হুঁশিয়ার হয়ে যাও! আহলে কিতাব—যারা তোমাদের পূর্বে গত হয়েছে—তারা ৭২টি দলে বিভক্ত হয়ে পড়েছিল। আর এই উম্মত অতিসত্বর ৭৩টি দলে বিভক্ত হয়ে পড়বে। তন্মধ্যে ৭২টি দলই জাহান্নামি, আর একটিমাত্র দল হবে জান্নাতি।[২] হজরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. বলেন,

'সুন্নত তরিকায় মধ্যপন্থায় ইবাদত করা বিদয়াতের পন্থায় বহু কষ্ট-পরিশ্রমলব্ধ ইবাদত অপেক্ষা উত্তম।'

হজরত উবাই ইবনে কাআব রা. বলেন,

'সঠিক পন্থা ও সুন্নতমতো চলা তোমাদের জন্য আবশ্যক। কেননা যে ব্যক্তি আল্লাহর পথ ও রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সুন্নাতের ওপর অটল থেকে মহান দয়াময় আল্লাহ তায়ালাকে স্মরণ করবে এবং তাঁর ভয়ে চোখ থেকে অশ্রু বের হবে, সেটা কখনো জাহান্নামের অগ্নি স্পর্শ করবে না। আল্লাহর পথ ও রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সুন্নাতের অনুসারীদের জন্য মধ্যপন্থায় ইবাদত করা অনেক উত্তম, তাদের তুলনায়—যারা আল্লাহর পথ ও রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সুন্নাতের অনুসরণ না করে বহু কষ্ট ও পরিশ্রম বরদাশত করে।'

হজরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. বলেন,

'সুন্নতের অনুসারী হয়ে সুন্নতের আহ্বান করে ও বিদয়াত হতে বাধাদান করে, এমন লোকের দিকে তাকানো ইবাদত।'

---

১ হাদিসটি ইমাম তিরমিযি তাঁর 'সুনান' গ্রন্থের হাদিস নং ২৬৪১ তে উল্লেখ করেছেন। লেখক আল্লামা ইবনুল জাওযি রহ. এর সনদের আবদুর রহমান ইবনে যিয়াদ আল আফরিকী একজন যঈফ রাবী।

২ সুনানে আবি দাউদ : হাদিস নং ৪৫৯৭। হাদিসটিকে আলবানি রহ. সহিহ বলেছেন এবং তাঁর 'সহিহুল জামে' গ্রন্থের ২৬৪১ ও 'আস্‌সহিহা' গ্রন্থের ২০৪ নম্বরে উল্লেখ করেছেন।

বিখ্যাত তাবেয়ি আবুল আলিয়া রহ. বলেন, 'তোমাদের জন্য ওই সকল ব্যক্তিবর্গের পন্থা অবলম্বন করা আবশ্যক, যারা ঈমানদারদের বিভক্ত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত একতাবদ্ধ ছিলেন।' আসেম রহ. বলেন, আমি আবুল আলিয়া রহ. এর কথা হজরত হাসান বসরি রহ. এর কাছে উপস্থাপন করলে তিনি বলেন, 'হ্যাঁ, আল্লাহর শপথ! আবুল আলিয়া সত্য বলেছেন এবং তোমাদেরকে উত্তম উপদেশ দিয়েছেন।'

আওযায়ি রহ. বলেন, 'সুন্নতের ওপর অটল থাকো। যেখানে সাহাবায়ে কেরাম চুপ থেকেছেন, সেখানে তোমরাও চুপ থাকো। যেখানে তাঁরা কথা বলেছেন, সেখানে তোমরাও কথা বলো। যেখানে তাঁরা বাধা দিয়েছেন, সেখানে তোমরাও বাধা দাও। দীনের পূর্বসূরি তথা সাহাবায়ে কেরামের পথে চলো। তাহলে তোমরাও তা পাবে, যা তাঁরা পেয়েছিলেন।'

আওযায়ি রহ. বলেন, 'আমি মহান আল্লাহ তায়ালাকে স্বপ্নে দেখেছি। তিনি বলেছেন, হে আবদুর রহমান! তুমি সৎ কাজের আদেশ করো এবং অসৎ কাজ থেকে বিরত রাখো?! আমি বললাম, হে আমার পালনকর্তা! আপনার অনুগ্রহেই সেই সৌভাগ্য আমার হয়েছে। আমি আল্লাহর কাছে কামনা করেছি, হে আমার প্রতিপালক! আপনি আমাকে ইসলামের ওপর মৃত্যু দান করুন। তিনি বললেন, সুন্নতের ওপরও।'

সুফিয়ান সাওরি রহ. বলতেন, 'কোনো কথা সঠিক হয় না, যতক্ষণ পর্যন্ত তার ওপর আমল করা না হয়। কোনো কথা ও কাজ সঠিক হয় না, যতক্ষণ পর্যন্ত নিয়ত বিশুদ্ধ না হয়। কোনো কথা, কাজ ও নিয়ত সঠিক হয় না, যতক্ষণ পর্যন্ত তা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সুন্নত অনুযায়ী না হয়।'

ইউসুফ ইবনে আসবাত বলেন, আমাকে সুফিয়ান সাওরি রহ. বলেছেন, 'যদি তোমার কাছে সংবাদ আসে যে, অমুক ব্যক্তি পৃথিবীর পূর্ব প্রান্তে সুন্নাতের ওপর অটল রয়েছে, তাহলে তাকে সালাম পৌছাও। আর যদি তোমার কাছে সংবাদ আসে যে, অমুক ব্যক্তি পৃথিবীর পশ্চিম প্রান্তে সুন্নাতের ওপর অটল রয়েছে, তাহলে তাকে সালাম পৌছাও। কেননা আহলে সুন্নত ওয়াল জামাত খুবই কম অবশিষ্ট রয়েছে।'

আইয়ুব সাখতিয়ানি রহ. বলেন, 'আমি যখন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর তরিকার ওপর আমলকারী কোনো ব্যক্তির মৃত্যুসংবাদ শুনি,

তখন তাঁর চলে যাওয়া আমার কাছে এমন মনে হয় যেন আমার শরীরের কোনো অংশ দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাচ্ছে।'

আইয়ুব রহ. আরও বলেন, 'আরব-অনারব উভয়ের সফলতার অন্যতম নিদর্শন হচ্ছে, আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে আহলে সুন্নত ওয়াল জামাতের আলেম দান করেছেন।'

আবদুল্লাহ ইবনে শাওযাব রহ. বলেন, 'যুবকেরা আল্লাহর আনুগত্যে মনোযোগী হলে, তার ওপর আল্লাহ তায়ালার সবচেয়ে বড় নেয়ামত হচ্ছে তাকে ভ্রাতৃত্ব সম্পর্ক এমন ব্যক্তিদের সাথে তৈরি করে দেন, যারা সুন্নাতের অনুসারী।'

ইউসুফ ইবনে আসবাত বলেন, আমার পিতা মুতাযিলা সম্প্রদায়ের কদরি অনুসারী ছিলেন। আর আমার মামারা ছিলেন রাফেযি। আমি আল্লাহ তায়ালার শুকরিয়া আদায় করছি যে, তিনি ইমাম সুফিয়ান সাওরি রহ. এর উসিলায় আমাকে ওই উভয় ভ্রান্ত সম্প্রদায় থেকে বের করে মুক্তি দিয়েছেন।

মু'তামির ইবনে সুলাইমান তামিমি বলেন, আমি আমার পিতার সম্মুখে উপস্থিত হলাম। তখন আমি খুবই ভগ্নমনা ছিলাম। তিনি আমাকে দেখে বললেন, তোমার কী হয়েছে? আমি বললাম, আমার এক বন্ধু মৃত্যুবরণ করেছে। তিনি আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, সে কি সুন্নত তরীকায় থেকে মারা গেছে? আমি বললাম, হ্যাঁ। তিনি বললেন, তাহলে তার জন্য কোনো দুশ্চিন্তা কোরো না।

সুফিয়ান সাওরি রহ. বলেন, 'আহলে সুন্নাতের ব্যাপারে সর্বদা ভালো ও সদাচারের উপদেশ দাও। কেননা এরা বড়ই বেদুইন।'[১] ইমাম আবু বকর ইবনে আইয়্যাশ রহ. বলেন, 'শিরক ও বাতিল ধর্মের তুলনায় ইসলাম যেমন দুর্লভ ও বিরল, তদ্রূপ বিদয়াতপন্থীদের তুলনায় আহলে সুন্নত ওয়াল জামাত নিতান্ত বিরল।' ইমাম শাফেয়ি রহ. বলেন, 'যখন আমি হাদিস ও সুন্নাতের অনুসারী কাউকে দেখতে পাই, তখন মনে করি যেন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাহাবাদের মধ্য থেকে কাউকে দেখছি।'[২]

---

১ আবু নুয়াইম প্রণীত 'আল হিলইয়া' : ৯/১০৯; বায়হাকি প্রণীত 'মানাকিবুশ শাফেয়ি' : ১/৪৩৭।

২ [সনদ সহিহ] আবু নুয়াইম প্রণীত 'আল হিলইয়া' : ৯/১০৯।

জুনাইদ রহ. বলেন, 'নেকির সমস্ত রাস্তা মাখলুকের জন্য বন্ধ। কিন্তু তার জন্য বন্ধ নয়, যে ব্যক্তি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর অনুসরণ করেছে এবং রাসুলের তরিকাকে দৃঢ়তার সাথে ধরেছে। নেকির সকল রাস্তা তার জন্য উন্মুক্ত।'[৩]

জুনাইদ ইবনে মুহাম্মাদ রহ. অন্যত্র বলেন, 'আল্লাহ তায়ালার নৈকট্য অর্জনের সকল রাস্তা বন্ধ। কিন্তু ওই মুমিনদের জন্য বন্ধ নয়, যারা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর অনুসরণ করে ও তাঁর সুন্নত মতে চলে। যেমন আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেছেন :

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ

অবশ্যই তোমাদের জন্য রাসুলুল্লাহর মধ্যে রয়েছে উত্তম আদর্শ।[৪]

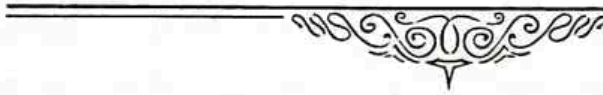
---

৩ [সনদ সহিহ] আল হিলইয়া : ১০/২৫৭; খতিব বাগদাদি প্রণীত 'আল ফকিহ ওয়াল মুতাফাক্কিহ' : ১/১৫০।

৪ সুরা আহযাব : আয়াত ২১

দ্বিতীয় অধ্যায়

বিদয়াত ও বিদয়াতিদের নিন্দার বর্ণনা



হাদিস শরিফে এসেছে : হজরত আয়েশা রা. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا مَا لَيْسَ فِيهِ فَهُوَ رَدٌّ

'যে ব্যক্তি আমাদের পক্ষ থেকে স্বীকৃত নয় এমন কোনো আমলের প্রচলন করল, তা প্রত্যাখ্যাত হবে।'[১]

উক্ত হাদিস ভিন্ন আরও কয়েকটি সনদেও হজরত আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত আছে। হজরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর রা. হতে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

مَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي

'যারা আমার সুন্নাতের প্রতি বিরাগ পোষণ করবে, তারা আমার দলভুক্ত নয়।'[২]

আবদুর রহমান ইবনে আমর ও হুজর ইবনে হুজর আলকালায়ী হজরত ইরবাজ ইবনে সারিয়া রা. এর সাথে সাক্ষাৎ করেন। এই ইরবাজ ইবনে সারিয়া ওই সকল সাহাবিদের অন্তর্ভুক্ত—যাদের সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেছেন, وَلَا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ "আর তাদের উপরও কোন দোষ নেই, যারা তোমার কাছে আসে, যাতে তুমি তাদের বাহন জোগাতে পার। তুমি বললে, 'আমি তোমাদেরকে বহন করানোর জন্য কিছু পাচ্ছি না, তখন তারা ফিরে গেল, তাদের চোখ অশ্রুতে ভেসে যাওয়া অবস্থায়, এ দুঃখে যে, তারা পাচ্ছে না এমন কিছু যা তারা ব্যয় করবে।"[৩] আমরা সেই ইরবাজ রা.-কে সালাম দিয়ে বললাম, আমরা আপনার খেদমতে আপনাকে দর্শন করে সৌভাগ্যবান হওয়ার মনোবাসনা নিয়ে এসেছি এবং আপনার থেকে কিছু ইলমী ফয়েজ নিয়ে যাব। ইরবাজ রা. বললেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদিন ফজরের নামাযের পর আমাদেরকে মর্মস্পর্শী ওয়াজ শোনালেন, যাতে (আমাদের) সকলের চোখে পানি এল এবং অন্তর কেঁপে উঠল। কোনো একজন বলল, এ তো বিদায়ী ব্যক্তির নসিহতের মতো। হে আল্লাহর রাসুল! অতএব

---

১ সহিহ বুখারি ও মুসলিম

২ সহিহ বুখারি : হাদিস নং ৫০৬৩, সহিহ মুসলিম : হাদিস নং ১৪০১

৩ সুরা তাওবাহ : আয়াত ৯২

আমাদেরকে কিছু অসিয়ত করুন? রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন,

أُوصِيكُمْ بِتَقْوَى اللَّهِ وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ، وَإِنْ عَبْدًا حَبَشِيًّا، فَإِنَّهُ مَنْ يَعِيشْ بَعْدِي فَسَيَرَى اخْتِلافًا كَثِيرًا، فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ مِنْ بَعْدِي، تَمَسَّكُوا بِهَا، وَعَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ، وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الأُمُورِ، فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ، وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلالَةٌ

'আমি তোমাদেরকে আল্লাহ তায়ালাকে ভয় করার এবং (নেতৃ-আদেশ) শ্রবণ ও মান্য করার উপদেশ দিচ্ছি, যদিও সে (নেতা) হাবশি ক্রীতদাস হয়ে থাকে। তোমাদের মধ্যে যারা বেঁচে থাকবে, তারা বহু বিভেদ-বিসংবাদ প্রত্যক্ষ করবে। তোমরা নতুন নতুন বিষয় আবিষ্কার করা হতে দূরে থাকবে। কেননা তা গোমরাহী। তোমাদের মধ্যে কেউ সে যুগ পেলে সে যেন আমার সুন্নাতে ও সৎপথপ্রাপ্ত খুলাফায়ে রাশিদিনের সুন্নাতে দৃঢ়ভাবে অবিচল থাকে। তোমরা এসব সুন্নতকে চোয়ালের দাঁতের সাহায্যে শক্তভাবে আঁকড়ে ধরো। হুঁশিয়ার! হুঁশিয়ার! তোমরা নব আবিষ্কৃত কথা থেকে দূরে থাকবে। কেননা প্রত্যেক নব আবিষ্কৃত বিষয় বিদয়াত, আর প্রত্যেক বিদয়াত পথভ্রষ্টতা।'[১] ইমাম তিরমিযি রহ. বলেন, হাদিসটি 'হাসান সহিহ'।

হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ রা. সূত্রে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণিত, তিনি বলেন,

'আমি তোমাদের আগে হাউয-এর কাছে গিয়ে হাজির হব। আর (ওই সময়) তোমাদের কতগুলো লোককে অবশ্যই আমার সামনে উঠানো হবে। আবার আমার সামনে থেকে তাদেরকে আলাদা করে নেয়া হবে। তখন আমি বলব, হে প্রতিপালক! এরা তো আমার উম্মত। তখন বলা হবে, তোমার পরে এরা কী নতুন কাজ ও পথ বের করেছে তা তুমি জানো না।'[২]

হাদিসটি বুখারি ও মুসলিম তাঁদের 'সহিহ' গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন।

---

১ আবু দাউদ : হাদিস নং ৪৬০৭; তিরমিযি : হাদিস নং ২৬৭৬; ইবনে মাজাহ : হাদিস নং ৪২, ৪৩ ও ৪৪ (আলবানি হাদিসটি সহিহ বলেছেন)

২ সহিহ বুখারি : হাদিস নং ৬৫৭৫ ও ৬৫৭৬; সহিহ মুসলিম : হাদিস নং ২২৯৭

আবদুল্লাহ ইবনে মুহাররিয[৩] বলেন, একটি একটি করে সুন্নত যেতে যেতে দীন চলে যাবে।

মা'মার রহ. বলেন, একবার বিখ্যাত তাবেয়ি তাউস বসা ছিলেন, তাঁর পাশে বসা ছিল তাঁর ছেলে। ইত্যবসরে মুতাযিলা সম্প্রদায়ের জনৈক ব্যক্তি এল এবং শরিয়তের বিষয়ে ভ্রান্ত বিশ্বাসমূলক কথোপকথন শুরু করল। তাউস রহ. তার উভয় কানে আঙ্গুল দিয়ে ছেলেকেও বললেন, হে বৎস! তুমিও কানে আঙ্গুল দাও—যাতে তার কথা শুনতে না পাও। কেননা এই অন্তর দুর্বল। পরে বললেন, হে বৎস! খুব দৃঢ়ভাবে কানে আঙ্গুল দিয়ে রাখো। তারপর বারবার একই কথা বলতে থাকলেন যে, দৃঢ়ভাবে কানে আঙ্গুল দিয়ে রাখো। এমতাবস্থায় ওই মুতাযিলা অনুসারী লোকটি ওঠে চলে গেল।[৪]

ঈসা ইবনে আলী আযযাবি বলেন, আমাদের সাথে এক ব্যক্তি ইবরাহিম রহ. এর খেদমতে আসা-যাওয়া করত। একসময় ইবরাহিম রহ. জানতে পারেন যে, এই লোক মুরজিয়া সম্প্রদায়ের অনুসারী। পরে ইবরাহিম রহ. বললেন, এবার যাওয়ার পর পুনরায় আমাদের এখানে আসবে না।

মুহাম্মাদ ইবনে দাউদ হাদ্দাদ বলেন, আমি সুফিয়ান ইবনে উয়াইনাকে বললাম, এই ব্যক্তি যার নাম ইবরাহিম ইবনে আবি ইয়াহইয়া—সে তাকদিরের ব্যাপারে বিভ্রান্তিমূলক আপত্তি করে থাকে। এ কথা শুনে সুফিয়ান ইবনে উয়াইনা রহ. আমাকে বললেন, মানুষকে তাদের সম্পর্কে সাবধান করতে থাকো এবং আল্লাহর কাছে নিরাপত্তা প্রার্থনা করো।

সালেহ বলেন, আমি ইবনে সিরিন রহ. এর কাছে বসা ছিলাম। ইত্যবসরে এক ব্যক্তি এসে তাকদিরের বিভিন্ন দরজার একটি দরজা খুললে ইবনে সিরিন রহ. তাকে বলেন, তুমি চলে যাও; নতুবা আমিই চলে যাব। ইবনে আবি মুতী' হতে বর্ণিত, জনৈক বিদয়াতি ব্যক্তি বলল, আপনাকে একটি কালিমা বলব। তিনি বললেন, না; অর্ধেকও বোলো না। বিখ্যাত তাবেয়ি আইয়ুব সাখতিয়ানি বলেন, বিদয়াতিরা যে পরিমাণ কষ্ট-ত্যাগ সহ্য করতে থাকে, আল্লাহ তায়ালার কাছ থেকে তারা ততবেশি দূরে সরতে থাকে।

হজরত সুফিয়ান সাওরি রহ. বলেন, ইবলিস অন্যান্য গুনাহের চেয়ে বিদয়াতকে অধিক পছন্দ করে। কেননা গুনাহ থেকে তাওবা করার সুযোগ

---

৩ হাফেজ জাহাবি বলেন, তিনি 'মাতরুকুল হাদিস'। তিনি আবু জাফরের খেলাফতকালে ইন্তেকাল করেছেন। ইমাম ইবনে মাজাহ রহ. তাঁর থেকে বর্ণনা করেছেন।

৪ [সনদ সহিহ]।

থাকে। কিন্তু বিদয়াত এমন অপরাধ, যা থেকে তাওবা করার সুযোগ থাকে না।[১]

মুয়াম্মিল ইবনে ইসমাঈল রহ. বলেন, আবদুল আযিয ইবনে আবি রাওয়াদ ইন্তেকাল করলে আমি তার জানাযায় উপস্থিত হই। তার জানাযা 'বাবুস সাফা'য় রাখা হয়। সেখানে মানুষজন নামায পড়ার জন্য কাতারবন্দি হয়। ইত্যবসরে সুফিয়ান সাওরি রহ.-কে দেখা যায়। লোকজন বলছে, সুফিয়ান সাওরি এসেছেন। তিনি এসেছেন, তা আমিও দেখেছি। কিন্তু তিনি এসেই জানাযার সামনে দিয়ে ফিরে চলে গেলেন। অর্থাৎ জানাযার নামায পড়লেন না। না পড়ার কারণ হচ্ছে, মৃত লোকটি ছিল মুরজিয়া সম্প্রদায়ের অনুসারী।

সুফিয়ান সাওরি রহ. বলেন, যে ব্যক্তি বিদয়াতিদের কাছ থেকে ইলম শেখে, আল্লাহ সেই ইলম দ্বারা তাকে উপকৃত করবেন না। আর যে ব্যক্তি বিদয়াতির সাথে হাত মেলাবে, সে যেন ইসলামের মন ভেঙ্গে দিল। (অর্থাৎ কষ্ট দিল)

সাঈদ আলকারিযি রহ. বলেন, একবার সুলাইমান তামিমি অসুস্থ হয়ে পড়লে তিনি ভীষণ কান্না করতে থাকেন। তাকে বলা হলো, আপনি কি মৃত্যুর ভয়ে ক্রন্দন করছেন? তিনি বললেন, না; বরং আমি এ জন্য কাঁদছি যে, একদিন আমি এক বিদয়াতির কাছে গিয়েছিলাম, যে তাকদিরে বিশ্বাসী ছিল না এবং মাখলুককে সর্বময় ক্ষমতাবান মনে করত। আমি তাকে সালাম দিয়ে ফেলেছিলাম। এখন আমার ভীষণ ভয় করছে, আমার মহান প্রতিপালক আল্লাহ তায়ালা সে ব্যাপারে আমাকে জিজ্ঞাসাবাদ করেন কি না!

ফুযাইল বিন আয়ায বলতেন, যে ব্যক্তি কোনো বিদয়াতিকে ভালোবাসবে, আল্লাহ তায়ালা তার নেক আমল ধ্বংস করে দেবেন এবং ইসলামের নূর তার অন্তর থেকে উঠিয়ে নেবেন। ফুযাইল রহ. এমনও বলতেন, যখন তুমি বিদয়াতিকে কোনো রাস্তায় দেখো, তখন ওই রাস্তা ছেড়ে তুমি ভিন্ন রাস্তায় হাঁটবে। বিতয়াতীদের কোনো ভালো আমলই আল্লাহ তায়ালার দরবারে উঠানো হয় না। যে ব্যক্তি বিদয়াতিদের সাথে উঠাবসা করে তাকে দীনের হেকমত ও মারেফত দেয়া হয় না। আল্লাহ তায়ালা কাউকে বিদয়াতিদের

---

১ ইবনুল জা'দ হতে মুসনাদে এ বর্ণনাটি উদ্ধৃত : ১৮৮৫।

সাথে শত্রুতা পোষণ করতে দেখলে, আমার মনে হয় তাকে আল্লাহ তায়ালা ক্ষমা করে দেবেন।[২]

গ্রন্থকার আল্লামা ইবনুল জাওযি রহ. বলেন, এ সংক্রান্ত কিছু কথা হাদিসেও বর্ণনা করা হয়েছে। উম্মুল মুমিনীন হজরত আয়েশা রা. বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন,

مَنْ وَقَرَ صَاحِبَ بِدْعَةٍ فَقَدْ أَعَانَ عَلَى هَدْمِ الإِسْلاَمِ

'যে ব্যক্তি বিদয়াতিকে সম্মান করল, সে ইসলামকে ধ্বংস করে দিতে সাহায্য করল।'[৩]

মুহাম্মাদ ইবনে নসর জারি রহ. বলেন, যে ব্যক্তি বিদয়াতিদের কথা শোনার জন্য কান পাতে, সে আল্লাহর নিরাপত্তা থেকে বেরিয়ে যায়। তাকে তার মনের ওপর ছেড়ে দেয়া হয়। লাইস ইবনে সাবেত রহ. বলতেন, আমি যদি দেখি বিদয়াতিরা শূন্যে উড়ছে, তবুও আমি তার অনুসরণ করব না।

বিশ্‌র আলহাফি বলতেন, আমি বাজারে বিদয়াতিদের মুরুব্বি মুরাইসির মৃত্যুসংবাদ শুনতে পাই। যদি খ্যাতির আশঙ্কা না হতো, তাহলে আমি আল্লাহর শোকর আদায় করে সিজদা করতাম এবং বলতাম- 'আল্লাহ তায়ালার শোকর—যিনি ফিতনা সৃষ্টিকারী বিদয়াতিকে মৃত্যু দিয়েছেন।' আর মানুষকেও এ কথা বলতে বলতাম।

গ্রন্থকার বলেন, আমার কাছে এ বার্তা এসেছে যে, মুহাম্মাদ ইবনে সাহান বুখারি বলেন, আমরা একবার ইমাম গাযালি রহ. এর মজলিসে উপস্থিত ছিলাম। তিনি বিদয়াতিদের ভ্রান্তিমূলক কথাবার্তার কুৎসা ও নিন্দা করে আলোচনা আরম্ভ করলে আমাদের মধ্য থেকে একজন আরয করল, আপনি যদি এই আলোচনা ছেড়ে আমাদেরকে হাদিস শোনাতেন, তাহলে আমরা অধিক খুশি হতাম। ইমাম গাযালি রহ. এতে রাগ হয়ে গেলেন এবং বললেন, বিদয়াতিদের প্রতিবাদ করা এবং তাদের রোধ করার উদ্দেশ্যে কাজ করা আমার কাছে ষাট বছর ইবাদতের চেয়ে উত্তম।

---

২ আবু নুয়াইম প্রণীত 'আল হিলইয়া' : ৮/১০৩, ১০৪।

৩ [মুনকার] বর্ণনাটি হাসান ইবনে ইয়াহইয়া আল খুশানির জীবনিতে ইবনে আদি উদ্ধৃত করেছেন। আল কামিল : ২/৩২৪; ইবনুল জাওযি প্রণীত 'আল মাওযুয়াত' : ১/২৭১। তিনি বলেছেন, এটি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ব্যাপারে মনগড়া কথা।

সুন্নত ও বিদয়াতের সংজ্ঞা

গ্রন্থকার বলেন, এখানে কেউ আমাকে প্রশ্ন করতে পারেন, আপনি তো সুন্নাতের প্রশংসা এবং বিদয়াতের নিন্দা বিষয়ক আলোচনা করেছেন, এবার আমাদেরকে সুন্নত ও বিদয়াতের সংজ্ঞা সম্পর্কে ধারণা দিন। কেননা অনেক বিদয়াতিকে দেখা যায়, তারা নিজেদেরকে আহলে সুন্নাতের অনুসারী মনে করে।

তদুত্তরে বলা হবে, সুন্নাতের আভিধানিক অর্থ 'পথ'। এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, যারা হাদিস ও আসার অনুসারী—তারা বিশুদ্ধ সূত্রে প্রাপ্ত রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর সাহাবাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে থাকে। এরাই আহলে সুন্নত। কেননা এরাই সেই পথের অনুসারী যাদের মধ্যে নব আবিষ্কৃত কোনো কথা, প্রথা বা বিষয় অন্তর্ভুক্ত হয়নি। কেননা বিদয়াত এবং দীনে নিত্যনতুন আবিষ্কার তো রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং সাহাবায়ে কেরাম রা.-এর পরে প্রকাশ পেয়েছে।

অন্যদিকে বিদয়াত ওইসব কর্মকাণ্ডকে বলা হয়, যার উদ্ভব নতুনভাবে ঘটেছে। ইসলামের শুরুতে যার অস্তিত্ব ছিল না।

তোমরা দেখতে পাবে, হজরত আবু বকর রা. এবং হজরত ওমর রা. হজরত যায়দ ইবনে সাবিত রা.-কে কুরআন মাজিদ একত্র করতে বললে, যায়দ রা. বলেছিলেন, আপনারা উভয়ে এমন কাজ কেন করছেন যা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম করেননি?[১]

আবদুল্লাহ ইবনে আবি সালামাহ বলেন, হজরত সাআদ ইবনে মালেক রা. এক হাজীকে তালবিয়ার সময় لَبَّيْكَ ذَا الْمَعَارِجِ বাক্য বলতে দেখে বলেছিলেন, 'আমরা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর যুগে এমন বাক্য বলতাম না।'

আবুল বুখতারি রহ. বর্ণনা করেন, জনৈক ব্যক্তি হজরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা.-কে বললেন, এখানকার মসজিদে মাগরিবের পর কিছু লোক জমায়েত হয়ে বসে। সেখানে এক ব্যক্তি বলে থাকে, তোমরা এতবার

---

১ ইমাম বুখারি রহ. বর্ণনাটি যায়দ রা.-এর হাদিস থেকে উদ্ধৃত করেছেন। বিস্তারিত : ৯/৯ আসসুলতানিয়া।

আল্লাহ তায়ালার তাকবির বলো, এতবার আল্লাহ তায়ালার তাসবিহ বলো এবং এতবার আল্লাহ তায়ালার হামদ্ বলো। এ কথা শুনে হজরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. বললেন, তারা আগামীতে এমন করতে দেখলে তোমরা আমাকে খবর দেবে। (সময়মতো তাদেরকে সেখানে জমায়েত দেখতে পেয়ে লোকেরা ইবনে মাসউদ রা.-কে সংবাদ দিলে) তিনি মজলিসে গিয়ে বসলেন। তিনি উল্লিখিত নিয়মের আলোচনা প্রত্যক্ষ করে দাঁড়িয়ে গেলেন। ইবনে মাসউদ রা. বললেন, আমি আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ। শপথ ওই মহান সত্তার, যিনি ব্যতীত আর কোনো উপাস্য নেই! তোমরা অহেতুক একটি অন্যায় বিদয়াত বের করেছ। তোমরা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাহাবাদের চেয়েও ইলমের ক্ষেত্রে আগে বেড়ে যাচ্ছ! এ কথা শুনে আমর ইবনে উতবা أستغفر الله বললেন। অতঃপর তিনি বললেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং সাহাবাদের বাতানো নিয়ম মেনে চলা তোমাদের জন্য অপরিহার্য। যদি ডানে-বাঁয়ে চলতে চাও তবে নির্ঘাত তোমরা মারাত্মক পথভ্রষ্ট হয়ে যাবে।

হাদিস বর্ণনাকারী বলেন, আল্লাহর কসম! আমরা পরে দেখেছি, ওদের অধিকাংশই পরে খারেজিদের দলভুক্ত হয়ে গেছে।

ইবনে আউফ বলেন, আমরা ইবরাহিম নখয়ি রহ. এর কাছে বসা ছিলাম। ইত্যবসরে জনৈক ব্যক্তি এসে বলল, 'হে আবু ইমরান! আপনি আমার জন্য দোয়া করুন, আল্লাহ তায়ালা যেন আমাকে আরোগ্য করেন।' আমি দেখলাম, ইবরাহিম নখয়ি রহ. তার কথাটি খুবই অপছন্দ করেছেন। তাঁর চেহারায় সেই আলামত দৃশ্যমান হলো। তিনি এর সুন্নত নিয়ম বাতলে দিয়ে উৎসাহ প্রদান করলেন। পাশাপাশি এসব ব্যাপারে মানুষের কাছ থেকে যে সকল বিদয়াত দেখা যায়, তার ক্ষতিকারক দিকগুলো সম্পর্কে অবহিত করলেন এবং নিন্দা জানালেন।

যুন্নুন মিসরি রহ.-এর কাছে মুহাদ্দিস আলেমদের কিছু ব্যক্তিবর্গ এসে প্রবৃত্তির ভয়াবহতা এবং শয়তানের প্ররোচনা সম্পর্কে কিছু জানতে চাইলে তিনি বলেন, এ ব্যাপারে আমি কিছু বলতে পারব না। কেননা এমন কথাবার্তা নব আবিষ্কৃত (বিদয়াত)। তোমরা আমার কাছে নামায-সংক্রান্ত বা হাদিস সম্পর্কে প্রশ্ন করো।

যুন্নুন মিসরি রহ. তার ছেলের পায়ে লাল মোজা দেখে বলেছিলেন, হে ছেলে! এটা খুলে ফেলো। কেননা এটা লৌকিকতা ও বিলাসিতার সামগ্রী।

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এমন মোজা পরেননি; বরং তিনি কালো সাদাসিধে মোজা পরেছেন।

আহলে সুন্নতের অপরিহার্যতা

শায়খ আবুল ফারাজ ইবনুল জাওযি বলেন, আমরা এ কথা বর্ণনা করে এসেছি যে, পূর্ববর্তী মনীষীগণ সকল প্রকার বিদয়াত থেকে দূরে থাকতেন; বাহ্যিকভাবে সেগুলোতে যদিও ক্ষতিকারক কিছু দেখা না যায়। এতে তাদের উদ্দেশ্য ছিল—শরিয়তে এমন কিছুর আবির্ভাব দেখা না দিক যা ইসলামের প্রারম্ভলগ্নে ছিল না। তথাপি এমন কিছু বিষয়ের উন্মেষ ঘটেছে যা দ্বারা শরিয়তের তেমন কোনো ক্ষতি সাধিত হয়নি। যেমন বর্ণিত আছে, রমযানের রাতে কিছু লোক একাকী নামায আদায় করতেন, আর কিছু লোক জামাতে নামায আদায় করতেন। তা দেখে হজরত ওমর রা. হজরত উবাই ইবনে কাআব রা. এর পেছনে দাঁড় করিয়ে দিলেন। এক রাত অতিবাহিত হলে সেই মুক্তাদীদের দেখে বললেন, 'এটা ভালো বিদয়াত।' কেননা জামাতের নামায শরিয়াসিদ্ধ। এ দ্বারা একই মজলিসে বহু দীনি বন্ধু মিলে যাবে। আর অধিকাংশের দোয়া আল্লাহ কবুল করেন। হাসান রহ. 'কাসাস' গ্রন্থে বলেন, ওয়াজ-মাহফিল বিদয়াত, তবে উত্তম। কেননা ওয়াজ-নসিহত শরিয়তসমর্থিত। এটা স্বতঃসিদ্ধ কথা, যে-সকল নতুন বিষয় শরিয়তের বুনিয়াদের মাধ্যমে হয়ে থাকে সেটা নিন্দনীয় নয়। বিদয়াত যদি এ মনে করে বের করা হয় যে, এটা শরিয়তের কোনো একটি উত্তম বিষয়ের সম্পূরক, তবে এটা দ্বারা শরিয়তের অপূর্ণতা বোঝা যায়। সুতরাং এটা অগ্রহণযোগ্য। এছাড়া সেটা যদি শরিয়তের কোনো মূল বিধানের পরিপন্থী হয়, তাহলে তা চরম গর্হিত।

উপরোক্ত আলোচনা দ্বারা স্পষ্ট হলো যে, আহলে সুন্নত হলো, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও খুলাফায়ে রাশেদিনের পদাঙ্ক অনুসারীরা। অন্যদিকে আহলে বিদয়াত হলো, যারা বিশুদ্ধ সূত্রে প্রাপ্ত কুরআন ও হাদিস ছেড়ে এমন বিষয় আবিষ্কার করে, যা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও খুলাফায়ে রাশেদিনের যুগে ছিল না এবং তা শরয়ি বুনিয়াদের ওপর ভিত্তি করে উদ্ভূত হয়নি। এ জন্য বিদয়াতিদের দেখবে—তারা তাদের বিদয়াত গোপন রাখে। কিন্তু আহলে সুন্নত কখনো সুন্নতকে গোপন রাখেন না। তাদের কথা স্পষ্ট এবং বিশুদ্ধ সূত্রে প্রাপ্ত। এরাই সফলকাম।

হজরত মুগিরা ইবনে শুবাহ রা. হতে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

لا يَزَالُ نَاسٌ مِنْ أُمَّتِي ظَاهِرِينَ حَتَّى يَأْتِيَهُمْ أَمْرُ اللَّهِ وَهُمْ ظَاهِرُونَ

'আমার উম্মতের একটি দল সর্বদা বিজয়ী থাকবে। এমনকি যখন কিয়ামত আসবে তখনও তারা বিজয়ী থাকবে।'[১]

হজরত সাওবান রা. হতে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,

لا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي ظَاهِرِينَ عَلَى الْحَقِّ لا يَضُرُّهُمْ مَنْ خَذَلَهُمْ حَتَّى يَأْتِيَ أَمْرُ اللَّهِ وَهُمْ كَذَلِكَ

'সর্বদা আমার উম্মতের একটি দল হকের ওপর অটল থাকবে। কেউ তাদের ক্ষতি করতে পারবে না যদিও কেউ তাদের সাহায্য না করে। এভাবেই কিয়ামত এসে যাবে।'[২]

এ অর্থে হজরত মুয়াবিয়া রা., হজরত জাবের রা., হজরত আবদুল্লাহ রা. এবং হজরত কুররাহ রা.ও হাদিস বর্ণনা করেছেন। ইমাম তিরমিযি রহ. ইমাম বুখারি রহ. হতে বর্ণনা করেন, হজরত আলী ইবনুল মাদিনি রহ. বলতেন, হাদিসে যে দলের কথা উল্লেখ আছে, তারা হচ্ছে যারা হাদিসের ওপর আমল করে।

আহলে বিদয়াতের প্রকারভেদ

হজরত আবু হোরায়রা রা. হতে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,

تَفَرَّقَتِ الْيَهُودُ عَلَى إِحْدَى وَسَبْعِينَ فِرْقَةً أَوْ ثِنْتَيْنِ وَسَبْعِينَ، وَالنَّصَارَى مِثْلُ ذَلِكَ، وَتَفْتَرِقُ أُمَّتِي عَلَى ثَلاثٍ وَسَبْعِينَ فِرْقَةً

'ইহুদিরা ৭১ বা ৭২ সম্প্রদায়ে বিভক্ত ছিল। খ্রিষ্টানরাও অনুরূপ সম্প্রদায়ে বিভক্ত হয়ে পড়ে। আর আমার উম্মত ৭৩ সম্প্রদায়ে বিভক্ত হবে।'[১]

---

১ সহিহ বুখারি : হাদিস নং ৩৬৪০, সহিহ মুসলিম : হাদিস নং ১৯২১

২ সহিহ মুসলিম : হাদিস নং ১৯২০

ইমাম তিরমিযি রহ. হাদিসটিকে সহিহ বলেছেন। এ হাদিসটি আমি পূর্বের অধ্যায়ে উল্লেখ করেছি। সেখানে আরও কিছু অতিরিক্ত শব্দ আছে,

كُلُّهُمْ فِي النَّارِ إِلا مِلَّةً وَاحِدَةً، قَالُوا: مَنْ هِيَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: " مَا أنا عَلَيْهِ وَأَصْحَابِي

'এসব দল জাহান্নামি। মাত্র একটি দল ছাড়া।' সাহাবারা জিজ্ঞেস করলেন, ইয়া রাসুলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! সেটি কোন্ দল? তিনি বললেন, 'যে দল আমার এবং আমার সাহাবাদের অনুসরণ করবে, তারাই মুক্তিপ্রাপ্ত দল।'

হজরত আনাস ইবনে মালেক রা. হতে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,

" إِنَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ تَفَرَّقَتْ إِحْدَى وَسَبْعِينَ فِرْقَةً، فَهَلَكَتْ سَبْعُونَ فِرْقَةً وَخَلَصَتْ فِرْقَةٌ وَاحِدَةٌ، وَإِنَّ أُمَّتِي سَتَفْتَرِقُ عَلَى اثْنَيْنِ وَسَبْعِينَ فِرْقَةً يَهْلَكُ إِحْدَى وَسَبْعُونَ وَتَخْلَصُ فِرْقَةٌ.قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا تِلْكَ الْفِرْقَةِ؟ قَالَ: الْجَمَاعَةُ

'বনি ইসরাইল পরস্পর মতভেদ করতে গিয়ে ৭১ দলে বিভক্ত হয়ে পড়ে। যার মধ্যে ৭০টি দল ধ্বংস হয়ে যায়, তথা জাহান্নামি হয়ে যায়। একটিমাত্র দল আযাব থেকে মুক্তি পায়। কিছুদিন পর আমার উম্মত ৭২টি দলে বিভক্ত হয়ে পড়বে। যার মধ্যে ৭১টি ধ্বংস হয়ে যাবে। আর কেবল একটি দল মুক্তি পাবে। সাহাবায়ে কেরাম রা. আরয করলেন, ইয়া রাসুলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! সেই দল কোনটি? তিনি বললেন, সেটি হচ্ছে জামাত।'[২]

লেখক শায়খ আবুল ফারাজ রহ. বলেন, যদি কেউ জানতে চায় যে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হাদিসে বর্ণিত এই উম্মতের পথভ্রষ্ট সম্প্রদায়গুলো কি চেনা সম্ভব? উত্তরে বলব, নিশ্চিতভাবেই সেই পথভ্রষ্ট বিভক্ত সম্প্রদায়গুলো মূল পরিচয়, বিভিন্ন দলে-উপদলে বিভক্তি এবং তাদের পথভ্রষ্টতার কারণ সম্পর্কে আমরা যথাযথ অবগত হয়েছি।

---

১ 'আসসিলসিলাতুস সহিহা' গ্রন্থের ২০৩ ও ২০৪ নম্বরে উল্লেখ করে শায়খ আলবানি রহ. হাদিসটি সহিহ বলেছেন; সুনানে আবি দাউদ : ৩৮৪২; সুনানে তিরমিযি : ২১২৮।

২ ইবনে মাজাহ : ৩৯৯৩।

যদিও বিভিন্ন উপদলে বিভক্ত ছোট ছোট সম্প্রদায়গুলোর বিস্তারিত আমাদের জানা নেই, তথাপি নিদ্বিধায় বলা যায়, নিম্নোক্ত ৬টি বড় দল থেকেই এসব বিদয়াতি উপদলের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ। ১. হারুরিয়া, ২. কদরিয়া, ৩. জাহমিয়া, ৪. মুরজিয়া, ৫. রাফেযিয়া ও ৬. জবরিয়া। বিদ্বান আলেমগণ বলেন, বিদয়াত ও পথভ্রষ্টতার গোড়াপত্তন এই ৬টি দল থেকেই। প্রত্যেক দলের রয়েছে ১২টি করে উপদল। সুতরাং সর্বমোট ৭২টি দল হয়ে যায়— যারা আহলে সুন্নত ওয়াল জামাত থেকে বিচ্ছিন্ন। হারুরিয়া বা খারেজি সম্প্রদায় পরস্পরের দ্বন্দ্বের কারণে ১২টি দলে বিভক্ত হয় :

১. **আযরাকিয়া :** এরা মনে করে, এদের দলের লোক ছাড়া আর কেউ মুমিন হতে পারে না। তারা আহলে কিবলাকে কাফের ঘোষণা দিয়েছে।

২. **আবাযিয়া :** তাদের মত হচ্ছে, যারা আমাদের কথা শুনবে তারা মুমিন, আর যারা শুনবে না তারা মুনাফিক।

৩. **সালাবিয়া :** এরা মনে করে আল্লাহ কোনো কিছু জারি করেননি এবং তকদিরে কিছু লেখেননি।

৪. **হাযেমিয়া :** তারা বলে, আমরা জানি না ঈমান কী জিনিস। বেচারা মাখলুক তো সবাই অপারগ।

৫. **খালাফিয়া :** তাদের মতে, জিহাদ পরিত্যাগকারী পুরুষ ও নারী কাফের।

৬. **মুকাররমিয়া :** এদের মতবাদ হচ্ছে, কাউকে স্পর্শ করা বৈধ নয়। কেননা আমাদের জানা নেই, কে পবিত্র আর কে অপবিত্র। যতক্ষণ পর্যন্ত কেউ আমাদের সামনে এসে গোসল করে তাওবা না করবে, ততক্ষণ পর্যন্ত তার সাথে পানাহার করা বৈধ নয়।

৭. **কানযিয়া :** তাদের দাবি, কাউকে কোনোপ্রকার ধন-সম্পদ প্রদান করা বৈধ নয়। কেননা হতে পারে সে সেই ধন-সম্পদ পাওয়ার উপযুক্ত নয়।

৮. **শামরাখিয়া :** এই খবিসরা বলে, অপরিচিত নারীকে ছুঁয়ে দেখাতে কোনো ক্ষতি নেই। কেননা নারীদেরকে সুগন্ধিদ্রব্য হিসেবে সৃষ্টি করা হয়েছে।

৯. **আখনাসিয়া :** এরা মনে করে, মৃত্যুর পর ভালো-মন্দ কোনো কর্মের শান্তি বা শাস্তি পতিত হবে না।

১০. **মাহকামিয়া :** এদের দাবি, কেউ যদি মাখলুকের কাছে কোনো ধরনের বিচার চায়, তাহলে সে কাফের।

১১. **মুতাযিলা :** হারুরিয়া দলের উপদল মুতাযিলারা বলে, আলী ইবনে আবি তালিব রা. ও মুয়াবিয়া রা. এর ঘটনা আমাদের কাছে সন্দেহজনক মনে হয়েছে। এ কারণে উভয়ের ওপর আমরা নাখোশ।

১২. **মাইমূনিয়া :** এদের দাবি, আমি যাকে চাই সে ছাড়া অন্য কেউ ইমাম হতে পারে না।

কদরিয়ারা ১২টি সম্প্রদায়ে বিভক্ত হয় :

১. **আহমারিয়া :** তাদের মতে, আল্লাহর জন্য উচিত হচ্ছে, বান্দাকে এমন কাজ থেকে দূরে রাখা, যাতে গুনাহ হতে পারে।

২. **সানাভিয়া :** তাদের মতবাদ হচ্ছে, উত্তম বস্তু আল্লাহর পক্ষ থেকে সৃষ্টি হয়, আর মন্দ বস্তু ইবলিসের পক্ষ থেকে সৃষ্টি হয়।

৩. **মুতাযিলা :** এরা কুরআনকে মাখলুক বলে। আখিরাতে আল্লাহর দিদার অসম্ভব মলে মনে করে।

৪. **কীসানিয়া :** এরা বলে, আমরা জানি না, এ সব কি আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন? এটাও আমরা জানি না যে, মৃত্যুর পর শান্তি পাবো নাকি শাস্তি?

৫. **শয়তানিয়া :** এরা মনে করে আল্লাহ তায়ালা শয়তান সৃষ্টি করেননি।

৬. **শরিকিয়া :** কুফর ছাড়া সব মন্দ কাজ তকদীরের লেখা বলে মনে করে।

৭. **ওয়াহমিয়া :** এরা বলে, মানুষের কর্মকাণ্ডের কোনো অস্তিত্ব নেই। ভালো-মন্দেরও কোনো অস্তিত্ব নেই।

৮. **রাবেন্দিয়া :** এরা বলে, আল্লাহর পক্ষ থেকে যে সকল কিতাব অবতীর্ণ হয়েছে, তার সবগুলোর ওপর আমল করা ফরজ। চাই তা রহিত হোক বা অরহিত।

৯. **বাতারিয়া :** যারা পাপ করে তাওবা করে তাদের তাওবা গ্রহণীয় নয় বলে মনে করে তারা।

১০. **নাকেসিয়া :** এরা বলে থাকে, যারা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বায়য়াত ছেড়ে দিয়েছে, তাদের কোনো গুনাহ হবে না।

১১. **কাসেতিয়া :** এদের দাবি, দুনিয়াবিরাগী হওয়ার চেয়ে দুনিয়ার সন্ধানে পড়ে থাক উত্তম।

১২. **নেযামিয়া :** এরা বলে, যে আল্লাহকে বস্তু মনে করে সে কাফের।

জাহমিয়ারা ১২টি সম্প্রদায়ে বিভক্ত হয় :

১. **মুতাল্লা :** এদের মতে, মানুষ যাকে সন্দেহ করবে সেটা মাখলুক। যে ব্যক্তি আল্লাহর দিদার সম্ভব বলে মনে করে সে কাফের।

২. **মুরাসিয়া :** এরা আল্লাহর অধিকাংশ সিফাতকে মাখলুক বলে দাবি করে।

৩. **মুলতাযিকা :** এরা আল্লাহকে সর্বত্র উপস্থিত বলে মনে করে।

৪. **ওয়ারেদিয়া :** এরা মনে করে, যে ব্যক্তি আল্লাহকে চিনতে পেরেছে, সে কখনো জাহান্নামে যাবে না। আর জাহান্নামিরা কখনো সেখান থেকে বের হতে পারবে না।

৫. **যানাদিকা :** কারও জন্য এটা সম্ভব নয় যে, নিজের জন্য কোনো সৃষ্টিকর্তা সাব্যস্ত করে। কেননা প্রত্যক্ষ করা ছাড়া কোনো বিষয় প্রমাণিত হতে পারে না। পঞ্চইন্দ্রিয়ের সাহায্যে যাকে হৃদয়ঙ্গম ও উপলব্ধি করা যায় না, তার সম্পর্কে বিশ্বাসের কোনো ভিত্তি নেই বলে মনে করে তারা।

৬. **হারাকিয়া :** এরা বলে, কাফেরদেরকে জাহান্নামে একবার পুড়িয়ে কয়লা করে দেয়া হবে। এর পর তারা সর্বদা কয়লা হয়েই থাকবে। আগুনের তেজ এরা আর অনুভব করবে না।

৭. **মাখলুকিয়া :** এরা কুরআনকে মাখলুক বলে দাবি করে।

৮. **ফানিয়া :** এরা মনে করে, জান্নাত-জাহান্নাম উভয়টিই ধ্বংস হয়ে যাবে। তাদের আরও দাবি হচ্ছে, জান্নাত-জাহান্নাম এখনও সৃষ্টি করা হয়নি।

৯. **মুগিরিয়া :** এরা নবীদের অস্বীকার করে। তাদেরকে কেবল জ্ঞানী বলে।

১০. **ওয়াকেফিয়া :** এরা বলে, আমরা নীরবতা পালন করি। কুরআনকে মাখলুকও বলি না মাখলুক নয় বলেও মনে করি না।

১১. **কবরিয়া :** এরা বলে, কবরে আযাব নেই। আখিরাতে শাফায়াত নেই।

১২. **লফযিয়া :** কুরআনের সাথে কথা বলাকে এরা মাখলুক মনে করে।

মুরজিয়ারা ১২টি সম্প্রদায়ে বিভক্ত হয় :

১. **তারেকিয়া :** তারা বলে, ঈমান ছাড়া মাখলুকের ওপর আল্লাহর জন্য কোনো কাজ ফরয নেই। তাঁর ওপর ঈমান এনে সে যা চায় করতে পারবে।

২. **সায়েবিয়া :** এদের বিশ্বাস, আল্লাহ তায়ালা মাখলুককে সৃষ্টি করে ছেড়ে দিয়েছেন। সে যা ইচ্ছে করতে পারে।

৩. **রাজিয়া :** এরা বলে, আমরা কোনো পাপীকে গুনাহগার ও নাফরমান বলতে পারি না। এভাবে কোনো নেককারকে অনুগত ও ফরমাবরদার বলতে পারি না। কেননা আমরা জানি না, এ ব্যক্তি আল্লাহর কাছে কেমন!

৪. **শাকিয়া :** এরা বলে, নেক আমল ও আনুগত্য ঈমানের অংশ নয়।

৫. **বুহাইসিয়া :** এদের মতে, ঈমান ইলমকে বলা হয়। যারা হক-বাতিল ও হালাল-হারামের পার্থক্য নির্ণয় করতে পারে না, তারা কাফের।

৬. **আমলিয়া :** এদের মতবাদ হচ্ছে, ঈমান কেবল আমলের নাম।

৭. **মুসতাসনিয়া :** এরা ঈমানের পার্থক্যের ব্যাপারটি অস্বীকার করে।

৮. **মুশাব্বাহ :** এরা বলে, আল্লাহর চোখ আমাদের চোখের মতো এবং আমাদের হাত তাঁর হাতের মতো।

৯. **হাশাবিয়া :** সব হাদিসকে এরা একই বিধান বলে মনে করে। তাদের মতে, নফল ছেড়ে দেয়া ফরয ছেড়ে দেয়ার মতো অপরাধ।

১০. **যাহেরিয়া :** এরা শরয়ি ব্যাপারে কিয়াস ও ইজতিহাদকে অস্বীকার করে।

১১. **বদইয়া :** এই উম্মতের মধ্যে সর্বপ্রথম এরাই বিদয়াতের সূত্রপাত ঘটায়।

১২. **মানকূসিয়া :** এরা বলে, ঈমান বাড়ে না, কমেও না।

রাফেযিয়ারা ১২টি সম্প্রদায়ে বিভক্ত হয় :

১. **আলাভিয়া :** এরা বলে, জিবরাঈল আলাইহিস সালাম এর মাধ্যমে রাসুলের পয়গাম হজরত আলী রা. এর কাছে পাঠানোর কথা ছিল, কিন্তু জিবরাঈল আলাইহিস সালাম ভুল করে তা অন্যত্র প্রেরণ করেন।

২. **আমরিয়া :** এরা দাবি করে, রিসালাতের কর্মকাণ্ডে হজরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে হজরত আলী রা.-ও শরিক আছেন।

৩. **শিয়া :** এরা বলে, হজরত আলী রা. রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর অসী। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পর আলী রা. খলিফা হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু উম্মত অন্যজনের বায়য়াত গ্রহণ করে কুফরী করেছে।

৪. **ইসহাকিয়া :** এরা মনে করে কিয়ামত পর্যন্ত নবুয়তের ধারা অব্যাহত থাকবে। যে ব্যক্তি আহলে বায়তের ইলম জানবে, সে-ই নবী হবে।

৫. **নাদূসিয়া :** এদের দাবি, হজরত আলী রা. এই উম্মতের সবার চেয়ে উত্তম। অতএব যে ব্যক্তি আলী রা. এর চেয়ে অন্যকে উত্তম মনে করবে, সে কাফের।

৬. **ইমামিয়া :** পৃথিবী কখনো একজন ইমাম থেকে শূন্য থাকবে না। আর ইমাম হবেন হজরত হোসাইন রা. এর সন্তান থেকে। তাকে জিবরাঈল আলাইহিস সালাম শিক্ষা দেন। তিনি মারা গেলে অন্যকে তার স্থলাভিষিক্ত করা হয়।

৭. **যায়দিয়া :** হজরত হোসাইন রা. এর সকল সন্তান ইমাম। এদের কেউ উপস্থিত থাকলে অন্যদের পেছনে নামায পড়া জায়েয নেই। চাই সে পরহেযগার হোক বা শরিয়তবিরোধী কোনো কাজ করুক।

৮. **আব্বাসিয়া :** এরা মনে করে, আব্বাস ইবনে আবদিল মুত্তালিবের সন্তানগণই খিলাফতের অধিক উপযুক্ত।

৯. **মুতানাসিখা :** এরা মনে করে, আত্মাসমূহ একজনের শরীর থেকে গিয়ে অন্যজনের শরীরে ঠাঁই নেয়। অতএব নেককারদের আত্মা তার শরীর থেকে বের হয়ে এমন ব্যক্তির শরীরে প্রবেশ করে, যে পৃথিবীতে খুব সুখে-শান্তিতে বসবাস করে। অন্যদিকে পাপীর আত্মা তার শরীর থেকে বের হয়ে এমন ব্যক্তির ভেতরে প্রবেশ করে, যে পৃথিবীতে খুবই দুঃখ-কষ্টের সাথে বসবাস করে।

১০. **রাজইয়া :** এই সম্প্রদায় মনে করে, হজরত আলী রা. এবং তাঁর সাথিরা পুনরায় পৃথিবীতে ফিরে আসবেন এবং শত্রুদের থেকে প্রতিশোধ নেবেন।

১১. **লায়েনিয়া :** এই দল হজরত ওসমান, তালহা, যুবাইর, মুয়াবিয়া, আবু মুসা আশয়ারী ও উম্মুল মুমিনীন আয়েশা রা. প্রমুখদের লানত দেয়।

১২. **মুতারাব্বিসা :** এরা আবেদ-দরবেশদের পোশাক পরে এবং সকল যুগে একজন মানুষকে সকল কাজের আমির নিযুক্ত করে। তারা দাবি করে সে-ই এই উম্মতের মাহদি। সে মারা গেলে আরেকজনকে তার স্থলাভিষিক্ত করা হয়।

জবরিয়ারাও ১২টি সম্প্রদায়ে বিভক্ত হয় :

১. **মুযতারিবা :** এরা বলে, মানুষ কিছুই করতে পারে না। সকল কাজ আল্লাহ তায়ালাই করেন।

২. **আফআলিয়া :** এরা বলে, আমাদের কাজ তো আমাদের থেকেই বের হয়, কিন্তু এ সকল কাজ করা বা না করার কোনো যোগ্যতা নেই। এক্ষেত্রে আমরা চতুষ্পদ জন্তুর ন্যায়। যাকে রশি বেঁধে যেদিকে নিয়ে যাওয়া হয়, সে সেদিকেই যায়।

৩. **মাফরূগিয়া :** এরা বলে, সকল কিছুই সৃষ্টি হয়ে গেছে। এখন আর কিছু সৃষ্টি হচ্ছে না।

৪. **নাজ্জারিয়া :** এরা বলে, আল্লাহ মানুষকে তার ভালো-মন্দের জন্য শাস্তি দেন না; বরং নিজের কাজকেই শাস্তি দেন।

৫. **মাত্তানিয়া :** এরা বলে, তোমার মনে যা ভালো মনে হয় তা-ই করো।

৬. **কাসাবিয়া :** বান্দা কোনো ধরনের সাওয়াব ও আযাবের কাজ করতে পারে না।

৭. **সাবেকিয়া :** এরা বলে, যার মনে চায় সে ভালো করবে, আর যার মন চায় না সে করবে না। কেননা নেককার গুনাহ করলে কোনো ক্ষতি হয় না। আর পাপী ভালো কাজ করলেও কোনো ফল পাবে না।

৮. **হুব্বিয়া :** এদের মতে, যে ব্যক্তি আল্লাহর ভালোবাসার পাত্র থেকে পান করেছে, তার আর কোনো ইবাদত করতে হবে না।

৯. **খাওফিয়া :** এরা মনে করে, যে ব্যক্তি আল্লাহকে ভালোবাসে, তার উচিত নয় আল্লাহকে ভয় পাওয়া। কেননা প্রেমিক প্রেমিকাকে ভয় করতে পারে না।

১০. **ফিকরিয়া :** এরা বলে, মানুষ যে পরিমাণ ইলম ও মারেফত অর্জন করে, সে পরিমাণ ইবাদতের দায়িত্ব তার ওপর থেকে ওঠে যায়।

১১. **হুসনিয়া :** এরা পৃথিবীর সকল মানুষকে সমান মনে করে। তাদের মতে, একজনকে আরেকজনের ওপর প্রধান্য দেয়া যাবে না। কেননা সকলেই এক আদম আলাইহিস সালাম এর সন্তান।

১২. **মায়িয়া :** এরা মনে করে, আমরা যেসব কাজ করি, সেগুলোর ওপর আমরা পরিপূর্ণ যোগ্য ও সর্বময় ক্ষমতাবান।

তৃতীয় অধ্যায়

ইবলিসের ফিতনা ও ধোঁকার ব্যাপারে হুঁশিয়ারি

মানুষের মাঝে সৃষ্টিগতভাবে নফসানী বা প্রবৃত্তির খায়েশ বিদ্যমান রয়েছে। এ কারণেই সে এমন বস্তুর অন্বেষণ করে যা দ্বারা মনের শান্তি ও আনন্দ মেলে। মানুষের মাঝে ক্রোধও রাখা হয়েছে। তাই সে যন্ত্রণাদায়ক বিষয়কে প্রতিহত করে। এমনকি তাকে বিবেকও দান করা হয়েছে, যা নফসের জন্য মুয়াল্লিম বা শিক্ষকসদৃশ। সে নফসকে শিক্ষা দেয় যে, তুমি যা অর্জন করবে বা প্রতিহত করবে তা যেন সীমার ভিতর থেকে হয়। আর শয়তানকে তার পরম শত্রু হিসেবে সৃষ্টি করা হয়েছে। সে উত্তেজিত করতে থাকে, অর্জন ও প্রতিহত করার ব্যাপারে যেন মানুষ সীমালঙ্ঘন করে ফেলে। হুকামায়ে রব্বানী অর্থাৎ আল্লাহভীরু মহা মনীষীগণ বলেছেন, আকল বা বিবেকের উচিত এরূপ শত্রু থেকে সর্বদা সাবধান থাকা—যার শত্রুতা হজরত আদম আলাইহিস সালাম এর সময় থেকে সুস্পষ্ট হয়ে আছে। শয়তান তার আপন জীবন আদমসন্তানকে ধ্বংস করার জন্য উৎসর্গ করে দিয়েছে। আল্লাহ মানুষকে শয়তানকে দেখার শক্তি দান করেননি বটে কিন্তু এর পরিবর্তে তাকে সতর্ক করে দিয়েছেন এবং তার চক্রান্ত থেকে বেঁচে থাকার নির্দেশ দিয়েছেন। আল্লাহ তায়ালা কোরআনের বিভিন্ন সুরাতে এ সম্পর্কে বলেছেন।

وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ إِنَّمَا يَأْمُرُكُمْ بِالسُّوءِ وَالْفَحْشَاءِ وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ

'এবং শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করো না। নিশ্চয় সে তোমাদের জন্য সুস্পষ্ট শত্রু। নিশ্চয় সে তোমাদেরকে আদেশ দেয় মন্দ ও অশ্লীল কাজের এবং আল্লাহর ব্যাপারে এমন কিছু বলতে, যা তোমরা জানো না।[১]'

الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ وَاللَّهُ يَعِدُكُمْ مَغْفِرَةً مِنْهُ وَفَضْلًا وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

'শয়তান তোমাদেরকে দরিদ্রতার প্রতিশ্রুতি দেয় এবং অশ্লীল কাজের আদেশ করে। আর আল্লাহ তোমাদেরকে তার পক্ষ থেকে ক্ষমা ও অনুগ্রহের প্রতিশ্রুতি দেন। আর আল্লাহ প্রাচুর্যময়, সর্বজ্ঞ।[২]'

وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا

---

১ সুরা বাকারা : আয়াত ১৬৮-১৬৯
২ সুরা বাকারা : আয়াত ২৬৮

'শয়তান তাদেরকে প্রতারিত করে পথভ্রষ্ট করতে চায় ।[১]'

إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ

'শয়তান শুধু মদ ও জুয়া দ্বারা তোমাদের মধ্যে শত্রুতা ও বিদ্বেষ সঞ্চার করতে চায়। আর (চায়) আল্লাহর স্মরণ ও নামায থেকে তোমাদের বাধা দিতে। অতএব, তোমরা কি বিরত হবে না[২]?'

إِنَّهُ عَدُوٌّ مُضِلٌّ مُبِينٌ

'নিশ্চয় সে পথভ্রষ্টকারী প্রকাশ্য শত্রু।[৩]'

إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا إِنَّمَا يَدْعُو حِزْبَهُ لِيَكُونُوا مِنْ أَصْحَابِ السَّعِيرِ

'নিশ্চয় শয়তান তোমাদের শত্রু; অতএব তাকে শত্রু হিসেবে গণ্য করো। সে তার দলকে কেবল এজন্যই ডাকে যাতে তারা জ্বলন্ত আগুনের অধিবাসী হয়।[৪]'

وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ

'মহাপ্রতারক (শয়তান) যেন তোমাদেরকে আল্লাহ সম্পর্কে ধোঁকায় ফেলতে না পারে।[৫]'

أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ أَنْ لَا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ

'হে বনি আদম, আমি কি তোমাদেরকে এ মর্মে নির্দেশ দেইনি যে, 'তোমরা শয়তানের উপাসনা করো না। নিঃসন্দেহে সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু।[৬]'

পবিত্র কুরআনে এ-সংক্রান্ত বহু আয়াত রয়েছে।

---

১ সুরা নিসা : আয়াত ৬০
২ সুরা মায়িদা : আয়াত ৯১
৩ সুরা কাসাস : আয়াত ১৫
৪ সুরা ফাতির : আয়াত ৬
৫ সুরা লোকমান : আয়াত ৩৩
৬ সুরা ইয়াসিন : আয়াত ৬০

ইবলিসের ফিতনা ও ধোঁকার ব্যাপারে হুঁশিয়ারি

শায়খ আল্লামা আবুল ফারাজ রহ. বলেন, মনে রাখতে হবে, ইবলিসের কাজ হচ্ছে, মানুষকে বিভিন্নভাবে সন্দেহে পতিত করে পথভ্রষ্ট করা। সর্বপ্রথম সে নিজেই এমন সন্দেহে আটকা পড়েছিল। সিজদার ব্যাপারে আল্লাহর নির্দেশ অমান্য করে সে সন্দেহে পতিত হয়, যা ছিল সম্পূর্ণ ভুল। যুক্তির পেছনে পড়ে সে নিজের শ্রেষ্ঠত্বের জানান দেয়। যেমন আল্লাহ তায়ালা আমাদেরকে অবহিত করেছেন এভাবে— خَلَقْتَنِي مِنْ نَارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ 'ইবলিস বলল, আপনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন আগুন দিয়ে, আর তাকে সৃষ্টি করেছেন মাটি দিয়ে।'[৭] অন্যত্র বর্ণিত আছে, 'সে বলল, দেখুন, এ ব্যক্তি, যাকে আপনি আমার উপর সম্মান দিয়েছেন, যদি আপনি আমাকে কিয়ামত পর্যন্ত সময় দেন, তবে অতি সামান্য-সংখ্যক ছাড়া তার বংশধরদেরকে অবশ্যই পথভ্রষ্ট করে ছাড়ব।'[৮] أَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ 'আমি তার চেয়ে উত্তম' বলে সে সিজদা করতে অস্বীকৃতি জানায়। এতে সে চিরদিনের জন্য আল্লাহর লানত ও শাস্তি খরিদ করে নেয়।

অতএব শয়তান যখন কোনো মানুষকে প্ররোচনা দেয়, তখন মানুষের উচিত, এই চিরশত্রুর ধোঁকা থেকে দূরে থাকা। কাউকে যদি সে বলে যে, আমি তোমার মঙ্গল কামনা করি। তখন তাকে উত্তর দিতে হবে, যে তুমি নিজের মঙ্গল বোঝো না সে আবার আমার মঙ্গল দিয়ে কী করবে? এছাড়া আমি আমার চিরশত্রুর ওপর কী করে ভরসা রাখতে পারি? তোমার কথায় আমি প্রভাবিত হব না। এখন শয়তান ধোঁকা দেবার আর কোনো উপায় না দেখে মানুষের 'নফসে আম্মারা' থেকে সাহায্য নেয়। নফসকে উদ্বুদ্ধ করে। কেননা সে উদ্যোগী হয়ে মানুষকে পাপকাজে লিপ্ত হতে বাধ্য করে। তাই এ ক্ষেত্রে বিবেকের সাহায্য নিতে হবে। বিবেক গুনাহের পরিণতি চিন্তা করবে।

ইয়ায ইবনে হিমার বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,

---

৭ সুরা সোয়াদ : আয়াত ৭৬

৮ সুরা বনি ইসরাইল : আয়াত ৬২

يَأَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَمَرَنِي أَنْ أُعَلِّمَكُمْ مَا جَهِلْتُمْ مِمَّا عَلَّمَنِي فِي يَوْمِي هَذَا، إِنَّ كُلَّ مَالٍ نَحَلْتُهُ عَبْدِي فَهُوَ لَهُ حَلالٌ، وَإِنِّي خَلَقْتُ عِبَادِي حُنَفَاءَ كُلَّهُمْ، فَأَتَتْهُمُ الشَّيَاطِينُ فَاجْتَالَتْهُمْ عَنْ دِينِهِمْ، وَأَمَرْتُهُمْ أَنْ لا يُشْرِكُوا بِي مَا لَمْ أُنْزِلْ بِهِ سُلْطَانًا، وَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى نَظَرَ إِلَى أَهْلِ الأَرْضِ فَمَقَتَهُمْ عَرَبَهُمْ وَعَجَمَهُمْ إِلا بَقَايَا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ

'হে মানুষেরা! আল্লাহ তায়ালা আমাকে সেসব কথা তোমাদেরকে বলার নির্দেশ দিয়েছেন, যা তোমরা জানো না। আল্লাহ তায়ালা আমাকে আজই বলেছেন, যে সম্পদ আমি আমার বান্দাকে দান করেছি, তা তাদের জন্য হালাল তথা বৈধ। আমার সকল বান্দাকে একটি সত্য দীনের ওপর সৃষ্টি করেছি। পরে শয়তান তাদের কাছে এসে তাদের ধর্মবিমুখ করে দিয়েছে। তখন তারা আমার সাথে সে সব বস্তুকে শরিক করে যার ব্যাপারে আমি কোনো প্রমাণ অবতীর্ণ করিনি। রাসুলূল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, আল্লাহ তায়ালা আরব-অনারব সবার দিকে দেখে মুষ্টিমেয় কিছু আহলে কিতাব ছাড়া অবশিষ্ট সকলের ওপর ভীষণ ক্রোধান্বিত হন।'[১]

ইয়ায ইবনে হিমার থেকে অন্য একটি সূত্রে বর্ণিত আছে, একদিন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খুতবায় বলেছিলেন, আল্লাহ তায়ালা আমাকে সেসব কথা তোমাদেরকে বলার নির্দেশ দিয়েছেন, যা তোমরা জানো না। এরপর তিনি পূর্বের হাদিসটি বললেন।

হজরত জাবের রা. হতে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,

إِنَّ إِبْلِيسَ يَضَعُ عَرْشَهُ عَلَى الْمَاءِ، ثُمَّ يَبْعَثُ سَرَايَاهُ فَأَدْنَاهُمْ مِنْهُ مَنْزِلَةً أَعْظَمُهُمْ فِتْنَةً، يَجِيءُ أَحَدُهُمْ، فَيَقُولُ: فَعَلْتُ كَذَا وَكَذَا، فَيَقُولُ: مَا صَنَعْتَ شَيْئًا، قَالَ: ثُمَّ يَجِيءُ أَحَدُهُمْ، فَيَقُولُ: مَا تَرَكْتُهُ حَتَّى فَرَّقْتُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ امْرَأَتِهِ.قَالَ: فَيُدْنِيهِ مِنْهُ، أَوْ قَالَ: فَيَلْتَزِمُهُ، وَيَقُولُ: نَعَمْ: أَنْتَ

'ইবলিস পানিতে তার সিংহাসন গেড়েছে। সেখান থেকে তার বাহিনীকে দিগ্বিদিক পাঠায়। ওই সৈনিক শয়তানের অধিক নৈকট্য লাভ করে, যে বড়

---

১ সহিহ মুসলিম : হাদিস নং ২৮৬৫

বড় ফিতনা চালু করতে পারে। সৈনিকেরা একে একে এসে তাদের কর্মকাণ্ডের ফিরিস্তি বর্ণনা দিয়ে বলে, আমি এমন এমন করেছি। উত্তরে শয়তান বলে, তোমরা তো কিছু করোনি। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, শয়তানের সৈনিকদের মধ্য থেকে একজন এসে বলে, আমি অমুকের পরিবারে ঝগড়া ও ফাটল সৃষ্টি করে দিয়েছি। এ কথা শুনে শয়তান তাকে কাছে বসায়। অন্যত্র বর্ণিত আছে, তাকে শয়তান আলিঙ্গন করে বলে, নিশ্চয় তুমি বেশ ভালো কাজ করেছ এবং মহৎ কাজ করেছ।'[২]

হজরত জাবের রা. বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন,

إِنَّ إِبْلِيسَ قَدْ يَئِسَ أَنْ يَعْبُدَهُ الْمُصَلُّونَ، وَلَكِنْ فِي التَّحْرِيشِ بَيْنَهُمْ

'নামাযি ব্যক্তি তার অনুসরণ করবে—এ ব্যাপারে শয়তান নিরাশ হয়ে গেছে। কিন্তু তাদের মাঝে ঝগড়া সৃষ্টি করে তাদের ওপর নিয়ন্ত্রণ নিতে সে সক্ষম হয়ে যায়।'[৩]

হজরত আনাস ইবনে মালেক রা. হতে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,

إِنَّ الشَّيْطَانَ وَاضِعٌ خَطْمَهُ عَلَى قَلْبِ ابْنِ آدَمَ، فَإِنْ ذَكَرَ اللَّهَ خَنَسَ، وَإِنْ نَسِيَ اللَّهَ الْتَقَمَ قَلْبَهُ

'শয়তান আদমসন্তানের অন্তরে তার শুঁড় গেড়ে আছে। যদি সে আল্লাহ তায়ালার জিকির করে তখন তার শুঁড় সরিয়ে নেয়, আর যদি আল্লাহকে ভুলে যায় তাহলে তার অন্তরকে গ্রাস করে ফেলে।'[৪]

হজরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. হতে বর্ণিত, শয়তান এমন একটি জামাতের ওপর দিয়ে যাচ্ছিল যারা আল্লাহর যিকিরে মগ্ন ছিল। শয়তান তাদেরকে ফিতনায় ফেলতে চায়। কিন্তু সমবেত থাকার কারণে পারছিল না। পরে সে আরেকটি জমায়েতে উপস্থিত হয়ে দেখল, তারা দুনিয়াবি কথাবার্তা বলছে। তাদেরকে সে এমন প্ররোচনা দিতে থাকে যে, সেখানে ঝগড়া-ঝাঁটি এবং খুনের মতো জঘন্য ঘটনা ঘটে গেল। আল্লাহর

---

২ সহিহ মুসলিম : হাদিস নং ২৮১৩
৩ সহিহ মুসলিম : হাদিস নং ২৭১২
৪ [যঈফ] 'যঈফুল জামে' : হাদিস নং ৩৪৫৪

যিকিরকারী লোকেরা সেই ঝগড়া মীমাংসা করতে গেলে তাদের মাঝেও বিভেদ সৃষ্টি হয়ে গেল।[১]

হজরত কাতাদাহ রা. হতে বর্ণিত, ইবলিসের কাছে এক শয়তান আছে, যাকে 'কাবকাব' বলা হয়। তার মুখ চল্লিশ বছর ধরে লাগাম পরিহিত। কোনো বালক সেই রাস্তা দিয়ে গেলে এই শয়তানকে বলা হয়, তোমাকে চল্লিশ বছর ধরে এই ছেলের জন্য বেঁধে রেখেছি। যাও, একে ধরো এবং ফিতনায় ফেলো।

সাবেত বুনানি রহ. বলেন, আমার কাছে এই হাদিস পৌঁছেছে যে, শয়তান একবার হজরত ইয়াহইয়া আলাইহিস সালাম এর কাছে প্রকাশ পেলে তিনি তার গায়ে সব ধরনের অলংকার দেখতে পান। তা দেখে তিনি বললেন, হে ইবলিস! তোমার কাছে যে-সব অলংকার দেখছি, তা কীভাবে এসেছে? সে বলল, এসব হচ্ছে দুনিয়ার চাহিদা ও প্রবৃত্তি। এ দ্বারা আমি আদমসন্তানকে ঘায়েল করে থাকি। হজরত ইয়াহইয়া আলাইহিস সালাম জিজ্ঞেস করলেন, এখানে কি আমার জন্যও কিছু আছে? সে বলল, আপনি পেট ভরে খেলে নামায পড়া আপনার জন্য কষ্টকর করে থাকি এবং আল্লাহর যিকিরকে আপনার জন্য ভারী করে থাকি। ইয়াহইয়া আলাইহিস সালাম বললেন, এছাড়া আর কিছু আছে কি? শয়তান বলল, আর কিছু নেই। ইয়াহইয়া আলাইহিস সালাম বললেন, আল্লাহর শপথ! আমি কখনো পেট ভরে আহার করব না। ইবলিস বলল, আল্লাহর শপথ! আমি কখনো মানুষের উপকার করব না।

হজরত হারেস ইবনে কায়স রা. হতে বর্ণিত, নামায পড়ার সময় যখন তোমার কাছে শয়তান এসে বলে, তুমি রিয়া করছ, তখন নামাযকে দীর্ঘ করে দাও।

ইবনে আমের উবাইদ ইবনে রিফাআ থেকে শুনেছেন, তিনি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পর্যন্ত সনদ পৌঁছিয়ে বর্ণনা করেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, বনি ইসরাইলে মাঝে এক পাদ্রী ছিল। তার যুগে শয়তান এসে কোনো মেয়ের গলা টিপে অসুস্থ করে ফেলল এবং তার অভিভাবকদেরকে বলল, একে সুস্থ করতে হলে অমুক পাদ্রীর কাছে নিয়ে যাও। তার কাছে থাকলে সুস্থ হয়ে যাবে। তারা

---

১ ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল প্রণীত 'আযযুহদ' : ১৭৫।

মেয়েকে নিয়ে পাদ্রীর কাছে গিয়ে বলল, মেয়েটি অসুস্থ। তাকে আপনার কাছে রাখুন। মেয়েটিকে পাদ্রীর কাছে সোপর্দ করা হলো। এদিকে শয়তান পাদ্রীর মনে এ ধারণা সৃষ্টি করে দিল যে, এখন তো তুমি লাঞ্ছিত হয়ে যাবে। তাই অভিভাবকরা তোমাকে মেরে ফেলবে। অতএব মেয়েটিকে হত্যা করে ফেলো। আর অভিভাবকরা যখন আসবে, তখন বলবে, সে মারা গেছে। পাদ্রী সে মতে কাজ করল। মেয়েটিকে হত্যা করে ফেলল। অপরদিকে শয়তান অভিভাবকদের কাছে এসে তাদের অন্তরেও এ ধারণা সৃষ্টি করে দিল যে, পাদ্রী মেয়ের সাথে অপকর্ম করে অন্তঃসত্ত্বা করে ফেলেছে। তাই অবমাননার ভয়ে তাকে মেরে ফেলেছে। অভিভাবকরা এসে মেয়ের কথা জিজ্ঞেস করলে পাদ্রী বলল, সে মারা গেছে। তখন তারা পাদ্রীকে পাকড়াও করে। এবার শয়তান এসে পাদ্রীর অন্তরে এ ধারণা সৃষ্টি করে যে, দেখো আমিই তোমাকে এ বিপদে ফেলেছি। এখন আমার কথা মানো, তাহলে মুক্তি পাবে। আমাকে দু'টি সিজদা করো। পাদ্রী তখন শয়তানকে দু'বার সিজদা করল। এ বিষয়টিরই উল্লেখ কুরআনে কারীমের এ আয়াতে রয়েছে–

كَمَثَلِ الشَّيْطَانِ إِذْ قَالَ لِلْإِنسَانِ اكْفُرْ فَلَمَّا كَفَرَ قَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِّنكَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ

'(এরা) শয়তান-এর ন্যায়, সে মানুষকে বলেছিল, 'কুফরি করো', অতঃপর যখন সে কুফরি করল তখন সে বলল, আমি তোমার থেকে মুক্ত; নিশ্চয় আমি সকল সৃষ্টির রব আল্লাহকে ভয় করি।'[২],[৩]

উপরোক্ত ঘটনাটি অন্যভাবেও আমাদের কাছে পৌঁছেছে। ওয়াহাব ইবনে মুনাব্বিহ রহ. বলেন, বনি ইসরাইলে জনৈক আবেদ পাদ্রী ছিল। সে যুগে তার সমকক্ষ আর কেউ ছিল না। সে সময় এক পরিবারে তিন ভাই ও এক কুমারী বোন ছিল। তিন ভাই কোথাও যুদ্ধে যাবে। কুমারী বোনকে কার কাছে রেখে যাবে, চিন্তা করে এমন কোনো নির্ভরযোগ্য ও বিশ্বস্ত লোক পাওয়া যাচ্ছিল না। তাই তারা একমত হলো, অমুক আবেদের কাছে সোপর্দ করে যাবে। কারণ সে আবেদ ওই যুগে তাদের দৃষ্টিতে নির্ভরযোগ্য

---

২ সুরা হাশর : আয়াত ১৬

৩ ঘটনাটি ইবনে আবিদ্দুনইয়া রহ. তাঁর 'মাকাইদুশ শাইতান' গ্রন্থে (পৃ. ৬১) এবং ইবনে মারদুভিয়া তাঁর তাফসীরগ্রন্থে উবাইদ ইবনে আবী রুফাআহ থেকে মুরসাল সহিহ সনদের সাথে উল্লেখ করেছেন। বায়হাকি প্রণীত 'শুয়াবুল ঈমান' : ৫৪৪৯; মুসতাদরাকে হাকিম : ৪/৪৮৫।

ও বিশ্বস্ত ছিল। তিন ভাই আবেদের কাছে এসে বোনকে তার তত্ত্বাবধানে রেখে যাওয়ার আবেদন জানাল। কিন্তু পাদ্রী তাদের আবেদন প্রত্যাখ্যান করে দিল এবং তাদের কাছে এ থেকে পানাহ চাইল। তারা খুব কাকুতি-মিনতি জানালে অবশেষে আবেদ তা মঞ্জুর করে নিল এবং তাদেরকে বলল, তোমাদের বোনকে আমার গির্জার কাছে এ ঘরে রেখে যাও। তারা আপন বোনকে গির্জার সংলগ্ন ঘরে রেখে যুদ্ধে চলে গেল।

মেয়েটি আবেদের কাছে লালিত-পালিত হচ্ছে। পাদ্রী মেয়ের জন্য খাবার এনে গির্জার দরজার সামনে রেখে গির্জার ভেতরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিত। এরপর মেয়েকে ডেকে বলত, তোমার খাবার নিয়ে যাও। মেয়েটি এসে খাবার নিয়ে যেত। এভাবে কিছুদিন অতিবাহিত হওয়ার পর শয়তান এসে পাদ্রীকে প্ররোচনা দিয়ে তার অন্তর নরম করে ফেলল যে, মেয়েটির জন্য দিনের বেলায় ঘর থেকে বের হয়ে গির্জার দরজা পর্যন্ত আসা সমীচীন নয়। কারণ মানুষ দেখে তাকে দোষারোপ করতে পারে। এতে ভুল বোঝাবুঝির সৃষ্টি হতে পারে। তাই উত্তম পন্থা হলো, খাবারটা তার ঘরের দরজায় রেখে আসা। এটা একটা বিরাট পুণ্যের কাজ হবে। পাদ্রী তা-ই করতে থাকল।

এভাবে আরও কিছুদিন গত হলে শয়তান এসে পাদ্রীর মনে প্ররোচনা ঢালল যে, মেয়েটি নীরব কুঠরিতে একাকী বসে থাকে। এতে তার খুব কষ্ট হয়। তার কষ্ট ও দুশ্চিন্তা লাঘব করার জন্য মাঝেমধ্যে তার সাথে কিছু কথাবার্তা বলা উচিত। পাদ্রী এ কাজের জন্যও প্রস্তুত হয়ে গেল। কখনো কখনো তার সাথে কথাবার্তা বলতে শুরু করল। শয়তান এবারও পাদ্রীর পিছু নেয়। কিছুদিন পর পাদ্রীর অন্তরে এসে এ প্ররোচনা দিল যে, এভাবে তো মেয়েটির মনে তাত সান্ত্বনা আসছে না। এক কাজ করো, তুমি আপন গির্জার দরজায় বসো, আর সে ঘরের দরজায় বসুক। এভাবে সামনাসামনি কথোপকথন চলুক। এতে তার মনে যথেষ্ট সান্ত্বনা আসবে। শয়তানের এ প্রস্তাবও কার্যকর হয়ে গেল। পাদ্রী এখন তার গির্জার দরজায় বসে আর মেয়েটি তার ঘরের দরজায় বসে। এভাবে চলতে থাকে উভয়ের মাঝে কথোপকথন।

আরো কিছুদিন এভাবে কেটে গেল। এবার শয়তান এসে পাদ্রীর মনে এ ধারণা সৃষ্টি করল যে, এভাবে কথাবার্তা বলতে গেলে মেয়েটিকে বাইরে আসতে হয়। এতে মানুষ তার চেহারা দেখতে পাবে। এটাও তেমন ভালো

দেখাচ্ছে না। এর চেয়ে সুন্দর হয় তুমি নিজেই তার ঘরে চলে যাও। ঘরের ভেতরে নির্জনে কথা বলো। এতে তোমাদের প্রতি কারও কুধারণা সৃষ্টি হবে না। আর মেয়েটির মন আরও বেশি সান্ত্বনা লাভ করবে। পাদ্রী তা-ই করতে শুরু করল। এবার স্বয়ং মেয়ের ঘরের ভেতরে গিয়ে নির্জনে সংলাপ করে আসে। এদিকে শয়তান পাদ্রীর মনে ফুটিয়ে তুলতে শুরু করে মেয়ের সৌন্দর্য। একদিন একান্তে কথাবার্তা বলাকালে একপর্যায়ে পাদ্রী মেয়েটিকে চুমু খেয়ে ফেলে। এখন তার কাছ থেকে আর পিছু ছাড়ছে না ধোঁকাবাজ শয়তান। তাকে আরও ভালো করে প্ররোচনা ও প্রলোভন দিতে থাকে। এভাবে পাদ্রী একসময় মেয়েটির সাথে অপকর্ম করে বসে। আর এতে মেয়েটি অন্তঃসত্ত্বা হয়ে যায়।

কিছুদিন পর মেয়েটি প্রসব করে ফুটফুটে এক সন্তান। এবার শয়তান এসে পাদ্রীর মনে আরেক সংশয় সৃষ্টি করে যে, মেয়ের ভাইয়েরা যখন এসে সন্তানকে দেখবে, তখন কী বলবে? কী পরিণতি হবে তখন? অবশ্যই তারা মনে করবে, তুমি মেয়ের সাথে অবৈধ কাজ করেছ। যার ফলে এ সন্তান জন্ম নিয়েছে। তখন তোমাকে লজ্জিত ও অপমানিত হতে হবে। অতএব মুক্তির পথ হলো, তুমি সদ্যভূমিষ্ট শিশুটিকে হত্যা করে ফেলো। পাদ্রী তা-ই করল। সন্তানটি হত্যা করে একটি গর্তে পুঁতে রাখল। কিছু দিন পর শয়তান আবার পাদ্রীর কাছে এসে এ ভয় দেখাল যে, মেয়ে তার ভাইদের কাছে কখনো এ ঘটনা গোপন রাখবে না। কোনো একসময় এ সত্য প্রকাশ পাবে। তখন তোমার কী উপায় হবে? সুতরাং এখনই সে ব্যবস্থা করে নাও। মেয়েটিকেও হত্যা করে ফেলো। তাহলে আর কোনো আশঙ্কা থাকবে না। পাদ্রী তার কথামতো মেয়েটিকে হত্যা করে সন্তানের সাথে একই গর্তে পুঁতে রাখল। তার ওপর দিয়ে রাখল একটি ভারী পাথর। পরে সে আগের মতো গির্জায় গিয়ে ইবাদত-বন্দেগিতে দিন গুজরান করতে থাকল।

কিছুদিন পর ভাইয়েরা যুদ্ধ থেকে ফিরে এসে পাদ্রীর কাছে গেল এবং বোনের খবর নিতে গেলে পাদ্রী বলল, তোমার বোন তো মারা গেছে। এ বলে সে কাঁদতে শুরু করল এবং খুব আফসোস ও শোক প্রকাশ করল। মেয়ের কবরও দেখাল। ভাইয়েরা কবরের পাশে এসে বোনের জন্য দোয়া করল। কয়েক দিন কবরের পাশে কাটিয়ে বাড়ি ফিরে গেল তিন ভাই।

কয়েক দিন গত হলে এক রাতে শয়তান স্বপ্নে জনৈক মুসাফিরের বেশে তাদের সামনে এসে হাজির হলো। প্রথমে বড় ভাইয়ের কাছে গিয়ে বোনের

অবস্থা জিজ্ঞেস করল। সে বোনের মৃত্যুর ঘটনা ব্যক্ত করলে শয়তান বলল, এ সব মিথ্যা। তোমরা পাদ্রীর কথা বিশ্বাস করে বোনের মৃত্যুর ঘটনা কী করে মেনে নিলে? অথচ প্রকৃত ঘটনা হলো, পাদ্রী তার সাথে অবৈধ কাজ করেছে। ফলে সে অন্তঃসত্ত্বা হয়ে পড়ে এবং পরে একটি সন্তান প্রসব করে। অবমাননা ও লজ্জার ভয়ে পাদ্রী শিশু ও মা উভয়কে হত্যা করে মাটির নিচে পুঁতে রেখেছে। যে ঘরে সে থাকত, সে ঘরের গর্তের ভেতরে উভয়কে পাওয়া যাবে। একই স্বপ্ন অপর দুই ভাইকেও দেখাল। সকালে ঘুম হতে ওঠে পরস্পর নিজেদের স্বপ্ন ব্যক্ত করলে তিন ভাই-ই বেশ চিন্তিত ও আশ্চর্যান্বিত হয়ে পড়ে। বড় ভাই বলল, এগুলো কিছুই না। এগুলো নিছক কল্পনা। কিন্তু অপর দুই ভাই এটা মানতে নারাজ। তারা ঘটনাস্থলে গিয়ে তদন্ত করার সংকল্প করে পাদ্রীর উদ্দেশে আবারও রওয়ানা হয়। স্বপ্নে বর্ণিত জায়গায় গিয়ে মাটি খুঁড়ল। সত্যিই বোন ও সন্তানের লাশ পেয়ে গেল। তারা পাদ্রীর কাছে কৈফিয়ত চায়। পাদ্রী ঘটনা স্বীকার করতে বাধ্য হয়।

এরপর তিন ভাই মিলে তৎকালীন বাদশাহর কাছে মোকাদ্দমা দায়ের করে। পাদ্রীকে গির্জা থেকে বের করে ফাঁসিকাষ্ঠে ঝুলানোর উদ্দেশ্যে নেয়া হয়। এবারও শয়তান পাদ্রীর কাছে এসে উপস্থিত। শয়তান পাদ্রীকে বলল, আমাকে চিনতে পেরেছ? আমি তোমার ওই সঙ্গী, যে তোমাকে মেয়ের সাথে অবৈধ কাজে লিপ্ত করেছি। তোমার মাধ্যমে তাকে অন্তঃসত্তা করেছি। অতঃপর তোমার মাধ্যমে হত্যাকাণ্ড ঘটিয়েছি। এখন যদি বাঁচতে চাও, তবে আমার কথা মানবে কি না বলো? তুমি আল্লাহকে অস্বীকার করলে আমি তোমার মুক্তির পন্থা বের করে দেব। পাদ্রী শয়তানের পরামর্শ অনুযায়ী আল্লাহর সাথে কুফরী করতে কুণ্ঠাবোধ করল না। এরপর শয়তান তাকে ফেলে চলে গেল। এদিকে জল্লাদ তাকে ঝুলাল ফাঁসিকাষ্ঠে। এ বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে নিম্নে আয়াতে কারিমায়–

كَمَثَلِ الشَّيْطَانِ إِذْ قَالَ لِلإِنْسَانِ اكْفُرْ فَلَمَّا كَفَرَ قَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِنْكَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ

'(এরা) শয়তান-এর ন্যায়, সে মানুষকে বলেছিল, 'কুফরি করো', অতঃপর যখন সে কুফরি করল তখন সে বলল, আমি তোমার থেকে মুক্ত; নিশ্চয় আমি সকল সৃষ্টির রব আল্লাহকে ভয় করি।'[১]

ওহাব ইবনে মুনাব্বিহ রহ. বলেন, হজরত ঈসা আলাইহিস সালাম এর যুগে জনৈক পাদ্রী ছিল। সে তার গির্জায় ইবাদত করত নির্জনে। শয়তান তাকে ধোঁকা দেয়ার জন্য সকল প্রকার চেষ্টা করেছে। বিভিন্ন ধরনের ফন্দি আঁটতে থাকে। কিন্তু কিছুতেই সে সফল হতে পারছে না। অবশেষে হজরত ঈসা আলাইহিস সালাম এর আকৃতিতে তার কাছে আসে। পাদ্রী বলল, তুই যদি ঈসা হয়ে থাকিস, তাহলে তোর কোনো প্রয়োজন আমার নেই। তুই কি আমাদেরকে ইবাদত করার আদেশ করিসনি? আমাদের সাথে কেয়ামতের ওয়াদা করিসনি? যা নিজের কাজে চলে যা। এ কথা শোনার পর অভিশপ্ত শয়তান ফিরে যায় ভগ্ন মনোরথে।

সালেম ইবনে আবদুল্লাহ তাঁর পিতা হজরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর রা. হতে বর্ণনা করেন, হজরত নুহ আলাইহিস সালাম যখন কিস্তিতে আরোহণ করেন, তখন কিস্তিতে এক অপরিচিত বৃদ্ধকে দেখতে পান। সে বলল, আমি এসেছি এ জন্য যে, আপনার সহচরদের ধোঁকা দেবো, যাতে তাদের অন্তর আমার সাথে থাকে আর দেহ আপনার সাথে থাকে। হজরত নুহ আলাইহিস সালাম বললেন, আল্লাহর দুশমন! এখান থেকে বের হয়ে যা! অতঃপর শয়তান বলল, পাঁচটি বস্তু রয়েছে, যেগুলোর মাধ্যমে আমি মানুষকে ধ্বংস করে থাকি। তন্মধ্যে তিনটি বলব, আর দু'টি বলব না। তৎক্ষণাৎ হজরত নুহ আলাইহিস সালাম এর কাছে অহী অবতীর্ণ হলো যে, আপনি তাকে বলুন, যেন সে ওই দু'টিই বলে। তিনটি বলার প্রয়োজন নেই। শয়তান বলল, ওই দু'টির সাহায্যেই আমি মানুষকে ধ্বংস করে থাকি–

১. হাসাদ বা হিংসা তথা পরশ্রীকাতরতা। এর কারণেই আমি অভিশপ্ত ও বিতাড়িত হয়েছি।

২. লিপ্সা। আদম আলাইহিস সালাম এর জন্য সমস্ত জান্নাত বৈধ করে দেয়া হয়েছিল। আমি তাকে লিপ্সার কারণে সেই জান্নাত থেকে বের করে নিয়ে আসতে সক্ষম হয়েছি।

---

১ সূরা হাশর : আয়াত ১৬

এক বর্ণনায় আছে, একবার শয়তান হজরত মুসা আলাইহিস সালাম এর সাথে সাক্ষাৎ করে বলল, হে মুসা! আল্লাহ তায়ালা আপনাকে নবুয়ত ও রিসালাতের জন্য মনোনিত করেছেন। আপনার সাথে কথা বলেছেন। আমিও আল্লাহর মাখলুক ও সৃষ্টি। আল্লাহর দরবারে আমার একটি অপরাধ ও ত্রুটি হয়ে গেছে। সে জন্য আমি তাওবাহ করতে চাই। আপনি আল্লাহর দরবারে একটু সুপারিশ করবেন, যাতে তিনি আমার তাওবাহ মঞ্জুর করেন। হজরত মুসা আলাইহিস সালাম আল্লাহর দরবারে দোয়া করলেন। আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্দেশ এলো—হে মুসা! তোমার সুপারিশ গৃহীত হলো। অতঃপর শয়তানের সাথে হজরত মুসা আলাইহিস সালাম এর সাক্ষাৎ হলে তিনি শয়তানকে বললেন, আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে এ জবাব এসেছে যে, তুমি হজরত আদম আলাইহিস সালাম এর কবরকে সিজদা করো। তাহলে তোমার তাওবাহ কবুল হয়ে যাবে। শয়তান রাগান্বিত হয়ে বলল, যাকে জীবিত অবস্থায় সিজদা করিনি, তাকে মৃত্যুর পর সিজদা করব? এরপর শয়তান হজরত মুসা আলাইহিস সালাম কে লক্ষ্য করে বলল, আমার জন্য যেহেতু আপনি সুপারিশ করেছেন, তাই আমার ওপর আপনার কিছু দাবি রয়েছে। অতএব আপনার উপকারার্থে কয়েকটি কথা বলে দিচ্ছি। আপনি তিন অবস্থায় আমার কথা স্মরণ করবেন। ওই তিন অবস্থায় যেন আমি আপনাকে ধ্বংস করে না ফেলি :

১. ক্রোধের সময়। কেননা ক্রোধের সময় আমি অন্তরে প্ররোচনা দিতে থাকি। ক্রোধান্বিত ব্যক্তির চোখের প্রতি আমার চোখ থাকে। শিরা-উপশিরায় রক্তের ন্যায় চলাচল করি।

২. জিহাদর সময়। কেননা জিহাদের সময় আমি মানুষের কাছে যাই এবং কাফিরদের সাথে যুদ্ধ করার সময় তাকে স্ত্রী ও সন্তানাদির কথা স্মরণ করিয়ে দেই। অতএব সে জিহাদ ছেড়ে চলে আসে।

৩. গাইরে মাহরাম ও বেগানা মহিলা সম্মুখে পড়লে। কেননা ওই সময় আমি পুরুষের কাছে ওই মহিলার বার্তাবাহক সেজে থাকি।

কুরাশি বলেন, হজরত সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যিব বলেছেন, আল্লাহ তায়ালা যত নবীকে পাঠিয়েছেন শয়তান তাঁকে নারীর মাধ্যমে ধ্বংস করার ব্যাপারে নিরাশ হয়নি। (যদিও নবীদের বেলায় সে সক্ষম হয়নি)।

কুরাশি বলেন, ফুযাইল ইবনে ইয়ায বলেছেন, আমার কোনো একজন শায়খ থেকে এ হাদিস জানতে পেরেছি যে, হজরত মুসা আলাইহিস সালাম

যখন আল্লাহ তায়ালার সাথে কথোপকথন করছিলেন, ঠিক সে সময় তাঁর নিকট শয়তান গিয়ে উপস্থিত হয়। ফেরেশতা শয়তানকে দেখে বলল, বদবখত! মুসা আলাইহিস সালাম আপন রবের সাথে কথা বলছেন, আর এ অবস্থায় তুই তার থেকে কিসের আশা করছিস? প্রত্যুত্তরে শয়তান বলল, আমি তাঁর থেকে ওই আশাই করছি—যা তাঁর পিতা আদম থেকে করেছিলাম, যখন তিনি জান্নাতে অবস্থান করছিলেন।

কুরাশি বলেন, আবদুর রহমান ইবনে যিয়াদ হতে বর্ণিত, একবার হজরত মুসা আলাইহিস সালাম কোনো এক মজলিসে উপবিষ্ট থাকাবস্থায় শয়তান এসে তাঁর নিকট উপস্থিত হয়। তার মাথায় ছিল বিচিত্র রঙের একটি টুপি। হজরত মুসা আলাইহিস সালাম এর নিকটে পৌঁছে সে টুপিটি মাথা থেকে নামিয়ে ফেলে এবং সামনে রেখে দেয়। অতঃপর মুসা আলাইহিস সালাম-কে সালাম করে।

হজরত মুসা আলাইহিস সালাম তাকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কে? সে বলল, আমি শয়তান। হজরত মুসা আলাইহিস সালাম বললেন, আল্লাহ তোকে জীবিত না রাখুক। তুই এখানে কেন এসেছিস? শয়তান বলল, আপনাকে সালাম করার জন্য এসেছি। কারণ আল্লাহর কাছে আপনার বিরাট মর্যাদা রয়েছে। হজরত মুসা আলাইহিস সালাম জিজ্ঞেস করলেন, তোর মাথায় এটা কী দেখেছিলাম? শয়তান বলল, এর মাধ্যমে আমি বনি আদমকে বিভিন্নভাবে আকৃষ্ট করে থাকি। হজরত মুসা আলাইহিস সালাম জিজ্ঞেস করলেন, কোন্ কাজ করলে তুই মানুষের ওপর প্রভাব খাটাতে পারিস? সে উত্তর দিল, মানুষ যখন নিজ সত্তাকে ভালো মনে করে, নিজের আমলকে বড় করে দেখে এবং পাপের কথা ভুলে যায়। এরপর শয়তান হজরত মুসা আলাইহিস সালাম-কে লক্ষ্য করে বলল, হে মুসা! আপনাকে আমি তিনটি বিষয় সম্পর্কে সতর্ক করছি,

১. গাইরে মাহরাম মহিলার সাথে নির্জনে বসবেন না। কেননা কোনো ব্যক্তি যখন কোনো গাইরে মাহরাম মহিলার সাথে নির্জনে বসে, তখন আমি স্বয়ং তাদের সাথে বসে যাই। অবশেষে ওই মহিলার সাথে তাকে ফিতনায় পতিত করি।

২. আল্লাহর সাথে কোনো ওয়াদা করলে তা পূরণ করবেন। কেননা মানুষ যখন আল্লাহর সাথে কোনো ওয়াদা করে, তখন ওই ব্যক্তি এবং তার ওয়াদা পূরণের মাঝে আমি সরাসরি প্রতিবন্ধক হয়ে যাই।

৩. কোনো সদকা করার ইচ্ছে করলে তা অবশ্যই দিয়ে দেবেন। কেননা কোনো ব্যক্তি যখন কোনো কিছু সদকা করার ইচ্ছে করে তখন আমি তার মাঝে এবং সদকার কাজ সম্পাদন করার মাঝে প্রতিবন্ধক হয়ে যাই। আর এ কাজ আমি স্বয়ং করে থাকি। অন্য কোনো সহচরের মাধ্যমে করাই না।

এ কথা বলে শয়তান বিদায় নিল এবং আফসোস প্রকাশ করে বলে গেল, হায়! আমি মুসাকে এমন তিনটি বিষয় বলে দিলাম—যা দ্বারা সে আদমসন্তানকে সতর্ক করে দেবে।

কুরাশি বলেন, হাসান ইবনে সালেহ বর্ণনা করেন, আমি শুনেছি, শয়তান মহিলাকে বলে, তুই আমার অর্ধ বাহিনী। তুই আমার এমন তীর—যার লক্ষ্য ভ্রষ্ট হয় না। তুই আমার রহস্যস্থল এবং তোকে আমি আমার স্বার্থ উদ্ধারের জন্য দূত হিসেবে ব্যবহার করে থাকি। কুরাশি আরও বলেন, আকিল ইবনে মা'কাল বর্ণনা করেন, আমি ওয়াহাব ইবনে মুনাব্বিহ রহ. এর কাছে শুনেছি, কোনো এক পাদ্রীর সাথে শয়তানের সাক্ষাৎ হলে পাদ্রী তাকে জিজ্ঞেস করে, আচ্ছা, বনি আদমের এমন কী চরিত্র আছে যা তোর জন্য বড় সহায়ক? শয়তান বলল, ক্রোধ। মানুষ যখন রাগান্বিত হয়, তখন আমি তাকে এমনভাবে উলট-পালট করি, যেভাবে ছেলেরা ফুটবল নিয়ে খেলা করে।

কুরাশি বলেন, হজরত সাবিত রা. হতে বর্ণিত–

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন পৃথিবীতে এলেন, তখন শয়তান তার বাহিনীকে সাহাবায়ে কেরামের কাছে পাঠাল। তারা ব্যর্থ হয়ে সাদা খাতা নিয়ে ফিরে গেল। শয়তান তাদেরকে জিজ্ঞেস করল, কী হলো? তাদের ওপর কি কোনো আক্রমণ করতে পারলে না? উত্তর তার বাহিনী জবাব দিল, আমরা এমন লোক আজ পর্যন্ত দেখিনি। তখন শয়তান তার বাহিনীকে বলল, আচ্ছা, এখন তাদেরকে ছেড়ে দাও। অচিরেই বিভিন্ন দেশ বিজয় হবে এবং প্রচুর ধন-সম্পদ হস্তগত হবে, তখন তোমাদের লক্ষ্যে তোমরা পৌঁছতে পারবে।[১]

কুরাশি বলেন, হজরত আবু মুসা রা. বর্ণনা করেন, প্রত্যহ সকাল হলে শয়তান তার বাহিনীকে এ নির্দেশ দিয়ে ছেড়ে দেয় যে, তোমাদের মাঝে যে কেউ কোনো মুসলমানকে পথভ্রষ্ট করতে পারবে, আমি তাকে মুকুট পরাব।

---

১ মাকায়িদুস শায়তান : ৩৬।

অতঃপর তাদের মধ্য হতে একজন এসে বলে, আমি অমুক মুসলমান এবং তার স্ত্রীর মাঝে বিচ্ছেদ ঘটিয়ে দিয়েছি। এ কথা শুনে শয়তান বলে, হতে পারে সে আরেক বিবাহ করে নেবে। আরেকজন এসে বলে, আমি অমুক মুসলমানকে তার পিতা-মাতার অবাধ্য করে ছেড়েছি। তা শুনে শয়তান বলে, হতে পারে সে পুনরায় পিতা-মাতার সেবা করবে। আরেকজন এসে বলে, আমি অমুককে মদ্যপান করিয়ে ছেড়েছি। শয়তান বলে, হ্যাঁ, বড় কাজ করেছিস। আরেকজন এসে বলে, আমি অমুককে ব্যভিচারে লিপ্ত করে ছেড়েছি। শয়তান বলে, তুইও বিরাট কাজ করেছিস। এরপর আরেকজন এসে বলে, আমি অমুকের মাধ্যমে হত্যাকাণ্ড ঘটিয়ে ছেড়েছি। এ খবর শুনে শয়তান বলে, তুই করেছিস সবচেয়ে বড় কাজ![২]

কুরাশি বলেন, হাসান বর্ণনা করেন, এক জায়গায় একটি বৃক্ষ ছিল। মানুষ আল্লাহর ইবাদত ছেড়ে ওই বৃক্ষের পূজা করত। এক ব্যক্তি বৃক্ষের কাছে এসে বলল, আমি এ বৃক্ষটি অবশ্যই কেটে ফেলব। এ কথা বলে সে আল্লাহর ভয়ে বৃক্ষটি কাটার প্রস্তুতি নেয়। এমন সময় শয়তান এক ব্যক্তির আকৃতি ধারণ করে এসে তাকে জিজ্ঞেস করল, তুমি কী করতে চাচ্ছ? সে বলল, মানুষ আল্লাহর ইবাদত ছেড়ে এ বৃক্ষের পূজা করছে। তাই এ বৃক্ষটি আমি কেটে ফেলব। শয়তান বলল, তুমি তো আর এর পূজা করছ না! অন্যেরা পূজা করলে তাতে তোমার কী অসুবিধা? সে বলল, আমি এ বৃক্ষ কাটবই। এ কথা শুনে শয়তান বলল, তুমি কি এমন জিনিস চাও—যা তোমার জন্য উত্তম ও লাভজনক? তুমি বৃক্ষ কাটা বাদ দিলে দৈনিক ভোরে বালিশের নীচে দু'টি করে স্বর্ণমুদ্রা পাবে। সে বলল, তুমি যে ওয়াদা করলে, এর জামিন কে হবে? শয়তান বলল, আমি স্বয়ং এর জামিনদার। ওই ব্যক্তি বৃক্ষ না কেটে ফিরে চলে গেল।

পরের দিন ঠিকই বালিশের নীচে দু'টি স্বর্ণমুদ্রা পেল। কিন্তু দ্বিতীয় দিন ভোরে আর কোনো স্বর্ণমুদ্রা পেল না। এসে সে ভীষণ রাগান্বিত হয়ে আবার ওই বৃক্ষটি কাটতে প্রস্তুত হয়। ইত্যবসরে শয়তানও এসে উপস্থিত হয়। পূর্বের ন্যায় শয়তান তাকে জিজ্ঞেস করল, তোমার কী করার ইচ্ছে? সে জবাব দিল, আমি বৃক্ষটি কেটে ফেলব। কেননা মানুষ আল্লাহর ইবাদত ছেড়ে এ বৃক্ষের পূজা করছে। শয়তান বলল, তুই মিথ্যুক। আল্লাহর ভয়ে তুই বৃক্ষটি কাটছিস না। তারপরও যখন সে বৃক্ষটি কাটতে শুরু করল,

---

২ মাকায়িদুস শায়তান : ৬০।

তখন শয়তান তাকে মাটিতে আছাড় দিয়ে ধরাশায়ী করে এবং গলা টিপে অর্ধমৃত করে ফেলল। অতঃপর তাকে বলল, তুই কি আমার পরিচয় জানিস? আমি হলাম শয়তান। প্রথমবার তুই আল্লাহর জন্য রাগান্বিত হয়েছিলি, তাই তোর ওপর আমার প্রভাব চলেনি; তোকে আমি পরাস্ত করতে পারিনি। তারপর দু'টি স্বর্ণমুদ্রার প্রলোভনে তুই সে কাজ বর্জন করেছিলি। এবার তুই রাগান্বিত হয়েছিস দু'টি স্বর্ণমুদ্রা জন্য, তাই আমি অনায়াসে তোকে পরাস্ত করতে সক্ষম হই।

কুরাশি বলেন, যায়দ ইবনে মুজাহিদ হতে বর্ণিত, শয়তানের সন্তানদের মধ্যে পাঁচজন এমন রয়েছে, যাদের প্রত্যেকের ওপর একটি করে দায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছে। তাদের নাম হলো—সাবির, আ'ওয়ার, মুসাওয়াত, দাসিম ও যাকাম্বুর।

১. **সাবির :** বিপদ-আপদ ও বালা-মসিবতের তদারকি তার দায়িত্বে। অর্থাৎ মসিবতের সময় চিৎকার করা, মাতম করা, জামা-কাপড় ছিঁড়ে ফেলা, বুকে ও মুখে আঘাত করা ইত্যাদি কাজ করানো—যেগুলো জাহিলিয়াতে যুগে ছিল।

২. **আ'ওয়ার :** যিনা-ব্যভিচারের দায়িত্বে নিয়োজিত। তার প্ররোচনায় পড়ে মানুষ এ মন্দ কাজে লিপ্ত হয়ে থাকে।

৩. **মুসাওয়াত :** মিথ্যা-সংক্রান্ত বিষয়াশয় তার দায়িত্বে। সে মিথ্যা সংবাদ প্রচার করে এবং মানুষকে তা মনোযোগের সাথে শোনার প্রতি উৎসাহিত করে। সে মানুষের আকৃতিতে এক ব্যক্তির কাছে এসে কোনো এক মিথ্যা খবর শোনায়। সে ব্যক্তি মানুষের কাছে এসে বলে, আমি এক ব্যক্তিকে দেখেছি। তাকে চিনি কিন্তু নাম জানি না—সে বলেছে এমন কথা।[১]

৪. **দাসিম :** তার কাজ বড় অদ্ভুত। সে মানুষের ঘরে গিয়ে গৃহকর্তার চোখে গৃহে অবস্থানকারীদের দোষত্রুটি প্রকাশ করে দেখায় এবং তাকে উত্তেজিত করার ফন্দি আঁটতে থাকে।

৫. **যাকাম্বুর :** তার কাজ বাজারে। হাট-বাজারে এসে সে তার ঝান্ডা উত্তোলন করে থাকে।

মাখলাদ ইবনে হোসাইন বলেন, আল্লাহ তায়ালা বান্দাকে কোনো কাজের দিকে ডাকলে তখন শয়তান সেখানে গিয়ে উপস্থিত হয়। সে দু'টি কাজের

---

১ মাকায়িদুস শায়তান : ৩৫।

একটি করে থাকে। হয়তো বান্দার কাজে সীমালঙ্ঘন করাবে, নতুবা ত্রুটি-বিচ্যুতি করিয়ে ছাড়বে।

গ্রন্থকার শায়খ আবুল ফারাজ রহ. বলেন, শয়তানের প্রতারণা ও প্ররোচনা বহু ধরনের হয়ে থাকে। ইনশাআল্লাহ অচিরেই সেগুলো সম্পর্কে আলোকপাত করা হবে। যেহেতু শয়তানের চক্রান্ত অসংখ্য এবং সেগুলো মানুষের অন্তরকে বেষ্টন করে আছে, তাই সেগুলো থেকে বেঁচে থাকা খুবই দুরূহ কাজ। শয়তান মানুষকে তার মনঃপূত বিষয়ের দিকে আকৃষ্ট করে থাকে। তখন সে সেদিকে অনায়াসে দৌড়াতে থাকে, যেভাবে নৌকা পানির স্রোতে অনায়াসে চলতে থাকে। ফেরেশতারা কোনো মুসলমানকে যখন ঈমানের সাথে মৃত্যুবরণ করতে দেখে, তখন বিস্ময় প্রকাশ করে যে, কীভাবে শয়তানের অগুনতি ধোঁকা থেকে সে বেঁচে এলো।

আবদুল আযিয ইবনে রাফি বলেন, মুমিন বান্দার রুহ যখন আসমানে নিয়ে যাওয়া হয়, তখন ফেরেশতারা বলে, সুবহানাল্লাহ! আল্লাহ তায়ালা এ বান্দাকে শয়তান থেকে মুক্তি দিয়েছেন। আমরা তার মুক্তির ব্যাপারে আশ্চর্যবোধ করছি।

সকল মানুষের সাথে শয়তান রয়েছে মর্মে আলোচনা

ইবনে কুসাইত বলেন, উরওয়া ইবনে যুবাইর রহ. হজরত আয়েশা রা. থেকে বর্ণনা করেন, এক রাতে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর কাছ থেকে ওঠে বাইরে তাশরিফ নিয়ে গেলেন। হজরত আয়েশা রা. বলেন, এতে আমার ঈর্ষা হলো। অতঃপর তিনি এতে আমাকে চিন্তিত দেখতে পেয়ে বললেন, হে আয়েশা! তোমার কী হয়েছে? তোমার কি ঈর্ষা হচ্ছে? আমি আরয করলাম, ইয়া রাসুলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আপনার মতো মহান ব্যক্তির ওপর আমার মতো মেয়ের কেন ঈর্ষা হবে না? রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, হে আয়েশা! তোমার ওপর কি তোমার শয়তান প্রভাব ফেলছে? আমি আরয করলাম, ইয়া রাসুলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার কাছেও কি শয়তান আছে? তিনি বললেন, হ্যাঁ। আমি বললাম, আপনার সাথেও আছে? তিনি

বললেন, হ্যাঁ, আমার সাথেও আছে। কিন্তু আমার প্রতিপালক আমাকে তার ওপর বিজয়ী করে দিয়েছেন। এমনকি সে আমার অনুগত হয়ে গেছে।[১]

লেখক বলেন, এ হাদিসটি মুসলিমে রয়েছে। অন্যত্র এভাবে এসেছে যে, আল্লাহ তায়ালা আমাকে তার ওপর বিজয়ী করে দিয়েছেন। এ জন্য আমি তার মন্দ প্ররোচনা থেকে বিরত থাকতে পারি।

খাত্তাবি রহ. বলেন, সাধারণ বর্ণনায় فَأَسْلَمَ অর্থাৎ অতীতবাচক শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। যার অর্থ সে মুসলমান হয়ে গেছে। কিন্তু সুফিয়ান ইবনে উয়াইনা রহ. فَأَسْلَمُ তে মুযারে'র সীগাহ মুতাকাল্লিম ব্যবহার করেছেন। অর্থাৎ আমি তার মন্দ প্ররোচনা থেকে বিরত রয়েছি। সুফিয়ানের কথা হচ্ছে, শয়তান মুসলমান হতে পারে না। গ্রন্থকার বলেন, আমার মতে, ইবনে উয়াইনার কথা উত্তম। এ দ্বারা চেষ্টা-সাধনা ও কষ্ট-ত্যাগের আলামত প্রকাশ পায়। কেননা শয়তান তার বিরোধী। কিন্তু দৃশ্যত হজরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. এর হাদিসটি ইবনে উয়াইনার কথার সমর্থন করে না।

হজরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, তোমাদের মধ্যে কোনো মানুষ নেই, যার কাছে একজন ফেরেশতা আর একজন শয়তান থাকে না। সাহাবারা আরয করলেন, ইয়া রাসুলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! আপনার সাথেও কি এমন আছে? তিনি বললেন, আমার সাথেও আছে। কিন্তু আল্লাহ তায়ালা তার ওপর আমাকে বিজয়ী করে দিয়েছেন। এ কারণে আমার কাছ থেকে সত্য কথা ছাড়া আর কিছু বের হয় না।[২]

অন্য রেওয়ায়েতে আছে, فلا يأمرني إلا بخير আমার কাছ থেকে ভালো কাজ ছাড়া কিছু বের হয় না। লেখক বলেন, এ হাদিসটি কেবল মুসলিমে আছে। এর রাবি সালেম আবুল জুয়ুদের পুত্র। আবুল জুয়ুদের নাম রাফে'। হাদিসের বাহ্যিক ভাষ্য অনুযায়ী শয়তানের মুসলমান হওয়ার কথা বোঝা যাচ্ছে। দ্বিতীয় অভিমতের সম্ভাবনাও উড়িয়ে দেয়া যায় না।

---

১ সহিহ মুসলিম : হাদিস নং ২৮১৫

২ সহিহ মুসলিম : হাদিস নং ২৮১৪

মানুষের শিরায় শয়তানের বিচরণ মর্মে আলোচনা

নবী-সহধর্মিণী উম্মুল মুমিনীন হজরত সাফিয়্যাহ রা. বর্ণনা করেন, একবার তিনি রমাযানের শেষ দশকে মসজিদে আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর খেদমতে উপস্থিত হন। তখন আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইতিকাফরত ছিলেন। সাফিয়্যাহ তাঁর সঙ্গে কিছুক্ষণ কথাবার্তা বলেন। অতঃপর ফিরে যাবার জন্য ওঠে দাঁড়ান। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে পৌঁছে দেয়ার উদ্দেশে ওঠে দাঁড়ালেন। যখন তিনি (উম্মুল মুমিনিন) উম্মু সালামাহ (রাযি.)-এর গৃহ-সংলগ্ন মসজিদের দরজা পর্যন্ত পৌঁছলেন, তখন দু'জন আনসারি সেখান দিয়ে যাচ্ছিলেন। তাঁরা উভয়ে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে সালাম করলেন। তাঁদের দু'জনকে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তোমরা দু'জন থামো। ইনি তো (আমার স্ত্রী) সাফিয়্যাহ বিনতু হুয়ায়্যি রা.। এতে তাঁরা দু'জনে 'সুবহানাল্লাহ হে আল্লাহর রাসুল', বলে উঠলেন এবং তাঁরা বিব্রতবোধ করলেন। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, শয়তান মানুষের রক্তের শিরায় চলাচল করে। আমি ভয় করলাম যে, সে তোমাদের মনে 'মন্দ ধারণা' বা 'কোনো সন্দেহ' সৃষ্টি করতে পারে।[৩] হাদিসটি বুখারি ও মুসলিমে আছে।

খাত্তাবি রহ. বলেন, হাদিসটির ফিকহি শিক্ষা হচ্ছে, মানুষের এমন সব নিন্দনীয় বিষয় থেকে বিরত থাকা মুস্তাহাব, যা দ্বারা কু-ধারণা সৃষ্টি হয় এবং মনে ভয়ের সৃষ্টি হয়। তার উচিত—দোষ থেকে নিজেকে মুক্ত করতে মানুষের অপবাদ থেকে বাঁচার চেষ্টা করা। এ ব্যাপারে ইমাম শাফেয়ি রহ. হতে বর্ণিত আছে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই শঙ্কা করেছিলেন, যে আনসারি ওই দুই সাহাবির মনে কু-ধারণা আসতে পারে এবং এতে তারা কাফের হয়ে যেতে পারে। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর এমন করে বলাটা তাদের উপকারের স্বার্থে, ভিন্ন কোনো স্বার্থে নয়।

---

৩ সহিহ বুখারি : হাদিস নং ২০৩৫-৩১০১; সহিহ মুসলিম : হাদিস নং ২১৭৫-২৪৭০

শয়তান থেকে পানাহ চাওয়ার আলোচনা

শায়খ আবুল ফারাজ রহ. বলেন, আল্লাহ তায়ালা কুরআন তেলাওয়াতের সময় শয়তান থেকে পানাহ চাওয়ার নির্দেশ দিয়ে বলেছেন,

فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْءَانَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ

'সুতরাং যখন তুমি কুরআন পড়বে তখন আল্লাহর কাছে বিতাড়িত শয়তান হতে পানাহ চাও।[১]'

অন্যত্র জাদু আক্রান্ত হওয়ার সময় বলেছেন,

قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ

'বলো, 'আমি আশ্রয় প্রার্থনা করছি ঊষার রবের কাছে।[২]'

এ ধরনের দু'স্থানে যেহেতু শয়তান থেকে পানাহ চাওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন, অন্যস্থানে তো অবশ্যই পানাহ চাইতে হবে।

আবুততাইয়াহ বলেন, আমি আবদুর রহমান ইবনে খাম্বাশকে জিজ্ঞেস করলাম, আপনি কি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাহচর্য পেয়েছেন? তিনি বললেন, হ্যাঁ। আমি বললাম, তাহলে বলুন, যে রাতে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর জন্য শয়তান চক্রান্ত করেছিল, তখন তিনি কী করেছিলেন? তিনি উত্তরে বললেন, শয়তানের দল বিভিন্ন বন-জঙ্গল ও পাহাড়-পর্বত থেকে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ওপর এসে চড়াও হয়। তাদের একজনের হাতে ছিল অগ্নিশিখা। সে তা দিয়ে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর চেহারা মোবারক জ্বালিয়ে দিতে চেয়েছিল। ইত্যবসরে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে হজরত জিবরাঈল আলাইহিস সালাম এসে বললেন, ইয়া রাসুলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! আপনি পড়ুন। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আমি কী পড়ব? জিবরাঈল আলাইহিস সালাম বললেন, বলুন,

---

১ সুরা নাহাল : আয়াত ৯৮

২ সুরা ফালাক : আয়াত ১

أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ وَذَرَأَ وَبَرَأَ، وَمِنْ شَرِّ مَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمِنْ شَرِّ مَا يَعْرُجُ فِيهَا، وَمِنْ شَرِّ فِتَنِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، وَمِنْ شَرِّ كُلِّ طَارِقٍ إِلا طَارِقًا يَطْرُقُ بِخَيْرٍ يَا رَحْمَنُ، قَالَ: فَطُفِئَتْ نَارُهُمْ وَهَزَمَهُمُ اللَّهُ تَعَالَى

'আমি আশ্রয় চাচ্ছি আল্লাহ তায়ালার পরিপূর্ণ কালিমাসমূহের মাধ্যমে, তিনি যা সৃষ্টি করেছেন এবং বিস্তার করেছেন তার অনিষ্ট থেকে, আকাশ থেকে যা অবতীর্ণ হয় তার অনিষ্ট থেকে, আকাশে যা ওঠে তার অনিষ্ট থেকে। দিবা-রাত্রির অনিষ্ট থেকে এবং প্রত্যেক নিশাচরের অনিষ্ট থেকে, তবে ওই নিশাচর নয় যে কল্যাণ নিয়ে আসে হে দয়াময়।' রাবি বলেন, এই দোয়া পড়ার দ্বারা শয়তানের আগুন নিভে যায় এবং আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে পরাস্ত করে দেন।[৩]

হজরত আয়েশা রা. হতে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, 'তোমাদের সবার কাছে শয়তান আসে এবং জিজ্ঞেস করে, তোমাকে কে সৃষ্টি করেছে? সে বলে আল্লাহ। তারপর শয়তান বলে, তাহলে আল্লাহকে কে সৃষ্টি করেছে? সুতরাং তোমাদের কারও মনে যখন এই ধারণার সৃষ্টি হবে, তখন বলবে, آمنت بالله ورسوله এটা বললে তোমার কাছ থেকে ইবলিসের এই প্ররোচনা দূরীভূত হয়ে যাবে।'[৪]

হজরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, 'আদমসন্তানের ওপর শয়তানের প্রভাব রয়েছে, ফেরেশতারও প্রভাব রয়েছে। শয়তানের প্রভাব পড়লে সে মন্দ কাজে লিপ্ত হয় এবং সত্যকে অস্বীকার করে। অন্যদিকে ফেরেশতার প্রভাব পড়লে ভালো কাজের দিকে ধাবিত হয় এবং সত্যকে মান্য করে। তোমাদের মনে যখন সু-ধারণার উদয় হয়, তখন জেনে নেবে তা আল্লাহর পক্ষ থেকে এসেছে এবং শুকরিয়া আদায় করবে। পক্ষান্তরে মন্দ বিষয় উঁকি দিলে শয়তানের কাছ থেকে আল্লাহর কাছে পানাহ চাইবে। এরপর তিনি নিম্নোক্ত আয়াত পড়েন–

الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ

---

৩ মুসনাদে আহমাদ : ৩/৪১৯ [আলবানি রহ. হাদিসটি সহিহ বলেছেন]

৪ সহিহ মুসলিম : হাদিস নং ১০৩৪-৩৩৪

লেখক আল্লামা ইবনুল জাওযি রহ. বলেন, এই হাদিসটি জারির ইবনে আতা এবং আতা ইবনে মাসউদ রা. থেকে 'মাওকুফ' বর্ণনা করেন।

হজরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হজরত হাসান ও হজরত হোসাইন রা. এর জন্য নিম্নোক্ত দোয়া পড়ে পানাহ চাইতেন আর বলতেন, তোমাদের পিতা ইবরাহিম আলাইহিস সালাম ইসমাঈল ও ইসহাক আলাইহিস সালাম-এর জন্য দোয়া পড়ে পানাহ চাইতেন,

أُعِيذُكُمَا بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّةِ مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ وَهَامَّةٍ وَمِنْ كُلِّ عَيْنٍ لامَّةٍ

অর্থ : 'আমি আল্লাহর পরিপূর্ণ কালিমার দ্বারা প্রত্যেক শয়তান, বিষাক্ত প্রাণী এবং প্রত্যেক কুদৃষ্টির অনিষ্ট হতে পানাহ চাচ্ছি।'[১]

আবু বকর আম্বারি বলেন, 'হাম্মাহ' শব্দটি 'হাওয়াম' এর বহুবচন। হাম্মাহ ওই মাখলুকদের বলা হয়, যারা মন্দ ও ক্ষতিকারক বিষয়ের ইচ্ছে পোষণ করে। 'লাম্মাহ' অর্থ কষ্টদায়ক বস্তু।

সাবেত রহ. হতে বর্ণিত, মুতরাফ বলেন, আমি চোখ মেলে দেখলাম, আদম সন্তান মহান আল্লাহ তায়ালা এবং ইবলিসের মাঝে অবস্থান করছে। আল্লাহ যদি তাকে রক্ষা করতে চান তবে হেফাজত করেন। আর আল্লাহ যদি তাকে ছেড়ে দেন তাহলে শয়তান তাকে নিয়ে নেয়।

পূর্বেকার এক মনীষীর ঘটনায় উল্লেখ আছে, তিনি তাঁর ছাত্রদের কাছে প্রশ্ন করলেন, আচ্ছা, শয়তান যখন তোমার সামনে গুনাহের উপকরণ সুন্দরভাবে সাজিয়ে রাখে তখন তুমি কী করবে? ছাত্র বলল, আমি তাকে কষ্ট ও পরিশ্রমে পতিত করব। বুযুর্গ আবারও একই প্রশ্ন করলে ছাত্রও পুনরায় আগের মতো উত্তর দেয়। বুযুর্গ বললেন, এটা তোমার জন্য বেশ কষ্টসাধ্য হবে। অতঃপর বললেন, আচ্ছা, যদি তুমি কোথাও ছাগলের পালের নিকট দিয়ে গমন করো এবং সেই পালে একটি কুকুর তোমাকে আক্রমণ করে এবং তোমাকে সামনে অগ্রসর হতে না দেয়, তাহলে কী করবে? ছাত্র বলল, আমি যথাসম্ভব কুকুরকে প্রহার করব এবং যতদূর সম্ভব তাকে প্রতিহত করব। বুযুর্গ বললেন, এটাও তোমার জন্য কষ্টকর হবে।

---

১ সহিহ বুখারি : হাদিস নং ৩৩৭১

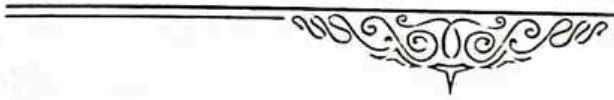
তোমার উচিত ওই ছাগলের পালের মালিককে ডাকা, সে তোমাকে কুকুরের আক্রমণ থেকে রক্ষা করবে।

গ্রন্থকার বলেন, জেনে রাখা দরকার—মুত্তাকি এবং দুনিয়াদারের সাথে ইবলিসের উদাহরণ হচ্ছে, যেমন এক ব্যক্তি বসে আছে এবং তার সম্মুখে কোনো খাবার নেই। কুকুর তার কাছে এলে সে যদি ধমক দেয় তবে কুকুর চলে যাবে। অন্যত্র গিয়ে যদি সে এমন ব্যক্তিকে দেখে যার সম্মুখে খাবার আছে, গোস্তও আছে; এই লোক কুকুরকে যতই ধমক দিক, কুকুর সরতে চাইবে না। প্রথমজন হচ্ছে মুত্তাকীর উদাহরণ। আর দ্বিতীয়জন হচ্ছে দুনিয়াদারের। তার থেকে শয়তান পৃথক হতে চাইবে না। কেননা সে সবার সাথে মিলেমিশে থাকে।

[আমরা আল্লাহর কাছে শয়তান হতে পানাহ চাই]

চতুর্থ অধ্যায়

‘তালবিস’ ও ‘গুরুর’ অর্থের বর্ণনা



আল্লামা ইবনুল জাওযি রহ. বলেন, 'তালবিস' অর্থ : মিথ্যাকে সত্যরূপে প্রকাশ করা। আর 'গুরুর' হচ্ছে একপ্রকার অজ্ঞতা, যার মাধ্যমে ভ্রান্ত মতাদর্শ বিশুদ্ধ মনে হয় এবং নিকৃষ্ট বস্তু উৎকৃষ্ট মনে হয়। এই অজ্ঞতার অন্তরালে রয়েছে এমন এক সন্দেহের উপস্থিতি, যা দ্বারা এই ধোঁকার সৃষ্টি হয়। ইবলিস সর্বোচ্চ চেষ্টা কসরত করে মানুষের কাছে আসে এবং তাকে কাবু করতে চায়। মানুষের বিবেক-বুদ্ধি ও জ্ঞান-অজ্ঞতার পার্থক্যের অনুপাতে ইবলিসের প্রভাব নিয়ন্ত্রিত হয়।

জেনে রাখা দরকার, মানুষের অন্তর একটি দুর্গের মতো। সেই দুর্গের চতুষ্পার্শ্ব প্রাচীরে ঘেরা। প্রাচীরের রয়েছে কিছু দরজা-জানালা। সেখানে অবস্থান করে আকল বা বিবেক-বুদ্ধি নামক পাহারাদার। ফেরেশতারা সেই দুর্গে যাতায়াত করে। দুর্গের একপাশে রয়েছে আশ্রয়কেন্দ্র। সেখানে প্রবৃত্তি এবং শয়তান আনাগোনা করে; এদেরকে কেউ বাধা-নিষেধ করে না। দুর্গওয়ালা ও আশ্রয়স্থলওয়ালাদের মাঝে প্রায়শ যুদ্ধ হয়। শয়তান দুর্গের আশেপাশে ঘোরাঘুরি করতে থাকে যাতে দুর্গপ্রহরীর অসতর্কতার সুযোগে দুর্গে ঢুকে পড়তে পারে। প্রহরীকে অসতর্ক পেলেই সে অন্দরমহলে প্রবেশ করে।

অতএব পাহারাদারদের উচিত, দুর্গের যে সকল দরজায় তাদেরকে নিয়োগ করা হয়েছে, সেদিকে যেন সর্বক্ষণ খেয়াল রাখে। সে যেন অল্প সময়ের জন্যও উদাসীন বা বেখবর না থাকে। কেননা শত্রু সর্বদা সুযোগের অপেক্ষায় আছে, সে কখনো উদাসীন থাকে না। কোনো এক ব্যক্তি হাসান বসরি রহ.-কে জিজ্ঞেস করেছিল, শয়তান কি নিদ্রা যায়? উত্তরে তিনি বলেন, শয়তান যদি নিদ্রা যেত, তাহলে আমাদের অনেক আরাম হতো। পরে সেই দুর্গ আল্লাহর স্মরণ ও ঈমানের নূর দ্বারা আলোকিত থাকত। সেই দুর্গে একটি বিশালাকৃতির আয়না রয়েছে। যে কেউ সেখানে তাদের মুখ দেখতে পায়। শয়তান যখন আশ্রয়কেন্দ্রে বসে তখন প্রথমে খুব বেশি করে ধোঁয়া ছড়ায়। এতে দুর্গের প্রাচীর কালো হয়ে যায় এবং আয়নায় মরিচা পড়ে যায়। এই ধোঁয়া 'ফিকর' তথা ভালো চিন্তা ও ধ্যানের মাধ্যমে দূরীভূত হয়ে যায় এবং আল্লাহর জিকিরের মাধ্যমে পরিষ্কার হয়ে যায়।

শত্রুপক্ষ কয়েক দিক থেকে আক্রমণ চালাতে চায়। কখনো দুর্গের ভেতর প্রবেশ করে, তখন পাহারাদার তাকে প্রতিহত করে। আবার কখনো ভেতরে প্রবেশ করে চুপিসারে বসে থাকে। আবার কখনো পাহারাদারের

অসতর্কতার সুযোগ নিয়ে দুর্গে অবস্থান করে। কখনো কখনো ধোঁয়া উড়িয়ে দেয়া বাতাসে বসে যায়। তা কেউ টের পায় না। কখনো আবার পাহারাদার অসর্তকতাবশত দুর্গ থেকে বের হয়ে যায়, তখন তাকে শয়তান বন্দি করে ফেলে এবং শয়তানদের খেদমত করতে বাধ্য করে। এমতাবস্থায় প্রবৃত্তির অনুসরণ করতে গিয়ে সে শয়তানের বাহিনীর সাথে সহাবস্থান করতে থাকে। তখনই শুরু হয় যাবতীয় পাপাচারের সূত্রপাত।

জনৈক বুযুর্গ বলেছেন, আমি শয়তানকে দেখেছি। সে আমাকে বলল, এমন একটা যুগ ছিল যখন আমি মানুষকে তালিম দিতাম। আর এখন আমিই মানুষ থেকে তালিম নিই। অধিকাংশ সময়ই শয়তান জ্ঞানী ও বুদ্ধিমানের সংশ্রবে থাকে এবং খাহেশাতে নফসানী তথা প্রবৃত্তিকে একজন নববধূর আকৃতিতে উপস্থাপন করে। ব্যস, মানুষ তা দেখে অনায়াসেই এর প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়ে এবং শয়তানের জালে সহজে আটকে যায়। পাষাণ ও শক্তিশালী যে শত্রুর ভয়ংকর জালে মানুষ বারেবারে হোঁচট খায়, তার নাম অজ্ঞতা ও মূর্খতা। তার চেয়ে কিছুটা কম শক্তিশালী শত্রু হচ্ছে নফসানী খাহেস বা প্রবৃত্তি। তার চাইতে কিছুটা দুর্বল শত্রু অলসতা ও উদাসীনতা। যতক্ষণ পর্যন্ত অণু পরিমাণ ঈমানের বর্ম কারও পরনে আচ্ছাদিত থাকে, ততক্ষণ পর্যন্ত সে শত্রুর তিরের আঘাতে ঘায়েল হয় না।

হাসান ইবনে সালেহ বলেন, শয়তান মানুষের জন্য নেকির নিরানব্বটি (৯৯) দরজা উন্মুক্ত করে, যার মধ্যে একটি দরজার উদ্দেশ্য থাকে পাপ কাজে লিপ্ত করা।

আ'মাশ বলেন, জনৈক ব্যক্তি বর্ণনা করেছেন, যিনি জিনের সাথে কথোপকথন করে থাকেন। তিনি বলেছেন, শয়তান পরস্পর আলাপচারিতায় বলে থাকে, যে ব্যক্তি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সুন্নাতের অনসরণ করে, তাকে ঘায়েল করা আমাদের জন্য খুবই কঠিন। কিন্তু যে প্রবৃত্তির অনুসরণ করে আমরা তাদের সাথে নিত্য খেলা করে থাকি।

পঞ্চম অধ্যায়

আকিদা-বিশ্বাসের ক্ষেত্রে শয়তানের ধোঁকা

সুফিসতায়িদের ওপর শয়তানের ধোঁকার বর্ণনা

গ্রন্থকার বলেন, সুফিসতায়ি এমন এক গোষ্ঠী, যারা সুফিসতা নামক ব্যক্তির অনুসারী। তাদের বিশ্বাস—বস্তুর কোনো হাকিকত বা বাস্তবতা নেই। কেননা যে-সব বস্তু আমরা দূর থেকে দেখে থাকি, তা হয়তো আমরা যেমন দেখছি তেমন, আবার এর বিপরীতও হতে পারে। আলেমরা তাদের ওপর অভিযোগ তুলে বলেছেন, তোমাদের এই কথার কোনো বাস্তবতা আছে? নাকি নেই? যদি তোমরা বলো যে, কোনো বাস্তবতা নেই, তাহলে তোমাদের দাবি গ্রহণযোগ্য নয়। কেননা একটা অবাস্তব ও অবান্তর কথা কীভাবে গ্রহণযোগ্য হতে পারে? পক্ষান্তরে যদি এর বাস্তবতা আছে বলে স্বীকার করো, তাহলে তোমরা নিজেদের মত বর্জন করে আমাদের মত মেনে নিলে যে, বস্তুর হাকিকত বা বাস্তবতা আছে।

আবু মুহাম্মাদ হাসান ইবনে মুসা নাওবখতি রহ. তাঁর প্রণীত *কিতাবুল আরা ওয়াদদিয়ানাত*-এ এই গোষ্ঠীর মাযহাবের আলোচনা করে বলেছেন, আমি অধিকাংশ মুতাকাল্লিমিন তথা তার্কিক আলেমদের দেখেছি, তারা মাযহাবটি সম্পর্কে স্পষ্ট ভ্রান্তিতে রয়েছেন। কেননা তারা এ গোষ্ঠীটির সাথে বিতর্ক ও মুবাহাসা করেছেন এবং বিস্তারিত প্রমাণপঞ্জি ও মুনাযারার মাধ্যমে তাদের যুক্তি খণ্ডন করেছেন। অথচ এরা কিছুতেই বস্তুর হাকিকত, নির্দেশ এবং প্রত্যক্ষকরণকে স্বীকার করতে রাজি নয়। তথাপি কীভাবে এসব ব্যক্তি তাদের সাথে কথা বলে? যারা বলে, আমরা জানি না তোমরা আমার সাথে কথা বলছ, নাকি বলছ না। এ সব লোক কী করে বিতর্ক করতে আসে? যে এটুকু জানে না যে, সে উপস্থিত আছে নাকি অনুপস্থিত! এমন লোকেরা কী করে কারও উদ্দেশ্যে কথা বলে? যারা উদ্দিষ্ট ব্যক্তিকে অদৃশ্যের দাবি করে! বিশুদ্ধকে বাতিল মনে করে!

নাওবখতি বলেন, বিতর্ক তাদের সাথে মানায়, যারা একটি স্থির লক্ষ্য নির্ণয় করে এবং নির্দিষ্ট একটি দাবিতে অটল থাকে। তার দাবি সাব্যস্তের লক্ষ্যে সে নানাবিধ প্রমাণ ও যুক্তি উপস্থাপন করবে। কিন্তু এদের তো কোনো সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য বা দাবি নেই, যাতে তারা স্থির থাকতে পারে। সুতরাং এদের সাথে বিতর্কে জড়ানোর কোনো মানে হয় না।

গ্রন্থকার বলেন, তার কথাটি আবুল ওয়াফা ইবনে আকিল খণ্ডন করে বলেছেন, একটি দলের অভিমত, আমরা সুফিসতায়িদের সাথে কী ব্যাপারে কথা বলব? কেননা সর্বোচ্চ তারা এমন করতে পারে যে, বিতার্কিকদের

যুক্তিকে তারা স্পর্শযোগ্য বস্তুর সাথে তুলনা করবে এবং উপস্থিতকে অজ্ঞাত বা অনুপস্থিত বলে প্রমাণ দেবে। অথচ এসব লোক গোড়া থেকেই স্পর্শযোগ্য বিষয়ের অস্বীকারকারী। আবুল ওয়াফা বলেন, এ বিষয়টি খুবই হীনম্মন্যতার পরিচায়ক। তাদের সাথে বিতর্ক করে নিরাশ হয়ে ফেরার কোনো যুক্তি নেই। কেননা তারা যা কিছু ভাবনা লালন করছে, তা কেবল কুমন্ত্রণা; এর বেশি কিছু নয়। সুতরাং তাদের অযৌক্তিক যুক্তিতে ভগ্নমনোরথে ফেরার অবকাশ নেই। এদেরকে ঘাড়ত্যাড়া প্রকৃতির সাথে জুড়িয়ে দেয়া হয়েছে। আমাদের এবং তাদের উপমা হচ্ছে, আল্লাহ একজন ট্যারা চক্ষুবিশিষ্ট লোক পাঠিয়েছেন, যে সর্বদা একটি চাঁদকে দু'টি দেখে। সে তার ধারণায় কখনো সন্দিগ্ধ হয় না। নিশ্চিতভাবে সে মনে করে, আকাশজুড়ে দু'টি চাঁদই আবহমান কাল ধরে বিদ্যমান। তার জন্মদাতা পিতা বলে, চাঁদ একটি। তোমার চক্ষুর সমস্যার কারণে দু'টি দেখছ। নিজের ট্যারা চোখটি বন্ধ করে দেখো তো! যখন সে এক চোখ করে, তখন বলে, জানো বাবা! এখন আমি একটি চাঁদ দেখছি, কারণ আমার একটি চোখ এখন বন্ধ! তাই আরেকটি অদৃশ্য হয়ে গেছে। এখন তার কথা দ্বারা আরও একটি সন্দেহ সৃষ্টি হয়ে গেল। পরে তার পিতা বলল, আচ্ছা যদি তোমার কথা মতে এ কারণেই একটি চাঁদ অদৃশ্য হয়ে যায়, তাহলে এক কাজ করো। তোমার যে চোখটি ভালো, সেটি একবার বন্ধ করে ট্যারা এক চোখে দেখো তো দেখি! ট্যারা ছেলে যখন এমনটি করে দেখল যে, কিরে এখন দেখি এক চোখে আবার দুই চাঁদ! এবার সে হাড়ে হাড়ে বাবার কথার সত্যতার প্রমাণ পায় যে, আসলে চাঁদ একটিই।

মুহাম্মাদ ইবনে ঈসা নিযাম বলেন, সুফিসতায়ি মতাদর্শী সালেহ ইবনে আবদুল কুদ্দুসের এক ছেলে মারা গেলে আবুল হুযাইল তার কাছে যান। আমিও তার সঙ্গী ছিলাম এবং সে সময় ছোট ছিলাম। সালেহ খুব শোকাপ্লুতস্বরে কথা বলছিল। তার পেরেশান অবস্থা প্রত্যক্ষ করে আবুল হুযাইল বললেন, আমি তোমার শোক ও দুঃখের কোনো কারণ দেখছি না। কেননা তোমাদের মতে তো মানুষ আর নিষ্প্রাণ বস্তুর মাঝে কোনো পার্থক্য নেই। সালেহ উত্তরে বলল, হে আবুল হুযাইল! আমি ছেলের বিরহে কাঁদছি না। আমি তো কাঁদছি এ জন্য যে, সে 'কিতাবুশ শুকূক' বা সন্দেহের কিতাব পড়েনি। আবুল হুযাইল জানতে চাইলেন, 'কিতাবুশ শুকূক' আবার কী? সে বলল, ওটা সেই কিতাব—যা আমি লিখেছি। যে সেটা পড়বে, সে অতীতের কর্মকাণ্ড নিয়ে সন্দিহান হয়ে যাবে। নিযাম বলেন, আমি সালেহকে

বললাম, তাহলে তুমিও তোমার পুত্রের মৃত্যুতে সন্দেহ করো এবং তার ওপর আমল করো। ভাববে যে, সে মরেনি, কিংবা হয়তো মরে গেছে। সন্দেহে পতিত হয়ে যাও, সে কি *কিতাবুশশুকুক* পড়েছে? হয়তো পড়েছে, যদিও সে পড়েনি।

আবুল কামেস বলখি ঘটনা বর্ণনা করে বলেন, জনৈক সুফিসতায়ি একজন তার্কিক আলেমের কাছে আসা-যাওয়া করত। একবার উভয়ের মাঝে বিতর্ক হলো। তার্কিক আলেম এক লোককে বলে দিলেন যে, সুফিসতায়ির বাহনটি কোথাও সরিয়ে নাও। তো, সুফিসতায়ি লোকটি ঘর থেকে বের হয়ে বাহন না পেয়ে আলেমের কাছে গিয়ে বলল, আমার বাহনটি কোথায়? আলেম উত্তর দিলেন, এটা কেমন কথা? তুমি হয়তো বাহনে করে আসনি। সে বলল, কেন বাহন নিয়ে আসব না? আলেম বললেন, সত্যি করে বলো। সে বলল, এটা আমি নিশ্চিত করেই বলছি। আলেম বারংবার বলতে থাকলেন যে, তুমি হয়তো বাহন নিয়ে আসোনি, মনে করে দেখো। সে বলল, আপনি কী বলতে চান? এটা মনে করার মতো কোনো বিষয় নয়। আমি নিশ্চিত যে, আমি বাহনে করেই এসেছি। আলেম বললেন, তাহলে তুমি কীভাবে দাবি করো যে, বস্তুর কোনো হাকিকত বা বাস্তবতা নেই? কেমন করে দাবি করো যে, নিদ্রা এবং সজাগ অবস্থা একই সমান? সুফতাসায়ি লাজবাব বনে গেল এবং স্বীয় মাযহাব ছেড়ে আসতে বাধ্য হলো।

দার্শনিকদের ওপর শয়তানের ধোঁকা

নাওবখতি[১] বলেন, অজ্ঞদের দল মনে করে, বস্তুর হাকিকত বা বাস্তবতা বিশেষ একটি নয়; বরং প্রত্যেক বস্তুর বাস্তবতা প্রত্যেক জাতি-গোষ্ঠীর নিকট তাদের বিশ্বাসের অনুরূপ। যেমন—মধু পিত্ত প্রকৃতি রোগীদের কাছে তিক্ত স্বাদের হয় আর অন্যদের কাছে তা খুবই মিষ্টি। অনুরূপভাবে পৃথিবীকেও যারা 'কাদিম' আদি মনে করে, তাদের মতে আদি। আবার যারা 'হাদেস' অনাদি ও অবিনশ্বর মনে করে, তাদের দৃষ্টিতে অনাদি। আর বিভিন্ন প্রকার রং-কে যারা শরীরী মনে করে, তাদের মতে তা 'আরেযি' তথা পরনির্ভরশীল। অর্থাৎ বস্তুর বাস্তবতা বিভিন্ন রকম।

---

১ তার পূর্ণ নাম : আবু মুহাম্মাদ আল হাসান ইবনে ইহাইয়া আন নাওবাখতি। তিনি একজন ইমামিয়া শিয়াপন্থী বিতার্কিক। নিজ মতবাদের ওপর লেখা তার গ্রন্থের নাম 'আল আরা ওয়াদ দিয়ানাত'।

নাওবখতি বলেন, এরাও সুফিসতায়িদের অন্তর্ভুক্ত। তাদের জবাবে বলা যায়, তোমাদের কথা সঠিক? তাহলে তারা বলবে, হ্যাঁ, আমাদের মতে সঠিক আর তোমাদের মতে ভুল। তখন আমরা বলব, তোমার এই স্বীকারোক্তি তোমাদের মাযহাব নিজেদের বিরুদ্ধেই বাতিল বলে গণ্য হলো। তোমাদের কাছে দলিল আছে। আর যে কোনো কারণে নিজের কথা বাতিল হওয়ার ওপর দলিল সাব্যস্ত করে, তাহলে তার বিপক্ষে তার মাযহাব বাতিল হিসেবে পরিগণিত হওয়ার জন্য যথেষ্ট। দ্বিতীয় আরেকটি উত্তর তাদের ক্ষেত্রে এমনভাবে উপস্থাপন করা যায়, তাদেরকে জিজ্ঞেস করা হবে, তোমরা প্রত্যক্ষদর্শনের জন্য কোনো বাস্তবতা মানো কি না? যদি বলে, প্রত্যক্ষদর্শনের বাস্তবতা বিশ্বাসের ওপর নির্ভরশীল। তাহলে তারা মূল হাকিকত তথা বাস্তবতাকে অস্বীকার করল। এখন তাদের সাথে ওইভাবেই কথা হবে যেভাবে কথা হয়েছিল পূর্ববর্তী সম্প্রদায়ের সাথে।

নাওবখতি বলেন, এই গোষ্ঠীর কেউ কেউ এমন আছে, যারা বলে, পৃথিবী বিবর্তনশীল। তারা আরও বলে, মানুষ একটি বস্তু দ্বিতীয়বার মনে রাখতে পারে না। কেননা বস্তু সর্বদা বিবর্তিত ও পরিবর্তিত হতে থাকে। তার উত্তরে বলা যায়, তোমরা এই জ্ঞান কোথায় পেলে? অথচ তোমরা নিজেরাই ওই বাস্তবতাকে অস্বীকার করো, যার কারণে এই পৃথিবী অস্তিত্বে এসেছে। দ্বিতীয়বার আমরা যখন তোমাদের কাউকে জবাব দেবো, তখন সেই ব্যক্তি হবে না—যার সাথে আমরা কথা বলেছি।

দাহরিয়াদের ওপর শয়তানের ধোঁকা

গ্রন্থকার বলেন, ইবলিস বহু মাখলুককে এই সংশয়ে নিমজ্জিত করেছে যে, নাউযুবিল্লাহ, কোনো সৃষ্টিকর্তা ও মাবুদ নেই। আর এই বস্তুজগৎ কোনো সৃষ্টিকর্তার মাধ্যম ছাড়াই অস্তিত্বে এসেছে। এসব লোক যেহেতু সৃষ্টিকর্তাকে কোনো কিছুর মাধ্যমে পাননি এবং তার পরিচয়ের জন্য জ্ঞান-বুদ্ধি খাটাননি, তাই তারা সৃষ্টিকর্তাকে সম্পূর্ণভাবে অস্বীকার করে যাচ্ছে। কোনো বুদ্ধিমান লোক কি এমন নাস্তিক্যবাদী চিন্তা-চেতনা লালন করতে পারে? মানুষের চলাচল যদি এমন কোনো মাঠের পাশ দিয়ে হয়, যেখানে কোনো দালান কোঠা নেই, পরে আবার কখনো সেখান দিয়ে অতিবাহিত হওয়ার সময় যদি কোনো দেয়াল বা দালানের অস্তিত্ব দেখে, তাহলে নিশ্চিত করে সে বলবে, এই দেয়াল বা দালানের কোনো নির্মাতা অবশ্যই রয়েছেন। তাহলে এই

জমিনের বিছানা, ওই বিশাল আকাশ এবং এ সব আশ্চর্য বস্তুজগৎ কি এর সৃষ্টিকর্তার অস্তিত্বের প্রমাণ দেয় না? কোনো এক আরব কবি কত সুন্দর করে বলেছেন :

إن البعرة تدل على البعير * فهيكل علوي بهذه اللطافة

ومركز سفلي بهذه الكثافة * أما يدلان على اللطيف الخبير

"উটের বাহ্য তার উট হওয়ার ওপর প্রমাণ সাব্যস্ত করে। তাহলে মহাকাশের ওই সূক্ষ্মজগৎ আর জমিনের এই সমুদয় বস্তুজগৎ কি মহান কুশলী এবং সর্বজ্ঞাত সৃষ্টিকর্তার প্রমাণ দেয় না?"

আবার মানুষ যদি তার নিজের সত্তা ও অস্তিত্ব সম্পর্কে চিন্তা-গবেষণা করে তাহলে এ ব্যাপারে সে যথেষ্ট প্রমাণ ও যুক্তি পেতে পারে। কেননা এই মানব শরীরে যে প্রজ্ঞা ও হেকমত বিদ্যমান, এখানে সবিস্তারে তা আলোকপাতের অবকাশ নেই। চিন্তা করুন, সামনের দাঁত এজন্য ধারালো করে সৃষ্টি করেছেন যাতে খাবার বা অন্যান্য বস্তু কাটা যায়। ভেতরের দাঁতগুলো প্রশস্ত করে সৃষ্টি করেছেন, যাতে খাবার পেষণ ও চূর্ণ করা যায়। জিহ্বাকে এমন নরম করেছেন যাতে খাবারকে ওলট-পালট করা যায়। আঙ্গুলে গিড়া সৃষ্টি করা হয়েছে যাতে তা খোলা এবং বন্ধ করা যায়। এতে করে তার জন্য কাজ করা সহজ হয়। আবার কোনো কোনো আঙ্গুল বড় আবার কোনোটা ছোট। আবার সবগুলো আঙ্গুল মেললে বরাবর সমান হয়ে যায়। এতেও রয়েছে অপরিসীম হেকমত। কে সৃষ্টি করল এই শরীর? মানবদেহে আল্লাহ তায়ালা কিছু অদৃশ্য শক্তি রেখেছেন। তন্মধ্যে একটি হলো প্রাণ। প্রাণ বের হয়ে গেলে মানবদেহ বেকার হয়ে পড়ে। আরেকটি হলো আকল বা বিবেক; যা মানুষকে কল্যাণজনক বিষয়ের প্রতি পথ প্রদর্শন করে। প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ প্রত্যহ বলে, أفي الله شك "আল্লাহর অস্তিত্বে কি কোনো সন্দেহ আছে?" আসলে এরা আল্লাহকে প্রকাশ্য জাগতিক উপায়ে দেখার বৃথা চেষ্টা করে পথভ্রষ্ট হয়েছে।

কিছু লোক আল্লাহর অস্তিত্বকে অস্বীকার করে এ জন্য যে, আল্লাহ তায়ালার যে অস্তিত্ব 'ইজমালি' বা মিলিতভাবে সাব্যস্ত করা হয়েছে তারা তা বিস্তারিতভাবে উপলব্ধি করতে পারেনি। পক্ষান্তরে আমরা অনেক জিনিস এ-রূপ ইজমালি ও মোটামুটিভাবে উপলব্ধি করি; বিস্তারিত উপলব্ধি করতে পারি না। কিন্তু এর দরুন ওই জিনিসের অস্তিত্ব অস্বীকার করি না। যেমন

বিবেক-বুদ্ধি আমরা ইজমালি ও মোটামুটিভাবেই উপলব্ধি করে থাকি। বিস্তারিতভাবে জ্ঞানেন্দ্রিয় দ্বারা উপলব্ধি করতে পারি না। তাই বলে কি আকল বা বিবেকের অস্তিত্বকে কেউ অস্বীকার করতে পারবে?

নাস্তিকেরা আমাদের উপরোক্ত যুক্তিতে প্রশ্ন উত্থাপন করে যে, তোমাদের কথা অনুযায়ী যেভাবে কোনো একটি নবঘটিত বস্তুর জন্য সৃষ্টিকর্তার প্রয়োজন, অদ্রূপ মূলধাতুরও প্রয়োজন; যা পূর্ব হতে ছিল। যেমন টেবিল তৈরি করতে হলে যেভাবে মিস্ত্রির প্রয়োজন, তেমনই কাঠেরও প্রয়োজন—যা মূলধাতু উপাদান। টেবিলের যে আকৃতি আমাদের সামনে দেখা যাচ্ছে, তার জন্য উক্ত উপাদান অপরিহার্য। এ হিসেবে জগৎ চিরন্তন ও অবিনশ্বরই প্রমাণিত হলো।

এ প্রশ্নের জবাবে বলা হবে, আল্লাহ তায়ালা কোনো বস্তু সৃষ্টি করার ব্যাপারে কোনো ধাতু ও উপাদানের মুখাপেক্ষী নন। কোনো প্রকার ধাতু ও উপাদান ব্যতীতই তিনি সবকিছু সৃষ্টি ও আবিষ্কারে সক্ষম। কোনো আকৃতির অস্তিত্বের জন্য ধাতু ও উপাদান অপরিহার্য নয়। যেমন চরকার একটি আসল আকৃতি আছে। কিন্তু চরকা যখন ঘুরতে থাকে তখন প্রতি মুহূর্তে তার আকৃতির পরিবর্তন হতে থাকে। আর সে আকৃতির জন্য কোনো ধরনের ভিন্ন উপাদান নেই। এ ক্ষেত্রে এমন এক আকৃতি পাওয়া যায়—যা উপাদানবিহীন। কিন্তু তোমরা সৃষ্টির এমন একটি উপমা দেখাও—যা সৃষ্টিকর্তাবিহীন অস্তিত্ব লাভ করেছে।

প্রকৃতিবাদীদের ওপর শয়তানের ধোঁকার বর্ণনা

গ্রন্থকার বলেন, শয়তান যখন দেখল, নাস্তিক্যবাদ তথা সৃষ্টিকর্তার অস্বীকারকারীদের মধ্যে তার কথা কম মান্য করা হয়। কেননা মানুষের বিবেক-বুদ্ধি এ কথার সাক্ষ্য দেয় যে, সৃষ্টিবস্তুর অবশ্যই সৃষ্টিকর্তা থাকা চাই। শয়তান এবার এই ধূম্রজাল ছড়াল যে, এই সৃষ্টিবস্তু প্রাকৃতিকভাবেই সৃষ্টি হয়েছে। মৌল চার উপাদানের মাধ্যমে এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি। সুতরাং বোঝা যাচ্ছে, এগুলো প্রাকৃতিকভাবেই সৃষ্ট।

তার উত্তর হচ্ছে, আমরা বলি, প্রকৃতির সমবেত হওয়া তো এ কথার প্রমাণ বহন করে যে, প্রকৃতি বিদ্যমান। না এটা নিজেই সৃষ্টিকর্তা। তথাপি এটাও প্রমাণিত যে, প্রকৃতি সমবেত ও সংমিশ্রণ ব্যতীত অস্তিত্বেই আসতে পারে না এবং এটা খোদ প্রকৃতিরই বিপরীত। সুতরাং বোঝা গেল প্রকৃতিও

আদিষ্ট ও অপারগ। তাছাড়া এটাও স্বীকৃত যে, প্রকৃতির নিজস্ব কোনো জীবন, জ্ঞান ও শক্তি নেই। সুতরাং এটা কী করে সৃষ্টিকর্তা হতে পারে? একটি সুশৃঙ্খলিত ও সুনিয়ন্ত্রিত কর্মযজ্ঞ কোনো জ্ঞানী বা বুদ্ধিসম্পন্নই করতে পারে। কোনো বস্তু নিজেই যখন জ্ঞানী নয়, তখন কী করে সে আরেক জ্ঞানীর সৃষ্টিকর্তা হতে পারে? যার নিজস্ব কোনো শক্তি নেই সে অন্যকে শক্তি বিলাবে কীভাবে? বিরুদ্ধবাদীরা যদি বলে যে, সৃষ্টিকর্তা যদি জ্ঞানী ও বুদ্ধিমান হতো তাহলে এই সৃষ্টিবস্তুতে কোনো ত্রুটি থাকত না এবং কষ্টদায়ক কোনো জীবজন্তু সৃষ্টি হতো না। তাই এগুলো সব প্রাকৃতিকভাবেই সৃষ্টি। আমরা এর উত্তরে বলে থাকি, এই অভিযোগ তোমাদের ওপর পতিত হয়। মহান সৃষ্টিকর্তা যেভাবে সুনিপুণ ও সুশৃঙ্খলিতভাবে বিশ্বজগৎ ও জাগতিক বস্তু-সামগ্রী সৃষ্টি করেছেন, প্রকৃতির মাধ্যমে তা কখনো সম্ভব নয়। আমরা দেখতে পাই, একই মৌসুমে সূর্যের প্রতিক্রিয়া বিভিন্ন ফলে বিভিন্ন রকম হয়ে থাকে। কোনো শস্য বা ফলে রস আনয়ন করে আবার কোনোটিতে রস শোষণ করে। যদি প্রকৃতিই প্রকৃত কর্তা হতো তাহলে এ পার্থক্য ঘটত না। এর অবশ্যই একজন নিয়ন্তা ও কর্তা রয়েছেন। যিনি সূর্য দ্বারা ইচ্ছেমাফিক কাজ নেন। আরও লক্ষ করা যেতে পারে, যাকে সূর্যের কিরণ শুষ্ক করে সেটা থাকে আবরণমুক্ত। আর যাকে আর্দ্র ও রসালো করে সেটা থাকে আবরণমুক্ত। অথচ বাহ্যিক দৃষ্টিতে ক্রিয়া বিপরীত হওয়ার কথা ছিল।

আমরা আরও দেখতে পাই, একই পানি দ্বারা উৎপন্ন ফলমূলের কোনোটি টক হচ্ছে, আবার কোনোটি হচ্ছে মিষ্ট। এটা একমাত্র মহান সৃষ্টিকর্তারই কাজ, যিনি মহা প্রজ্ঞাবান, সক্ষম ও সক্রিয়। সেদিকে ইশারা করে পানি সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা বলেন,

يُسْقَىٰ بِمَاءٍ وَاحِدٍ وَنُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلَىٰ بَعْضٍ فِي الْأُكُلِ

"সবই সিঞ্চিত একই পানিতে কিন্তু স্বাদের ক্ষেত্রে আমি করে দেই তাদের কোনোটাকে বেশি ভালো এবং কোনোটাকে কম ভালো।"[১]

---

১ সুরা রা'আদ : ৪

দ্বিত্ববাদী (সানুভিয়া)-দের ওপর শয়তানের ধোঁকা

দ্বিত্ববাদী বা সানুভিয়াদের মতাদর্শ হচ্ছে, তারা বলে, পৃথিবীর সৃষ্টিকর্তা দু'জন। ১. ভালো কাজের সৃষ্টিকর্তা, এটি নূর বা আলো, ২. মন্দ কাজের সৃষ্টিকর্তা, এটি যুলমাত বা অন্ধকার। উভয়টিই 'কাদীম' তথা অনন্ত, অনাদি ও চিরন্তন। উভয়েই সর্বদা ছিলেন এবং থাকবেন। উভয়ে শক্তিশালী, স্পর্শযোগ্য, শ্রোতা ও দ্রষ্টা। উভয়ে একে অন্যের বিপরীত।

দ্বিত্তবাদীদের কিতাব থেকে তাদের এই আকিদার কথা উল্লেখ করেছেন আবু মুহাম্মাদ নাওবখতি। তিনি বলেন, তাদের ধারণা—সেই দুই সৃষ্টির্কতা একজন অন্যজনের কাছাকাছি অবস্থান করেন। তাদের অনেকে মনে করে, নূর সর্বদা অন্ধকারের উপরে অবস্থান করে। কারো কারো ধারণা মতে, উত্তরে নূর তথা আলোর অবস্থান আর দক্ষিণে অন্ধকার। সর্বদা তারা একে অপরের থেকে পৃথক হয়ে অবস্থান করে। নাওবখতি বলেন, সানুভিয়াদের মতে, উভয় খোদা পাঁচ পাঁচটি বস্তুতে বিভক্ত। তন্মধ্যে চারটি হচ্ছে দেহজাতীয় আর একটি রুহ। নূরের দেহ চতুষ্টয়—অগ্নি, আলো, বাতাস ও পানি। আর তার রুহ হচ্ছে জ্যোতি। যা শরীরে সর্বদা অবস্থান করে। অনুরূপভাবে অন্ধকারের দেহ চতুষ্টয়—দাহন, তিমির, উত্তপ্ত হওয়া ও ধূলি। আর রুহ হচ্ছে ধূম্র। তারা নূরের শরীরকে 'মালাইকা' বা ফেরেশতা বলে আখ্যায়িত করে। আর অন্ধকারের শরীরকে শয়তান নামে ডাকে। কেউ কেউ বলে, অন্ধকার থেকে শয়তান সৃষ্টি হয় আর নূর দ্বারা ফেরেশতা সৃষ্টি হয়। নূর মন্দকে টপকাতে পারে না, আবার অন্ধকারও ভালোকে টপকাতে পারে না। নাওবখতি তাদের মাযহাবের আলো-অন্ধকার সংক্রান্ত অনেক মতভেদের কথা বর্ণনা করেছেন। তন্মধ্যে একটি হচ্ছে, তাদের ওপর কষ্ট ও ত্যাগ আবশ্যক এবং একদিনের অধিক খোরাক জমা রাখা যাবে না।

তাদের কারো কারো মতে, মানুষের জন্য তার জীবনের এক-সপ্তমাংশ রোজা রাখা বাধ্যতামূলক। মিথা, কৃপণতা, জাদু, মূর্তিপূজা, ব্যভিচার এবং চুরি পরিত্যাগ করা ফরয। কোনো প্রাণীকে কষ্ট দেয়া যাবে না। এসব ব্যাপারে তারা তাদের অপূর্ণ বুদ্ধি দিয়ে নিত্য-নতুন মতবাদ তৈরি করে।

ইয়াহইয়া ইবনে বিশর নাহাভান্দী বলেন, তাদের মধ্যে একটি গোত্র আছে যাদেরকে 'দিসানিয়া' বলা হয়। তাদের মতবাদ হচ্ছে, পৃথিবীর মূল উপাদান কঠিন ও রুক্ষ ছিল। এই অভ্যাস এককালে আল্লাহর শরীর, যাকে অগ্নি বলা হয়, তাতে অবস্থিত ছিল। আল্লাহ তায়ালা এতে কষ্ট পেয়েছেন।

নির্দিষ্ট এক সময় অতিক্রম হলে তিনি পৃথক করতে গেলে তা দেহের সাথে মিশে যায়। সেই দেহ এবং মৃত্তিকা দিয়েই এই পৃথিবী গঠিত। যা কিছু ভালো তার নূর, আর যা কিছু মন্দ তা যুলমাত বা অন্ধকার। যারা এই আকিদা লালন করে, তারা মানুষকে খুন করে এবং কষ্ট দেয়।

যারা এই আকিদা পোষণ করতে বাধ্য হয়, তার নেপথ্য কারণ হচ্ছে, তারা পৃথিবীতে মন্দ ও মতপার্থক্যে প্রভাবিত হয়ে পড়ে। সুতরাং বোঝা গেল একটি মূল বস্তু থেকে দু'টি বিপরীতমুখী বস্তু প্রকাশ হতে পারে না। যেমন আগুনে গরম ও ঠাণ্ডা একত্র হতে পারে না। আলেমগণ তাদের দ্বিত্ব মতবাদকে এভাবে খণ্ডন করেছেন যে, যদি সৃষ্টিকর্তা দু'জন হতেন তাহলে নিশ্চিত তারা একে অন্যের ওপর বিজয়ী হতেন অথবা পরাজিত হতেন। অথবা একজন বিজয়ী হতেন অন্যজন হতেন পরাজিত। এটা তো সম্ভব নয় যে, উভয়ে পরাজিত। সুতরাং একটি পন্থা খোলা আছে, তা হলো—উভয়ে বিজয়ী হওয়া। এখন ধরুন তাদের কেউ, একটি দেহকে নির্দিষ্ট কোনো নড়া-চড়ায় ফেলতে চান, অন্যজন চান চুপ রাখতে। তাহলে এদের উভয়ে যে লক্ষ্যে পৌঁছতে চাচ্ছেন, তা কি একই সময়ে একজনের ওপর কখনো সম্ভব? কেননা একজন যদি তার ইচ্ছা পূরণ করেন, তাহলে অন্যজন তো অপারগ হয়ে গেলেন।

সানাভিয়াদের মতবাদ 'ভালোর জনক নূর, মন্দের জনক যুলমাত বা অন্ধকার'—এটাকে আলেমগণ এভাবে খণ্ডন করেছেন যে, যদি কোনো মজলুম ভেগে গিয়ে অন্ধকারের কাছে আশ্রয় পায়, তাহলে এটা তো ভালো কাজ—যা মন্দের পক্ষ থেকে এসেছে। সুতরাং এই গোষ্ঠীর সাথে বিতর্কে জড়িয়ে নিজেকে প্রভাবিত বা প্রতারিত করা অনুচিত। কেননা তাদের মাযহাব নিছক একটি ধোঁকা, যার কোনো উৎস নেই।

দার্শনিক ও তাদের অনুসারীদের ওপর শয়তানের ধোঁকা

শয়তান দার্শনিকদেরকে ধোঁকা দেয়ার ক্ষেত্রে নিয়ন্ত্রণ পাওয়ার কারণ হচ্ছে, তারা কেবল তাদের অভিমত এবং বুদ্ধির শেকলে বন্দি। তারা নিজ খেয়াল-খুশি মতো কথা বলে। নবী আলাইহিস সালাম-দের প্রতি মনোযোগী হয় না। তাদের কেউ দাহরিয়া মতাদর্শ লালন করে। যারা বলে, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের কোনো সৃষ্টিকর্তা নেই। দার্শনিকদের এই মতবাদ নাওবখতিসহ অন্যান্যরা তাদের গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। নাহাভান্দি বলেন, এরিস্টটল এবং তার

অনুসারীদের মতে, পৃথিবী একটি গ্রহ—যা আকাশে ঘুরছে। এমন প্রত্যেক তারকার মধ্যে পৃথিবীর মতো অনেক পৃথিবী আছে। গাছ ও নদী আছে, যেমন পৃথিবীতে আছে। এই দলটি সৃষ্টিকর্তায় বিশ্বাসী নয়। এদের মধ্যে অনেকের বিশ্বাস—এই পৃথিবী অনাদি ও অবিনশ্বর। তাদের মতে সৃষ্টিকর্তার অস্তিত্বের সাথেই এর অস্তিত্ব লাভ হয়েছে। জালিনূস বলেন, সূর্য যদি নশ্বর হতো, তাহলে এতকাল অতিবাহিত হওয়ার পর অক্ষয় ও অপরিবর্তিত থাকত না। সূর্যের সাথে যেমন আলো সম্পৃক্ত, সৃষ্টিকর্তার সাথেও সৃষ্টি সম্পৃক্ত। একটি আরেকটির আগে বা পরে নয়। পরস্পর পরিপূরক। এই পক্ষের জবাবে বলা যায়, এতকাল সূর্যের মধ্যে পরিবর্তন আসেনি বলে যে অবিনশ্বর হবে এটা জরুরি নয়। কত মূল্যবান প্রস্তর রয়েছে, মণিমুক্তা ও হীরক রয়েছে। শত শত বছর অতিবাহিত হওয়ার পরও তাতে কোনো পরিবর্তনা আসছে না। তাই বলে কি সেটা অবিনশ্বর? এমন বহু বস্তুতে মৃত্যু আসে না; বরং স্বয়ংসম্পূর্ণভাবেই বিলুপ্ত হয়ে যায়। এছাড়া তোমরা কী করে জানলে যে, সূর্যের মৃত্যু বা ক্ষয় ঘটে না? কেননা দার্শনিকদের মতে সূর্য ভূপৃষ্ঠ থেকে প্রায় একশত সত্তর গুণ বড়। সুতরাং তাতে যদি প্রতিদিন একটি পাহাড় সমান অংশ ক্ষয় হতে থাকে, তা কখনো অনুধাবনযোগ্য হিসেবে ধরা পড়বে না। অতএব প্রকাশ হলো যে, সৃষ্টি হওয়া এবং বিলুপ্ত হওয়া ওই সর্বশক্তিমানের ইচ্ছার ওপর নির্ভরশীল, যিনি অবলুপ্ত হওয়া থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত।

তারা দাবি করে বলে, এতে সৃষ্টিকর্তা এবং সৃষ্টিজগৎ সৃষ্টির ক্ষেত্রে একটি কাল বা সময় থাকা জরুরি হয়ে পড়ে। তখন আমরা উত্তরে বলি, সময় বা কাল তো মাখলুক তথা সৃষ্ট বস্তু। আর সময়ের আগে কোনো সময় ছিল না। তাদেরকে আরও বলা যায়, বলো দেখি—সৃষ্টিকর্তা কি বর্তমান আকাশকে এক হাত উঁচুতে বা নিচুতে আনতে পারবেন? যদি তারা বলে যে, এটা তো সম্ভব নয়। তখন তারা একে তো সৃষ্টিকর্তাকে অপারগ ও দুর্বল সাব্যস্ত করল এবং যে বস্তু উপর-নিচ হওয়া অসম্ভব তার প্রকৃত অবস্থায় স্থির থাকা জরুরি নাকি সম্ভব? এটা কোনো কারণের ওপর নির্ভরশীল নয়।

তাদের মধ্যে যারা বলে যে, আল্লাহ তায়ালা এ পৃথিবীর সৃষ্টিকর্তা, তারা মূলত তাদের মতাদর্শ লুকিয়ে রাখে। বিশ্ব সৃষ্ট বস্তু হওয়া তাদের মতে সম্ভব, বাস্তবতায় নয়। কেননা কারক তার কাজে ইচ্ছা পোষণকারী হয়। আর তাদের মতে পৃথিবী প্রকাশ হওয়া জরুরি, এটা আল্লাহর কাজের

অন্তর্ভুক্ত নয়। তাদের মতবাদে এটাও আছে যে, বিশ্বব্রহ্মাণ্ড অবিনশ্বর। এর যেমন শুরু নেই, শেষও নেই। কেননা বিশ্বব্রহ্মাণ্ড 'ইল্লাতে কাদিমাহ'র 'মালুল'। আর মালুল তার ইল্লতের সাথে সর্বদা বিদ্যমান থাকে। এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড যখন অস্তিত্বে আসা সম্ভব, তাহলে তা না আদি হবে, না মালূল হবে।

নাওবখতি তার *'কিতাবুল আরা ওয়াদদিয়ানাত'*এ উল্লেখ করেন, সক্রেটিস মনে করে, বস্তুর উৎস তিনটি। ১. কর্তা ২. মূল ধাতু বা উপাদান ও ৩. আকৃতি। তাদের মতে, আল্লাহ তায়ালা হচ্ছে আকল তথা বিবেক-বুদ্ধি, কাল হচ্ছে সৃষ্টজগৎ ও ধ্বংসের প্রথম বিষয়বস্তু, আর আকৃতি শরীর নয়; বরং গুণ। এই সম্প্রদায়ের আরেকটি মতবাদ হচ্ছে, আল্লাহ তায়ালা হচ্ছেন কর্তা, কাল হচ্ছে কর্ম। তৃতীয় দলের মতে, আকল বস্তুকে সন্নিবেশ ও সুশৃঙ্খলরূপে সাজায়। চতুর্থ আরেক গ্রুপ বলে, আকল এটি সন্নিবেশ করে না; বরং মূলত অভ্যাসই তার কর্তা।

ইয়াহইয়া ইবনে বিশর ইবনে উমাইর নাহাভান্দি উল্লেখ করেন, দার্শনিকদের একটি মতবাদ হচ্ছে, যখন আমরা পৃথিবীকে সম্মিলিত, পৃথক পৃথক ও অটল দেখি, তাই বুঝে নিলাম যে, সেটি আদি নয়। আর নশ্বরের জন্য কোনো একজন নশ্বর সৃষ্টিকর্তা আবশ্যক। পরে আমরা দেখলাম, মানুষ পানিতে পড়ে যায়, ভালো করে সাঁতার কাটতে জানে না, তাই সেই আবিষ্কারক ও অভিজ্ঞের কাছে ফরিয়াদ করে, কিন্তু সে তার ফরিয়াদে সাড়া দেয় না। এমনই করে কেউ আগুনে পুড়ে যায়, তাই আমরা জেনে নিলাম যে, সৃষ্টিকর্তা অস্তিত্বহীন।

তিনি বলেন, আবিষ্কারকের অনস্তিত্বের ব্যাপারে এ সব লোক তিন ভাগে বিভক্ত। একদল মনে করে, সৃষ্টিকর্তা যখন এই পৃথিবী পরিপূর্ণভাবে সৃষ্টি সমাপ্ত করলেন, তা দেখে তার ভালো লাগল। সুতরাং তিনি ভয় পেলেন, কোথাও আবার বেশ-কম হয়ে গেল কি না! এতে না জানি এটি আবার ধ্বংস হয়ে যায়! এই ভয়ে নিজেকেই তিনি ধ্বংস করে দিলেন। পৃথিবী একা হয়ে গেল। আর সমুদয় বিধি-বিধান জীব-জন্তু এবং অন্যান্য বস্তুর মাঝে একীভূত হয়ে গেল। দ্বিতীয় আরেক দল মনে করে, এমন নয়; বরং সৃষ্টিকর্তার অস্তিত্বে একজাতীয় চিৎকার আরম্ভ হলো। এ জন্য তার শক্তি হ্রাস পেতে থাকে এবং নূর কমতে থাকে। এভাবেই সেই নূর ও শক্তি এই চিৎকারের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে গেল। এই চিৎকারকে পৃথিবী বলে।

সৃষ্টিকর্তার নূর বিগড়ে গেলে তাতে কিছু অংশ অবশিষ্ট থেকে যায়। এ সব লোকের ধারণা—পৃথিবী থেকে নূর একীভূত হয়ে তার দিকে প্রত্যাবর্তন করবে। অতঃপর তা পূর্বের আকৃতিতে ফিরে আসবে। যেহেতু সৃষ্টিবস্তুর কর্মকাণ্ডের ওপর তার নিয়ন্ত্রণ ছিল না, তাই তাদেরকে বিনা বিচারে ছেড়ে দেয়া হবে। এ কারণে পৃথিবীতে অন্যায় ছেয়ে গেছে। তৃতীয় সম্প্রদায়ের ধারণা—এমন নয়; বরং সৃষ্টিকর্তা যখন পৃথিবীকে সাজালেন, তখন তার অংশ পৃথিবীতে বিক্ষিপ্ত হয়ে গেছে। তাই পৃথিবীতে যে সকল শক্তি বিদ্যমান, তা সৃষ্টিকর্তারই অংশ, যা কখনো নিঃশেষ হবার নয়।

শায়খ ইবনুল জাওযি রহ. বলেন, এতক্ষণ পর্যন্ত নাহাভান্দি যা কিছু বললেন, তা আমি নেযামিয়ার একটি সংস্করণ থেকে উল্লেখ করেছি—যা ২২০ বছর পূর্বে লেখা হয়েছিল।[১] যদি তা উল্লেখ করা দ্বারা ইবলিসের নেক সুরতে ধোঁকার উদ্দেশ্য না থাকত, তাহলে আল্লাহ তায়ালার সম্মানে তাদের কথাগুলো খণ্ডন করা উত্তম হতো। এমন অসার ও অসংগতিপূর্ণ মতবাদের কথা উল্লেখ করা উচিত নয়। কিন্তু আমি তা উল্লেখ করা দ্বারা যে উপকারিতা রয়েছে তা-ও বর্ণনা করছি।

অধিকাংশ দার্শনিক এ মতবাদ পোষণ করেন যে, আল্লাহ তায়ালার কাছে সৃষ্টিজগৎ সংক্রান্ত কোনো জ্ঞান নেই, শুধু তার অস্তিত্বের জ্ঞান আছে। অথচ এটি প্রমাণিত যে, মাখলুক তার অস্তিত্ব সম্পর্কে অবগত এবং তার সৃষ্টিকর্তার সম্পর্কেও অবগত। ওপরের বর্ণনায় তো দেখা যাচ্ছে, তারা সৃষ্টিকর্তার চেয়ে সৃষ্টিবস্তুর সম্মান বহুগুণে বাড়িয়ে দিলেন!

গ্রন্থকার বলেন, এতটুকু কথার মাধ্যমেই তাদের মতবাদের অসারতা প্রমাণ হয়ে যায়। বেশি কথা বলার প্রয়োজন নেই। চিন্তার বিষয় হচ্ছে, এ সকল আহমকদেরকে ইবলিস কতটা ধোঁকা দিয়েছে! এরা পরিপূর্ণ বিবেক-বুদ্ধি থাকার দাবি করা সত্ত্বেও! এই আকিদায় শায়খ আবু আলী সিনা তাদের বিপক্ষে অবস্থান নিয়েছেন। তিনি বলেন, কথা এমন নয়; বরং আল্লাহর নিজ অস্তিত্ব সম্পর্কে জ্ঞান আছে এবং সামগ্রিক বস্তুজগতেরও জ্ঞান আছে। কিন্তু তার বিভিন্ন অংশ-বিশেষের জ্ঞান নেই। এই মাযহাবকে মুতাযিলারা গ্রহণ করে নিয়েছে। সম্ভবত তাদের জ্ঞান-বুদ্ধি অতিরিক্ত বেড়ে গেছে! আলহামদুলিল্লাহ, আল্লাহ তায়ালা আমাদেরকে ওই জামাতের অন্তর্ভুক্ত

---

১ এখন (২০১৮ খ্রিষ্টাব্দ) থেকে আনুমানিক এক হাজার বছর পূর্বে লেখা হয়েছিল। কারণ আল্লামা ইবনুল জাওযি (রহ.) ইন্তেকাল করেন ৫৯৭ হিজরী মোতাবেক ১২০১ খ্রিষ্টাব্দে।

করেছেন, যারা আল্লাহ তায়ালার অস্তিত্ব থেকে অজ্ঞতা ও অসম্পূর্ণতাকে অস্বীকার করে। আমরা আল্লাহ তায়ালার ইরশাদের ওপর ঈমান এনেছি :

أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ

"আল্লাহ তায়ালার কাছে কি মাখলুকের ইলম নেই?"[২]

আল্লাহ আরও বলেন,

وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ

"আল্লাহর কাছে জল-স্থল সবকিছুর জ্ঞান আছে।"[৩]

গ্রন্থকার বলেন, দার্শনিকরা মৃত্যুর পর জীবিত হওয়া, রুহসমূহ শরীরে প্রতিস্থাপন করা, জান্নাত ও জাহান্নামে শারীরিকভাবে উপস্থিত হওয়াকে অস্বীকার করে থাকে। তারা বলে, এগুলো কেবল উপমামাত্র, যা সাধারণ মানুষের জন্য বর্ণনা করা হয়েছে। যাতে শান্তি ও শাস্তি আত্মিক হওয়ার ব্যাপারটি বুঝে আসে এবং মনে করে, মানুষের সত্তা মৃত্যুর পর চিরকালের জন্য জীবিত থাকে। অথবা এমন তৃপ্তিতে থাকে, যা বর্ণনার অযোগ্য। এটা ওই সত্তা, যা পাপে লিপ্ত থাকে। এই কষ্টের মাত্রা মানুষের অনুমান মতো বেশ-কম হয়ে থাকে। আবার কখনো ওই সত্তা থেকে কষ্টগুলো মুছে যায় এবং দূর হয়ে যায়। এই গোষ্ঠীর কথার জবাবে বলা যায়, মৃত্যুর পর মানবসত্তা অস্তিত্বশীল হওয়ার ব্যাপারে আমরা অস্বীকারকারী নই। আর এটাও অস্বীকার করি না যে, নফসের জন্য শাস্তি ও শান্তি বিদ্যমান। কিন্তু এটা বলো, শারীরিকভাবে হাশরের মাঠে উপস্থিত হওয়াকে কেন অস্বীকার করছ? জান্নাত ও জাহান্নামে শারীরিক তৃপ্তি ও শাস্তির কথা কী করে অস্বীকার করা হয়? যেখানে শরিয়ত আমাদেরকে এ ব্যাপারে শিক্ষা দেয়। সুতরাং আমরা শাস্তি বা শান্তি শারীরিক ও আত্মিক—উভয়টিকে স্বীকার করি এবং বিশ্বাস করি। কিন্তু যে হাকিকতকে উপমা জগতের স্থলাভিষিক্ত করছ, এটা অপ্রমাণিত এবং জবরদস্তিমূলক মতবাদ। পরে যদি তারা বলে যে, শরীর গঠন হওয়ার পর চূর্ণ-বিচূর্ণ হওয়ার কারণে অদৃশ্য হয়ে যাওয়া সম্ভব।

তার উত্তরে আমরা বলব, কুদরতের সম্মুখে কোনো কথা অসম্ভব নয়। যেহেতু মানুষ তার সত্তাজুড়ে মানুষ, যদি ওই মাটি ছাড়া, যা দ্বারা সে সৃষ্টি

---

২ সুরা মুলক : আয়াত ১৪

৩ সুরা আনয়াম : আয়াত ৫৯

হয়েছে, অন্য কোনো মাটি দ্বারা তাকে বানানো হয়, তাহলে তো সে মানুষের গোত্র থেকে বেরিয়ে যাবে না। যেহেতু তার বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ক্ষুদ্র থেকে বৃহৎ আকৃতিতে রূপান্তরিত হয় এবং দুর্বল থেকে মোটাতাজার দিকে ধাবিত হয়। যদি তারা বলে, এই শরীর ওই শরীর আর নেই, যেহেতু তাকে এক অবস্থা থেকে অন্য অবস্থায় রূপান্তর করা হয়েছে। এমনকি রগ ও রক্তে পরিণত হয়েছে। তখন জবাবে আমরা বলব, আল্লাহ তায়ালার কুদরত বুদ্ধি ও দৃশ্যায়নের ওপর নির্ভরশীল নয়। এছাড়া আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে খবর দিয়েছেন যে, মানুষ কবর থেকে তার শরীরসমেত হাশরের মাঠে প্রত্যাবর্তন করবে।

হজরত আবু হোরায়রা রা. হতে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,

مَا بَيْنَ النَّفْخَتَيْنِ أَرْبَعُونَ» قَالُوا: يَا أَبَا هُرَيْرَةَ أَرْبَعُونَ يَوْمًا؟ قَالَ: أَبَيْتُ، قَالُوا: أَرْبَعُونَ شَهْرًا؟ قَالَ: أَبَيْتُ، قَالُوا: أَرْبَعُونَ سَنَةً؟ قَالَ: أَبَيْتُ، «ثُمَّ يُنْزِلُ اللهُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَيَنْبُتُونَ، كَمَا يَنْبُتُ الْبَقْلُ» قَالَ: «وَلَيْسَ مِنَ الْإِنْسَانِ شَيْءٌ إِلَّا يَبْلَى، إِلَّا عَظْمًا وَاحِدًا، وَهُوَ عَجْبُ الذَّنَبِ، وَمِنْهُ يُرَكَّبُ الْخَلْقُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

'উভয় ফুৎকারের মাঝে চল্লিশ জমানা হবে। লোকেরা জিজ্ঞেস করল, হে আবু হোরায়রা, এটা চল্লিশ দিনের জমানা? তিনি উত্তরে বললেন, আমার স্মরণ নেই। তার জিজ্ঞেস করল, এটা চল্লিশ মাসের জমানা? তিনি বললেন, আমার স্মরণ নেই। তারা জিজ্ঞেস করল, এটা কি চল্লিশ বছরের জমানা? তিনি উত্তরে বললেন, আমার স্মরণ নেই। তিনি বললেন, অতঃপর আল্লাহ তায়ালা আকাশ থেকে বৃষ্টি বর্ষণ করবেন, তখন তোমরা এমনভাবে জেগে উঠবে, যেভাবে সবুজ ঘাস জাগে। পরে বলেছেন, মানুষের পুরো অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়, কেবল অবশিষ্ট থাকে একটি হাড়, আর এটি হচ্ছে মেরুদণ্ডের হাড়। এর মাধ্যমেই কেয়ামতের দিন মানুষ মিলিত হবে।'[১]

১ সহিহ বুখারি : হাদিস নং ৪৯৩৫; সহিহ মুসলিম : হাদিস নং ২৯৫৫

দার্শনিকদের মতবাদ

শয়তান আমাদের মাযহাবের কিছু গোষ্ঠীর ওপর ধোঁকা দিয়ে বসেছে, তাদের ধীশক্তি, স্মরণশক্তি ও বিবেক-বুদ্ধির অন্দরে সে হানা দিয়েছে। তাদেরকে বুঝিয়েছে যে, দর্শনের অনুসরণ করা পুণ্যের কাজ। কেননা তাদের কাছ থেকে এমন কাজ ও কথা বেরোয়, যা অত্যন্ত বুদ্ধিদীপ্ত ও প্রজ্ঞাপূর্ণ। এরা সর্বদা সক্রেটিস, প্লেটো, এরিস্টটল, গ্যালিলিওদের অভিমত নিয়ে পড়ে থাকে। অথচ এসব জ্ঞানীদের ওপর কেবল গণিত, তর্কশাস্ত্র ও প্রকৃতিশাস্ত্র নির্ভরশীল। তারা নিজের বুদ্ধি-বিবেকের মাধ্যমে গোপন বিষয় প্রকাশ করে। কিন্তু যখন তারা সৃষ্টিকর্তার বিষয়ে কথোপকথন চালিয়েছেন, তখন হোঁচট খেয়েছেন। এ কারণে তাদের মাঝে মতভেদ সৃষ্টি হয়েছে। কিন্তু গণিতশাস্ত্রে মতভেদ সৃষ্টি হয়নি। আমরা তাদের হোঁচট খাওয়ার বিষয়টি তাদের মতবাদের আলোচনায় আলোকপাত করেছি।

তাদের হোঁচট খাওয়ার কারণ হচ্ছে, মানবিক শক্তি সৃষ্টিকর্তার শক্তিকে কেবল সংক্ষিপ্তভাবে বুঝতে পারে। এবং এই বোঝার জন্য তাকে শরিয়তের দিকে মনোযোগী হতে হয়। 'মুতাআখ্খিরিন' তথা পরবর্তী যুগের দার্শনিকদের জন্য উদাহরণে বলা হয়েছে যে, হাকিমগণ এবং পূর্ববর্তী দার্শনিকরা সৃষ্টিকর্তার অস্বীকারকারী ছিল। তারা শরিয়তকে দূরে নিক্ষেপ করত। এমনকি এটাকে ধোঁকা মনে করত। পরবর্তী যুগের দার্শনিকরা তাদের এই মতবাদকে সত্য হিসেবে মেনে নিয়েছে। তারা দীনের শিআর ছেড়ে দিয়েছে। নামাযকে অহেতুক ও বেকার মনে করেছে। নিষিদ্ধ বস্তুকে গ্রহণ করেছে। শরয়ি বিচারকে অসার ভেবেছে। ইসলামি জীবনাচার ছেড়ে ইহুদি-নাসারাদের আকিদা-বিশ্বাস গ্রহণ করে নিয়েছে। তাদের কাছে কোনো প্রমাণই নেই, তারা শুধু এটুকু জানে যে, তাদের পূর্ববর্তীরা জ্ঞানী ছিলেন। তাদের জন্য আফসোস হয়, তারা কি এটা জানে না যে, আম্বিয়া আলাইহিস সালামও জ্ঞানী ছিলেন এবং জ্ঞানীদের চেয়ে অনেক ঊর্ধ্বে ছিলেন?!

তারা তাদের জ্ঞানী মনীষীদের কাছে সৃষ্টিকর্তা অস্বীকারের ব্যাপারে যে বার্তা পেয়েছে তা শুধু অসারই নয়; বরং অসম্ভব। কেননা তাদের অধিকাংশ সৃষ্টিকর্তাকে অস্বীকার করে এবং নবুওয়াতকেও অস্বীকার করে। তথাপি তারা এ বিষয়ে চিন্তা-গবেষণা করা বেকার ভেবেছে। তাদের মধ্যে গুটিকয়েক লোক তা অস্বীকার করে দাহরিয়ার অনুসারী হয়েছে। যাদের বুদ্ধির বিকৃতি কয়েকভাবে আলোকপাত করা হয়েছে। আমরা আমাদের

অনেক দার্শনিকদের দেখেছি, তারা তাদের দর্শন দিয়ে কেবল গাদ্দারি আর ঘাড়ত্যাড়া মনোভাবই লালন করেছে। এখন তারা না দর্শনের চাহিদা বুঝতে পারছে, না ইসলামের চাহিদা জানতে পারছে; বরং তাদের অনেকে এমন আছে, যারা রোযা রাখে, নামায পড়ে—তারপরও সৃষ্টিকর্তা এবং নবুওয়াত নিয়ে প্রশ্ন তোলে এবং হাশরের মাঠে শারীরিক উপস্থিতির ব্যাপারে অভিযোগ উত্থাপন করে। তাদেরকে দেখবে, তারা জাগতিক টানাপোড়েনের শিকার। সাধারণত তারা তাকদিরের ওপর অসন্তুষ্ট। এমনকি আমাকে কোনো কোনো দার্শনিক বলেছেন, তুমি সে বিষয়ে বিতর্ক করছ যা আকাশে আছে। সে ব্যাপারে তারা বহু কবিতা আবৃত্তি করে থাকে। তন্মধ্যে কয়েকটি পঙ্‌ক্তি নিম্নরূপ :

أتراها صنعة من غير صانع * أم تراها رمية من رام وقوله

واحيرتا من وجود ما تقدمه * منا اختيار ولا علم فيقتبس

كأنه في عماء ما يخلصنا * منه ذكاء ولا عقل ولا شرس

ونحن في ظلمة ما إن لها قمر * فيها يضيء ولا شمس ولا قبس

مدلهين حيارى قد تكنفنا * جهل يجهمنا في وجهه عبس

فالفعل فيه بلا ريب ولا عمل * والقول فيه كلام كله هوس

'আফসোস! পৃথিবীতে আমাদের জন্য ভালো নির্ধারণ করা হয়নি, না কোনো জ্ঞান অর্জিত হচ্ছে। তাহলে অযথা জ্ঞানার্জন করে কী লাভ? আমরা কালের বাহুডোরে এমন মসিবতে আক্রান্ত, যেখান থেকে না বিবেক-বুদ্ধি আমাদের মুক্তি দিতে পারে, না কোমল স্বভাব ও আচার-ব্যবহার। আমরা এমন অন্ধকারে নিমজ্জিত, যেখানে না কখনো চন্দ্রের উদয় হয়, না সূর্যের আলো, না বিজলির ঝিলিক। নিশ্চয় কালের খেয়ায় কাজ করা নিছক বেকার এবং কোনো প্রকার কথাবার্তা বলা একদম বেহুদা।'

যেহেতু আমাদের কালে দর্শন ও বৈরাগ্যবাদ—উভয়টিই নিকটবর্তী, তাই আমাদের ধর্মের অনেক লোক তাদের আঁচলে ঠাঁই নিয়েছে। কেউ কেউ তাদের অনুসরণ করছে। এ জন্য তোমরা অধিকাংশ বেকুবদের দেখবে, যখন তারা আকিদার অধ্যায়ে চিন্তা-ভাবনা করে, তখন খামোখা দর্শনের পেছনে পড়ে থাকে। আর যখন সাধনায় ব্রতী হতে চায়, তখন বৈরাগী

সাজে। অবশেষে আমরা আল্লাহর কাছে কামনা করি, তিনি যেন আমাদেরকে ধর্মের ওপর অটল ও অবিচল রেখে শত্রুদের খপ্পর থেকে রক্ষা করেন।

গ্রহপূজারিদের ওপর শয়তানের অভিনব ধোঁকা

সৌরজগতের বিভিন্ন গ্রহ-নক্ষত্রের মূর্তি তৈরি করে তার পূজা-অর্চনাকারীরা বলে, ঊর্ধ্বজগতের আত্মাসমূহের প্রত্যেকটির একটি করে দেহ রয়েছে। যেভাবে আমাদের প্রত্যেকের রুহের জন্য একটি বিশেষ দেহ রয়েছে। আমরা সে-সব আত্মা পর্যন্ত পৌঁছতে সক্ষম না বিধায় তাদের দেহের নমুনা তৈরি করে তার পূজা করি, তাকে ভোগ দান করি এবং তার জন্য উৎসর্গ করি। এর জন্য ঘর নির্মাণ করি।

ইয়াহইয়া ইবনে বিশর নাহাভান্দির বর্ণনামতে, তাদের এক সম্প্রদায় বলে, সাতটি গ্রহ-নক্ষত্র তথা—শনি, বৃহস্পতি, মঙ্গল, শুক্র, বুধ, চন্দ্র ও সূর্য—এগুলো জগতের নিয়ন্ত্রক। উক্ত সম্প্রদায় প্রত্যেকটির একটি করে মূর্তি তৈরি করে তার আকৃতির সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ একটি প্রাণী তার জন্য উৎসর্গ করে থাকে। শনি গ্রহের একটি অন্ধ মূর্তি তৈরি করে। অতঃপর তার জন্য একটি বৃদ্ধ বলদ উৎসর্গ করে। বলদকে একটি গর্তে ফেলে অগ্নিদগ্ধ করে আর বলে, হে অন্ধ মাবুদ! তুমি পবিত্র। তবে তোমার মন্দ প্রকৃতি রয়েছে, যা কখনো ভালো কাজ করে না। আমরা তোমার জন্য তোমার সাদৃশ্যপূর্ণ একটি ভোগ উৎসর্গ করলাম। তুমি এটা গ্রহণ করে আমাদেরকে স্বীয় মন্দ ও অশিষ্টকর বিষয় থেকে নিরাপদে রেখো।

একটি দুগ্ধপায়ী শিশু বৃহস্পতি গ্রহের জন্য উৎসর্গ করে। তার নিয়ম হচ্ছে, প্রথমে একজন বাঁদি ক্রয় করে। তার সাথে সপ্ত মূর্তির খাদেমরা সংগম করে। সে প্রসবের পর নবজাত শিশুকে বিশেষ পদ্ধতিতে উক্ত মূর্তির জন্য উৎসর্গ করে আর বলে, হে কল্যাণের উপাস্য! আপনি মন্দ বিষয় সম্পর্কে সম্পূর্ণ অজ্ঞ। আপনার জন্য আপনার মতো একটি নিষ্পাপ ভোগ উৎসর্গ করলাম। আপনি আমাদের কাছ থেকে এটা গ্রহণ করে আপনার কল্যাণময় আত্মা থেকে আমাদের কিছু দান করুন।

মঙ্গলের জন্য একজন কালো বর্ণের ব্যক্তিকে উৎসর্গ করে। ওই ব্যক্তিকে তারা একটি হাউজের ভেতর প্রবেশ করায়। হাউজের ভেতর পেরেক থাকে। পেরেকে তাকে ভালো করে বাঁধা হয়। যাইতুন তেল দ্বারা হাউজটি

পূর্ণ করা হয়। একজাতীয় ঔষধ এতে মেশানো হয়; যাতে তার স্নায়ুতন্ত্রগুলো শক্তিশালী হতে পারে। ভালো মানের খাবার খাইয়ে তাকে হৃষ্টপুষ্ট করা হয় এবং চর্বি বৃদ্ধি পায়। এক বছর ধরে এভাবে খাবার পর তার দেহের চর্বিগুলো পৃথক করে মাথার নিম্নাংশে একত্র করে মঙ্গলের মূর্তির কাছে উপস্থাপন করে বলে, হে মন্দ ও অনিষ্টের উপাস্য! তোমার অনুরূপ একটি ভোগ তোমার জন্য উৎসর্গ করলাম। তুমি এটা গ্রহণ করে তোমার মন্দ আত্মার অনিষ্ট থেকে আমাদেরকে রক্ষা করো।

পূর্বে উল্লেখিত যে নিষ্পাপ শিশুকে বৃহস্পতির জন্য উৎসর্গ করা হয়েছিল, তার মাকে সূর্যের জন্য উৎসর্গ করা হয়। তাকে সূর্যের প্রদক্ষিণ করানো হয়। অতঃপর সূর্যের মূর্তিকে সম্বোধন করে বলে, হে জ্যোতিষ্ক উপাস্য! তুমি প্রশংসনীয়। তোমার অনুরূপ একটি ভোগ তোমার জন্য উৎসর্গ করেছি। তুমি আমাদের ভোগ গ্রহণ করে আমাদেরকে তোমার কল্যাণ দান করো।

এভাবে শুক্রের জন্য একজন অর্ধ বয়স্কা বোবা মহিলাকে উৎসর্গ করে। তাকে ওই মূর্তির কাছে নিয়ে বলে, হে নির্বাক উপাস্য! তোমার জন্য তোমার অবিকল একজন সুশ্রী ও নির্বাক মহিলাকে উৎসর্গ করেছি। তুমি আমাদের ভোগ গ্রহণ করো। এরপর লাকড়ি এনে মহিলার গায়ে আগুন ধরিয়ে দেয়। সে পুড়ে ভস্ম হয়ে গেলে কিছু ভস্ম মূর্তির মুখে মেখে দেয় গ্রহপূজারিরা।

একজন শিক্ষিত, জ্ঞানী ও বুদ্ধিমান যুবককে তারা বুধ গ্রহের জন্য উৎসর্গ করে। বিভিন্নভাবে প্রলুব্ধ করে তাকে হাজির করা হয়। তাকে এমন ঔষধ সেবন করানো হয়, যার ফলে তার জ্ঞান লোপ পেয়ে যায় এবং বাকরুদ্ধ হয়ে যায়। তাকে সে মূর্তির সামনে পেশ করে বলে, হে বুদ্ধিমান উপাস্য! তোমার জন্য তোমার মতো বুদ্ধিমান যুবক ভোগ নিয়ে এসেছি। তুমি আমাদের ভোগ গ্রহণ করে নাও। এরপর ওই বুদ্ধিমান যুবককে কেটে চার টুকরো করা হয়। মূর্তির চারপাশে চারটি লাকড়ি পুঁতে এক একটি লাকড়ির মাথায় এক একটি টুকরো ঝুলিয়ে আগুন ধরিয়ে দেয়া হয়। এটি পুড়ে ভস্ম হয়ে গেলে তা মূর্তির মুখে মাখিয়ে দেয়া হয়।

এভাবে চাঁদের জন্য বড়সড় চেহারাবিশিষ্ট এক লোককে উৎসর্গ করা হয়। তাকে ডেকে বলা হয়, হে উপাস্যদের ডাকপিয়ন! হে ঊর্ধ্বজগতের সর্বাপেক্ষা হালকাদেহী!

মূর্তিপূজারিদের ওপর শয়তানের ফাঁদ

গ্রন্থকার আল্লামা ইবনুল জাওযি রহ. বলেন, ইবলিস মানুষকে তার ফাঁদে আটকানোর সময় মানুষের হৃদয়-কুঠরিতে কিছু সন্দেহ ঢেলে দেয়। তখন সে প্রবৃত্তির দাসত্ব করে থাকে। বিবেক-বুদ্ধি যে কাজে প্রলুব্ধ করে সেখান থেকে সে মুখ ফিরিয়ে নেয়। 'হাওয়াস'[১] তথা পঞ্চ-ইন্দ্রিয়ের দিকে ঝুঁকে পড়ে। তখন ইবলিস মানুষকে চেহারা-আকৃতি তথা মূর্তিপূজার দিকে ধাবিত করে। মানুষের বিবেক-বুদ্ধি একেবারে লোপ করে দেয়। এদের কাউকে এই প্রবোধ দেয় যে, এ সকল মূর্তি তোমাদের দেবতা ও উপাস্য। আহমকেরা তা মেনে নেয়। যাদের কাছে সামান্য জ্ঞান-বুদ্ধি আছে, তারা জানে যে, এসব লোক আমাদের কথা মানবে না। তাই তারা আহমকদের আর বাধা দেয় না। তারা বলে, যদি তোমরা এ সব মূর্তি ও প্রতিমার পূজা-অর্চনা করো, তবে তা তোমাদেরকে সৃষ্টিকর্তার নিকটবর্তী করে দেবে। এদের ব্যাপারে পবিত্র কুরআনের এসেছে :

مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى

'আমরা এদের পূজা করি না, কিন্তু এ জন্য করি, যাতে সে আমাদেরকে আল্লাহর নিকটবর্তী করে দেয়।'[২]

---

১ . الحواس الخمسة : পঞ্চেন্দ্রিয়কে 'আলহাওয়াসসুল খামসা' বলা হয়। 'হাওয়াস' শব্দটি 'হাস্‌সাতুন' শব্দের বহুবচন। এর অর্থ ইন্দ্রিয়। যার দ্বারা কোনো বস্তু সম্পর্কে ধারণা লাভ করা হয় তাকে 'হাওয়াস' বলা হয়। তা দু'প্রকার : প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য। প্রকাশ্য ইন্দ্রিয় হলো পাঁচটি, যথা– চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা ও স্পর্শ। একইভাবে অপ্রকাশ্য ইন্দ্রিয়ও পাঁচটি, যথা– الحواس المشترك। কোনো বস্তুর আকৃতি অনুধাবনের শক্তিকে 'আল-হাওয়াস্‌সুল মুশতারাক' বলা হয়। الخيال : অনুধাবনকৃত আকৃতির সংরক্ষণের স্থানকে 'খায়াল' বলা হয়। المتصرفة : সংরক্ষণ-স্থানের পরিচালনাকারী শক্তিকে 'আল-মুতাসাররিফাহ' বলা হয়। الواهمة: এমন এক শক্তি, যা ব্যক্তিগত বোধসমূহকে অনুধাবন করে। الحافظة : ধারণাশক্তিকে অনুধাবনের খাজানাকে 'হাফেজা' বলা হয়। তর্ক শাস্ত্রবিদদের পরিভাষায় এ পঞ্চেন্দ্রিয়কে 'وجدانيات' বলা হয়।

২ সুরা যুমার : আয়াত ৩

মূর্তিপূজারিদের ওপর ইবলিসের ফাঁদের সূচনা

হিশাম ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে সায়েব কালবী কর্তৃক বর্ণিত, হিশাম বলেন, আমার পিতা বলেছেন : সর্বপ্রথম মূর্তিপূজা করা হয় আদম আলাইহিস সালাম-এর তিরোধানের পর। শীশ এর সন্তানরা আদম আলাইহিস সালাম-কে ভারতের[১] 'ইয়াজ' নামক পৃথিবীর সবচেয়ে উর্বরতম ও সবুজাভ সেই পর্বতের গুহায় দাফন করে, যেখানে তাঁকে বেহেশত থেকে অবতরণ করানো হয়েছিল। হিশাম বলেন, আমার পিতা আমাকে বলেছেন, তিনি আবু সালেহ থেকে এবং তিনি ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণনা করেছেন 'আদম আলাইহিস সালাম এর ছেলে শীশ এর সন্তানরা সে গুহাতে আদম আলাইহিস সালাম এর শরীরের পার্শ্বে আগমন করে এর সম্মান করত এবং তাঁর জন্য আল্লাহ তায়ালার রহমত কামনা করত। এদের এ অবস্থা দেখে কাবিলের সন্তানদের একজন বলল, হে কাবিলের সন্তানগণ! বনি শীশদের একটি তাওয়াফ করার স্থান রয়েছে যার চার পার্শ্বে তারা তাওয়াফ করে এবং এটাকে তারা সম্মান করে, অথচ তোমাদের এ ধরনের কিছু নেই। তাই সে তাদের জন্য একটি মূর্তি তৈরি করল এবং সে-ই হলো প্রথম মানুষ, যে মূর্তি তৈরি করল।'

হিশাম তার পিতা থেকে বর্ণনা করেছেন যে, 'ওয়াদ্দ' 'সুয়া'' 'ইয়াগুছ' 'ইয়াউক' ও নসর' এরা সকলেই সৎ মানুষ ছিলেন। তারা সকলেই এক মাসের মধ্যে মৃত্যুবরণ করেন। ফলে তাঁদের স্বজনরা তাঁদের জন্য খুবই বেদনার্ত হয়। তাদের এ অবস্থা দেখে কাবিল গোত্রের এক ব্যক্তি বলল, আমি কি তোমাদের জন্য তাঁদের আকৃতিতে আত্মাবিহীন পাঁচটি মূর্তি তৈরি করে দেব? তারা সবাই এতে সম্মত হলে সে তাদের জন্য তাঁদের আকৃতিতে পাঁচটি মূর্তি নির্মাণ করে দিল। এর পর লোকেরা তাদের রক্তের সম্পর্কানুযায়ী এ মূর্তিগুলোর নিকটে এসে এগুলোকে নিজের ভাই, চাচা ও চাচাতো ভাই এর মতো মনে করে এগুলোকে সম্মান ও এর চার পার্শ্বে তাওয়াফ করতে থাকল। এ অবস্থার উপর এ যুগ অথবা এ প্রজন্ম অতিবাহিত হয়ে যায়। এ মূর্তি নির্মাণ করা হয় ইয়াজাজ ইবনে মাহলাইল ইবনে কাইনান ইবনে আনুশ ইবনে শিশ ইবনে আদম আলাইহিস সালাম এর যুগে। এরপর দ্বিতীয় যুগ বা প্রজন্ম আসলে তারা এ মূর্তিগুলোকে প্রথম প্রজন্মের বা যুগের চেয়ে আরও অধিক পরিমাণে সম্মান প্রদর্শন করে।

---

১ বর্তমান শ্রীলংকার

এরপর আসে তৃতীয় যুগ বা প্রজন্মের লোকেরা, তারা বলল, প্রথম যুগের জনগণ আল্লাহ তায়ালার নিকট এ পাঁচটি মূর্তির শাফায়াত প্রাপ্তির আশায় এঁদের সম্মান করেছে। এ মনে করে এ মূর্তিগুলোর উপাসনা করার ফলে তারা এগুলোর মান-মর্যাদা অনেক বৃদ্ধি করে। এভাবে তাদের কুফরী কার্যকলাপ মারাত্মক আকার ধারণ করলে অবশেষে আল্লাহ তায়ালা ইদ্রীস আলাইহিস সালাম-কে তাদের নিকট সর্বপ্রথম নবী হিসেবে প্রেরণ করে তাদেরকে তাওহিদের প্রতি আহ্বান জানান, কিন্তু তারা তাঁকে অস্বীকার করে। ফলে আল্লাহ তায়ালা ইদ্রীস আলাইহিস সালাম-কে সমুন্নত স্থানে উঠিয়ে নেন। কালবী আবু সালেহ থেকে এবং আবু সালেহ ইবনে আব্বাস রা. থেকে যে বর্ণনা করেছেন, সে অনুযায়ী বনি আদমের অবস্থা নুহ পর্যন্ত এভাবে গুরুতর থেকে গুরুতর হতে থাকে, অবশেষে আল্লাহ নুহ আলাইহিস সালাম-কে তাদের নিকট রাসুল হিসেবে প্রেরণ করেন।'

এ ঐতিহাসিক বর্ণনাগুলো আমাদেরকে মোটামুটিভাবে এ প্রমাণ দিচ্ছে যে, তাওহিদ থেকে অংশীবাদের দিকে মানুষের পথভ্রষ্টতার সূত্রপাত হয় সৎ মানুষদের (যারা সাধারণ মানুষদের পরিভাষায় আউলিয়া) কবরসমূহে প্রারম্ভে অবস্থান গ্রহণ এবং পরবর্তীতে তাঁদেরকে স্মরণ ও আল্লাহ তায়ালার ইবাদতে আগ্রহ লাভের উদ্দেশ্যে তাঁদের মূর্তি নির্মাণের মধ্য দিয়ে। কিন্তু সময়ের পরিবর্তনে পরবর্তী প্রজন্মের লোকদের কাছে সেই সৎ মানুষদের মূর্তি নির্মাণের পিছনে তাদের পূর্বপুরুষদের কী উদ্দেশ্য ছিল, তা হারিয়ে যায়। এর সাথে সংযোজিত হয় আল্লাহর রুবূবিয়্যাত সম্পর্কিত ধর্মীয় জ্ঞানের অভাব। সে কারণে তারা পথভ্রষ্টতার দিকে অনেক দূর এগিয়ে যায়। এভাবে তারা শয়তানের প্ররোচনায় পড়ে আল্লাহর উলূহিয়্যাত ও রুবূবিয়্যাতে শিরকি কর্মে নিমজ্জিত হয়েছিল।

আদম সন্তানদেরকে এভাবে পথভ্রষ্ট করার মাধ্যমে শয়তান প্রত্যেক যুগে বনি আদমকে পথভ্রষ্ট করার পদ্ধতি ও কৌশল সম্পর্কে অবগত হয়ে যায় এবং পরবর্তী প্রতিটি জাতিকে শিরকে নিমজ্জিত করার ক্ষেত্রে সে তার পরিচিত এই পদ্ধতি ও কৌশল প্রয়োগ করতে থাকে। যদিও যুগের চাহিদানুযায়ী প্রয়োজনের নিরিখে এ পদ্ধতি প্রয়োগের ক্ষেত্রে সে নিত্যনতুন পন্থা অবলম্বন করেছে। কুরআনুল কারিম আমাদের জন্য এ কথার উত্তম সাক্ষ্য যে, শয়তান এ পদ্ধতি প্রয়োগ করেই অতীতে হূদ, সালেহ, ইব্রাহীম, মুসা ও ঈসা আলাইহিস সালাম-এর জাতিসমূহকে পথভ্রষ্ট করেছিল। তাদেরকে নিজ হাতে তৈরি মূর্তিসমূহের ব্যাপারে একই ধরনের ধারণা ও

উপাসনায় লিপ্ত করেছিল। শয়তান এভাবে যুগের পর যুগ ধরে বনি আদমকে পথভ্রষ্ট করার জন্য তার সেই পূর্ব প্রতিজ্ঞা পূরণের জন্য বিরামহীনভাবে কাজ করে চলেছে। তার এ প্রচেষ্টার ফলে যে ইব্রাহীম আলাইহিস সালাম-একনিষ্ঠ তাওহিদের অনুসারী ও ঘোষণাকারী ছিলেন, একসময় সে ইব্রাহীম আলাইহিস সালাম-এর বংশধরদেরকেও সে পথভ্রষ্টতার অতলতলে নিক্ষেপ করেছিল। মহান আল্লাহ একান্ত অনুগ্রহে শেষ নবী ও রাসুল মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে প্রেরণ করার ফলে দীনে ইব্রাহীমের অনুসারী বলে দাবিদার অনুসারীদের মধ্যে পুনরায় তাওহিদের পতাকা উড্ডীন হয়েছিল; কিন্তু শয়তানের নিরবচ্ছিন্ন প্রচেষ্টার ফলে সেই তাওহিদী বিশ্বাসের মাঝেও সুদূর অতীতকাল থেকেই শয়তান পুনরায় শিরকি চিন্তা-ভাবনা ও কর্মের অনুপ্রবেশ ঘটাতে সক্ষম হয়েছে।

ইসমাঈল আলাইহিস সালাম বড় হয়ে জনগণকে তাঁর পিতা ইব্রাহীম আলাইহিস সালাম-এর দীনের প্রতি আহ্বান জানান। ফলে সে সময়ের অধিকাংশ লোকই তাঁর অনুসারী হয়ে গিয়ে মহান আল্লাহর উলূহিয়্যাত ও রুবূবিয়্যাতে সম্পূর্ণরূপে তাওহিদে বিশ্বাসী হয়ে যায়। যুগের আবর্তনে যখন তাদের মধ্যে কয়েক প্রজন্ম অতিক্রান্ত হয়ে যায় এবং দীর্ঘদিন যাবৎ ধর্ম সম্পর্কে তারা নতুন করে কোনো শিক্ষা পায়নি, তখন তারা ধর্মের অনেক বিষয়াদি ধীরে ধীরে ভুলতে থাকে। একপর্যায়ে তাদের মাঝে শুধু তাওহিদী বিশ্বাস এবং ইব্রাহীম আলাইহিস সালাম-এর স্মৃতি-বিজড়িত কিছু ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান ও নিদর্শনাদি ব্যতীত আর কিছুই অবশিষ্ট থাকেনি। অবশেষে তারা তাওহিদী বিশ্বাস থেকেও বিচ্যুত হয়ে মূর্তিপূজা করার ফলে মুশরিকে পরিণত হয়। তাদের মাঝে প্রতিমাপূজার মাধ্যমে শিরকি কর্মকাণ্ডের সূচনা হয় কাবা শরিফের সম্মানে এর পার্শ্ব থেকে সংগৃহীত পাথরের চার পার্শ্বে তাওয়াফ করার মাধ্যমে, যা তারা মক্কা থেকে দূর-দূরান্তে হিজরত করার সময় সাথে করে নিয়ে অবতরণস্থলের এক পার্শ্বে স্থাপন করত। তাদের মাঝে ইব্রাহীম ও ইসমাঈল আলাইহিস সালাম-এর ধর্মের কিছু বিষয়াদি যেমন, কাবা শরিফের সম্মান করা, এর তাওয়াফ, হজ্জ ও উমরা করা, সাফা ও মারওয়াহ পর্বতদ্বয়ে সায়ী করা, আরাফা ও মুযদালিফায় অবস্থান গ্রহণ করা, আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে উট ও বকরি কুরবানী বা উৎসর্গ করা—ইত্যাদি কর্ম প্রচলিত ছিল। যদিও এ সব ক্ষেত্রে

তারা নিজ থেকে কিছু বিষয়াদি সংযোজন ও বিয়োজন করেছিল, যা মূল ধর্মীয় কর্মের অন্তর্ভুক্ত ছিল না।

এরপর তাদের ধর্মীয় অবস্থার আরও অবনতি ঘটে। তাদের মাঝে মূর্তিপূজার মাধ্যমে শিরকি কর্মকাণ্ড শুরু হয় রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর রেসালত লাভের প্রায় ৩০০ বছর পূর্বে খুযায়াহ গোত্র প্রধান ও মান্যবর ব্যক্তিত্ব আমর ইবনে লুহাই এর মাধ্যমে। ঐতিহাসিক ইবনে হিশামের বর্ণনামতে, আমর ইবনে লুহাই কোনো উপলক্ষে মক্কা থেকে সিরিয়া গমন করে সেখানকার লোকদেরকে কতিপয় মূর্তির পূজা করতে দেখে বলে, এ মূর্তিগুলো কী, যাদের আপনারা উপাসনা করছেন? উত্তরে লোকেরা বলল, এদের কাছে বৃষ্টি চাইলে এরা আমাদেরকে বৃষ্টি দান করে, সাহায্য চাইলে তারা আমাদের সাহায্য করে। এ কথা শুনে আমর ইবনে লুহাই বলল, এদের মধ্য থেকে একটি মূর্তি আমাকে দান করুন, আমি সেটিকে আরব দেশে নিয়ে যাব, ফলে আরবরা এর উপাসনা করবে। এতে লোকেরা তাকে 'হুবল' নামের একটি মূর্তি দান করে। অতঃপর সে তা নিয়ে মক্কায় আগমন করে এবং তা কাবা শরিফের নিকটতম এক স্থানে সম্মানের সাথে স্থাপন করার পর আরব জনগণকে এর উপাসনা ও সম্মান করার জন্য নির্দেশ করে।

এ আমর ইবনে লুহাই ছিল জিন-সাধক। সে তার অনুগত জিন এর পরামর্শ অনুযায়ী নুহ আলাইহিস সালাম-এর জাতির উপাস্য সেই মূর্তিগুলো জেদ্দা এলাকা থেকে মাটি খনন করে বের করে নিয়ে আসে। সেগুলোকে নুহ আলাইহিস সালাম-এর সময়কার প্রলয়ঙ্করী বন্যা ও তুফান এতদঞ্চলে বহন করে নিয়ে এসেছিল। ধীরে ধীরে বন্যার পানি নেমে যাবার সময় এগুলো জেদ্দা এলাকার চরাঞ্চলে আটকা পড়েছিল এবং পরবর্তীতে তা বালুর নিচে চাপা পড়ে গিয়েছিল। আমর ইবনে লুহাই তার অনুগত জিনের পরামর্শে এগুলোকে বের করে নিয়ে এসে হজ্জের মৌসুমে আরব জনগণকে এগুলোর উপাসনা করার প্রতি আহ্বান জানায়। লোকেরা এতে তার আনুগত্য করলে সে বিভিন্ন গোত্রের মাঝে তা বণ্টন করে দেয়। সে অনুযায়ী 'ওয়াদ' (وَدّ) নামের মূর্তিটি ছিল দাওমাতুল জানদাল এলাকার 'কালব' গোত্রের নিকট, 'সুয়া' (سُوَاع) নামের মূর্তিটি ছিল 'হুজায়েল' গোত্রের নিকট, 'য়াগুছ' (يغوث) নামের মূর্তিটি ছিল 'মুরাদ' গোত্রের নিকট, 'ইয়াউক' (يعوق)

নামের মূর্তিটি ছিল হামাদন গোত্রের নিকট, আর 'নাছর' (نسر) নামের মূর্তিটি ছিল ইয়ামনের 'হিময়ার' গোত্রের নিকট। এ পাঁচটি মূর্তির পাশাপাশি 'আরব জনপদে আরও অসংখ্য মূর্তি ছিল।

হজরত আদম আলাইহিস সালাম স্বীয় প্রভুর সান্নিধ্যে চলে যাওয়ার প্রাক্কালে তাঁর সন্তানদেরকে সঠিক ধর্মের ওপরে একই মুসলিম জাতিভুক্ত রেখে গেছেন। তখন তাদের ধর্ম ছিল এক ও অভিন্ন এবং মহান আল্লাহই ছিলেন তাদের একক রব ও উপাস্য। তাদের মাঝে এ অবস্থা পরবর্তী কয়েক প্রজন্ম পর্যন্ত বিরাজমান ছিল। কালের পরিক্রমায় যখন তাদের মাঝে ধর্মীয় শিক্ষার অবনতি ঘটে, তখন তাদের চিরশত্রু শয়তান তাদের পিতা-মাতার বিরুদ্ধে যেভাবে ষড়যন্ত্র করেছিল ঠিক সেভাবেই তাদের বিরুদ্ধেও ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়েছিল এবং অবশেষে তাদেরকে মু'মিন ও মুশরিক দু'টি দলে বিভক্ত করতে সক্ষম হয়েছিল। এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ বলেন, 'মানুষেরা তো (ধর্মের দিক থেকে প্রারম্ভে) একই জাতিভুক্ত ছিল, অতঃপর তারা (এ ক্ষেত্রে) মতবিরোধে লিপ্ত হয়।'[১]

এ আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, মানুষেরা দীর্ঘ এক সময় পর্যন্ত একই ধর্ম ও একই বিশ্বাসের উপরে প্রতিষ্ঠিত ছিল। পরবর্তীতে তাদের মাঝে এ বিষয়ে মতভেদের সূত্রপাত হয়। এতে কিছু লোক পূর্বের ন্যায় তাওহিদী বিশ্বাসের ওপরেই বহাল থাকে, আর কিছু লোক সে বিশ্বাসের পরিপন্থী কর্মে লিপ্ত হয়। আমরা হাদিস দ্বারা অবগত হয়েছি যে, আদম আলাইহিস সালাম থেকে নুহ আলাইহিস সালাম পর্যন্ত দশ যুগ বা প্রজন্মের সকল লোক ইসলামের ওপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। উক্ত হাদিসে বর্ণিত 'আশারাতু ক্বরুন' এর অর্থ এক হাজার বছরও হতে পারে, আবার দশ প্রজন্মের লোকও হতে পারে। তবে 'আল-ইসলাম' শব্দের দ্বারা এ যুগকে সীমাবদ্ধ করাতে প্রথম অর্থই অগ্রগণ্য বলে মনে হয়। কারণ, এতে মনে হয় যে, মানুষেরা এ সময়সীমা পর্যন্ত ইসলামের ওপর প্রতিষ্ঠিত ছিল এবং আদম ও নুহ আলাইহিস সালাম এর মাঝে পরবর্তী আরও অনেক যুগ রয়েছে, যাতে সকল লোকেরা ইসলামের ওপর একমত ছিল না; বরং পরবর্তীতে তারা মুমিন ও কাফের এ দু'দলে বিভক্ত হয়ে গিয়েছিল। যার ফলে তাদেরকে সংশোধনের জন্যে প্রথমে আল্লাহ তায়ালা ইদ্রীস আলাইহিস সালাম-কে তাদের নিকট নবী হিসেবে প্রেরণ করেছিলেন । এরপর প্রথম রাসুল

---

১ সুরা ইউনুস : আয়াত ১৯

হিসেবে শরিয়ত দিয়ে নুহ (আলাইহিস সালাম)-কে তাদের নিকট প্রেরণ করেছিলেন।

'কুরুন' 'قرون' শব্দটিকে কুরআন ও হাদিসে প্রজন্মের অর্থে ব্যবহৃত হতে দেখা যায়। যেমন আল্লাহ বলেন, وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِن بَعْدِ نُوحٍ 'আর আমি অনেক প্রজন্মের মানুষদেরকে ধ্বংস করেছি নুহ এর পরে।'[২] এ আয়াতে 'قرون' শব্দ দ্বারা প্রজন্মই উদ্দেশ্য করা হয়েছে। অনুরূপভাবে (خَيْرُ النَّاسِ قَرْنِي) 'আমার যুগের মানুষেরা সর্বোত্তম মানুষ"[৩] এ-হাদিসেও 'ক্বরন' (قرن) শব্দটি প্রজন্মের অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। তবে ইবনে আব্বাস রা. এর হাদিসে বর্ণিত 'কুরুন' (قرون) শব্দটি প্রজন্মের অর্থে ব্যবহৃত না হয়ে 'সময়' এর অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে বলে প্রতীয়মান হয়। হাদিসের বাহ্যিক অর্থের দ্বারা যদিও এ কথা মনে হয় যে, আদম ও নুহ আলাইহিস সালাম-এর মধ্যে মোট এক হাজার বছর অতিবাহিত হয়েছে এবং এ সময়ের সকল লোকেরা মুসলিম ছিল; কিন্তু এ বাহ্যিক অর্থটি ইতিহাস ও বাস্তবতার সাথে খাপ খায় না। কেননা, বাস্তবতা এ কথার সাক্ষ্য দিচ্ছে যে, একটি জাতির মধ্যে বিভ্রান্তি হঠাৎ করে এসে যায় না; বরং তা ধীরে ধীরে হয়ে থাকে এবং আল্লাহ তায়ালাও কোনো জাতির বিভ্রান্তির প্রথম অবস্থাতেই নবী ও রাসুল প্রেরণ করেন না। এমতাবস্থায় ইবনে আব্বাস রা.-এর হাদিসের বাহ্যিক অর্থ গ্রহণ করলে বলতে হবে যে, মানুষের মধ্যে বিভ্রান্তি শুরু হয়েছে নুহ আলাইহিস সালাম-এর যুগ থেকেই এবং আল্লাহ তাঁকে তাঁর জাতির বিভ্রান্তির প্রারম্ভেই রাসুল করে পাঠিয়েছেন, যদিও তা বাস্তবতা-বহির্ভূত।

এ দিকে ইতিহাস সাক্ষ্য দিচ্ছে যে, আদম আলাইহিস সালাম সন্তানদের দ্বারা মূর্তিপূজার কারণে যখন তাদের কুফরী কার্যকলাপ চরম পর্যায়ে পৌঁছে যায়, তখন আল্লাহ তায়ালা তাদের নিকট ইদ্রীস (আলাইহিস সালাম)-কে নুহ আলাইহিস সালাম-এর পূর্বে নবী হিসেবে প্রেরণ করেছিলেন। তিনি এসে তাদেরকে তাওহিদের দিকে আহ্বান জানালে তারা তাঁকে অস্বীকার করে, ফলে আল্লাহ তায়ালা তাঁকে (ইদ্রীস আলাইহিস সালাম) মর্যাদাপূর্ণ

---

২ সুরা বনি ইসরাঈল : আয়াত ১৭

৩ সহিহ বুখারি : হাদিস নং ১৬৩

স্থানে উঠিয়ে নেন। এ ইতিহাসও ইবনে আব্বাস রা. এর হাদিসের বাহ্যিক অর্থের সম্পূর্ণ বিপরীত। এ কারণে আমরা এ কথা বলতে বাধ্য হচ্ছি যে, ইবনে আব্বাস রা. এর হাদিস দ্বারা আদম ও নুহ আলাইহিস সালাম এর মধ্যকার মোট সময় নির্ধারণ করার উদ্দেশ্য করা হয়নি; বরং এর উদ্দেশ্য সে সময়সীমা বর্ণনা করা যে সময়ের মধ্যে সকল লোকেরা ইসলামের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল, যদিও তাঁদের উভয়ের মাঝে এ সময়সীমার বাইরে আরও অনেক সময় ছিল, যাতে লোকেরা ইসলাম তথা তাওহিদের উপর একমত ছিল না।

আরবের লোকেরা ছোট এবং বড় বিভিন্ন রকমের মূর্তিদেরকে আল্লাহ তায়ালার রুবূবিয়্যাত ও উলূহিয়্যাতের বৈশিষ্ট্যে সমকক্ষ বানিয়ে নিয়েছিল। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি মূর্তি নিম্নরূপ–

লাত : এটি 'তায়েফ' নামক স্থানের 'সাকিফ' গোত্রের প্রসিদ্ধ এক দেবী-মূর্তির নাম। এর মাধ্যমে তারা কুরায়েশ গোত্রের উপর গর্ব করত। ইমাম ইবনে কাসির এর বর্ণনামতে এটি ছিল একটি সাদা পাথরের মূর্তি। এর মধ্যে একটি ঘরের চিত্র অঙ্কিত ছিল। কাবা ঘরের ন্যায় এটিকে তারা পর্দা দ্বারা আবৃত করে রেখেছিল। অনুরূপভাবে তারা কাবা শরিফের প্রাঙ্গণের ন্যায় এর প্রাঙ্গণকেও পবিত্র জ্ঞান করত। সাকিফ গোত্র থেকেই এর খাদেম নিয়োগ করা হতো। ইমাম ইবনে জারির এর বর্ণনামতে তারা 'আল্লাহ' শব্দের স্ত্রী-লিঙ্গ হিসেবে এর নাম 'লাত' রেখেছিল। ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, সেখানে সুদূর অতীতে একটি চারকোণাবিশিষ্ট পাথরে বসে একজন ইহুদি ব্যক্তি হাজীদের জন্য 'সাতু' তৈরি করে খেতে দিত। লোকটি সেখানে মৃত্যুবরণ করলে তার সততা ও ভালো কর্মের জন্য লোকেরা এ-পাথরকে সম্মান করে এর পার্শ্বে অবস্থান গ্রহণ করতে আরম্ভ করে। কুরায়েশ এবং সমগ্র আরব গোত্রের লোকেরাও একে পূজা ও সম্মান করত।

উয্যা : 'উয্যা' নামের এ দেবীটি মক্কার নিকটবর্তী 'নাখলাহ' নামক স্থানে স্থাপিত ছিল। এটা কুরায়েশ গোত্রের দেবতাদের মধ্যে সবচেয়ে বড়মাপের দেবতা ছিল। কুরায়েশরা কাবা শরিফের হরমের ন্যায় এর জন্যও একটি হরম (পবিত্র এলাকা) নির্ধারণ করেছিল। সম্ভবত এটি ছিল কুরায়েশদের যুদ্ধের দেবী। তাদের সাথে কারও যুদ্ধ হলে তারা এ দেবীর কাছে যুদ্ধে জয় কামনা করত। সে জন্যই উহুদ যুদ্ধের সময় আবু সুফিয়ান রা. মুসলিমদের

লক্ষ্য করে বলেছিলেন : 'আমাদের উয্যা দেবতা আছে, তোমাদের কোনো উয্যা নেই।' মূলত এ দেবতাটি ছিল বত্নে নাখলাহ নামক স্থানের তিনটি ছোট বাবলা গাছের সমষ্টি। এ গাছগুলোতে একটি মহিলা জিন থাকত। এর উপাসকরা তা বুঝতে না পারলেও এ জিনই এর উপাসকদেরকে এ গাছের মধ্য থেকে অলৌকিকভাবে শব্দ শোনাত। মক্কা বিজয়ের পর রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খালিদ ইবনে ওয়ালিদ রা.-কে তা ধ্বংস করার জন্য প্রেরণ করেছিলেন। তিনি পর পর তৃতীয় গাছটি কাটতে উদ্যত হলে আকস্মিকভাবে সে জিনটি ঘাড়ে হাত রেখে, দাঁত কটমট করে, এলোমেলো কেশে কুৎসিত হাবশী মহিলার আকৃতিতে আত্মপ্রকাশ করে। খালেদ রা. তরবারি দিয়ে তার ঘাড়ে আঘাত করলে তা দ্বিখণ্ডিত হয়ে হঠাৎ একটি কবুতরে রূপান্তরিত হয়ে মরে যায়। অতঃপর রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট ফিরে এসে সর্বশেষ গাছ কাটতে গিয়ে তিনি যা দেখলেন তা তাঁকে জানালেন। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-তা শুনে বললেন,

'এ হাবশী মহিলাই মূলত 'উয্যা' ছিল, আরবদের জন্য এরপর আর কোনো উয্যা থাকবে না।'[১] অপর এক বর্ণনামতে উয্যা নামের এ দেবীটি একটি সাদা পাথর ছিল।

মানাত : এটি প্রাচীন দেব-দেবীদের মাঝে অন্যতম একটি দেবীর নাম। সম্ভবত এটি ছিল কুরবানির দেবী। এর নামে পশুর রক্ত প্রবাহিত করা হতো। এটাকে ভাগ্যদাতা ও মৃত্যুদানকারী বলে মনে করা হতো। মক্কা ও মদিনার মধ্যবর্তী 'কুদায়েদ' নামক স্থানে এটি স্থাপিত ছিল। হজ্জ উপলক্ষে 'ইয়াসরিব' তথা মদিনার আওস এবং খাযরাজ গোত্রদ্বয়ের লোকেরা এসে এর চার পার্শ্বে তাওয়াফ করত। এতে (শয়তানের পক্ষ থেকে নিযুক্ত) একটি মহিলা জিন থাকত এবং এ জিনই এর পূজারিদেরকে নানা রকম অলৌকিক কর্মকাণ্ড করে দেখাত। মক্কা বিজয়ের পর রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নির্দেশে সা'য়ীদ ইবনে যায়দ আশহালী রা. এ মূর্তিটি ধ্বংস করতে যান। এ সময় সে জিনটি কালো বর্ণের একটি মহিলা আকৃতিতে উলঙ্গ অবস্থায় এলোমেলো কেশে আত্মপ্রকাশ করে নিজের জন্য ধ্বংসের আহ্বান করে বুক চাপড়াতে ছিল। সা'য়ীদ রা. তাকে এ অবস্থাতেই হত্যা করেন।

---

১ [হাদিসটির সনদ খুবই দুর্বল]

লাত, উয্যা ও মানাতকে নারীর নামে নামকরণ করার কারণ : লাত, উয্যা ও মানাত এগুলো তিনটি নারী দেবীর নাম। এগুলো মুশরিকদের কল্যাণ ও অকল্যাণ করতে পারে এ ধারণার ভিত্তিতে তারা এদেরকে সব সময় কল্যাণার্জন এবং অকল্যাণ দূরীকরণের জন্য আহ্বান করত। তাদের এ আহ্বান সম্পর্কে আল্লাহ বলেন,

إِنْ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ إِلَّا إِنَاثًا وَإِنْ يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا مَرِيدًا

'তারা তো আল্লাহকে ব্যতীত শুধু নারীদের আহ্বান করে, আসলে তারা কেবল অবাধ্য শয়তানকেই আহ্বান করে।'[১] এখানে 'ইনাসান' বলে লাত, উয্যা, মানাত ও অন্যান্য নারী নামের সকল দেবীদেরকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে। এগুলোকে 'ইনাস' বলার পিছনে মোট তিনটি কারণ থাকতে পারে–

এক. 'ইনাসান' শব্দটি 'উনসা' শব্দের বহুবচন। এর অর্থ নারী। লাত, উয্যা ও মানাত এ তিনটিকে নারীর নামে নামকরণ করার কারণে এদেরকে 'ইনাসান' বলা হয়ে থাকতে পারে। মূলত কোনো নারীদের সাথে এদের ঐতিহাসিক কোনো সম্পর্ক থাকার কারণে নয়।

দুই. আয়েশা রা. এর মতে 'ইনাস' অর্থ 'আওসান' তথা প্রতিমাসমূহ। 'আওসান' শব্দটি 'ওয়াসান' শব্দের বহুবচন। আরবিতে বহুবচন-জাতীয় শব্দগুলো স্ত্রীলিঙ্গ হিসেবে গণ্য হয়ে থাকে। যেহেতু মুশরিকরা একাধিক 'ওয়াছান' তথা প্রতিমাকে আহ্বান করত, সে জন্য এগুলোকে 'ইনাসান' বলা হয়েছে।

তিন. মুশরিকরা ফেরেশ্তাদেরকে আল্লাহর মেয়ে মনে করে এদের মাধ্যমে আল্লাহর নিকটবর্তী হওয়ার জন্য এদের উপাসনা করত। তারা এগুলোর নারী আকৃতির মূর্তি তৈরি করে এদের পূজা-অর্চনার জন্য কিছু নিয়ম নীতি তৈরি করেছিল, এদের গলায় অলংকার ঝুলিয়ে দিয়ে বলেছিল: এরা আল্লাহর মেয়ে যাদের আমরা উপাসনা করি। বিশিষ্ট তাবেঈ দাহহাক রহ. থেকে এ ব্যাখ্যাটি বর্ণিত হয়েছে। 'তারা এ সব মূর্তিকে আহ্বান করে মূলত অবাধ্য শয়তানকেই সাহায্যের জন্য আহ্বান করত', উক্ত আয়াতে এ কথা বলার কারণ হলো : শয়তানই মূলত তাদেরকে এ সবের আহ্বান করতে প্ররোচিত করত। উবাই ইবনে কা'ব রা. এর বর্ণনামতে এ সব

---

১ সুরা নিসা : আয়াত ১১৭

মূর্তির সাথে একটি করে মহিলা জিন থাকত। আর এ জিনরাই অদৃশ্যে থেকে তাদের আহ্বানকারীদের উপকার করে দিত। ফলে মুশরিকরা এ উপকারকে এ সব মূর্তির কাজ বলেই মনে করত। তাদের ধারণামতে ফেরেশ্‌তারা আল্লাহর মেয়ে হওয়ার কারণে তারা আল্লাহর অতীব নিকটতম ও প্রিয়ভাজন। তাদের সন্তুষ্টি অর্জন করতে পারলে আল্লাহর নিকটবর্তী হওয়া সম্ভব। সে জন্যেই তারা তাদের উপাসনা করত এবং বলত–

مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى

'তারা আমাদেরকে আল্লাহর নিকটবর্তী করে দেবে, এ উদ্দেশ্যেই আমরা তাদের উপাসনা করছি।'[২] আরও বলত : 'এরা আল্লাহর কাছে আমাদের জন্য শাফা'আতকারী।'[৩] লাত, উয্যা ও মানাত এ তিনটি দেবীকে নারীর নামে নামকরণ করার কারণ হিসেবে যে তিনটি কারণ বর্ণনা করা হয়েছে, এর যে কোনোটির কারণে এগুলোর উপর্যুক্ত নামকরণ হয়ে থাকতে পারে। তৃতীয় সম্ভাবনাটির কথা ঐতিহাসিকভাবে প্রমাণিত না হলেও মুশরিকরা যে ফেরেশ্‌তাদেরকে আল্লাহর মেয়ে মনে করত এবং ফেরেশ্‌তাদেরকে উদ্দেশ্য করেই যে তারা এ তিনটি দেবীকে উপর্যুক্ত নামে নামকরণ করেছিল, তা স্বয়ং কুরআন দ্বারাই প্রমাণিত। তারা যে ফেরেশ্‌তাদেরকে নারী মনে করত সে সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা বলেন,

وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَاثًا

'তারা ফেরেশ্‌তাদেরকে, যারা আল্লাহর বান্দা, তাদেরকে নারী বলে স্থির করেছে।'[৪] আবার ফেরেশ্‌তাদেরকে যে তারা আল্লাহর মেয়ে মনে করত, সে সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা বলেন,

أَفَرَأَيْتُمُ اللَّاتَ وَالْعُزَّى، وَمَنَاةَ الثَّالِثَةَ الْأُخْرَى، أَلَكُمُ الذَّكَرُ وَلَهُ الْأُنْثَى، تِلْكَ إِذًا قِسْمَةٌ ضِيزَى، إِنْ هِيَ إِلَّا أَسْمَاءٌ سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ

---

২ সুরা যুমার : আয়াত ৩
৩ সুরা ইউনুস : আয়াত ১৮
৪ সুরা যুখরুফ : আয়াত ১৯

'তোমরা কি ভেবে দেখেছ লাত, উয্যা ও তৃতীয় আরেকটি মানাত সম্পর্কে? পুত্র-সন্তান কি তোমাদের জন্যে আর কন্যা-সন্তান আল্লাহর জন্যে। এটা হবে খুব অন্যায় বণ্টন। এগুলো কতকগুলো নাম বৈ আর কিছুই নয়, যা তোমরা ও তোমাদের পূর্বপুরুষেরা রেখেছ, এসবের কোনো প্রমাণ আল্লাহ অবতীর্ণ করেননি।'[১]

উক্ত আয়াত দু'টির দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, তারা ফেরেশ্‌তাদেরকে আল্লাহর মেয়ে মনে করেই তাদের উপাসনার মাধ্যমে আল্লাহর নিকটবর্তী হওয়ার উদ্দেশ্যে লাত, উয্যা ও মানাত নামের এ তিনটি দেবীকে নারীর নামে নামকরণ করেছিল।

গ্রন্থকার আল্লামা ইবনুল জাওযি রহ. বলেন, চিন্তা করুন—কীভাবে শয়তান তাদেরকে নিজের অনুগত করে নিয়েছে এবং তাদের বিবেক-বুদ্ধি হরণ করে নিয়েছে। যে সব বস্তু নিজ হাত দ্বারা তৈরি করেছে, তাকেই পূজা করছে। আল্লাহ তায়ালা এই বানোয়াট মূর্তিপূজারিদের নিন্দায় বলেন,

أَلَهُمْ أَرْجُلٌ يَمْشُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ أَيْدٍ يَبْطِشُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ أَعْيُنٌ يُبْصِرُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ
آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا قُلِ ادْعُوا شُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ كِيدُونِ فَلَا تُنْظِرُونِ

"এ সব মূর্তির কি পা আছে যা দ্বারা সে চলতে পারে? তাদের কি হাত আছে যা দ্বারা তারা ধরতে পারে? তাদের কি চোখ আছে যা দ্বারা তারা দেখতে পায়? তাদের কি কান আছে যা দ্বারা তারা শুনতে পায়।"[২] এতে মূর্তিপূজার প্রতি ইঙ্গিত দেয়া হয়েছে। অর্থাৎ তোমরা তো পা দিয়ে হাঁটো, হাত দিয়ে ধরো, চোখ দিয়ে দেখো আর কান দ্বারা শোনো; এরা তো এসব কর্মকাণ্ড থেকে অপারগ। এরা নিষ্প্রাণ। তোমরা প্রাণবিশিষ্ট হয়েও কী করে নিষ্প্রাণ নিঃসাড় বস্তুকে পূজা করো!? এসব মূর্তিপূজারিরা যদি সামান্য চিন্তা-ভাবনা করত, তাহলে বুঝত যে, আসল উপাস্য তো সবকিছুর সৃষ্টিকর্তা। তার সাথে আর কাউকে ইবাদতে শরিক করত না। সুতরাং একমাত্র আল্লাহ তায়ালারই ইবাদত করা আবশ্যক। যিনি সর্বশক্তিমান ও ক্ষমতাবান। তারপরও মূর্তিপূজারিদের অন্তরে এ কথা বধ্যমূলভাবে গেঁথে আছে যে, এ সব মূর্তি আমাদের জন্য সুপারিশ করবে। এটা নিছক তাদের

---

১ সুরা নাজম : আয়াত ১৯
২ সুরা আ'রাফ : আয়াত ১৯৫

কল্পনাপ্রসূত মতবাদ। যার কোনো ভিত্তি নেই। আর এসব মূর্তির সাথে তার কোনো সম্পর্কও নেই।

অগ্নি, সূর্য ও চন্দ্রপূজারিদের ওপর ইবলিসের ফাঁদ

গ্রন্থকার আল্লামা ইবনুল জাওযি বলেন, একটি গোষ্ঠীর ওপর ইবলিস এভাবে ফাঁদ পাতল যে, তাদের মনে সে আগুনের ইবাদত তথা পূজা করার জন্য প্ররোচনা দিতে থাকল। ইন্ধন দিল, আগুন এমন এক রত্ন—পৃথিবীজুড়ে যার কোনো বিকল্প নেই। অর্থাৎ সমগ্র পৃথিবী এর মুখাপেক্ষী। এখান থেকেই একদল সূর্যের পূজায় মগ্ন হলো। ইমাম আবু জাফর জারির তাবারি রহ. উল্লেখ করেন, আদমপুত্র কাবিল যখন হাবিলকে খুন করে তার পিতার কাছ থেকে পালিয়ে ইয়ামেন চলে গেল, তখন ইবলিস তার কাছে এসে বলল, হাবিলের নজরানা কেন গৃহীত হয়েছে জানো? আগুন এসে তার নজরানা কেন ভস্মীভূত করেছে জানো? কারণ, সে অগ্নির সেবা করত এবং তার পূজা করত। এখন তুমিও আগুন এনে তার সেবা ও পূজা করো, তাহলে দেখবে সে তোমার জন্য এবং তোমার সন্তানদের জন্য শুভ পরিণাম বয়ে আনবে। কাবিল এ কথা শুনে একটি আতশখানা তৈরি করে তার পূজা-অর্চনা আরম্ভ করে দিল।

হাফিয বলেন, যারাদশ্ত—যাকে অগ্নিপূজারিরা নবী বলে মনে করে, সে বলখ শহর থেকে এসে দাবি করল, সে বহতা পর্বতে থাকত। সেখানে তার ওপর অহী অবতীর্ণ হতো। এদেশ খুবই ঠাণ্ডা। ওখানকার লোকজন ঠাণ্ডা ছাড়া কিছুই চিনত না এবং স্বীকার করত যে, শুধু পাহাড়ের অধিবাসী ছাড়া অন্য কোথাও থেকে কোনো নবী পাঠানো হয়নি। যারা তাকে মেনেছে তাদের জন্য সে খুবই নোংরা ও নিকৃষ্ট বিধি-বিধান চাপিয়ে দিয়েছে। যেমন, পেশাব দ্বারা অযু করা, মায়ের সাথে সহবাস করা এবং অগ্নিপূজা করা ইত্যাদি। উপরোক্ত যারাদশ্তের কথামালায় আছে, আল্লাহ একাকী ছিলেন, একাকিত্বের মেয়াদ বৃদ্ধি পেতে থাকলে তিনি চিন্তা-ভাবনা করে ইবলিসকে সৃষ্টি করেন। ইবলিস তার সম্মুখে এলে আল্লাহ তাকে খুন করতে চান, এতে সে বাধা দেয়। আল্লাহ দেখলেন, সে নিয়ন্ত্রণে আসছে না। তখন নির্দিষ্ট একটি সময়ের জন্য তার সাথে সন্ধি করে নেন। (নাউযুবিল্লাহ)

জানা কথা, অগ্নিপূজরিরা অগ্নিপূজা করার জন্য অসংখ্য আতশখানা তৈরি করে। সবার আগে আফ্রিদুন নামীয় ব্যক্তি অগ্নিপূজা করার জন্য তারসুস

নামক শহরে একটি অগ্নিকুণ্ডলী স্থাপন করে, আরেকটি বোখারায় স্থাপন করে। আর ব্রাহ্মণ সিস্তানে অগ্নিকুণ্ডলী স্থাপন করে। এভাবে বহু স্থানে আগুন পূজার ব্যবস্থা করা হয়। জুডিসের কাছে এমন কিছু আগুন ছিল, সে দাবি করত এগুলো আকাশ হতে এসেছে। আর তিনি তা উৎসর্গ করেছেন। এটা এভাবে হয়েছে যে, সে একটি সীমানা নির্ধারণ করল এবং তার মধ্যখানে একটি বোতল স্থাপন করল, এদিকে উৎসর্গের জন্তু একটি লাকড়ির ওপর টাঙালো, এটি গন্ধকমিশ্রিত ছিল। দ্বিপ্রহরে সূর্য মাথা বরাবর এলে ছাদের প্রদীপ থেকে সূর্যের রশ্মি বোতলে পড়লে গন্ধকের তীব্র তেজে লাকড়িতে আগুন ধরে যেত। জুডিস বলত, তোমরা এ আগুন নেভাবে না।

গ্রন্থকার বলেন, ইবলিস কিছু মানুষের অন্তরে চন্দ্রপূজার প্ররোচনা দিল। অন্য আরও কিছু মানুষের মনে প্রয়োগ করল তারকা-পূজার ইন্ধন। ইবনে কুতাইবা রহ. বলেন, ইসলামের পূর্বে অজ্ঞতার যুগে একটি গোষ্ঠী পূজা করত শা'রুল উবূর নামীয় তারার। এতে তারা নিমজ্জিত হলো নানাবিধ ফিতনায়। এর উত্তরণে তাদের মনে উৎসর্গের স্বাদ জাগলো।

আবু কাবাশা—যার দিকে ইঙ্গিত করে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মুশরিকরা সম্বোধন করত ইবনে আবি কাবাশা বলে। সে-ই প্রথম ব্যক্তি যে শু'রা নামীয় তারকা পূজা করত। তার মতে, এই তারকা আকাশের পার্শ্ব কর্তন করে। এটা ছাড়া আর কেউ আকাশের পার্শ্ব কর্তন করতে পারে না। এই ধারণায় তারা এটাকে পূজা করতে থাকে। এটা কুরাইশদের মতবাদের বিপরীত বলে সাব্যস্ত হয়। এ কারণে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর পক্ষ হতে প্রেরিত হয়ে একমাত্র আল্লাহর ইবাদতের দিকে মানুষকে দাওয়াত দিয়ে বলেন, ছেড়ে দাও এসব মূর্তিপূজা। কুরাইশরা তখন বলতে আরম্ভ করল, এটাও আবু কাবাশার পুত্র। অর্থাৎ আবু কাবাশা যেমন আমাদের বিরোধিতা করেছে, অনুরূপ এ-ও আমাদের বিরোধিতা করছে। বনি ইসরাইল এমন প্রেক্ষিতে হজরত মারইয়াম আলাইহিস সালামকে 'উখতে হারুন' বা হারুনের বোন বলে সম্বোধন করত। অর্থাৎ হারুনের মতো সৎচরিত্রবান ও নেককার।

স্মর্তব্য যে, শু'রা নামীয় তারকা দু'টি। একটি হচ্ছে উক্ত শু'রা উবূর, আর অন্যটিকে বলা হয় শু'রা গুমাইসা। এদের আবার রয়েছে প্রতিপক্ষও। ইবলিস অন্য জাতিগুলোকে ফেরেশতাদের পূজা করতে প্ররোচনা দিতে থাকে। ফেরেশতাকে তাই তারা আল্লাহর কন্যা বলে অভিহিত করতে শুরু

করে। আরেক জাতিকে গরু ও ঘোড়াকে পূজা করার ব্যাপারে প্রলুব্ধ করতে থাকে। এই গরুপূজারিদের একজন ছিল সামেরী। তা'বীর নামক গ্রন্থে আছে, ফেরাউনও পশু পূজা করত। এ-সব বেকুবদের বুঝি আকল-বুদ্ধি বলতে কিছুই থাকতে নেই!

প্রাক ইসলামিক যুগে জাহেলদের ওপর শয়তানের কুমন্ত্রণা

গ্রন্থকার আল্লামা ইবনুল জাওযি রহ. বলেন, ইবলিস কীভাবে মানুষের ওপর মূর্তিপূজার প্রলোভন দিয়ে থাকে এতক্ষণ ধরে আমি তার বিবরণ দিয়ে এসেছি। এ-সংক্রান্তে ইবলিসের মস্ত বড় চক্রান্ত ছিল, তখনকার লোকেরা বিনা প্রমাণে, কোনো প্রকার চিন্তা-ভাবনা না করেই বাপ-দাদা তথা পূর্ব-পুরুষদের পদাঙ্ক অনুসরণ করত। এ ব্যাপারে আল্লাহ তায়ালা বলেন,

وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ

"তাদের যখন বলা হয়, আল্লাহ যে বিধান অবতীর্ণ করেছেন তা মেনে চলো, জবাবে তারা বলে, আমাদের বাপ-দাদাদের যে পথের অনুসারী পেয়েছি আমরা তো সে পথে চলব। আচ্ছা, তাদের বাপ-দাদারা যদি একটুও বুদ্ধি খাটিয়ে কাজ না করে থেকে থাকে এবং সত্য-সঠিক পথের সন্ধান না পেয়ে থাকে, তাহলেও কি তারা তাদের অনুসরণ করে যেতে থাকবে?"[১]

এভাবেই তাদের মধ্য থেকে একদলের ওপর ইবলিস এমন কুমন্ত্রণা দিল যে, তারা দাহরিয়া তথা নাস্তিকদের পন্থা বেছে নিল। সৃষ্টিকর্তা এবং মৃত্যুর পর পুনরুত্থানকে অস্বীকার করে বসল। বলল, কোনো সৃষ্টিকর্তা নেই এবং মৃত্যুর পর কখনো জীবিত করা হবে না।

'দুনিয়ার জীবনই আসল জীবন, এরপর আমাদেরকে আর জীবিত করা হবে না।' অন্যত্র আছে—তারা বলত, 'কালের পরিক্রমায় আমরা হারিয়ে যাব।'

তাদের এক দলের ওপর শয়তান প্রভাব ফেলল এভাবে যে, তারা নিজের রায়মতে সৃষ্টিকর্তাকে তো স্বীকার করেছে, কিন্তু রাসুল এবং কিয়ামতকে অস্বীকার করে বসে। আরেক দলের মাঝে শয়তান ফেরেশতাদেরকে

---

১ সুরা বাকারা : আয়াত ১৭০

আল্লাহর কন্যা বলে স্বীকার করতে প্ররোচিত করল। একদল ঝুঁকল ইহুদি-খ্রিষ্টানদের প্রতি, আরেক দল অগ্নিপূজারিদের দিকে। এই আকিদা আরবের অধিকাংশ বনু তামীম গোত্রের মাঝে বিদ্যমান ছিল। তার পুত্র হাজেব পোষণ করত এই মতবাদ।

আরবের কিছু অধিবাসী সৃষ্টিকর্তাকে স্বীকার করে বলত, তিনি শুরুতে সৃষ্টি করেছেন এবং মৃত্যুর পর আবারও সৃষ্টি করবেন। তখন তারা সাজা ও শাস্তি উভয়টাই প্রাপ্ত হবে। আবদুল মুত্তালিব ইবনে হাশিম, যায়দ ইবনে আমর ইবনে নুফাইল, কাইস ইবনে সাইদা এবং আমের ইবনুয্ যারাব এই আকিদা পোষণ করতেন। বর্ণিত আছে, আবদুল মুত্তালিব একজন অত্যাচারী—দুনিয়াতে যে কোনো শাস্তি পায়নি—তার উদ্দেশ্যে বলেছিলেন, আল্লাহর কসম! এই দুনিয়ার বাইরে আরেকটি জগৎ আছে, যেখানে ভালো-মন্দ উভয়ের বদলা দেয়া হবে। যুহাইর ইবনে আবি সালমাও এই দলভুক্ত ছিলেন। (এই আকিদার কথা 'সাবয়ায়ে মুয়াল্লাকা'তে বিবৃত হয়েছে। সেখানে আবৃত্তি হয়েছে–

يؤخر فيوضع في كتاب فيدخر * ليوم الحساب أو يعجل فينقم

"যখন সৃষ্টিকর্তার কাছে তোমাদের মন্দ বিষয়ে বিচারের কথা জানা আছে, তা তো লুকাতে পারবে না। সুতরাং দু'টি রাস্তা উন্মুক্ত—হয়তো শাস্তি পেতে দেরি হবে, তখন আমলনামায় তা লিপিবদ্ধ হয়ে হিসাবের দিন দেখতে পাবে। নচেৎ এখন কর্মের মাধ্যমে তার প্রতিবিধান করে নাও এবং অপরাধীদের শাস্তি দাও।"

তারা ইসলামের প্রারম্ভলগ্নে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হয়। এদের মধ্যে যায়দ আলফাওয়ারিস বিন হাসান রয়েছেন। আরও আছেন, কিলমিস ইবনে উমাইয়া আলকিনানী। এসব ব্যক্তিরা কা'বার ছায়ায় দাঁড়িয়ে লোকদের ওয়াজ শোনাতেন। হজের মৌসুম ছাড়া অন্য সময় আরবের বিভিন্ন গোত্র এদের ওয়াজ শ্রবণ না করে বাড়ি যেতেন না। একদিন তিনি বলেন, হে আরববাসী! আমার কথা শোনো এবং মান্য করো, তাহলে তোমরা সফলকাম হবে। আরববাসী সমস্বরে বলল, কী সে কথা? তিনি বললেন, তোমাদের প্রত্যেক গোত্র পৃথক পৃথক মূর্তি বানিয়ে পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছ। আমি খুব ভালো করেই জানি, আল্লাহ তায়ালা ওসবে সন্তুষ্ট নন। আল্লাহ তায়ালা ওই ঠাকুরগুলোর প্রতিপালক। তিনি চান, কেবল তাঁরই

উপাসনা করা হোক। এ ওয়াজ শুনে সে বছর মানুষজন ছুটে চলে গেল, তার ওয়াজ আর শুনল না।

আরবের কিছু কিছু গোত্রের বিশ্বাস ছিল, কেউ মারা গেলে তার কবরে যদি তার উট বেঁধে দিয়ে আবার ছেড়ে দেয়া হয়, তারপর সেই উটটি মারা গেলে হাশরের দিন এই সাওয়ারী সে পাবে। এমন যদি না হয়, তবে সে হেঁটে হেঁটে হাশরের মাঠে অগ্রসর হবে। আমর ইবনে যায়দ আলকালবী এমন মতবাদ পোষণ করতেন।

তাদের মধ্যে অনেকেই নিরবচ্ছিন্নভাবে শিরকে লিপ্ত থাকতেন। খুব কম লোক এসব মূর্তির উপাসনা ছেড়ে শুধু আল্লাহর ইবাদত করত। যেমন কায়স ইবনে সায়েদা ও যায়দ ইবনে আমর ইবনে নুফাইল। জাহেলি যুগে লোকজন সর্বদা নিত্য নতুন বিদয়াত সৃষ্টি করত। এতে তারা হালাল মাস হারাম করত আর হারাম মাস হালাল করত। কেউ মারা গেলে তার স্ত্রীকে তার নিকট ভাই সম্পর্কিত ব্যক্তি ওয়ারিস হিসেবে লাভ করত। তারা বুহাইরা সংস্কৃতি চালু করে। অর্থাৎ কোনো উটনী পাঁচটি বাচ্চা প্রসব করলে, পঞ্চমবার যদি মাদী উট প্রসব করে, তখন তার কান ছেদন করে দেয়া হতো এবং মহিলাদের জন্য তার গোস্ত খাওয়া বিবেচিত হতো নিষিদ্ধ হিসেবে। অনুরূপভাবে তারা সায়েবা নামীয় এক সংস্কৃতি উদ্ভাবন করে। অর্থাৎ উট, গাভী বা ছাগলের কিছু পাল স্বাধীনভাবে ছেড়ে দেয়া হতো। তাদের পিঠে কোনো সাওয়ারি আরোহণ নিষিদ্ধ থাকত এবং তাদের দুধ দোহনও করা যেত না। এভাবে তারা উসিলার রসম আবিষ্কার করে। উসিলা ওই ছাগলকে বলা হয়, যে সাতটি ছানা জন্ম দেয়। সপ্তমবার যদি দু'টি ছানা প্রসব করে যার একটি নর, অন্যটি মাদী হয়, তবে তারা এ দু'টিকে জবেহ করার উপযোগী মনে করত না এবং তারা বলত, তার দ্বারা কেবল পুরুষেরাই উপকৃত হতে পারবে, মহিলারা এ দ্বারা কোনোভাবে উপকৃত হতে পারবে না। এভাবে 'হাম' সংস্কৃতির উদ্ভাবন করে। মুশরিকরা আরও দাবি করত, আল্লাহ তায়ালা আমাদেরকে এই সংস্কৃতি মেনে চলার নির্দেশ দিয়েছেন। অথচ এটি ছিল চরম মিথ্যাচার। আল্লাহ তায়ালা বলেন,

وَلٰكِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ

"অথচ যারা কাফির, তারা আল্লাহর ব্যাপারে মিথ্যা অপবাদ দিচ্ছে।"[১]

---

১ সুরা মায়িদা : আয়াত ১০৩

পরে মুশরিকরা যে সকল বাহিরা, সায়েবা, উসিলা ও হাম[১] নির্ধারণ করেছিল এবং তাকে যেভাবে পুরুষের জন্য বৈধ আর নারীদের জন্য অবৈধ সাব্যস্ত করেছিল, তা আল্লাহ তায়ালা রহিত করে বলেন,

قُلْ آلذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِ الْأُنثَيَيْنِ

"তিনি কি উভয় নর হারাম করেছেন, না উভয় মাদিকে[২]"

এমনই করে ইবলিস আরবের গ্রামবাসীকে সন্তানদের খুন করতে প্রলুব্ধ করতে থাকে। তাই অনেককে দেখা যায়, যারা স্বীয় কন্যাসন্তানদের খুন করে কুকুর দিয়ে তার মাংস ভক্ষণ করিয়ে সেই কুকুরকে লালন-পালন করত। সেই অন্ধকার যুগে ইবলিস মানুষের মনমুকুরে এমন কূটচাল গেঁথে দিল যে, তারা বলল, لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا "আল্লাহ যদি চাইতেন তবে আমরা শিরক করতাম না।[৩]" অর্থাৎ তিনি যদি আমাদের শিরকের ওপর খুশি না থাকতেন, তাহলে এমন ব্যবস্থাপত্র দিতেন, যা দ্বারা আমরা আর শিরকে পতিত হতাম না। দেখুন, এই অজ্ঞরা আল্লাহর ইচ্ছার ব্যাপারে প্রশ্ন তোলার কী কপট স্পর্ধা দেখিয়েছে!

নবুওয়ত অস্বীকারকারীদের ওপর শয়তানের ফাঁদ

ইবলিস ব্রাহ্মণ ও হিন্দুদের ওপর এমন প্ররোচনার পর্দা ঢেলে দিল যে, তারা এতে নবুওয়ত অস্বীকার করে বসল। এই ফাঁদের খপ্পরে পড়ে তারা শতধা বিভক্ত হয়ে গেল। হিন্দুদের কোনো কোনো সম্প্রদায় দাহরিয়া মতবাদের, কেউ আবার সানাভিয়ার মতো, কেউ বা ব্রাহ্মণ্যবাদের ধারক।[৪] কেউ কেউ কেবল আদম ও ইবরাহিম আলাইহিস সালামকে নবী হিসেবে মানে। আবু

---

১ ক. 'বাহীরা' ওই উট, যার কান কেটে প্রতিমার নামে ছেড়ে দেয়া হতো। খ. 'সায়েবা' ওই উট, যাকে প্রতিমার নামে ছেড়ে দেয়া হতো। গ. 'হাম' ওই উট, যাকে কয়েকবার সংগমের পর সাওয়ারী এবং বোঝা বহন থেকে মুক্ত করে দেয়া হতো এবং ঘ. 'উসীলা' ওই উটনী, যাকে কয়েকবার মাদী বাচ্চা প্রসবের পর মূর্তির নামে মুক্ত করে দিত।

২ সুরা আন'আম : আয়াত ১৪৪

৩ সুরা আর'আম : আয়াত ১৪৮

৪ ওঁ বা ওঁকার (অপর বানানে ওঙ্কার) বা প্রণব, সনাতন হিন্দুধর্মের পবিত্রতম ও সর্বজনীন প্রতীক। এটি হিন্দু দর্শনের সর্বোচ্চ ঈশ্বর ব্রহ্মের বাচক। এই ধর্মের প্রতিটি সম্প্রদায় ও উপসম্প্রদায়ের নিকটেই এটি পবিত্র বলে গণ্য। স্বামী বিবেকানন্দের মতে, ওঁ-কার "সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডের প্রতীক, ঈশ্বরেরও প্রতীক।"

মুহাম্মাদ নাওবখতি তাঁর 'কিতাবুল আরা ওয়াদদিয়ানাত' গ্রন্থে বর্ণনা করেন, হিন্দু ব্রাহ্মণদের একটি দলের অভিমত হচ্ছে, সৃষ্টিকর্তা আছেন। রাসুল এসেছেন। স্বর্গ-নরকও আছে। আরও বলে, তাদের রাসুল ছিলেন একজন ফেরেশতা, যিনি মানুষের আকৃতিতে ধরাধামে এসেছিলেন। কিন্তু তার কাছে কোনো ঐশী গ্রন্থ ছিল না। তার ছিল চারটি হাত, দশটি মাথা। তার মধ্যে একটি মাথা ছিল মানুষের মাথার মতো, আর অবশিষ্ট মাথাগুলো ছিল বাঘ, ঘোড়া, হাতি, শুয়োর ইত্যাদি জন্তুর ন্যায়। সে তাদেরকে অগ্নিপূজার নির্দেশ দেয় এবং প্রাণীহত্যায় বাধা দেয়। আবার শুধু আগুনের সম্মানে প্রাণী হত্যারও নির্দেশ দেয়। মিথ্যা ও মদ্যপান হতে নিষেধ করে। ব্যভিচার বৈধ বলে ঘোষণা দেয়। পাশাপাশি তাদেরকে গাভিপূজার আদেশ করে। তাদের মধ্যে কেউ ধর্মত্যাগী হলে তার মাথা, দাড়ি, গোফ, ভ্রু ও চোখের পাপড়ি উপড়ে ফেলা হতো। পরে তাকে গাভীর কাছে নিয়ে প্রণাম করানো হতো। এমন অনেক ভ্রান্ত মতবাদে টইটম্বুর তাদের ধর্ম। এসব বর্ণনা করে বেহুদা সময় অপচয়ের কোনো মানে হয় না। আমরা এবার ইবলিস তাদের অন্তরে যে ছয়টি সন্দেহের জাল বিছিয়েছে সেগুলো বিশ্লেষণ করব :

১. প্রথম সন্দেহ হচ্ছে, তাদের কেউ একজন এ বিষয়ে জ্ঞাত হয়েছে যে, ঐশীদূতকে সবার থেকে গোপন রাখা হয়েছে। তারা বলে, مَا هَٰذَا إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ ' এ ব্যক্তি আর কিছুই নয় কিন্তু তোমাদেরই মতো একজন মানুষ।'[৫] অর্থাৎ যে বিষয় সম্পর্কে সবাই অজ্ঞাত, তা কী করে প্রকাশ পেতে পারে? এর জবাব হচ্ছে, যদি এ সকল লোক মানবিক বিবেক-বোধ দ্বারা কথা বলে, তাহলে বলা হতো যে, তাদের জাতি থেকে এক ব্যক্তির কাছে এমন উত্তম গুণাবলি বিদ্যমান যা দ্বারা সে সবার চেয়ে অগ্রগামী হয়েছে। সুতরাং তার বিশেষ গুণের কারণে সে তার উপযুক্ত হতে পারে যে, তার ওপর অহী তথা ঐশী বার্তা আসে। প্রত্যেক মানুষ তো এর উপযোগী হয় না। সবার এটা জানা, আল্লাহ তায়ালা সব সৃষ্টিকে জোড়ায় জোড়ায় সৃষ্টি করেছেন। এর মধ্যে বহু জাত থাকে। অনেকগুলো থেকে ঔষধ তৈরি হয়, যা দ্বারা শরীর আরোগ্য লাভ করে। তো, আল্লাহ তায়ালা যখন পাথর ও উদ্ভিদের মধ্যে এত উপকারী গুণ রেখেছেন, যা দ্বারা শরীরের কঠিন রোগ-বালাই ভালো হয়, যা প্রকৃতপক্ষে এই নশ্বর পৃথিবীতেই নিঃশেষ হয়ে যায়।

---

৫ সুরা মুমিনুন : আয়াত ২৪।

তাহলে আখেরাতে এটা ঠিক রাখার জন্য তো এমন আরোগ্য বিধান আরও অধিক প্রয়োজন। সুতরাং এটা অস্বাভাবিক কোনো বিষয় নয় যে, আল্লাহ তায়ালা তাঁর সৃষ্টির মধ্য থেকে কিছু মানবকে সুউচ্চ প্রজ্ঞার সাথে বিশিষ্ট করবেন, যার দ্বারা সে মাখলুককে আল্লাহ তায়ালার দিকে আহ্বান করবে। আর মানুষের মাঝে অন্যায়-অনাচারের কারণে যে সকল ব্যাধির সৃষ্টি হয়েছে তার চিকিৎসা ও প্রতিবিধান বাতলে দেবেন। সুতরাং যারা নবুওয়তকে অস্বীকার করে তারা কেবল শয়তানের প্ররোচনায় পড়েই এমন করে থাকে—এতে কোনো সন্দেহ নেই। আল্লাহ তায়ালা কিছু মানবকে এমন রিসালত ও অসিয়ত দ্বারা বিশিষ্ট করেছেন, যার মাধ্যমে মানুষ বিশ্বের শান্তি ও চরিত্রের শুদ্ধতা নিশ্চিত করতে পারে। আল্লাহ তায়ালা সেদিকে ইশারা করে বলেন, أَكَانَ لِلنَّاسِ عَجَبًا أَنْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ رَجُلٍ مِّنْهُمْ أَنْ أَنذِرِ النَّاسَ "মানুষের জন্য এটা কি একটা আশ্চর্যের ব্যাপার হয়ে গেছে যে, আমি তাদেরই মধ্যে থেকে একজনকে নির্দেশ দিয়েছি, (গাফিলতিতে ডুবে থাকা) লোকদেরকে সজাগ করে দাও।"[১]

২. নবুওয়ত অস্বীকারকারীরা বলে, আল্লাহ তায়ালা ফেরেশতাকে কেন রাসুল বানিয়ে পাঠালেন না? ফেরেশতারাই তো তাঁর অধিক নিকটবর্তী। তারা নবী হলে কোনো সন্দেহ থাকত না।

তিনভাবে এর জবাব দেয়া যায়–

ক. ফেরেশতারা অতীব শক্তিশালী হওয়ার কারণে পাহাড়-পর্বতের মতো ভারী বস্তু ওলট-পালট করে দিতে পারে। এটা কোনো মুজেযার পর্যায়ে পড়ে না, যা তার সত্যতার দাবিতে প্রমাণ হিসেবে উপস্থাপিত হতে পারে। মুজেযা সেটাই হয়, যা তার সচরাচর অভ্যাসের বিপরীত হয়। এতে তার সত্যতা সহজেই প্রমাণিত হয়।

খ. প্রত্যেক বস্তু তার নিজ জাতির দিকে অধিক ধাবিত হয়। সুতরাং মানুষের কাছে মানবজাতি থেকেই নবী হওয়া উচিত। এতে তাকে মানুষ ভয় বা ঘৃণা করবে না এবং তার কথাবার্তা বুঝবে। অতঃপর সেই জাতিভুক্ত বিশেষজনকে বিশেষ মুজেযা প্রদান করা হলে জাতি সহজেই তা স্বীকার করতে বাধ্য হবে।

---

১ সুরা ইউনুস : আয়াত ২

গ. ফেরেশতাকে দেখার শক্তি মানুষের নেই। তাদের দেখলে মানুষ ভয়ে মৃত্যুমুখে পতিত হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। তাছাড়া নবীদেরকে আল্লাহ্ তায়ালা নির্দিষ্ট কিছু বৈশিষ্ট্যের সাথে প্রেরণ করতে চান। যেমন আল্লাহ্ তায়ালা বলেন, وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَّجَعَلْنَاهُ رَجُلًا "যদি ফেরেশতা পাঠাতাম তাহলেও তাকে মানুষের আকৃতিতেই পাঠাতাম।"[২] পরে আরও বলেন, وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِم مَّا يَلْبِسُونَ "এবং এভাবে তাদেরকে ঠিক তেমনি সংশয়ে লিপ্ত করতাম যেমন তারা এখন লিপ্ত রয়েছে।"[৩] অর্থাৎ যদি ফেরেশতাকে পুরুষ মানুষের আকৃতিতে পাঠানো হতো, তাহলে তারা জানতে পারত না যে, এ কী ফেরেশতা নাকি মানুষ!

৩. তৃতীয় সন্দেহস্বরূপ অস্বীকারকারীদের দাবি, নবীরা যে সকল মুজেযার দাবি করে, অদৃশ্যের যে সকল ইলমের কথা বলে এবং যে অহী বা প্রত্যাদেশ তারা প্রাপ্ত হন—আমরা তো দেখি এমন কর্মকাণ্ড জ্যোতিষী ও যাদুকরেরাও দেখিয়ে থাকে। সুতরাং কোন্ প্রমাণের ভিত্তিতে আমরা বুঝে নেব যে, এটা মুজেযা; যাদু নয়। অতএব বিশুদ্ধ ও ভুয়ার মধ্যে পার্থক্যের আর কোনো প্রমাণ রইল না।

এর জবাবে আমরা বলব, আল্লাহ তায়ালা সন্দেহ দূর করার মতো বহু প্রমাণ বয়ান করেছেন এবং মানুষকে জ্ঞান-বুদ্ধি ও বিবেচনার শক্তি দিয়েছেন। এর মাধ্যমে সে যাদু ও মুজেযার মাঝে পার্থক্য নির্ণয় করে নেবে। কোনো জাদুকরের কি মৃতকে জীবিত করার, লাঠিকে সাপ বানানোর সামর্থ্য বা কৌশল জানা আছে? রয়ে গেল জ্যোতিষীর কথা। তো, সে মাঝে মাঝে ঠিক বলে, আবার কখনো কখনো ভুল ভবিষ্যদ্বাণী দেয়। নবুওয়ত এর সম্পূর্ণ বিপরীত। কেননা এতে কোনো প্রকার ভুল বা ভ্রান্তির বিন্দু পরিমাণ অবকাশ নেই। (বিশেষ করে চন্দ্র দ্বিখণ্ডিকরণের মতো ঘটনা আদৌ কোনো জাদুকর দেখাতে পারবে কি?)

৪. চতুর্থত নবুওয়ত অস্বীকারকারীরা বলে, নবীরা যা কিছু বলেন, তা আকলের বিপরীত। সুতরাং তা গ্রহণযোগ্য নয়। যদি আকলসিদ্ধ হয় তাহলে আকলই তো যথেষ্ট।

---

২ সুরা আন'আম : আয়াত ৯

৩ সুরা আন'আম : আয়াত ৯

এর জবাবে আমরা বলব, এটা নির্দ্বিধায় বলা যায়, অধিকাংশ মানুষ নিজেদের জাগতিক নেতৃত্বদানে অপারগ। তাদের জন্য একজন নির্বাহী পরিচালকের মতো জ্ঞানী লোক ও শাসনকর্তার প্রয়োজন পড়ে। সুতরাং ঐশী বিধি-বিধান এবং পরকালের ব্যাপারে কী করে অপারগ লোকেরা চিন্তা করবে? অতএব তাদের জন্য অহী বা ঐশী প্রত্যাদেশ অবশ্য জরুরি।

৫. পঞ্চম সন্দেহ হচ্ছে, শরিয়তে কিছু বিষয় এমন আছে, যেগুলোকে আমাদের মানবিক বোধ-বুদ্ধি ঘৃণা করে। যেমন, প্রাণী হত্যা। এটাকে শরিয়ত কীভাবে বৈধতা দিল?

তার উত্তরে আমরা বলতে পারি, অবশ্যই এক প্রাণী আরেক প্রাণীকে হত্যা বোধ-বুদ্ধি ও বিবেকের দৃষ্টিতে ঘৃণিত। কিন্তু যখন সৃষ্টিকর্তা এমন নির্দেশ প্রদান করেছেন, সেখানে বিবেকের অভিযোগ তোলার আর সুযোগ বা অবকাশ থাকে না।

৬. নবুওয়ত অস্বীকারকারীদের ষষ্ঠ সন্দেহ হচ্ছে, হতে পারে শরিয়তদাতা কিছু পাথর ও লাঠিতে সুনির্দিষ্ট কিছু বৈশিষ্ট্য রেখেছেন। আর এর মাধ্যমে এটাকে মুজিযা হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়েছে।

তদুত্তরে আমরা বলতে পারি, সন্দেহবাতিকদের কিছুটা লজ্জা থাকা চাই। কেননা উদ্ভিদের বৈশিষ্ট্য ও উপকারিতা দীর্ঘ সময় সুন্দরভাবে প্রকাশিত হয়েছে এবং এর রহস্য উন্মোচিত হয়েছে। তথাপি কোনো ব্যক্তি যদি সেই পাথর বা লাঠি পায় এবং তিনি তার বৈশিষ্ট্য উন্মোচিত করেন (যেমন মুসা আলাইহিস সালাম এর লাঠিতে কিছু বৈশিষ্ট্য ছিল) তখন তা দেখে তখনকার লোকেরা বলত, এটা তোমার মুজেযা নয়; বরং লাঠি বা পাথরের বৈশিষ্ট। পরে জানা গেল, মুজিযা কেবল একটি বিষয়েই হয়নি, কয়েকভাবে হয়েছে। যেমন, পাহাড় থেকে উটনী বের হওয়া, মুসা আলাইহিস সালাম এর লাঠি সম্পূর্ণভাবে মস্তাকার সাপে রূপান্তরিত হওয়া, পাথর থেকে ঝর্ণাধারা প্রবাহিত হওয়া, এই পবিত্র কুরআন মাজিদ[১] যা আনুমানিক ছয়শত ছয়শত বছর অতিক্রম হওয়া সত্ত্বেও অবিকৃত অবস্থায় মানুষ কান দ্বারা তা শ্রবণ করে, অন্তর দ্বারা চিন্তা-গবেষণা করে। এ ব্যাপারে চ্যালেঞ্জ ধরা হয়েছিল যে, কুরআনের মতো একটি সুরা বা আয়াত নিয়ে আসো। তা সম্ভব হয়নি এবং কিয়ামত পর্যন্ত সম্ভব হবেও না।

---

১ যা চৌদ্দশত বছরের অধিক সময় অবিকৃত অবস্থায় রয়ে গেছে।

তাহলে কোথায় এ-সব মহাপবিত্র মুজেযা আর কোথায় জ্যোতিষী, জাদুকর!

আবুল ওয়াফা ইবনে আকিল রহ. বলেন, নাস্তিকদের একঘেয়েমির স্বরূপ এমন যে, তারা চায় যে কোনোভাবে যেন সত্যের কালিমা মুছে যায় এবং সৃষ্টির মাঝে শরিয়তের কোনো বিধান না থাকে, মানুষ যেন সে মতে আমল না করে। সে নাস্তিকদের মধ্যে দার্শনিক ইবনুর রাওয়ান্দী, কবি আবুল আলা আল মুয়াররা এবং তাদের মতো আরও অনেকে রয়েছে। তাদের হাজারো হীন চক্রান্ত সত্ত্বেও অভীষ্ট লক্ষ্যে তারা বিন্দু পরিমাণ এগোতে পারেনি। উল্টো এসব কূপমন্ডুকদের প্রত্যাশার বিপরীতে পৃথিবীর দিকে দিকে বাড়ছে মসজিদ, বাড়ছে মুসল্লি সর্বত্র বাজছে শাশ্বত ইসলামের জয়গান। দৈনিক পাঁচবার সাধারণ মসজিদগুলোতে ইবাদতের জন্য আযান দেয়া হয়, নাস্তিকদের কানে তো দু'টি ছিদ্র ঠিকই আছে। তারা তা শুনতে পায়। মুসলমান হজের সময় নিজেদের জান, মাল, সময় কুরবানী করে দূর-দূরান্ত হতে হাজির হয় কা'বা প্রাঙ্গণে। এতে তারা নির্দ্বিধায় শত কষ্ট-ত্যাগ বরদাশত করে। তারপরও শরিয়তের নিদের্শ ঈমানের শক্তিতে বলীয়ান হয়ে আমলে ব্রতী হয়।

নাস্তিকদের ধোঁকাবাজি দেখুন! তাদের কেউ কেউ নকল আলেমদের কাছে কিছু পাপীকে লোভের ফাঁদে ফেলে মিথ্যা সনদের মাধ্যমে বানোয়াট কথাবার্তা শুনিয়ে তাদের গ্রন্থে প্রবেশ করায়। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং সাহাবাদের যমানার ঘটনাবলিতে মিথ্যা ও বানোয়াট কথাবার্তার মিশ্রণ ঘটিয়ে আলেমদের ধোঁকা দেয়। কিছু নাস্তিক নিজ দায়িত্বে এ কাজটি আঞ্জাম দিয়ে থাকে। তারা মুজেযার মতো বিভিন্ন বস্তু আবিষ্কার করে বলে, অমুক দেশে এমন পাথর তৈরি হয়, যার মধ্যে এমন বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান, যা দ্বারা অত্যাশ্চার্য বস্তু বের হয়। এছাড়া বহু জ্যোতিষী দিয়ে নানাবিদ প্রোপাগান্ডা প্রচার করে।

আসওয়াদ ওয়াজ করার সময় এমন বহু ভবিষ্যদ্বাণী করত। বর্তমান যুগেও এমন বহু মানুষ দেখা যায়, যারা এমন এমন কথা বলে বেড়ায় যা কেবল উন্মাদের মস্তিষ্কেই ঠাঁই পাওয়ার যোগ্য। আবুল ওয়াফা বলেন, এরা এমন অনেক আশ্চর্য বিষয়াবলি বলে বেড়ায়, যা সাধারণ মানুষ শুনে বিভ্রান্ত হয়ে পড়ে। তারা জানে না—এ সব নাস্তিকদের কূটচাল। আগ বাড়িয়ে বলে, নবীর সময় এমন আশ্চর্য বিষয় দেখলে কি তারা অবিশ্বাস করত?

"আর তোমরা যা আহার করো এবং তোমাদের ঘরে যা জমা করে রাখো তা আমি তোমাদেরকে জানিয়ে দেব।"[১] এর কোনো অবকাশ কি বর্তমানে অন্তরে অবশিষ্ট আছে? আর এটা তো সাধারণ অভ্যাস, যার স্থিতি এখনও নিষিদ্ধ হয়নি। শায়খ বলেন, দেখুন! এই অজ্ঞরা কোন্ দিকে ইঙ্গিত দিচ্ছে? এসব লোক যা ভেবেছে তা তো প্রকাশ্য। আর যে দিকে ইঙ্গিত করেছে সেটাও উন্মুক্ত। অতঃপর তারা বলে, এসো, আমরা তোমাদেরকে এমন অনেক দেশ, ব্যক্তি, গ্রহ ও বিশেষ সূত্র বলে দেব, আর সহজেই অনুমেয়—ওই অধিকাংশ ঘটনার যে কোনো একটি তো সত্য হবে। আর যখন একটি সত্য মেনে নেয়া হবে, তখন সবগুলোই সত্য হিসেবে মেনে নেবে। কেননা সবগুলোই এক রকম। তখন নবীরা যে সকল স্বভাববিরোধী মুজেযা নিয়ে এসেছিলেন তা বাতিল বলে গণ্য হবে। এই দুষ্টু নাস্তিকেরা সুফিদের একটি দলকে কাছে টেনে নেয়, যারা বলে বেড়ায়—অমুক বুযুর্গ তার পাত্র দজলা নদীর দিকে ঝুঁকালে তার পাত্র সোনায় পরিণত হয়ে যায়। আর এটা কারামত হিসেবে সুফিদের অনিবার্য অভ্যাসে পরিণত হয়ে গেছে। জ্যোতিষীদের কাছে এটা অভ্যাসের মতো। প্রকৃতিবিদদের মতে এটা বিশেষ বস্তুর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। সাধারণদের কাছে যাদু হিসেবে পরিগণিত। তাহলে ঈসা আলাইহিস সালাম এর বাক্য :

"আর তোমরা যা আহার করো এবং তোমাদের ঘরে যা জমা করে রাখো তা আমি তোমাদেরকে জানিয়ে দেবো"[২] এর প্রতিবিধান কী? এতে অভ্যাসবিরোধী কী দেখা দিল? কেননা এটা তো বরাবরই হয়ে থাকে। অভ্যাস তাকে বলে, যা গতানুগতিক সর্বদা চালু থাকে এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে পাওয়া যায়। অতঃপর কোনো বুদ্ধিমান দীনদার ব্যক্তি এতে ফাসাদ আছে বলে সাবধান করলে ধোঁকাবাজ সুফি বিবাদে লিপ্ত হয়ে পড়ে। তুমি আল্লাহর অলীদের কারামত অস্বীকার করো? এটাকে স্বাভাবিক অভ্যাস বলো? তুমি কি বিশিষ্টদের অস্বীকার করে লোহা মোমে রূপান্তর হওয়া, অগ্নি থেকে প্রাণী বের হওয়াকে স্বাভাবিক মনে করো? শেষে তারা বাস্তব ঘটনা দেখে মিথ্যা প্রতিপন্ন হলেও চুপ থাকে। তো, আসল কথা হচ্ছে সময়ের নাস্তিকেরা এতে ভীষণ বিচলিত। একদিকে মনস্তাত্ত্বিক নাস্তিকতার প্লাবন,

---

১ সুরা আলে ইমরান : আয়াত ৪৯

২ সুরা আলে ইমরান : আয়াত ৪৯

অন্যদিকে যাদুকর ও জ্যোতিষী। এদের কথাকে দেশের শাসকবর্গ ও মন্ত্রী-উজিরেরা বিনা বাক্যব্যয়ে বিশ্বাস করে থাকে।

এ-সব মহা ফিতনা থেকে মহান আল্লাহ তায়ালা এই মিল্লাতে হানীফা তথা মধ্যপন্থী জামাতকে হেফাজত করে থাকেন। তার কালিমা সুউচ্চ রাখেন। এভাবে বাতিলরা তাঁর গজবের প্লাবনে ভেসে যায়। কেননা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতায়ালা আহকামে নবুওয়তের সাহায্যকারী এবং বাতিলকে ধুলোয় উড়িয়ে দেন।

নবুওয়ত অস্বীকারকারীদের ব্যাপারে কিছু কথা

হিন্দুস্তানের ব্রাহ্মণদের একটি দল আছে, যাদের মনে শয়তান এভাবে ফাঁদ এঁকেছে যে, নিজের প্রাণ পুড়িয়ে দিয়ে আল্লাহর নৈকট্য অর্জন করো। সুতরাং কেউ মারা গেলে তার জন্য গর্ত খোঁড়া হয় আগুনে পোড়ানোর জন্য। বহু লোক এতে সমবেত হয়। ধূপ দিয়ে সুবাসিত করা হয়। ঢোল ও বাদ্যযন্ত্র বাজিয়ে মৃত প্রাণের সৎকার করা হয়। মনে করা সে স্বর্গের শিখরে আরোহণ করবে। তারা বলে তোমার এই ত্যাগ কবুল হোক। আমার স্থান স্বর্গে হোক। পরে সে নিজেকে নিজে গর্তে নিক্ষেপ করে এবং জ্বলে-পুড়ে কালো অঙ্গার হয়ে যায়। যদি কেউ সেই আগুনে ঝাঁপ না দিয়ে পালিয়ে যায়, তাহলে তাকে বিভিন্নভাবে তিরস্কৃত করা হয় এবং সম্পর্ক ছিন্ন করা হয়। পরে সে অপারগ হয়ে জ্বলে-পুড়ে মরার জন্য তৈরি হয়।

কারো কারো জন্য একটি পাথর গরম করে তা পেটে রাখা হয়। দ্বিতীয়বার আবার এরূপ করা হয়। এভাবে গরম পাথর লাগাতেই থাকে। একসময় তার পেট ফেটে যায় এবং পেটের অস্থি-মজ্জা সব বেরিয়ে পড়ে সে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে। কেউ আগুনের এত নিকটে দাঁড়ায় যে, তার চর্বি গলে গলে পড়তে থাকে এবং এভাবে সে মারা পড়ে।

কারো অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ টুকরো টুকরো করে আগুনে নিক্ষেপ করা হয়। মানুষ তার প্রশংসা করতে থাকে এবং তার মতো সম্মান প্রার্থনা করতে থাকে। শেষে সে অনিবার্য মৃত্যুর মুখে পতিত হয়। কেউ গাভির গোবরের গর্তে কোমর বরাবর দাঁড়িয়ে থাকে। তাতে আগুন ঢেলে দেয়া হয় আর সে জ্বলে-পুড়ে মরে যায়। কিছু কিছু হিন্দু গোত্র জল-পূজা করে এবং বলে পানির দ্বারা প্রাণ বেঁচে থাকে। সুতরাং তারা পানি সিজদা করে।

কারো কারো জন্য পানির কাছে গর্ত খোঁড়া হয়। সে গর্তে পড়ে যায়। ওদিকে গর্তে আগুন জ্বালিয়ে দেয়া হয়। সেখান থেকে সে ওঠে পানির কাছে যেতে চায়। পরে পানি থেকে আবার গর্তে দৌড়ে যায়। এমন করতে করতে একসময়ে সে মারা যায়। লোকটি যদি পানি ও গর্তের মাঝামাঝি মারা যায়, তখন মানুষজন তার জন্য আক্ষেপ করে বলে, সে স্বর্গ হতে বঞ্চিত হলো। যদি সে পানি বা গর্তে মারা যায়, লোকেরা তার স্বর্গবাসী হওয়ার ব্যাপারে সাক্ষী দেয়।

এদের কেউ কেউ ক্ষুধা-পিপাসার তীব্রতায় প্রায় বিসর্জন দেয়। অতএব শুরুতে তারা চলাফেরা করতে পারে না, তাই বসে যায়। একসময় আর বসে থাকাও সম্ভব হয় না, তখন মৃত মানুষের মতো শুয়ে থাকে। পরে তার মুখ দিয়ে আর কথা বের হয় না। পাকস্থলীর যন্ত্রণায় একসময় সে প্রচণ্ড চিৎকার করতে থাকে। চিৎকার বন্ধ হলে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে।

তাদের এক দল জমিনের ওপর উদাসীন হয়ে আমরণ পড়ে থাকে। তাদের মধ্যে কেউ কেউ স্ত্রীদের কাছে যায় না। সম্পূর্ণ উলঙ্গাবস্থায় কেবল একটি লেংটিজাতীয় টুকরো পরে চলাফেরা করে।

হিন্দুস্তানে উঁচু একটি পাহাড় আছে। তার নিচে এক গাছতলায় জনৈক ব্যক্তি কিতাব দেখে পড়তে থাকে—শুভ পরিণাম ওই ব্যক্তির, যে এই পাহাড়ের ওপর ওঠে নিজের পেট কেটে নিজ হাতে তার হৃৎপিণ্ড বের করতে পারবে। এদের কেউ কেউ মস্ত বড় এক পাথরখণ্ডের সাথে নিজেকে আঘাত দিতে দিতে মারা যায় আর লোকেরা তার জন্য শুভাশিস জানায়।

হিন্দুস্তানে গঙ্গা ও যমুনা নামে দু'টি নদী আছে। যে-সকল যোগী সন্ন্যাসী পাহাড়-পর্বতে অবস্থান করে, তারা ঈদের দিন বের হয়ে ওখানে যায়। সেখানে নির্দিষ্ট কিছু লোক আছে, যারা এ সকল যোগী ও সাধু-সন্ন্যাসীদের কাপড় ইত্যাদি খুলে তা দু'টুকরো করে ফেলে। এক টুকরো গঙ্গায়, আরেক টুকরো যমুনায় ভাসিয়ে দেয়। তাদের ধারণা—এই দু'টি নদী সোজা গিয়ে স্বর্গে ঠেকেছে।

আবু মুহাম্মাদ নাওবখতি রহ. এর সাথে দীর্ঘ কর্মকাণ্ডের কথা উল্লেখ করেছেন। যা এখানে উদ্ধৃত করা সময় অপচয়ের নামান্তর। আশ্চর্যের বিষয় হচ্ছে, হিন্দুস্তান থেকে মুসাফির ব্যক্তিরা হেকমতের বিষয়াশয় অর্জন করতেন। হিন্দুস্তানের লোকজন এমন অন্ধ জগতে বসবাস করছে যেখানে শয়তান অনায়াসে তার চক্রান্তের জাল বিস্তার করতে সক্ষম হচ্ছে, যার কিছু

নমুনা বর্ণনা করা হলো। আবু মুহাম্মাদ নাওবখতি বলেন, হিন্দুদের কোনো কোনা গোত্র মনে করে জান্নাতের ৩২টি দরজা আছে, যদি কোনো জান্নাতি সবার নিচে অবস্থিত দরজায় ৪ লাখ ৩৩ হাজার ছয়শত চব্বিশ বছর অবস্থান করে তবে সে উপরে উঠতে পারবে। পরবর্তী প্রতিটি দরজা এ হিসেবের দ্বিগুণ আকারে সাব্যস্ত হবে। অনুরূপভাবে জাহান্নামেরও ৩২টি দরজা আছে। সেখানে সর্বমোট ১৬ বার যামহারির ইত্যাদির মতো বিভিন্ন ধরনের সাজা ভোগ করতে হবে। আর বাকি ১৬ বার আগুনে পোড়ার মতো ভয়ংকর শাস্তির মুখোমুখি হতে হবে।

ইহুদিদের ওপর শয়তানের চক্রান্ত

গ্রন্থকার আল্লামা ইবনুল জাওযি রহ. বলেন, ইবলিস ইহুদিদেরকেও বিভিন্ন প্রকার চক্রান্ত ও ধোঁকায় ফেলেছে। সেসব চক্রান্ত ও ধোঁকা থেকে কয়েকটির আলোচনা পেশ করব, যা দ্বারা বাকিগুলো সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যেতে পারে। মোটাদাগে বলা যায়, তারা সৃষ্টিকর্তাকে সৃষ্টির সাথে মিলিয়ে ফেলেছে। তারা এটা বোঝে না, যদি উপমা সঠিক হতো তাহলে সৃষ্টির মাঝে যা পাওয়া যায়, তা স্রষ্টার মাঝেও পাওয়া যেত। আবু আবদুল্লাহ বিন হামেদ উল্লেখ করেছেন, ইহুদিদের ধারণা উপাস্য আল্লাহ একজন নুরানী ব্যক্তি। তিনি নুরের পালঙ্কে নুরের তাজ মাথায় দিয়ে বসে আছেন। মানুষের মতোই তাঁর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ।

এ ছাড়া তাদের ধারণা, ওযাইর আলাইহিস সালাম আল্লাহর পুত্র। ইহুদিরা যদি বুঝত যে, পুত্র হওয়া মানে তার ভেতর পিতার অংশ থাকা। এটা কত বড় আহমকির কথা যে, সৃষ্টিকর্তার আবার অংশবিশেষও থাকবে! অথচ আল্লাহ তায়ালা এ সব থেকে সম্পূর্ণরূপে পূতপবিত্র। এছাড়া পুত্র তো পিতার মতোই হয়। অথচ ওযাইর আলাইহিস সালাম পানাহার করতেন। অথচ আল্লাহ তো পানাহার থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত। স্মর্তব্য যে, ইহুদিরা বাস্তবতা সম্বন্ধে মোটেই জানত না—এমন নয়; তারা বাস্তবতা সম্মন্ধে অবগত ছিল। কিন্তু এতৎসত্ত্বেও যে তারা এরূপ উক্তি করেছে তার কারণ হলো, তারা দেখতে পেল যে, হজরত ওযাইর আলাইহিস সালাম মৃত্যুর একশ বছর পর পুনরুজ্জীবিত হয়েছেন এবং পূর্ণ তৌরাত মুখস্থ শুনিয়ে দিয়েছেন। তাই পরবর্তী যুগের ইহুদিরা খ্রিস্টানদের মতো দাবি করে বসল যে, তিনিও আল্লাহর পুত্র।

ইহুদিদের নির্বুদ্ধিতার আরেকটি প্রমাণ হলো, আল্লাহ তায়ালা যখন নিজ অনুগ্রহে শত্রুর কবল থেকে রক্ষা করে নীল নদী পার করে দিলেন তখন তারা দেখল, এক গোত্র মূর্তিপূজা করছে।

قَالُوا يَا مُوسَى اجْعَلْ لَنَا إِلَهًا كَمَا لَهُمْ آلِهَةٌ

'তারা মূর্তি দেখে মুসা আলাইহিস সালাম এর কাছে আবেদন করল, হে মুসা! আপনি তাদের ন্যায় আমাদের জন্যও একটি মূর্তির ব্যবস্থা করে দিন।'[১] হজরত মুসা আলাইহিস সালাম এ কথা শুনে তাদেরকে খুব শাসালেন। এতে তারা নিবৃত রইল। কিন্তু মনে হয় তাদের অন্তরে মূর্তিপূজার আগ্রহ সুপ্ত ছিল। তাই পরবর্তীকালে সামেরী গো-ছানা তৈরি করে তার ইবাদতের জন্য আহ্বান করলে তারা তার ডাকে সাড়া দেয়। ইহুদিদের এ পথভ্রষ্টতার দু'টি কারণ ছিল—১. সৃষ্টিকর্তা সম্পর্কে তাদের অজ্ঞতা, ২. তাদের ভেতর ইন্দ্রিয়গোচরযোগ্য উপাস্যের প্রতি আগ্রহ ছিল। এরা যে অজ্ঞ ও নির্বোধ, তার প্রমাণ মিলে তাদের আরেকটি উক্তি দ্বারা :

إِنَّ اللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحْنُ أَغْنِيَاءُ

'আল্লাহ দরিদ্র, আর আমরা ধনী।'[২]

শুধু তাই-নয়, তারা আরও বলত–

وَقَالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللَّهِ مَغْلُولَةٌ

'ইহুদিরা বলত, আল্লাহর হাত বাঁধা।'[৩]

অথচ আল্লাহ এসব থেকে পবিত্র।

শয়তানের ধোঁকায় পড়ে ইহুদিরা আরও বলত, কোনো শরিয়ত কখনো 'মানসূখ' তথা রহিত হতে পারে না। অথচ তারা জানত যে, হজরত আদম আলাইহিস সালাম এর যুগে মাহরাম মহিলাদের সাথে বিবাহ জায়েয ছিল। শনিবারে সমুদয় বৈধ কাজ করা জায়েয ছিল। কিন্তু পরবর্তীতে সেগুলো রহিত হয়ে গেছে। আসলে শয়তান ইহুদিদেরকে এমন প্ররোচনা দিয়েছে যে, আল্লাহ তায়ালা হাকীম। তার প্রত্যেকটি হুকুম হেকমতপূর্ণ ও প্রজ্ঞাময়। আর কোনো হেকমতকে রহিত করা জায়েয নয়। অতএব হজরত মুসা আলাইহিস সালাম এর শরিয়ত রহিত হতে পারে না। অথচ আল্লাহ তায়ালা

---

১ সুরা আ'রাফ : আয়াত ১৩৮

২ সুরা আলে ইমরান : আয়াত ১৮১

৩ সুরা মায়িদা : আয়াত ৬৪

ইবরাহিম আলাইহিস সালাম-কে তার পুত্র জবাই করার নির্দেশ দিয়ে পরে আবার নিষেধ করেন।

শয়তানের ফাঁদে পড়ে ইহুদিরা আরও দাবি করত যে,

وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً

'আমাদেরকে আগুন স্পর্শ করবে না। তবে সামান্য কয়েকদিনের জন্য।[৪]'

আর সে দিনগুলো হচ্ছে গো-ছানা পূজার কাল। শয়তান ইহুদিদেরকে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর প্রতি বিদ্বেষ ও শত্রুতা পোষণে উদ্বুদ্ধ করে। তাওরাতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বর্ণনা ছিল। সেখানে শেষ নবীর প্রতি ঈমান আনার নির্দেশ ছিল। কিন্তু হতভাগা এ জাতি সে বর্ণনা পরিবর্তন করে দেয়। আখেরী নবীর প্রতি তারা আর ঈমান আনে না। তাদের আলেমরা এ কাজে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছে আর মূর্খরা তাদের অনুসরণ করেছে। আরও আশ্চর্যের বিষয় হচ্ছে, নির্দেশ পরিবর্তন করার পাশাপাশি মনগড়া ধর্ম আবিষ্কারেও তারা অগ্রগামী থেকেছে। ইহুদিরা স্বয়ং মুসা আলাইহিস সালাম এর সাথেও চরম ধৃষ্টতাপূর্ণ আচরণ করেছে।

হজরত আবু হোরায়রা রা. বর্ণনা করেন, একবার রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইহুদিদের মাদরাসায় গিয়ে বললেন, তোমাদের মাঝে যে সবচেয়ে বড় আলেম তাকে আমার কাছে উপস্থিত করো। তারা বলল, আমাদের মাঝে সবচেয়ে বড় আলেম হলেন আবদুল্লাহ ইবনে সুরিয়া। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে নির্জনে নিয়ে গিয়ে বললেন, তোমাকে তোমাদের দীনের কসম দিচ্ছি, আল্লাহ তায়ালা বনি ইসরাঈলের প্রতি যেসব অনুগ্রহ করেছেন, আসমান থেকে খাবার হিসেবে মান্না ও সালওয়া দান করেছেন, নদী পার করিয়েছেন, মেঘ দ্বারা ছায়া দান করেছেন; এসব কিছুর বিনিময়ে তুমি সত্য করে বলো আমি রাসুল কি না? আবদুল্লাহ ইবনে সুরিয়া বলল, আল্লাহর কসম! আমি জানি আপনি রাসুল এবং আমার সম্প্রদায়ের লোকেরাও জানে। আপনার বর্ণনা তাওরাতে সুস্পষ্টরূপে বিদ্যমান। তবে এরা আপনার প্রতি হিংসা পোষণ করে। হিংসার বশীভূত হয়ে আপনাকে রাসুল হিসেবে মানছে না। তখন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইবনে সুরিয়াকে বললেন, তাহলে তোমার

---

৪ সুরা বাকারা : আয়াত ৮০

কী হলো? তুমি ঈমান আনছ না কেন? ইবনে সুরিয়া উত্তরে বলল, স্বগোত্রীয় লোকদের বিরোধিতা করাটা পছন্দ করছি না। অচিরেই এসব লোক ইসলাম গ্রহণ করবে এবং আপনার অনুগত হয়ে যাবে। তখন আমিও ইসলাম গ্রহণ করব।[১]

সালামা ইবনে সালাম ওয়াকাস হতে বর্ণিত, ইসলাম ধর্ম গ্রহণের পূর্বে বনি আবদুল আশহালের মহল্লায় আমাদের পার্শবর্তী এক ইহুদি বসবাস করত। একদিন সে তার ঘর থেকে বের হয়ে আমাদের নিকট এলো। ঘটনাটি ওই সময়কার, যখন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রেরিত হননি। যাক, ওই ইহুদি এসে আবদুল আশহালের মজলিসে দাঁড়ালো। সালামা রা. বলেন, সে সময় আমি ছোট ছিলাম। আমি একটি চাদর মুড়িয়ে ঘরের উঠানে বসেছিলাম। ইহুদি এসে মৃত্যুর পর জীবিত হওয়ার, কিয়ামত ও মিজান, জান্নাত ও জাহান্নামের কথা আলোচনা করল। তখনকার সাধারণ লোকেরা ছিল মূর্তি ও দেব-দেবীর পূজারি। তারা মৃত্যুর পর পুনরুত্থানে বিশ্বাসী ছিল না। অতএব তারা বলল, হে অমুক! তাহলে কি মৃত্যুর পর আবার জীবিত করে, ভালো-মন্দের বিচার করে শাস্তি বা শাস্তির আয়োজন করা হবে? ইহুদি বলল, হ্যাঁ। আমি কসম করে বলছি, জাহান্নামিরা সেদিন আশা করবে—ইস যদি এখান থেকে কিছু আগুন নিয়ে একটি চুলোয় রেখে সেখানে থাকতে পারতাম! তাহলে জাহান্নামের এই ভয়ংকর আগুন থেকে বাঁচতে পারতাম। এ কথা শুনে গোত্রের লোকেরা বলল, আরে! তুমি যা কিছু বলছ, তার কী প্রমাণ? ইহুদি চোখ মেলে আমার দিকে তাকাল। আমি তাদের সবার ছোট ছিলাম। ইহুদি বলল, এই ছেলে যদি পূর্ণ বয়স পায়, তাহলে সে নতুন নবী আলাইহিস সালাম এর সময়কাল পাবে। সালামা রা. বলেন, আল্লাহর কসম! বেশি দিন অতিবাহিত হয়নি, আল্লাহ তায়ালা রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে প্রেরণ করলেন। ইহুদি তখনো আমাদের মহল্লায় উপস্থিত ছিল। আমরা তো রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ওপর ঈমান এনেছি। আর ওই ইহুদি শত্রুতা এবং হিংসার কারণে অস্বীকার করে বসল। আমি একবার তাকে গিয়ে বললাম, আরে বদবখত! তুমি কি সেই নও যে আমাকে এমন পয়গাম্বরের পূর্বাভাস দিয়েছিলে? সে বলল, হ্যাঁ, আমি বলেছিলাম। কিন্তু সে ওই পয়গাম্বর নয়।

---

১ [সনদ খুবই দুর্বল, এতে আলী ইবনে মুজাহিদ আছেন– যিনি 'মাতরূক'] হাদিসটি বায়হাকী রহ. তাঁর 'সুনানে কুবরা'র ৮/২৪৬ ও ২৪৭ পৃষ্ঠায় সংকলন করেছেন।

খ্রিষ্টানদের ওপর ইবলিসের চক্রান্ত

গ্রন্থকার আল্লামা ইবনুল জাওযি বলেন, চক্রান্ত আর ধোঁকার নিত্যনতুন জালে ইবলিস নাসারা তথা খ্রিষ্টানদের কাবু করে রেখেছে। যেমন ইয়াকুবিয়া, মালিকিয়া ও নাসতুরিয়া। এদের সবারই ধারণা যে, আল্লাহ তায়ালা জাওহার তথা স্বনির্ভরশীল ধাতু। আর তার তিনটি উকনুম বা অংশ রয়েছে। সে তিন উকনুম হচ্ছে, পিতা, সন্তান ও রুহুল কুদস। অতঃপর তারা বলে, তিনজন মিলে একজন। এদের অনেকে মনে করে, উকনুমত্রয় হলো—গুণ ও বৈশিষ্ট্য। আর কেউ বলে, সেগুলো ব্যক্তি। কিন্তু এ অজ্ঞের দল বুঝল না যে, আল্লাহ তায়ালা যদি জাওহার বা ধাতুবিশেষ হতেন, তাহলে অন্যান্য জাওহারের ন্যায় স্থানের মুখোপেক্ষী হতেন। নড়াচড়া তার জন্য জরুরি হয়ে পড়ত। অথচ আল্লাহ এ সব থেকে পূতপবিত্র।

আবু মুহাম্মাদ নাওবখতি রহ. লেখেন, খ্রিষ্টানদের দু'টি দল মালাকিয়া ও ইয়াকুবিয়ারা বলে, মারইয়াম আলাইহিস সালাম যে সন্তান জন্ম দেন, সে আল্লাহ। কারো কারো অন্তরে শয়তান এই ফাঁদ পাতে যে, মাসীহ আল্লাহর পুত্র। কেউ বলে মাসীহ দুটি জাওহার। একটি আদি অন্যটি অনাদি। এছাড়া ইনজিলে পরিষ্কারভাবে আমাদের নবী হজরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর উল্লেখ আছে। কিন্তু শয়তান সেখানেও চক্রান্তের জাল ফেলে। তাই কারো অভিমত হচ্ছে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নবী, ঠিক আছে। কিন্তু তিনি কেবল আরবদের জন্য প্রেরিত হয়েছেন। অন্যদের জন্য নয়। ইবলিস তাদের কঠিন জালে আটকে ফেলে। তারা সত্য হতে বিমুখ হয়ে যায়। কেননা তারা যখন জানল যে, তিনি সত্য নবী, তাহলে এটাও জানার কথা যে, নবীরা কখনো মিথ্যা বলেন না। আর নিশ্চয় রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

بُعِثْتُ إِلَى النَّاسِ كَافَّةً

"আমি সারা দুনিয়ার সকলের জন্য প্রেরিত হয়েছি।"[২] আর এতেও কোনো সন্দেহ নেই যে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কায়সার, কিসরা এবং অন্যান্য দেশের রাজা-বাদশাদের কাছে হেদায়াতের বাণীসম্বলিত দূত ও পত্র প্রেরণ করেছেন।

---

২ সহিহ বুখারি : হাদিস নং ৪৩৮

ইহুদি ও খ্রিষ্টানদের ওপর ইবলিসের চক্রান্তের আরও কিছু নমুনা

ইবলিস ইহুদি ও খ্রিষ্টান উভয় ধর্মাবলম্বীদের ওপর এতো সূক্ষ্ম প্ররোচনা দিতে সক্ষম হয়েছে যে, তারা উভয় জাতি বলে, আমাদের পূর্বপুরুষদের কারণে আমরা আল্লাহর শাস্তি থেকে মুক্তি পাব। কেননা আমাদের মধ্য থেকে অসংখ্য নবী ও অলী এসেছেন। তাদের এই ধারণার বর্ণনা পবিত্র কুরআনে এভাবে এসেছে :

نَحْنُ أَبْنَاءُ اللهِ وَأَحِبَّاؤُهُ

"আমরা তো আল্লাহর পুত্র এবং তার প্রিয়ভাজন।"[১]

অর্থাৎ আমাদের মধ্য হতে আল্লাহর পুত্র ওযাইর আলাইহিস সালাম ও ঈসা আলাইহিস সালাম এসেছেন। শয়তানের এই চক্রান্তের পর্দা এভাবে উন্মোচন করা যায়, যদি কোনো ব্যক্তির ওপর আল্লাহর দেয়া কোনো বিধান (যেমন নামায, রোযা ইত্যাদি) নির্দেশিত থাকে, আর তার পক্ষ থেকে যদি অন্য কেউ সেটা আদায় করে নেয়, তাহলে কি তার হক আদায় হবে?

আরও বোঝার ব্যাপার হচ্ছে, যদি কারও সাথে ভালোবাসা থাকার কারণে তার নিকটবর্তীরা ভালোবাসার পাত্র হিসেবে পরিগণিত হয়, তবে যাদের সাথে তার শত্রুতা আছে তাদের সাথেও তার শত্রুতা থাকা স্বাভাবিক? মোটকথা, তাদের এ দাবি অসার ও বাতিল বলে বিবেচিত হতে বাধ্য। নিশ্চয় আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর কন্যাকে বলেছেন :

لَا أُغْنِي عَنْكَ مِنَ اللهِ شَيْئًا.

"আমি তোমার থেকে আল্লাহর আযাব হঠাতে পারব না।"[২]

(অর্থাৎ শাফায়াত তথা সুপারিশের অনুমতি তো ঈমানের ওপর নির্ভরশীল)। প্রিয়ভাজন হওয়ার মানদণ্ড হচ্ছে 'তাকওয়া'। সুতরাং যার তাকওয়া নেই তার জন্য ভালোবাসাও নেই। এছাড়া আল্লাহর ভালোবাসা মানুষের মতো

---

১ সুরা মায়িদা : আয়াত ১৮

২ সহিহ বুখারি : হাদিস নং ২৭৫৩, সহিহ মুসলিম : হাদিস নং ২০৪

মনের জোশের সাথে সম্পৃক্ত নয়। এমন হলে কিছুটা অবকাশ হয়তো থাকত।

সাবেয়ি সম্প্রদায়ের ওপর শয়তানের নেক সুরতে ধোঁকা

গ্রন্থকার বলেন, সাবেয়িনদের উৎস হচ্ছে صبأت থেকে। এটা ওই সময়কে বলা হয়, যখন এক বস্তু আরেক বস্তুতে প্রবেশ করে। صبأت النجوم ওই সময়কে বলা হয় যখন তারকা প্রকাশ হয়। صبأ به বলা হয় যখন শিশুর দাঁত ওঠে। الصابئون ওই সকল লোকদের বলা হয় যারা এক ধর্ম থেকে আরেক ধর্মে চলে যায়। সাবেয়ি ধর্মের ব্যাপারে ব্যাপারে দশটি অভিমত রয়েছে।

১. সাবেয়ি—এমন গোত্র যারা অগ্নিপূজারি ও খ্রিষ্টানদের অন্তর্ভুক্ত। এটা সালেম বর্ণনা করেছেন সাঈদ ইবনে যুবাইর থেকে এবং লাইস ইবনে আবি সুলাইম মুজাহিদ থেকে বয়ান করেছেন।

২. তারা ইহুদি অগ্নিপূজারিদের মাঝামাঝি একটি দল। ইবনে আবি নাজীহ মুজাহিদ থেকে এ অভিমত ব্যক্ত করেছেন।

৩. তারা ইহুদি ও খ্রিষ্টানদের মাঝামাঝি একটি দল। কাসেম ইবনে আবি বাযাহ মুজাহিদ থেকে এ মত ব্যক্ত করেছেন।

৪. তারা খ্রিষ্টানদের অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু তাদের ধর্মমত খ্রিষ্টানদের তুলনায় কিছুটা হালকা। এটা আবু সালেহ বলেছেন ইবনে আব্বাস রা. থেকে।

৫. তারা মুশরিকদের একটি দল। তাদের কোনো ধর্মগ্রন্থ নেই। এ অভিমতটিও কাসেম মুজাহিদ থেকে উল্লেখ করেছেন।

৬. সাবেয়িরা অগ্নিপূজারিদের মতো। এটা হাসান বসরির অভিমত।

৭. এরা আহলে কিতাবের একটি সম্প্রদায়, যারা যবূর কিতাব পড়ে। এটা আবুল গালিয়ার অভিমত।

৮. এরা সাবেয়ি গোত্রের দিকে ফিরে নামায পড়ে, ফেরেশতাদের উপাসনা করে এবং যবূর কিতাব পড়ে। এটা কাতাদাহ ও মুকাতিলের অভিমত।

৯. এরা আহলে কিতাবদের একটি দল। এটা সিদ্দি'র অভিমত।

১০. এই দলটি কেবল لا إله إلا الله বলে, আর কোনো কাজ করে না। না তাদের কোনো গ্রন্থ আছে, না আছে কোনো নবী-রাসুল। শুধু لا إله إلا الله ই বলে থাকে। এই অভিমতটি ব্যক্ত করেছেন ইবনে যায়েদ।

গ্রন্থকার বলেন, এ সব অভিমত হজরত ইবনে আব্বাস রা., কাসেম ও হাসান প্রমুখ তাফসিরকারকগণ হতে বর্ণিত। মুতাকাল্লিমিন তথা তার্কিক আলেমগণ বলেন, সাবেয়িদের ধর্ম বিভিন্ন প্রকারের হয়ে থাকে। কারও মতে, এই পৃথিবী চিরন্তন ও অবিনশ্বর। সৃষ্টিকর্তা এ থেকে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করেছেন। অধিকাংশ সাবেয়ির মতে, এ জগৎ অনাদি, এটা সৃষ্টি করা হয়নি। আর এসব লোক নক্ষত্রকে ফেরেশতা বলে থাকে। তারা একটি নক্ষত্রের নাম রেখেছে 'ইলাহ'। তার জন্য উপাসনালয় নির্মাণ করেছে। তাদের কারও মতে, আল্লাহর গুণাবলি 'নাফী' দ্বারা তথা নেতিবাচকভাবে বর্ণনা করা যায়, 'ইসবাত' তথা ইতিবাচক দ্বারা যায় না। এভাবে বলে, আল্লাহ মাখলুক নন, তিনি মৃত নন, তিনি দুর্বল নন। আরও বলে, আমরা এরূপ বলে থাকি যাতে তার কোনো অনুরূপ আকার বা সম্পর্ক সাব্যস্ত না হয়।

তারা নিজেদের মতো করে উপাসনার বিভিন্ন পন্থা তৈরি করে নিয়েছে। তারা প্রতিদিন তিন ওয়াক্ত নামায পড়ে। প্রথম নামায আট রাকাত, প্রত্যেক রাকাতে তিনটি করে সিজদা। আর সেটা আদায় করা হয় সূর্যোদয়ের পূর্বে। দ্বিতীয় নামায পাঁচ রাকাত, তৃতীয় নামাযও পাঁচ রাকাত। তারা এক মাসের রোযা রাখে। তার সীমা ৭ দিন। রোযা শেষে সদকা ও কোরবানী দেয়। উটের গোশত হারাম মনে করে। এমন আরও বহু কৃসংস্কারে ভরপুর এ ধর্মমত। যার উল্লেখ এখানে নিষ্প্রয়োজন।

সাবেয়িদের ধারণা—ভালো আত্মা সাওয়াবের দিকে প্রত্যাবর্তন করে এবং নূরে রূপান্তরিত হয়। অন্যদিকে খারাপ আত্মা জমিন ও অন্ধকারের দিকে ধাবিত হয়। কিছু সাবেয়ির ধারণা—এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড অবিনশ্বর; তা কখনো ধ্বংস হবে না। পাপ-পুণ্যের বিনিময় তারা পুনর্জন্মের মাধ্যমে লাভ করবে। যেভাবে হিন্দুরা ধারণা করে থাকে। এমন ধর্মের অসারতা প্রমাণ করা কোনো কষ্টসাধ্য বিষয় নয়। কেননা তাদের এসব কর্মকাণ্ড দলিলবিহীন মনগড়া মতবাদ।

ইবলিস সাবেয়িদেরকে এমন ফাঁদে আটকাতে সমর্থ হয় যে, তারা ঊর্ধ্বজগতের আধ্যাত্মিকতা অর্জনে পবিত্রতার আশ্রয় নেয় এবং কিছু নিয়ম-নীতি অনুসরণ করে দোয়া-কালাম পড়তে থাকে। এরা গ্রহ-নক্ষত্রবিদ্যা ও যাদুবিদ্যা শিখতে অধিক মনোযোগী হয়। তাদের মতে, আল্লাহ তায়ালা এবং সৃষ্টিজগতের মাঝে কোনো একটি উসিলা বা মাধ্যম থাকতে হয়, যে ক্ষমার অনুরোধ করবে এবং ভালোর দিকে পথ দেখাবে। কিন্তু শর্ত হচ্ছে, এই উসিলা কোনো মানবজাতি হতে পারবে না; বরং আধ্যাত্ম জগতের হতে হবে। সুতরাং তারা এর পেছনে দৌড়াতে থাকে। এমনকি শরীরসমেত হাশরের মাঠে সমবেত হওয়াকেও তারা অস্বীকার করে অবলীলায়।

অগ্নিপূজারিদের ওপর শয়তানের চক্রান্ত

ইয়াহইয়া ইবনে বিশর নাহাভান্দি রহ. বলেন, অগ্নিপূজারিদের প্রথম রাজা ছিল কিউমার্স। তিনিই প্রথম এটাকে একটি ধর্ম হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেন। পরে এ ধর্মে একের পর এক নবুওয়তের দাবিদার বাড়তে থাকে। অগ্নিপূজারিরা বলে, আল্লাহ তায়ালা (নাউযুবিল্লাহ) একজন আধ্যাত্মিক ব্যক্তি। তিনি প্রকাশ পেলে তার সাথে সমুদয় আধ্যাত্মিক বস্তুও প্রকাশ হয়ে পড়ে। তাদের আরও দাবি—আমরা যেমন ধর্ম আবিষ্কার করেছি, এমন ধর্ম আর কেউ আবিষ্কার করতে পারবে না। অনিবার্যভাবেই তারা নিজেদের মনগড়া অন্ধকার ধর্মের প্রচলন ঘটাতে থাকে। এভাবে তারা অগ্নিপূজারিতে পরিণত হয়।

তারা আগুনের উপাসনা ও পূজা করতে থাকে। সূর্যের দিকে ফিরে আদায় করে নামায এবং প্রমাণস্বরূপ বলে থাকে, সূর্য এ জগতের রাজা। সে দিন সৃষ্টি করে, রাত্রি দূরীভূত করে, উদ্ভিদে জাগায় প্রাণস্পন্দন, প্রাণীদের বাঁচিয়ে রাখে এবং তাদের শরীরে উষ্ণতার সৃষ্টি করে। তারা মৃত ব্যক্তিকে জমিনের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করার বাহানায় তাতে সমাহিত করে না। আরও বলে, এখান থেকে উদ্ভিদ জন্মে, আমরা এটাকে নাপাক করতে পারি না। কিন্তু জমিনে যদি গরু-ছাগল ইত্যাদি পায়খানা-পেশাব করে তাহলে তা পানি দ্বারা ধুয়ে ফেলে। জমিনে তারা থুতু ফেলে না। প্রাণীহত্যা ও জবাই করা নিষিদ্ধ মনে করে। বরকতের জন্য গাভীর মূত্র দিয়ে স্বীয় মুখ ধৌত করে থাকে। তারা আপন মায়ের লজ্জাস্থান নিজের জন্য বৈধ মনে করে। আরও বলে, মায়ের যৌন চাহিদা পূরণ করার জন্য পুত্রের চেয়ে অধিক হকদার

আর কে হতে পারে? স্বামী মারা গেলে পুত্র সেই নারীর জন্য অধিক উপযোগী বলে বিবেচিত হয়। যদি সেই নারীর কোনো ছেলে সন্তান না থাকে, তাহলে লটারির মাধ্যমে পুরুষ নির্বাচিত করা হয়। পুরুষের জন্য শত রমণী এমন কি হাজার রমণীকে বিয়ে করা বৈধ মনে করে। ঋতুবতী নারী গোসল করতে চাইলে মুয়াব্বিজ (অগ্নিকুণ্ডলীর পাহারাদার)কে একটি স্বর্ণমুদ্রা দিতে হয়। সে ওই নারীকে আগুনের ঘরে নিয়ে পশুর মতো চার হাত-পায়ে দাঁড় করিয়ে আঙ্গুল দ্বারা তার লজ্জাস্থান ঘষতে থাকে। এই নিয়ম রাজা কোব্বাদের আমল থেকে চালু হয়। সে নারীদেরকে সকল পুরুষের জন্য বৈধ ঘোষণা দেয়। যে-কোনো পুরুষ যে-কোনো নারীকে ভোগ করতে পারত। রাজা কোব্বাদ নিজেই তার মেয়েদের সাথে সহবাস করেন। এতে প্রজারাও তার অনুসরণ করতে থাকে। এ ব্যাপারে কেউ অস্বীকার করলে বলা হতো, তার ঈমান অপূর্ণ রয়ে গেছে।

নাহাভান্দি রহ. লেখেন, অগ্নিপূজারিদের মতবাদ অনুসারে, জমিনের নিচের দিকে কোনো শেষ নেই। যে আকাশ দেখা যায়, তা শয়তানের চামড়াসমূহের মধ্যে একটি চামড়া। পাহাড়-পবর্ত হচ্ছে তার হাড্ডি। সাগরের পানি তার পেশাব ও রক্ত দ্বারা গঠিত।

বনু উমাইয়া থেকে ইসলামি রাজত্ব পরিবর্তিত হয়ে বনু আব্বাসে হস্তগত হলে সে-সময় এক অগ্নিপূজারি তার অনুসারী নিয়ে এই ভ্রান্ত ধর্ম প্রচার করতে থাকে। সে অনেককে পথভ্রষ্ট করে। বহু ঘটনার সৃষ্টি হয়, যার বর্ণনা অনেক দীর্ঘ। এ ব্যক্তিই শেষ ব্যক্তি, যে অগ্নিপূজার ধর্ম প্রচার করে। কোনো কোনো আলেম বলেন, অগ্নিপূজারিদের জন্য আসমানী গ্রন্থ ছিল, যা তারা তেলাওয়াত করত, পড়ত ও পড়াত। পরে তারা নতুন ধর্মমত আবিষ্কার করলে তাদের ধর্মগ্রন্থ উঠিয়ে নেয়া হয়।

মোটকথা, আশ্চর্যজনকভাবে ইবলিস অগ্নিপূজারিদের ওপর প্রভাব বিস্তার করে যেতে থাকে। শয়তানের চক্রান্তের একটি হচ্ছে, ভালো কাজ ও মন্দ কাজের ব্যাপারে তাদের অন্তরে এই বিষয় গেঁথে দেয়া হয় যে, ভালো বস্তুর সৃষ্টিকর্তা মন্দ বস্তু সৃষ্টি করতে পারেন না। সুতরাং তারা দু'জন খোদা তথা উপাস্য নির্ধারণ করে নিল এবং বলল, তাদের মধ্যে একজন হচ্ছেন নূর। তিনি বিচারক। তিনিই কেবল ভালো বস্তু সৃষ্টি করেন। আর দ্বিতীয়জন হচ্ছে শয়তান, সে অন্ধকার। সে কেবল মন্দ বস্তু ও খারাপ কাজ সৃষ্টি করে।

যেমন আমরা বর্ণনা করে এসেছি সানাবিয়াদের মতবাদে। লেখক বলেন, সেখানে আমরা সে সব অভিযোগ খণ্ডন করে এসেছি।

কিছু কিছু অগ্নিপূজারির মতে, আল্লাহ তায়ালা চিরন্তন ও অবিনশ্বর। তার পক্ষ থেকে ভালো বস্তু ছাড়া আর কিছু সৃষ্টি হয় না। অন্যদিকে শয়তান হচ্ছে মাখলুক বা সৃষ্ট। তার থেকে মন্দ বস্তু ছাড়া আর কিছু বের হয় না। তার উত্তর হচ্ছে, তাদের বলা হবে, তোমরা যখন স্বীকার করছ যে, নূর (সৃষ্টিকর্তা) শয়তান (সৃষ্ট)-কে সৃষ্টি করেছে, তো তিনি মন্দের একটি পাতলা শরীর সৃষ্টি করেছেন। (এর থেকে মন্দ বস্তু আর কী হতে পারে?!)

অগ্নিপূজারিদের কেউ কেউ বলে বেড়ায়, সৃষ্টিকর্তা নূর। তিনি তার প্রতিপক্ষের চিন্তা করলেন। অতএব তিনি চিন্তা করে দেখলেন যে, আমার রাজত্বে যদি এমন কেউ সৃষ্টি হয়, যে আমার বিরোধিতা করে বসে! এই চিন্তা থেকে ইবলিসের সৃষ্টি। পরে শরিক সাব্যস্ত হরে ইবলিস কেবল নেতিবাচক বিষয়ে নিয়ন্ত্রণের দাবি করে।

নাওবখতি রহ. বলেন, অগ্নিপূজারিদের কেউ কেউ বলে, সৃষ্টিকর্তা কোনো একটি বিষয়ে সন্দেহ করেছিলেন। সেই সন্দেহ থেকেই শয়তান সৃষ্টি হয়। আরও বলেছেন, অগ্নিপূজারিরা দৃঢ়ভাবে অন্তরে লালন করে যে, সৃষ্টিকর্তা এবং শয়তান দু'টিই আদি ও অবিনশ্বর। তাদের উভয়ের মাঝে সমঝোতা ছিল। পৃথিবী বিপদাপদ থেকে মুক্ত ছিল। শয়তান সেখান থেকে পৃথক ছিল। পরে ইবলিস কূটচালের মাধ্যমে আকাশ ফেড়ে নিজের সৈন্যসামন্ত নিয়ে দৌড়াতে থাকলে তার শক্তি ও ক্ষমতা দেখে আল্লাহ ভয় পেয়ে তার ফেরেশতাদের নিয়ে পালিয়ে গেলেন। ইবলিস তার পিছু নিয়ে পৃথিবীর নিয়ন্ত্রণ নিয়ে নেয়। তিন হাজার বছর ধরে যুদ্ধ চলে। তবুও ইবলিস আল্লাহর কাছে পৌঁছতে পারল না এবং আল্লাহও তার সাথে সমঝোতায় সম্মত হলেন না। অবশেষে একটি শর্তে শয়তানের সাথে সন্ধি করলেন, সাত হাজার বছর পর্যন্ত ইবলিস তার সৈন্যসামন্ত নিয়ে পৃথিবীতে পদচারণা করবে। আল্লাহ এতে মঙ্গল দেখে সম্মত হলেন। পৃথিবীর মানুষ মেয়াদকাল পর্যন্ত সূর্যের আলো পাবে এবং দুর্দশায় পতিত হবে। এই মেয়াদ শেষ হলে তারা আবার সুখে বসবাস করতে পারবে। ইবলিস এই শর্তারোপ করল যে, তাকে যেন নেতিবাচক সকল কর্মকাণ্ডের ওপর ক্ষমতা দেয়া হয়। শর্তমতে সে পৃথিবীকে নেতিবাচক কর্মকাণ্ড দ্বারা ছেয়ে ফেলে। অগ্নিপূজারিরা দাবি করে—আল্লাহ ও শয়তান শর্তারোপের পর দু'জন ইনসাফওয়ালাকে সাক্ষী

রেখে তাদের তরবারি জমা দিল। ইনসাফওয়ালা সাক্ষী বলল, নির্দিষ্ট মেয়াদের পূর্বে কেউ শর্ত ভঙ্গ করলে তাকে এই তরবারি দ্বারা দ্বিখণ্ডিত করা হবে।

তারা এ ধরনের অজস্র অবান্তর কুসংস্কার আবিষ্কার করে। যা লিখে সময় নষ্ট করা অনুচিত বলে মনে করি। এটাও বলে রাখা প্রয়োজন যে, ইবলিস কতদূর পর্যন্ত তার চক্রান্তের জাল বিস্তৃত করেছে—তার ধারণা দেয়া যদি উদ্দেশ্য না হতো তবে এই ভ্রান্ত কথাগুলো উল্লেখ করতাম না। এই অপদার্থ গোষ্ঠীর ওপর আফসোস হয়, এক মুখে তারা স্বীকার করে যে, সৃষ্টিকর্তা উত্তম ও ভালো বলেন ও করেন। তথাপি তিনি কী করে মন্দ চিন্তায় পতিত হতে পারেন যেখান থেকে শয়তানের উৎপত্তি হয়? যে সকল মন্দের গোড়া। এই ভ্রান্তদের মতানুসারে তো এটাও বলা যায় যে, শয়তান ফেরেশতাও সৃষ্টি করতে পারে। তাদেরকে আরও বলা যায় যে, শয়তান যখন তার নিজের অঙ্গীকার ভঙ্গ করল তখন সে কী করে ইনসাফওয়ালাকে সাক্ষী হিসেবে মানে? সৃষ্টিকর্তাকে পরাজিত করা কীভাবে সম্ভব? এ সকল কথা মারাত্মক ভ্রান্ত। কেবল মানুষের বিবেকের ওপর শয়তানের কূটচালের জানান দেয়ার জন্য এ সকল উদ্ধৃতি উল্লেখ করা হলো।

গ্রহ ও জ্যোতিষ্কপূজারিদের ওপর ইবলিসের ধোঁকা

আবু মুহাম্মাদ নাওবখতি রহ. বলেন, একটি গোষ্ঠীর ধর্মমতে আকাশ অবিনশ্বর। এর কোনো সৃষ্টিকর্তা নেই। জালিনুস (গ্যালিলিও) একটি গোষ্ঠী থেকে বর্ণনা করেন, তাদের দাবি ছিল শুধু শনিগ্রহের আকাশ চিরন্তন ও অবিনশ্বর। তাদের অন্য একটি গোত্রের ধারণা—আকাশের পাঁচটি প্রকৃতি রয়েছে। তবে তা না উষ্ণ, না ভেজা, না শীতল, না শুষ্ক, না ভারী, না হালকা। কারও অভিমত হচ্ছে, নক্ষত্রগুলো একটি আগুনের খনি। ঘূর্ণনক্ষমতার কারণে সেগুলো পৃথিবীতে এসে ঠেকেছে। কেউ বলেছে, তারকা পাথরের মতো শরীরবিশিষ্টরূপে তৈরি। কারও মতে, মেঘ থেকে তারকার সৃষ্টি। প্রতিদিন দিনের বেলা সেগুলো নিভে যায় আর রাতের বেলা আলোকিত হয়ে ওঠে। যেমন কয়লাতে আগুন লাগার ফলে তা জ্বলে ওঠে এবং পরে আবার নিভে যায়।

এদের কারও অভিমত—চন্দ্রের শরীর আগুন ও বাতাস দিয়ে তৈরি। আরেক দলের ধারণা—গ্রহ পানি, বাতাস ও আগুন দিয়ে তৈরি। এদের

বক্তব্য হচ্ছে, শনিগ্রহ আনুমানিক ত্রিশ বছরে আকাশের সীমানা অতিক্রম করে শেষ করে। আর বৃহস্পতিগ্রহ আনুমানিক বারো বছরে তা সম্পন্ন করে। মঙ্গলগ্রহের সময় লাগে দুই বছর। সূর্য, শুক্র ও বুধগ্রহের পৃথিবী প্রদক্ষিণ করতে সময় লাগে এক বছর। অন্যদিকে চন্দ্র এর জন্য সময় নেয় মাত্র এক মাস।

এদের একটি গ্রুপের বক্তব্যমতে, গ্রহের রয়েছে সাতটি স্তর। আমরা যে গ্রহটি দেখছি সেটি হচ্ছে চন্দ্র। এর উপরে বুধ, তার উপর শুক্র, তার উপর সূর্য, তারপর মঙ্গল, এরপর বৃহস্পতি এবং শনির কক্ষপথ। অধিকাংশ দার্শনিকের মতে, সূর্যের অপরাধ সবচেয়ে মারাত্মক। এটি ভূপৃষ্ঠ থেকে নিরানব্বই গুণ বড়।

নক্ষত্রপূজারিরা মনে করে, নক্ষত্র জীবিত এবং আকাশ প্রাণবিশিষ্ট। প্রতিটি তারকারই প্রাণ আছে। পূর্বেকার দার্শনিকেরা বলতেন, তারকা পাপ ও পুণ্যের কাজ করে থাকে। মানুষের প্রাণ ও অভ্যাসে তার প্রভাব পড়ে। তারা সবাই জীবিত এবং আপন মতে তারা তাদের কাজ আঞ্জাম দিয়ে থাকে।

মৃত্যুর পর পুনরুত্থান অস্বীকারকারীদের ওপর শয়তানের ফাঁদ

গ্রন্থকার আল্লামা ইবনুল জাওযি রহ. বলেন, ইবলিস বহু মানষের মনে এমন প্ররোচনা দিয়েছে যে, তারা মৃত্যুর পর পুনরুত্থানকে অস্বীকার করে বসেছে এবং এটাকে অসম্ভব ভেবে নিয়েছে। ইবলিস তাদেরকে দুইভাবে ধোঁকা দিয়েছে। প্রথমত মানুষের মূল উৎসের দুর্বলতা, দ্বিতীয়ত শরীরের বিক্ষিপ্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ মাটি থেকে জড়ো করা অসম্ভব বলে ধারণা করা। তারা অভিযোগ তুলেছে এই বলে যে, কখনো কখনো বিভিন্ন পশুকে হিংস্র পশুরা খেয়ে ফেলে, তাহলে তাকে কীভাবে পুনরায় জীবিত করা হবে? কোরআন শরিফ তাদের উপরোক্ত দু'টি ভিত্তিহীন অভিযোগের জবাব বলেছে :

أَيَعِدُكُمْ أَنَّكُمْ إِذَا مِتُّمْ وَكُنْتُمْ تُرَاباً وَعِظَاماً أَنَّكُمْ مُخْرَجُونَ * هَيْهَاتَ هَيْهَاتَ لِمَا تُوعَدُونَ

'সে কি তোমাদেরকে একথা জানায় যে, যখন তোমরা সবার পরে মাটিতে মিশে যাবে এবং হাড়গোড়ে পরিণত হবে তখন তোমাদেরকে (কবর থেকে) বের করা হবে? অসম্ভব, তোমাদের সাথে এই যে অঙ্গীকার করা হচ্ছে এটা

একেবারেই অসম্ভব।'[১] আর দ্বিতীয় সন্দেহের দিকে ইশারা করে আল্লাহ বলেন,

أَئِذَا ضَلَلْنَا فِي الْأَرْضِ أَئِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ

"আমরা যখন মাটিতে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেলাম, তারপর কি আমাদেরকে আবার নতুনভাবে সৃষ্টি করা হবে?"[২] এটাই ছিল জাহেলি যুগে অধিকাংশ লোকের মাযহাব, যা তাদের একটি কবিতার পঙ্‌ক্তিতে ফুটে ওঠে :

يخبرنا الرسول بأن سنحيا * كيف حياة أصداء وهام

"আমাদেরকে রাসুল খবর দেয়, আমাদেরকে নাকি মৃত্যুর পর পুনরায় জীবিত করা হবে। আচ্ছা, ক্ষয়ে যাওয়া নিশ্চিহ্ন বস্তু ফের কী করে জীবিত হতে পারে?" আরেক অজ্ঞ আবুল আলা আলমুয়াররার কবিতা :

حياة ثم موت ثم بعث * حديث خرافة يا أم عمرو

"জীবন আছে, এরপর মৃত্যুও আছে। তারপর আবার জীবন! হে উম্মে আমর, এটা বিবেকপরিপন্থী কথা।"

প্রথম সন্দেহের জবাব হচ্ছে, মৃত্যুর পর আবার জীবিত হওয়ার যে উপকরণ অর্থাৎ মাটিকে তোমরা দুর্বল ও তুচ্ছজ্ঞান করছ, এটা ভুল। কেননা মানুষ তো শুরুতে ছিল কেবল এক ফোঁটা বীর্য, অতঃপত জমাট রক্ত—এভাবে বিভিন্ন পরিক্রমা শেষে মানুষ সৃষ্টি হয়েছে। তথাপি মানুষের যিনি উৎস—অর্থাৎ আদম আলাইহিস সালাম-কে তো মাটি দ্বারাই সৃষ্টি করা হয়েছে। এছাড়া যে মহান সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ তায়ালা অতি সুন্দর আকৃতিতে মানুষ সৃষ্টি করেছেন, তিনি নিশ্চয় যে-কোনো হীন ও দুর্বল উৎস থেকেও তা সৃষ্টি করতে পারেন। যেহেতু তিনি মানুষকে বীর্য দ্বারা সৃষ্টি করেছেন, আর মুরগিকে ডিম থেকে সৃষ্টি করেছেন, একটি ছোট কলি বা বীজ থেকে দারুণ দারুণ বৃক্ষ-তরু-গুল্ম সৃষ্টি করছেন, তাই তার শক্তি ও ক্ষমতার দিকে তাকালে দ্বিতীয় সন্দেহের উত্তরও অনায়াসে বেরিয়ে আসে। অনুরূপভাবে আল্লাহ তায়ালা বিক্ষিপ্ত বস্তুকে সমবেত করে দেখিয়েছেন। স্বর্ণের উপাদান বিভিন্ন স্থানে বিক্ষিপ্তভাবে ছড়িয়ে থাকে। তাকে সুনির্দিষ্ট একটি ডালাতে প্রক্রিয়াজাত করা হলে আর বিক্ষিপ্ত থাকে না, একত্রে সব স্বর্ণ জমাট হয়ে

---

১ সুরা মুমিনূন : আয়াত ৩৫-৩৬

২ সুরা সাজদাহ : আয়াত ১০

যায়। সুতরাং আল্লাহর ক্ষমতায় কী অন্তরায় থাকতে পারে? যেখানে তিনি চাইলেই সবকিছু হয়ে যায়। এছাড়াও যদি এটা মেনেও নেয়া হয় যে, দ্বিতীয়বার সৃষ্টি করার সময় এই মৃত্তিকা ব্যতীত অন্য মৃত্তিকা দিয়ে শরীর সৃষ্টি করতে হবে। তারপরও এর কোনো প্রয়োজন পড়বে না। কেননা মানুষ রুহ বা আত্মার নাম; শরীরের নাম নয়। কেননা সে মানুষ হিসেবে ঠিকই গণ্য হয় যদিও সে এককালে মোটা হয়, একসময় দুর্বল হয়ে পড়ে, আবার বৃদ্ধ হয়ে যায়। অথচ সে যে-মানুষ সে-মানুষই থাকে। যা দ্বারা মৃত্যুর পর পুনরায় জীবিত করা হবে তার সবচেয়ে আশ্চর্য প্রমাণ হচ্ছে, আল্লাহ তায়ালা হযরাতে আম্বিয়া আলাইহিস সালাম এর মাধ্যমে এমন কর্মকাণ্ডের প্রকাশ ঘটিয়েছেন, যা পুনরায় জীবিত হওয়ার ব্যাপারে নিশ্চয়তা দিতে যথেষ্ট। হজরত মুসা আলাইহিস সালাম-এর লাঠিকে বিশালাকায় সাপে রূপান্তর, পাহাড়ের অভ্যন্তর হতে বলিষ্ঠ উটনী বের করা, ঈসা আলাইহিস সালাম-এর হাতে মৃত ব্যক্তি পুনরায় জীবিত হওয়ার ঘটনাবলি এ কথারই সাক্ষ্য দেয়।

গ্রন্থকার বলেন, আমরা দার্শনিকদের মতবাদ খণ্ডনে বিস্তারিত আলোকপাত করে এলাম। কিছু কিছু লোক আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতায়ালার ক্ষমতা প্রত্যক্ষ করতে পারলে তাদের সন্দেহ দূরীভূত হয়। তাদের মধ্যে একজন বলে ওঠে,

وَلَئِنْ رُدِدْتُ إِلَى رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِنْهَا مُنْقَلَبًا

"সন্দেহের বশীভূত হয়ে বলল, আমাকে কি পুনরায় আল্লাহর কাছে ফিরিয়ে নিয়ে গিয়ে এখানকার চেয়ে উত্তম বিনিময় দান করা হবে?"[৩] আস ইবনে ওয়ায়েল বলল, 'সেখানেও আমার জন্য সম্পদ ও সন্তান দান করা হবে।"[৪] এ কথা সে সন্দেহের বশীভূত হয়ে বলেছে। ইবলিস তাকে প্ররোচিত করলে সে বলতে থাকে, যদি মৃত্যুর পর পুনরায় জীবিত করা হয় তবে সেখানেও আমরা ভালো ও সুখে থাকব। কেননা যিনি আমাদেরকে পৃথিবীতে সুখে-শান্তিতে রাখছেন, তিনি মৃত্যুর পর জীবিত হওয়ার পরও সুখে-শান্তিতে রাখবেন।

---

৩ সুরা কাহাফ : আয়াত ৩৬

৪ সুরা মারইয়াম : আয়াত ৭৭

গ্রন্থকার বলেন, এটা তাদের ভুল ধারণা। কেননা তারা এটা কেন বুঝছে না যে, হতে পারে পৃথিবীতে এগুলো আমাদেরকে ছাড় দেয়া বা সাজাস্বরূপ প্রদান করা হয়েছে। কখনো কখনো মানুষ সন্তান থেকে দূরে থাকতে চায়, আবার কখনো দাস-দাসীকে পূর্ণ স্বাধীনতা প্রদান করে।

আত্মা দেহান্তরে বিশ্বাসীদের ওপর ইবলিসের ধোঁকা

গ্রন্থকার বলেন, ইবলিস কিছু লোককে প্ররোচনা দিলে তারা এই পৃথিবীতেই দেহান্তর মতবাদে বিশ্বাসী হয়ে যায়। এদের ধারণা—উত্তম আত্মা শরীরে থেকে বেরিয়ে গেলে অন্য একটি শরীরে প্রবেশ করে। তখন সে ধন-সম্পত্তি দ্বারা সুখে-শান্তিতে বসবাস করতে পারে। আর অসৎ ব্যক্তিদের আত্মা শরীর থেকে বের হয়ে মন্দ শরীরে প্রবেশ করে, তখন তার দুঃখ-দুর্দশা আরও বৃদ্ধি পেতে থাকে। এই ধর্মতত্ত্ব ফেরাউন ও মুসা আলাইহিস সালাম এর যুগে প্রকাশ পায়।

আবুল কাসেম বলখি উল্লেখ করছেন, তারা এ-জন্য উক্ত ধর্মতত্ত্ব আবিষ্কার করেছে যখন তারা দেখল যে, শিশু ও পশু-পাখিরা দুঃখ-কষ্ট পেয়ে থাকে, তখন তারা বুঝে নিল এগুলো তাদের ওপর অন্যদের জন্য পরীক্ষাস্বরূপ। অথবা তাদেরকে এর বিনিময়ে বদলা ও বিনিময় প্রদান করা হবে। কিংবা কোনো অহেতুক কারণে হয়ে থাকবে। সুতরাং তারা এ ব্যাপারে দৃঢ় বিশ্বাস করে নিল যে এটা তাদের পাপের ফসল, যার শাস্তি এরা ভোগ করছে।

ইয়াহইয়া ইবনে বিশির ইবনে উমাইর নাহাভান্দি বলেন, হিন্দুরা বলে থাকে, মানবস্বভাব চার প্রকার। ১. সমন্বিত গঠন, ২. মন, ৩. বুদ্ধি ও ৪. সাধারণ স্বভাবপ্রকৃতি। সমন্বিত গঠন হচ্ছে ছোট রব বা প্রতিপালক, মন হচ্ছে খুব ছোট রব, বুদ্ধি হচ্ছে বড় রব। আর এটাই সর্বোচ্চ স্বভাব। মন বা আত্মা পৃথিবী ছেড়ে ছোট রবের সান্নিধ্যে চলে যায়। সুতরাং এই মন ও আত্মা যদি পবিত্র হয় তাহলে তাকে মূল স্বভাব গ্রহণ করে নেয়। পরে এটাকে পরিচর্যা করে ছোট গঠনের দিকে পাঠানো হয়। আর সেটা হচ্ছে মন বা আত্মা। এভাবে সে বড় প্রতিপালকের কাছে গিয়ে পৌঁছে। পরে একে যদি পুণ্য দ্বারা পরিপুষ্ট দেখে তাহলে ভূমণ্ডলে তার কাছে থেকে যায়। যদি পুণ্যে ত্রুটি থাকে তাকে বড় প্রতিপালকের কাছে পাঠানো হয়। পরে সে তাকে ছোট গঠনের দিকে পাঠায়, পরে তাকে আলো দ্বারা ঢেকে ফেলা হয়। পরে সে বিভিন্ন তরি-তরকারিতে রূপান্তরিত হয়ে যায়, যা মানুষ আহার করে থাকে

এবং সে মানুষের রূপ ধারণ করে। দ্বিতীয়বার সে এই জগতে সৃষ্টি লাভ করে। একই অবস্থা তার প্রত্যেক মৃত্যুর সময় ঘটে থাকে।

অন্যদিকে অসৎ ব্যক্তিদের আত্মা ছোট গঠনের কাছে পাঠানো হয়। তখন সেটা রূপান্তরিত হয়ে ঘাসের আকৃতি ধারণ করে। কিন্তু এ ধরনের ঘাস-পাতা জীবজন্তুরা ভক্ষণ করলে, তার আকৃতি কোনো জীব-জন্তুর আকার ধারণ করে। পরে এই জন্তু মারা গেলে আরেক জন্তুর আকার ধারণ করে। এভাবে প্রতিনিয়ত জন্মান্তর ঘটতে থাকে এবং একেক আকৃতিতে রূপান্তরিত হতে থাকে। প্রতি এক হাজার বছর অন্তর অন্তর সে মানুষের আকৃতিতে জন্ম লাভ করে। শেষে সে সৎ ও ভালো হয়ে জীবন যাপন করলে পুণ্যাত্মার সাথে গিয়ে মিলিত হয়।

গ্রন্থকার আল্লামা ইবনুল জাওযি রহ. বলেন, দেখুন, এই পথভ্রষ্টদের জন্য ইবলিস কী দারুণ ফাঁদ সাজিয়ে রেখেছে! কোনো ধরনের দলিল-প্রমাণ ব্যতিরেকে তারা এ-সব মতবাদ অবলীলায় মেনে নিয়েছে। অথচ বিবেকপ্রসূত ও উদ্ধৃতিনির্ভর সকল ধরনের প্রমাণের আলোকে এ ধর্মতত্ত্ব বাতিল বলে সাব্যস্ত।

আবুল হাসান আলী ইবনে নাযিফ আলমুতাকাল্লিম বর্ণনা করেন, ইমামিয়া (শিয়া) সম্প্রদায়ের ধর্মবেত্তা আবু বকর ইবনুল ফুলাস বাগদাদে আমাদের কাছে আসা-যাওয়া করত; তাকে আমি শিয়াদের অন্তর্ভুক্ত মনে করতাম। এক সময় তাকে দেখলাম, সে পৃথিবীতে পুনর্জন্মে বিশ্বাসী। একদিন আমাদের সামনে একটি কালো বিড়াল বসে থাকলে তাকে দেখলাম, বিড়ালটি সে আদর-সোহাগ করছে এবং শীতল চক্ষু কচলাচ্ছে। বিড়ালের চোখে স্বাভাবিকভাবে পানি দেখা যাচ্ছিল, যেমন সব সময় তার চোখে দেখা যায়। বেচারা খুব কান্নাকাটি করছে। আমি তাকে কান্নার কারণ জিজ্ঞেস করলে সে জবাবে বলল, তুমি কি দেখছ, আমি তার শরীরে হাত বোলালে সে কীভাবে কান্না করছে? এ নিশ্চিত আমার মা। মাতৃস্নেহে সে আমার দিকে তাকিয়ে কাঁদছে। বিড়াল আস্তে আস্তে মিউ মিউ চিৎকার আরম্ভ করলে আমি বললাম, তুমি যা বলছ বিড়ালটি তা বুঝছে? সে বলল, হ্যাঁ। আমি বললাম, তুমিও কি তার বুলির অর্থ বোঝো? সে বলল, না।

মুসলিম উম্মাহর আকিদা ও ধর্মবিশ্বাসে ইবলিসের ধোঁকা

গ্রন্থকার বলেন, এই উম্মতের আকিদায় দু'ভাবে ইবলিসের অনুপ্রবেশ ঘটে।

১. বাপ-দাদা ও পূর্বসূরিদের অনুসরণ-অনুকরণ
২. অনিষ্পত্তিযোগ্য বিষয়ে মনোনিবেশ করা

শয়তান দ্বিতীয় প্রকার লোকদেরকে বিভিন্নভাবে প্ররোচনা দিতে থাকে। আর প্রথম শ্রেণির লোকদের অন্তরে এ বিষয়টি ভালোভাবে গেঁথে দেয় যে, পূর্বসূরিদের অনুসরণ-অনুকরণ করতে থাকো। কেননা এর বিপরীত যুক্তি-প্রমাণগুলো অনেক সময় সন্দেহযুক্ত ও ত্রুটিপূর্ণ হয়ে থাকে। এতে সঠিক পথ আড়াল হয়ে যায়। সুতরাং আগেকার লোকদের অনুসরণ করাই নিরাপদ। এভাবে অনুসরণ-অনুকরণ করতে গিয়ে বহু মানুষ গোমরাহ হয়ে গেছে। সাধারণত এ কারণেই মানুষের মাঝে ধ্বংসযজ্ঞ নেমে এসেছিল। অবশ্য ইহুদি-খ্রিষ্টানরা তাদের মাতা-পিতার পাশাপাশি পাদ্রি ও পোপদের অন্ধ অনুকরণ করে চলেছে। ইসলামপূর্ব যুগ তথা জাহেলি যুগের লোকজনও এ ধরনের অনুসরণ-অনুকরণের পেছনে পড়েছিল। স্মর্তব্য, তারা যে প্রমাণের পরিপ্রেক্ষিতে পূর্বসূরিদের অনুসরণ-অনুকরণ করত, এর ভেতর থেকেই তাদের ধর্মের উন্মেষ ঘটেছে। কেননা যখন দলিল-প্রমাণ সন্দেহযুক্ত হয়ে পড়ে এবং সঠিক পথ আড়ালে থেকে যায় তখন নিশ্চয় সেই অনুসরণ-অনুকরণ ছেড়ে দেয়া কাম্য। যাতে পথভ্রষ্ট হতে না হয়। আল্লাহ তায়ালা এসব পূর্বসূরিদের অনুসরণ-অনুকরণের পেছনে পড়া লোকের ভ্রান্ত ধারণার প্রতি আলোকপাত করে বলেন,

بَلْ قَالُوا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَى أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَى آثَارِهِمْ مُهْتَدُونَ

"কাফেররা বলল, না। আমরা আমাদের বাপ-দাদাদেরকে এ পথে পেয়েছি। আমরা তাদেরই পদাঙ্ক অনুসরণ করছি।"[১]

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তোমরা কি এর চেয়ে ভালো ও উত্তম হেদায়াতের পথ পাওয়া সত্ত্বেও তাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে যাবে? অর্থাৎ এরপরও কি তোমরা পথভ্রষ্ট থাকবে? আল্লাহ তায়ালা বলেন,

إِنَّهُمْ أَلْفَوْا آبَاءَهُمْ ضَالِّينَ * فَهُمْ عَلَى آثَارِهِمْ يُهْرَعُونَ

---

১ সুরা যুখরুফ : আয়াত ২২

"কাফেররা তাদের বাপ-দাদাদেরকে পথভ্রষ্ট পেয়েছে, সুতরাং তারাও তাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করতে থাকবে।"[২]

গ্রন্থকার বলেন, জেনে রাখা দরকার, অনুসরণকারী যে বিষয়ে অনুসরণ করছে তাতে পূর্ণ আস্থা রাখা যায় না। আর অনুসরণ করার ক্ষেত্রে বিবেক-বুদ্ধিরও প্রচুর ক্ষয়-ক্ষতি সাধিত হয়। কেননা মানুষের বিবেক-বুদ্ধি এজন্য সৃষ্টি করা হয়েছে, যাতে চিন্তা-গবেষণা করা হয়। আর আল্লাহ তায়ালা ব্যক্তিকে বিবেক নামক বাতি দিয়েছেন যা দ্বারা সে আলোকিত হতে পারে, সেটা যদি সে নিভিয়ে দেয় এবং অন্ধকারে চলতে চায়, তাহলে এটা খুবই নিকৃষ্ট কাজ বলে বিবেচিত হতে বাধ্য।

আরো জেনে রাখা চাই, অধিকাংশ মাযহাবপন্থীদের মন-মানসিকতা যে ব্যক্তির প্রতি ঝুঁকেছে বা আকৃষ্ট হয়েছে, তার কথা কোনো চিন্তা-ভাবনা ছাড়া মান্য করতে থাকে এবং তার অনুসরণ করতে থাকে। এটাই মূল পথভ্রষ্টতা। কেননা দৃষ্টি ও মনোযোগ প্রকৃতপক্ষে কথার প্রতি রাখা উচিত; কোনো ব্যক্তির ওপর নয়। হারেস ইবনে হুত হজরত আলী রা.-কে বলেছিলেন, আপনি কি মনে করেন যে, আমরা ভেবে রেখেছি হজরত তালহা রা. ও হজরত যুবাইর রা. বাতিলের ওপর ছিলেন? এ কথা শুনে হজরত আলী রা. তাকে বললেন, হে হারেস! ব্যাপারটি তোমার কাছে স্পষ্ট নয়। সত্যের পরিচয় মানুষের দ্বারা সাব্যস্ত হয় না; বরং মানুষের পরিচয় সত্যের দ্বারা চেনা যায়।

ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল রহ. বলতেন, মানুষের জ্ঞানস্বল্পতার অন্যতম কারণ হচ্ছে সে দৃঢ় বিশ্বাসের সাথে মানুষের অনুসরণ করতে থাকে। এ কারণে ইমাম আহমদ রহ. 'মিরাস' এর জিদ-সংক্রান্ত মাসআলায় হজরত আবু বকর রা. এর অভিমত ছেড়ে দিয়ে হজরত যায়দ ইবনে সাবিত রা. এর অভিমত গ্রহণ করেছেন। প্রশ্ন উত্থাপন করে কেউ যদি বলে, সাধারণ মানুষজন তো দলিল-প্রমাণ সম্পর্কে অজ্ঞ, অতএব তারা কেন তাকলিদ বা অনুসরণ করবে না? উত্তরে বলা হবে, আকিদা ও বিশ্বাসগত দলিল-প্রমাণ একেবারে স্পষ্ট, যেমন আমরা দাহরিয়া বা নাস্তিক সম্প্রদায়ের খণ্ডন করতে গিয়ে ইঙ্গিত দিয়ে এসেছি। বিবেক-বোধসম্পন্ন কোনো ব্যক্তির কাছে এমন স্পষ্ট দলিল-প্রমাণ অস্বচ্ছ বা অস্পষ্ট হতে পারে না। বৈষয়িক মাসআলার ব্যাপারটি এ ক্ষেত্রে ভিন্ন। এমন মাসআলা যেহেতু একেক সময়ে একেক

---

২ সুরা সাফ্ফাত : আয়াত ৬৯-৭০

আঙ্গিকে উদ্ভাবিত হয় তাই এতে সাধারণ মানুষের নিষ্কৃতি দুষ্কর হয়ে দাঁড়ায়। ধোঁকায় পতিত হওয়ার সম্ভাবনা দেখা দেয়। সুতরাং এ সব মাসআলার ক্ষেত্রে সাধারণ মানুষের জন্য তাকলিদ তথা বিশ্বস্ত ও অভিজ্ঞ কোনো আলেমের অনুসরণ করা উত্তম। এছাড়া সাধারণ মানুষের এ ব্যাপারে এখতেয়ার রয়েছে যে, সে যে কোনো বিশ্বস্ত ও অভিজ্ঞ আলেমের অনুসরণ করতে পারে।

গ্রন্থকার বলেন, মুসলিম উম্মতের আকিদায় ইবলিসের অনুপ্রবেশের দ্বিতীয় রাস্তায় যাওয়ার প্রাক্কালে প্রথম রাস্তায় সে যেভাবে আহমক ও বেকুবদের নিয়ন্ত্রণ করতে গিয়ে কেবল তাকলিদ বা অনুসরণের জাল বিছিয়েছে এবং জানোয়ারের মতো তাদেরকে একজনের পিছে পিছে হাঁকিয়েছে, তার বিপরীতে যাদেরকে শয়তান দেখল যে, তাদের মন-মস্তিষ্ক বেশ প্রখর, বুদ্ধি বেশ তীক্ষ্ণ, তাদেরকেও যখন যেভাবে পেরেছে কাবু করছে। কারও মনে অনুসরণের প্রতি বিরাগ-বিতৃষ্ণ হওয়ার প্ররোচনা দিয়েছে। তাদের বলেছে, ইসলামি আকিদায় চিন্তা করো। শয়তান এতে একেক গোত্রকে একেক পন্থায় পথভ্রষ্ট করে ছেড়েছে। কেউ কেউ দেখল, শরিয়তের প্রকাশ্য বিষয়ে মনোযোগ দেয়া বিরাট দুর্বলতা। ইবলিস তখন তাদেরকে হাজির করালো দার্শনিকদের কাতারে। পর্যায়ক্রমের তাদের মতাদর্শ ছড়িয়ে দিতে সচেষ্ট হলো। এভাবে একসময় তারা ইসলাম থেকেই বেরিয়ে পড়ে। দার্শনিকদের আলোচনায় এ বিষয়ে বিশদ আলোচনা গত হয়েছে।

কারো কারো মনমুকুরে শয়তান কেবল পঞ্চইন্দ্রিয়ের স্পর্শ ও অনুধাবনযোগ্য বিষয়ে বিশ্বাস স্থাপন করতে প্রণোদিত করল। তাদের যদি বলা হয়, আচ্ছা, তোমরা কি নিজেদের মতবাদকে বিশুদ্ধ মনে করো? তারা হ্যাঁ-সূচক কিছু বললে বুঝতে হবে তারা মিথ্যুক ও ঝগড়াটে। কেননা আমাদের পঞ্চইন্দ্রিয়কে তো আমরা বিশুদ্ধ পাইনি। কেননা পঞ্চইন্দ্রিয় দ্বারা যে-সকল বিষয় জানা ও চেনা যায়, সেখানে মানুষ বিশেষে তারতম্য পরিলক্ষিত হয়। তাহলে একজনের পঞ্চইন্দ্রিয়ের স্পর্শ ও অনুধাবনযোগ্য বিষয়গুলো অন্যের ক্ষেত্রে সমানভাবে কী করে প্রযোজ্য হতে পারে? বোঝা গেল তারা তাদের মতবাদে স্থির থাকতে পারবে না।

কিছুসংখ্যক লোককে ইবলিস তাকলিদ তথা অনুসরণের ব্যাপারে নিরুৎসাহিত করে ইলমে কালামের দিকে মনোযোগী করে। তারা দার্শনিকদের দোষ-ত্রুটির সন্ধানে নেমে পড়ে। তারা তখন মনে করতে

থাকে আমরা মানুষের মনের কথাগুলো তুলে ধরছি। মুতাকাল্লিম সম্প্রদায়ের অবস্থা বিভিন্ন সময় বিভিন্ন প্রতিকূলতার সম্মুখীন হয়। অধিকাংশের অবস্থা এতই করুণ হয়ে দাঁড়ায়, তারা একসময় সত্য দীন সম্পর্কেও দ্বিধায় পড়ে যেতে থাকে। কেউ কেউ মুলহিদ ও মুরতাদ হয়ে যায়।

স্মর্তব্য, দীন ইসলামের পূর্বেকার যে-সকল আলেম-ওলামা ইলমে কালামের ব্যাপারে নীরবতা দেখিয়ে এসেছে, তারা কোনো দুর্বলতার কারণে এমনটি করেননি; বরং তাঁরা তীক্ষ্ণ আকল ও পরিপূর্ণ দেমাগ ব্যয় করে দেখেছেন, এ দ্বারা রোগীর আরোগ্য সম্ভব নয়, না নিবারণ সম্ভব তৃষ্ণার্তের পিপাসা। সুতরাং তাঁরা নিজেরাও এ শাস্ত্র থেকে বিরত থেকেছেন এবং অন্যদেরও দূরে রেখেছেন। ইমাম শাফেয়ি রহ. বলেন, মানুষ যদি শিরক ছাড়া অবশিষ্ট সকল প্রকার পাপ কাজ করে, তাও ইলমে কালামে মনোনিবেশ করার চেয়ে অনেক ভালো। আহলে কালামপন্থীদের ব্যাপারে তিনি লাঠি দিয়ে আঘাত করা এবং তাদেরকে পাড়ায়-পাড়ায় ঘোরানো উচিত বলে মনে করেন। যারা কুরআন-হাদিস বাদ দিয়ে যুক্তি-তর্কের পেছনে পড়ে তাদের এমন শাস্তি হওয়া উচিত বলে মনে করেন তিনি। ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল রহ. বলেন, কালাম-শাস্ত্রের লোকেরা কখনো সফল হতে পারবে না। আর এ শাস্ত্রে ব্যুৎপত্তি অর্জনকারীরা মুরতাদ ও যিন্দীক হয়ে থাকে।

লেখক আল্লাম ইবনুল জাওযি রহ. বলেন, কী করে কালাম-শাস্ত্রের ক্ষতির কথা উল্লেখ না করে থাকতে পারি! তোমরা দেখো, মুতাযিলারা এ শাস্ত্রের কারণে বলতে পারে যে, আল্লাহ তায়ালা সম্মিলিত বস্তু সম্পর্কে জ্ঞান রাখেন, বিক্ষিপ্ত বস্তুর বিস্তারিত সম্পর্কে তার জ্ঞান নেই। (নাঊযুবিল্লাহ)। জাহাম ইবনে সাফওয়ান বলেন, আল্লাহ তায়ালার জ্ঞান, ক্ষমতা ও হায়াত সবকিছু অনাদি ও সৃষ্ট। আবু মুহাম্মাদ নাওবখতি রহ. জাহামের এই অভিমত বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ তায়ালা কিছুই নয়।

আবু আলী জুব্বায়ী, আবু হাশেম ও তার অনুসারী মুতাযিলারা বলে, অদৃশ্য একটি বস্তু। সত্তা, প্রাণ ও গুণের মধ্যে এবং সাদা, লাল ও হলুদের মধ্যে। আল্লাহ তায়ালার এই ক্ষমতা নেই যে, তিনি সত্তাকে সত্তা এবং গঠনকে গঠন বা গুণকে গুণ হিসেবে সৃষ্টি করবেন। তিনি কেবল সত্তাকে অদৃশ্য থেকে দৃশ্যালোকে উপস্থাপন করতে পারেন।

'মুকতাবিস' গ্রন্থে কাজী আবু ইয়ালা উল্লেখ করেছেন, আমাকে আল্লাফ মুতাযিলী বলেছে, জান্নাতীদের নেয়ামত আর জাহান্নামিদের সাজা তাদের

শেষ কর্মফল। এটা আল্লাহ তায়ালার সিফাত হতে পারে না। তিনি এতে ব্যত্যয় ঘটানোর ক্ষমতা রাখেন না। এমতাবস্থায় তার দিকে মনোযোগী হওয়া ঠিক নয় এবং তাকে ভয় করা অনুচিত। কেননা তিনি মানুষের এমন পরিণতিতে ভালো-মন্দ কোনো কিছু করবার ক্ষমতা রাখেন না। কাউকে তিনি ক্ষতি বা উপকার করতে পারেন না। তার মতে, জান্নাতবাসী সকলে চুপ থাকবে। কোনো কথা বলতে পারবে না। নড়াচড়া করতে পারবে না। কোনো ক্ষমতা থাকবে না তাদের। তাদের প্রতিপালক তাদেরকে কিছুই করতে পারবে না। কেননা সকল প্রকার নশ্বর বস্তুর শেষ পরিণতি হচ্ছে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাওয়া, যার পর আর কোনো কিছুর অস্তিত্ব বাকি থাকবে না।

গ্রন্থকার বলেন, 'কিতাবুল মাকালাত' এ আবুল কাসেম আবদুল্লাহ ইবনে মুহাম্মাদ আলবলখি লেখেন, আবুল হুযাইল মুহাম্মাদ বিন হুযাইল আল্লাফ—যিনি বসরা অধিবাসী আবদুল কায়স গোত্রের গোলাম ছিলেন এবং মুতাযিলা অনুসারী ছিলেন—একাকী এ-কথা উদ্ভাবন করেন যে, জান্নাতবাসীর কার্যক্রম ফুরিয়ে গেলে শেষে তারা নিশ্চুপ হয়ে সব সময়ের জন্য মূর্তি আকারে পড়ে থাকবে। তার যদি অসীম ক্ষমতা থাকে তাহলে এমন হতে পারে না। এদিকে, অনন্তের ওপর তার ক্ষমতাবান হওয়াও অসম্ভব। এ ব্যক্তি আরও বলে, আল্লাহর ইলম কেবলই আল্লাহ।

আবু হাশেম বলেন, যে ব্যক্তি প্রত্যেক গুনাহ থেকে তাওবা করেছে, কিন্তু সে এক চুমুক মদ পান করেছে, এমন ব্যক্তি কাফেরের মতো চিরদিনের জন্য জাহান্নামের আগুনে দগ্ধ হতে থাকবে। নিযাম মুতাযিলী বলেন, আল্লাহ তায়ালা মন্দ কোনো বিষয়ের ওপর নিয়ন্ত্রণ রাখতে পারেন না। অন্যদিকে ইবলিস ভালো-মন্দ উভয়ের ওপর নিয়ন্ত্রণ রাখতে পারে। হিশাম আলকুতী বলতেন, অসীম ও অনন্ত আল্লাহর গুণ হতে পারে না। মুতাযিলাদের কারো কারো মতে, আল্লাহর পক্ষ থেকে মিথ্যা প্রকাশ হওয়া সম্ভব। কিন্তু এমন বিষয় তার থেকে প্রকাশ হয় না।

মুরজিয়া সম্প্রদায়ের লোকেরা বলে থাকে, মানুষের কোনো ক্ষমতা নেই; বরং তারা উদ্ভিদের মতো। না তারা কিছু করতে পারে, না করার অধিকার আছে। মুরজিয়া সম্প্রদায়ের লোকজন বলে থাকে, যারা কালিমা শাহাদাত মুখে উচ্চারণ করেছে, তারা যত পাপ করুক না কেন কখনো জাহান্নামে যাবে না। এ-সব লোক সহিহ হাদিস অস্বীকার করেছে, যেখানে আল্লাহর

একত্ববাদ স্বীকারকারীদেরকে জাহান্নাম থেকে বের করা হবে মর্মে বিবরণ আছে।

ইমাম ইবনে আকিল বলেন, মনে হয় যারা মুরজিয়া মাযহাব উদ্ভাবন করেছে, তাদের মধ্যে কেউ যিন্দীক ছিল। কেননা সাধারণ বিবেচনায় যে-কোনো ব্যক্তির আযাবের আয়াত দ্বারা ভীত হওয়া ও সাওয়াবের আশাবাদী হওয়া উচিত। মুরজিয়ারা যখন দেখল, সৃষ্টিকর্তা মহান আল্লাহ তায়ালাকে অস্বীকার করার কোনো উপায় নেই, কেননা মানুষে এসব শুনে ঘৃণা করে এবং তা বিবেক-বুদ্ধিরও বিপরীত। তাই তারা সৃষ্টিকর্তার অস্তিত্ব দ্বারা যে ফলাফল বেরিয়েছে তা মিটিয়ে দিতে আদাজল খেয়ে নেমে পড়েছে। অর্থাৎ তাকে ভয় করা এবং পাপ কাজে পতিত হওয়ার সময় তাকে উপস্থিত জানা। তারা এ ক্ষেত্রে শরয়ি দৃষ্টিকোণ ও বিধি-বিধান দূষিত করার পাঁয়তারা করতে থাকে।[১] এভাবে তারা ইসলামের সর্বনিকৃষ্ট দলে পরিণত হয়।

গ্রন্থকার বলেন, আবু আবদুল্লাহ ইবনে কাররাম তাকলিদ শুরু করলে সে একটি নিকৃষ্ট মাযহাবের আবির্ভাব ঘটায়। সে হাদিস থেকে সবচেয়ে 'যঈফ' হাদিস দ্বারা প্রমাণসূত্র আবিষ্কার করতে থাকে। সে সৃষ্টিকর্তার তুলনাকে সম্ভব মনে করে; এমনকি মহান আল্লাহ তায়ালার সত্তায় সৃষ্টির সাদৃশ্য বৈধ বলে মনে করে বলে, শরীর ও মৌল উপাদান পুনরায় সৃষ্টির ক্ষমতা আল্লাহ তায়ালার নেই। শুরুতেই কেবল তিনি সৃষ্টি করতে পারেন। সালেমিয়া সম্প্রদায়ের মতাদর্শ হচ্ছে, আল্লাহ তায়ালা কেয়ামতের দিন প্রত্যেক জাতি ও প্রতিটি বস্তুর সামনে তাদের আকৃতিতে দৃশ্যমান হবেন। সুতরাং মানুষ তাঁকে মানুষের আকৃতিতে দেখবে, জিনেরা জিনের আকৃতিতে দেখবে। এদের ধারণা—আল্লাহ তায়ালার এটা একটি রহস্য যে, যদি তিনি তাঁর প্রকৃত রূপ প্রকাশ করেন তাহলে এ বাহ্যিক নিয়ম-শৃঙ্খলা বিনষ্ট হয়ে যাবে।

গ্রন্থকার আল্লামা ইবনুল জাওযি র. বলেন, আমি আল্লাহ তায়ালার কাছে এমন ইলম হতে পানাহ চাই যা এই ধরনের ভয়ংকর ও ক্ষতিকর মাযহাবের দিকে নিয়ে যায়। মুতাকাল্লিম তথা তার্কিকরা তাদের ধারণামতে বলে

---

১ কোনো ধর্ম বা মতাদর্শ যখন প্রতিষ্ঠা পেয়ে যায় এবং তার অনুসারীরা শক্তিশালী হয়ে ওঠে, তখন এমন লোকেরাও স্বার্থ হাসিলের অভিপ্রায়ে সেই ধর্মের বা মতাদর্শের অনুসারীদের সঙ্গে ভিড়ে যায় যারা সেই ধর্মে বা মতাদর্শে আন্তরিকভাবে বিশ্বাস করে না। এই ধরনের স্বার্থবাদীরা ক্রমে নেতৃত্ব ও কর্তৃত্ব দখলের চেষ্টা করে।

বেড়ায়, যতক্ষণ সৃষ্টিকর্তাকে তার বেষ্টিত সকল নিয়ম-কানুন সহযোগে চেনা না হবে ততক্ষণ ঈমান পূর্ণতা পাবে না। এরা সম্পূর্ণ ভ্রান্তিতে নিমজ্জিত। কেননা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবায়ে কেরামগণকে ঈমানের নির্দেশ দিয়েছেন, মুতাকাল্লিমদের এ সকল আলোচনার নির্দেশ দেননি। সাহাবারা রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কথার ওপরই ছিলেন—যাঁদের মর্যাদা আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের ঘোষণামতে পূর্বাপর সকলের চেয়ে উঁচু। অন্যদিকে কালাম-শাস্ত্র তিরস্কারযোগ্য। যেদিকে আমরা ইঙ্গিত দিয়ে এসেছি যে, মুতাকাল্লিমরা নিজেদের মত ও পথের অনুসরণ করতে গিয়ে একসময় হীনম্মন্যতায় ভোগার কারণে দীন থেকে বিচ্যুত হয়ে পড়েন। তারা স্বচক্ষে এর অশুভ পরিণতি দেখে নেন।

ইবনুল আশআস বর্ণনা করেন, আমি আহমদ ইবনে সিনান থেকে শুনে বলছি, ওয়ালিদ ইবনে আব্বান আল কারাবিসী আমার মামা হন। তার মৃত্যুক্ষণ এলে তিনি তার পুত্রদের বলেন, তোমরা কি ইলমে কালামের ব্যাপারে আমার চেয়ে পারদর্শী কাউকে চেনো? তারা বলল, না। তোমরা কি আমাকে আপত্তিজনক কথাবার্তার কারণে অভিযুক্ত করো? তারা বলল, হ্যাঁ। পরে তিনি বললেন, হাদিসে পারদর্শী আলেমদের পথ ও মত অবলম্বন করা তোমাদের জন্য অত্যাবশ্যক। কেননা আমি তাঁদেরকে হকের অনুসারী হিসেবে দেখেছি।

আবুল মায়ালি জুয়াইনি (যিনি ইমাম গাযালির উস্তাদ) বলতেন, আফসোস! আমি আহলে ইসলাম ও তাঁদের ইলম ছেড়ে অতল সমুদ্রে পা ফেলেছি। আর সেদিকে সাঁতার কেটেছি, যেদিকে যেতে আমাকে বারণ করা হচ্ছে। এ সব এজন্য করেছি যাতে আমি সত্যের দেখা পাই এবং তাকলিদ থেকে দূরে থাকতে পারি। এখন ওসব থেকে মুখ ফিরিয়ে সত্য কালিমাকে গ্রহণ করলাম। তোমাদের উচিত বুড়ি মহিলাদের কথাকে আঁকড়ে ধরবে। আল্লাহ তায়ালা যদি তাঁর অপার অনুগ্রহে আমাকে বাঁচিয়ে রাখেন তাহলে আমি বুড়োদের দীনের ওপর মরব। তাহলে আশা করা যায় মৃত্যুকালে আমার কালিমা নসিব হবে। তিনি তার শাগরেদদের বলতেন, তোমরা ইলমে কালামে মত্ত হয়ো না। কেননা আমি যদি এর এমন ভয়ংকর নিকৃষ্ট পরিণতির কথা আঁচ করতে পারতাম তাহলে কখনো এ শাস্ত্রে লিপ্ত হতাম না।

আবুল ওয়াফা ইবনে আকিল তার কিছু শাগরেদকে বলেছেন, আমি নিশ্চিতভাবে জানি সাহাবায়ে কেরাম ইন্তেকাল করেছেন। অথচ জানতে

পারিনি 'জাওহার' (অনু) কী, 'আরয' (প্রস্থতা– কী? তোমরা যদি দেখো তোমাদের রায় হজরত আবু বকর রা. ও হজরত ওমর রা. এর সাথে সাংঘর্ষিক, তাহলে তোমার এই মুতাকাল্লিমপন্থীদের রায় প্রত্যাখ্যান করো। কেননা মুতাকাল্লিমদের মতো তোমার রায় অসম্পূর্ণ।

ইবনে আকিল বলেন, আমি অধিকাংশ মুতাকাল্লিমপন্থীদের শেষ পরিণতি অবলোকন করে দেখেছি, তারা শেষ সময়ে সন্দেহ বাতিকগ্রস্ততায় নিমজ্জিত হয়ে পড়ে। অনেকেই মুলহিদ ও নাস্তিক হয়ে যায়। তারা শরিয়তের নির্ধারিত সীমানা পেরিয়ে নিজেদের স্পর্শ ও অনুধাবনশক্তি দ্বারা বস্তুর হাকিকতের সন্ধানে পড়ে থাকে। অথচ তাদের আকলের সেই ক্ষমতা ও শক্তি নেই যা আল্লাহ তায়ালার রয়েছে। তাদের বলে দাও সেই শক্তি ও ক্ষমতা একমাত্র আল্লাহ তায়ালার নিয়ন্ত্রণে। তিনি বস্তুর যে হাকিকত জানেন মানুষকে তিনি সে বিষয়ে জানার সুযোগ দেননি।

ইবনে আকিল বলেন, শুরুতে দীর্ঘ সময় আমি কালাম-শাস্ত্রে অত্যুক্তি করেছি। শেষে কিতাবের দিকে প্রত্যাবর্তন করতে বাধ্য হয়েছি। আর বুড়ি মহিলার নিরাপদ দীন গ্রহণের যে কথা বলা হলো তা এ জন্য যে, মুতাকাল্লিম শাস্ত্রের বোদ্ধারা নিজেদের বাহ্যিক দৃষ্টিভঙ্গিতে আলোচনার এতো প্রান্তসীমায় আরোহণ করে, যেখানে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ দিতে গিয়ে আকল তথা বিবেক-বুদ্ধি ও বোধশক্তি থমকে যায়। সুতরাং শরিয়তের বিধি-বিধানে বিনা বাক্যব্যয়ে মনোযোগী হবে এবং হেতুর সন্ধানে পড়বে না। বুদ্ধি যখন এ ব্যাপারে নিশ্চিত হয়েছে যে, তার চেয়ে মহান আল্লাহ তায়ালা হেকমত ও প্রজ্ঞা অনেক ঊর্ধ্বে, তখন সে নির্দ্বিধায় আল্লাহর নির্দেশের কাছে অবনত হতে বাধ্য। আল্লাহ তায়ালার পবিত্র সত্তা অবিনশ্বর গুণে গুণান্বিত। তিনি কারও মুখোপেক্ষী নন। তাঁর সত্তা একক। তার কোনো বাড়তি বা সহায়ক শক্তির প্রয়োজন নেই।

উম্মতে মুহাম্মদির আকিদা-বিশ্বাসে শয়তানের ধোঁকা

উম্মতের কিছু লোক কুরআন ও হাদিসের বাহ্যিক দিককে গ্রহণ করেছে এবং তাদের স্পর্শ ও অনুধাবনশক্তির নিরিখে তা মূল্যায়ন করতে থাকে। কারো কারো মতে, আল্লাহ তায়ালা একটি শরীরের নাম। এটা হিশাম ইবনুল হিকাম, আলাম ইবনে মনসুর, মুহাম্মাদ ইবনুল খলিল ও ইউনুস ইবনে আবদুর রহমানের মাযহাব। অতঃপর তাদের মধ্যে পরস্পর মতানৈক্য দেখা

দেয়। কেউ বলে সেই শরীর অন্যান্য শরীরের অনুরূপ। কেউ বলল, না; বরং তা অন্যান্য শরীরের মতো নয়। তারপর আল্লাহর শরীর যদি অন্যান্য শরীরের অনুরূপ না হয় তাহলে কার শরীরের মতো? এখানেও মতানৈক্য দেখা দেয়। কারও মতে, সেটা হচ্ছে 'নূর'। কেউ বলেছে, তা সাদা রুপার মতো। এটা হিশাম ইবনুল হিকামের অভিমত। তিনি বলেন, তিনি তার আয়তনের সাতগুণ বড়। তার দৃষ্টিশক্তির প্রখরতা 'তাহতুসসারা' পর্যন্ত সমুদয় বস্তুতে বেষ্টিত এবং তিনি সবকিছু দেখছেন।

আবু মুহাম্মাদ নাওবখতি জাহিয থেকে, তিনি নিজাম থেকে বর্ণনা করেছেন, হিশাম ইবনুল হিকাম প্রতি বছর পাঁচটি করে মতবাদ বের করতেন। শেষে তিনি যে মতবাদে স্থির হন তা হচ্ছে, আল্লাহ তাঁর স্বীয় ব্যপ্তির সাতগুণ বড়। একদল বলে, তিনি রুপার মতো। কেউ বলেছে, তিনি একটি বলের মতো গোলাকার। যেদিক থেকেই দেখা যাক একই রকম তার আকৃতি। হিশাম বলেন, তার সত্তা সীমিত ও পরিমাপযোগ্য। এমনকি তার চেয়ে ঘোড়াকে বড় বলা হয়েছে। আরও বলা হয়েছে, তার আসল স্বরূপ ও আকৃতি সম্পর্কে তিনিই অবগত।

গ্রন্থকার বলেন, আকৃতি বলার কারণে বোঝা যাচ্ছে তাঁর পরিমাপ ও পরিমাণও আছে। যদি কেউ এমন দাবি করে তাহলে সে তো তাওহিদের ক্ষেত্রে প্রশ্ন উত্থাপন করল। কারণ এটা জানা কথা—বস্তু সত্তা হলেই তা পরিমাপযোগ্য হয়। এর বহু সাদৃশ্য ও উপমা রয়েছে। অথচ আল্লাহ তায়ালা বস্তু নন। তার কোনো সাদৃশ্য ও উপমা নেই। তার গুণ ইচ্ছার সীমাবদ্ধতায় আবদ্ধ নয়। সুতরাং মানতে হবে, তার শরীর নেই, জাওহার নেই—যা সীমার গণ্ডিতে আবদ্ধ। নাওবখতি রহ. বর্ণনা করেছেন, মুকাতিল ইবনে সুলাইমান, নুয়াইম ইবনে হাম্মাদ ও দাউদ আলহাওয়ারীও বলে থাকে যে, আল্লাহ তায়ালার আকার ও অঙ্গ আছে।

গ্রন্থকার আল্লামা ইবনুল জাওযি রহ. বলেন, তোমরা দেখে আসছে, এরা কীভাবে আল্লাহ তায়ালাকে অবিনশ্বর প্রমাণ করছে এবং তা মানুষের জন্য বলছে না। রোগ-শোক ইত্যাদি যা মানুষের জন্য সম্ভব তা আল্লাহর জন্য সম্ভব মনে করছে না। অতঃপর এদের প্রত্যেকে যারা আল্লাহর শরীর থাকার দাবি করে আসছে, তাদের যদি বলা হয় তোমরা কোন্ দলিলের ভিত্তিতে শরীর নশ্বর হওয়া সাব্যস্ত করো? এর পরিণতি কী হবে? শেষে তারা বলতে বাধ্য হয়ে পড়বে, যে মাবুদের জন্য তার শরীর হওয়া সাব্যস্ত করা হচ্ছে তিনি নশ্বর; অবিনশ্বর নন।

মুজাস্‌সিমা সম্প্রদায়ের একটি অভিমত হচ্ছে, আল্লাহ তায়ালাকে ছোঁয়া যায়। তাদের কথামতো তো বোঝা যায়, আল্লাহ তায়ালার সাথে কোলাকুলিও করা যেতে পারে! মুজাসসিমারা আরো বলে, আল্লাহর শরীর শূন্য। (যেমন আকাশ ও মাটির মাঝখানের শূন্যভূমি)। আর জগতের সকল শরীর তার মাঝে অবস্থিত। বায়ান ইবনে সামআন ইবনে ইমরান বলতেন, তার মাবুদ সম্পূর্ণ নূর এবং তিনি একজন পুরুষের আকৃতিতে রয়েছেন। তিনি চেহারা ছাড়া তার সমুদয় অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ধ্বংস করে দিতে পারেন। তাকে খালিদ ইবনে আবদুল্লাহ খুন করে।

মুগিরা ইবনে সাআদ আলআজলী বলতেন, তার মাবুদ একজন নূরানী পুরুষ। যার মাথার ওপর রয়েছে নূরের একটি তাজ। রয়েছে তার শরীরও। তার অন্তর থেকে ঝর্ণার মতো হেকমত গড়িয়ে পড়ে।

উপরোক্ত মতটি ব্যক্ত করতেন মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে হাসান ইবনে হাসান। যারাহ ইবনে আ'ইয়ুন কুফি বলতেন, শুরুতে আল্লাহ তায়ালার জ্ঞান, ক্ষমতা ও জীবনের গুণ ছিল না। পরে তিনি নিজের জন্য গুণগুলো সৃষ্টি করে নেন। দাউদ আলহাওয়ারী বলেন, তিনি শরীরসর্বস্ব। তার গোস্ত ও রক্ত আছে। আছে অস্থি ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ। তার মুখ থেকে সিনা পর্যন্ত ফাঁপা আর শরীরের বাকি অংশ কঠিন।

মোটকথা, যারা আল্লাহ তায়ালাকে স্পর্শ ও অনুভূতিযোগ্য হিসেবে বিবেচনা করছে, তাদের কেউ কেউ মনে করে তিনি তাঁর আরশে বসে আছেন। আর সেখান থেকে বের হলে তিনি আরশ ছেড়ে বের হন এবং নড়াচড়া করেন। তারা আল্লাহর সত্তাকে একটি পরিমাপযোগ্য সীমারেখায় আবদ্ধ বলে মনে করেছে। তারা প্রমাণস্বরূপ বলে থাকে–

يَنْزِلُ اللهُ إِلَى سَمَاءِ الدُّنْيَا

"আল্লাহ তায়ালা পৃথিবীর আকাশে অবতরণ করেন।"[১] তাদের যুক্তি— অবতরণ সে-ই করতে পারে যিনি উপরে অবস্থান করছেন। তারা অবতরণকে অনুভবযোগ্য বিষয়ের সাথে তুলনা করছে, যা দ্বারা তার শরীরের বর্ণনা আবিষ্কার করা হয়েছে। এই 'মুশাব্বাহ' গোষ্ঠীটি আল্লাহ তায়ালার সিফাতকে অনুভব ও অনুধাবনযোগ্য বিষয় হিসেবে সাব্যস্ত করে

---

১ সহিহ বুখারি : হাদিস নং ১১৪৫

থাকে। আমি এদের অধিকাংশ মতবাদের জবাব 'মিনহাজুল উসূল ইলা ইলমিল উসূল' গ্রন্থে উল্লেখ করেছি।

মুশাব্বাহ্ সম্প্রদায়ের কিছু লোক কেয়ামতের দিন আল্লাহ তায়ালার দিদারকে এমনভাবে উপস্থাপন করে যেন সে সম্মুখে উপস্থিত বিশেষ একজন ব্যক্তিকে দেখছে। হাদিসের বাণী—"আল্লাহ তায়ালা মুমিন বান্দাকে নিজের দিকে ডাকবেন"—ব্যস, এটুকু শুনে তারা এটাকে প্রমাণ হিসেবে উপস্থাপন করছে। তাদের এই অজ্ঞতা প্রকাশের কারণ হচ্ছে তারা আল্লাহ তায়ালা সম্পর্কে সম্পূর্ণ অজ্ঞ। তাদের কেউ কেউ বলে, আল্লাহ তায়ালার চেহারা আছে। আর এটাকে তারা আল্লাহর সত্তা ও সিফাত থেকে পৃথক মনে করে। প্রমাণস্বরূপ এ আয়াতটি উপস্থাপন করে—﴿وَيَبْقَىٰ وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ﴾ 'এবং তোমার মহীয়ান ও দয়াবান রবের সত্তাই অবশিষ্ট থাকবে'।[১] তারা আল্লাহ তায়ালার জন্য হাত ও আঙ্গুলও সাব্যস্ত করে। কেননা হাদিসে এসেছে—يَضَعُ السَّموات عَلى أُصْبَعٍ 'আল্লাহ আকাশমণ্ডলী তাঁর আঙ্গুলে রাখবেন।'[২] তারা আল্লাহর পা আছে বলেও দাবি করে। এভাবে অন্যান্য অঙ্গের কথাও প্রমাণ করে, যার উল্লেখ হাদিসে উদ্ধৃত হয়েছে। অর্থাৎ সেগুলো থেকে তারা মনগড়া মতবাদ সৃষ্টি করেছে। অথচ বিশুদ্ধ ও বাঞ্ছিত পন্থা ছিল, তারা যেন আয়াত ও হাদিসগুলো পড়ে এবং এর ব্যাখ্যা করতে গিয়ে নিজের অনুভব ও অনুধাবন ক্ষমতার আলোকে কোনো মতামত না দেয়। শেষে তাদেরকে কে নিষেধ করল যে, তোমরা চেহারা দ্বারা আল্লাহর সত্তা মেনে নাও। এটাকে অতিরিক্ত সিফাত হিসেবে সাব্যস্ত কোরো না! এর ভিত্তিতেই অনুসন্ধিৎসু ব্যক্তিরা ﴿وَيَبْقَىٰ وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ﴾ 'এবং তোমার মহীয়ান ও দয়াবান রবের সত্তাই অবশিষ্ট থাকবে'[৩] দ্বারা উপরোক্ত অর্থই ব্যক্ত করেছেন। অর্থাৎ কেবল তোমার রবের সত্তাই অবশিষ্ট থাকবে।

---

১ সুরা আররাহমান : আয়াত ২৭
২ সহিহ বুখারি : হাদিস নং ৭৪১৪
৩ সুরা আররাহমান : আয়াত ২৭

আল্লাহ তায়ালার বাণী— يُرِيدُونَ وَجْهَهُ [৪] অর্থাৎ يُرِيدُونَه অর্থাৎ তাকে চায়। এ সব লোক কেন বোঝে না যে, قُلُوْبُ الْعِبَادِ بَيْنَ إِصْبَعَيْنِ "তাঁর দুই আঙ্গুলে বান্দার কলব"[৫] দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে, আঙ্গুল দ্বারা যেহেতু কোনো বস্তুকে পাল্টে দেয়া হয়, আর যে বস্তু দুই আঙ্গুলের মাঝে থাকবে, আঙ্গুলওয়ালা যেভাবে চাইবেন সেভাবে তাকে ব্যবহার করতে পারবেন। এ জন্য এ শব্দটি উল্লেখ করেছেন। এটি তার কোনো বাড়তি সিফাত নয়।

গ্রন্থকার বলেন, আমার মতে এমন ব্যাখ্যা থেকেও চুপ থাকা উচিত। যদিও হতে পারে এ ব্যাখ্যাটিই উদ্দেশ্য। আর তার এমন সত্তা যার বিভিন্ন অংশ বিক্ষিপ্তভাবে রয়েছে—এমন বলা বৈধ নয়।

জাহেরিয়াদের সবচেয়ে আশ্চর্য অবস্থার মধ্যে এটি একটি যে, সালেমিয়া সম্প্রদায়ের লোকেরা বলে থাকে, কবরের মধ্যে মৃত ব্যক্তি পানাহার ও বিয়ে-শাদি করে। এমন ধারণার নেপথ্য কারণ হচ্ছে, তারা শুনেছে, নেককার ব্যক্তিদের জন্য কবরে বহু নেয়ামত রয়েছে। এ সব লোক যদি কেবল এটুকুতে বিশ্বাস করত যেটুকু হাদিসে এসেছে–

"মুমিনের রুহসমূহ পাখির ডানায় রাখা হয় এবং এরা জান্নাতের বৃক্ষ হতে আহার করে থাকে।"[৬] তাহলে তারা এই নিকৃষ্ট আকিদা হতে বাঁচতে পারত। কিন্তু এর সাথে তারা শরীরকেও মিলিয়ে ফেলেছে।

ইবনে আকিল রহ. বলেন, এই মাযহাবের মাঝে সেই ব্যাধি বিদ্যমান, যা জাহেলি জমানার লোকদের মাঝে ছিল। হাম ও সুদ্দার ব্যাপারে জাহেলি জমানার লোকজন যেমন বলত, তাদের কথাও তেমন। এ সকল লোকদের সাথে মুনাজারা ও বিতর্ক করা উচিত, যাতে জাহেলি জমানার কুসংস্কার সম্পর্কে অবগত হয়ে তা থেকে বিরত থাকার প্রয়াস পাওয়া যায়। এদের সাথে রাগ করে বিরোধিতা করা উচিত নয়। কেননা এতে তারা বিগড়ে যেতে পারে। ইবলিস এদের ওপর এমন স্থূলভাবে ফাঁদ পেতেছে যে, তারা শরিয়তসম্মত ও বিবেকসিদ্ধ আলোচনা ছেড়ে দিয়েছে। যেহেতু মৃত ব্যক্তির জন্য শাস্তি বা শাস্তির ব্যবস্থার কথা এসেছে, তো বোঝা গেল কবর বা শরীরের দিকে সাব্যস্ত করে কেবল এ জন্য বয়ান করা হয়েছে, যাতে মৃত

---

৪ সুরা আনআম : আয়াত ৫২

৫ সহিহ মুসলিম : হাদিস নং ৬৭৫০

৬ সুনানে ইবনে মাজাহ : হাদিস নং ১৪৪৯

ব্যক্তির অবস্থা সম্পর্কে জ্ঞাত হওয়া যায়। যেন এমন বলেছেন, কবরে দাফনকৃত ব্যক্তি এবং সেই রুহ যা তার শরীরে ছিল, তা জান্নাতের নেয়ামত দ্বারা আরাম ভোগ করছে কিংবা জাহান্নামের শাস্তি দ্বারা কষ্ট ভোগ করছে।

গ্রন্থকার বলেন, যদি প্রশ্ন করা হয়, তোমরা বিশ্বাসের ব্যাপারে অনুসরণকারীদের ওপরও দোষ চাপিয়ে দিচ্ছ, আবার অপাত্রে মুতাকাল্লিমদের ওপর দোষ দিচ্ছ। এখন বলো এক্ষেত্রে ইবলিসের কুমন্ত্রণা থেকে রেহাই পাওয়ার পন্থা কী? এর সহজ উত্তর হচ্ছে সেটা, যার ওপর রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর সাহাবায়ে কেরাম অটল ছিলেন। অর্থাৎ তাঁরা ঈমান এনেছেন যে, আল্লাহ তায়ালা হক। তাঁর সমুদয় সিফাত, যা কুরআন ও হাদিসে এসেছে তা হক। আমরা এর কোনো অর্থ বিগড়াতে পারি না। অপাত্রে পর্যালোচনা করে এমন বিষয়ের মানুষের বোধশক্তি বহির্ভূত কোনো বিষয়ের অবতারণা করা যাবে না। হজরত আলী রা. বলেন, আল্লাহর কসম! আমি কোনো মাখলুককে নিজের এবং মুয়াবিয়া রা.-এর মাঝে বিচারক সাব্যস্ত করিনি; বরং কুরআনকে বিচারক সাব্যস্ত করেছি। (আর কুরআন মাখলুক নয়)। আরও বিশ্বাস করতে হবে যে, এরপরও কুরআনকে শোনা হয়। প্রমাণ—حَتَّىٰ يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ "যদি কোনো মুশরিক আশ্রয় চায়, তাহলে তাকে আশ্রয় দাও, যতক্ষণ পর্যন্ত সে আল্লাহর কালাম শোনে।"[১] আল্লাহর কালাম আসমানী গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত। আল্লাহ তায়ালা বলেন, فِي رَقٍّ مَّنشُورٍ 'যা সূক্ষ্ম চামড়ার ওপর লিখিত[২]।' জাগতিক চামড়ার সাথে এর কোনো তুলনা করা চলে না। এর কোনো উপমা উপস্থাপন অসম্ভব বলে বিশ্বাস করতে হবে। এর তাফসীরে নিজের মনগড়া কোনো মতামত দেয়া যাবে না।

ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল রহ. এ ব্যাপারে নিষেধ করে বলতেন, তোমরা কুরআনের সাথে নিজের কথাকে মাখলুক বা গাইরে মাখলুক বলো না। এতে সালফে সালেহীনের অনুসরণ থেকে ছিটকে পড়বে। আর এখন! এমন লোকদের দেখে আশ্চর্য লাগে যারা কোনো ইমামের অনুসরণ করে আবার এ জাতীয় বদয়ী মাসআলার ব্যাপারে কথা বলে।

---

১ সুরা তাওবাহ : আয়াত ৬

২ সুরা তূর : আয়াত ৩

আমর ইবনে দিনার রহ. হতে বর্ণিত, আমি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর এমন নয়জন সাহাবিকে দেখেছি, যারা বলতেন, যে ব্যক্তি কুরআনকে মাখলুক বলে আখ্যায়িত করবে সে কাফের। ইমাম মালেক ইবনে আনাস রহ. বলেন, যে ব্যক্তি কুরআনকে মাখলুক বলবে, তাকে তাওবা করাতে হবে। যদি সে তাওবা করে তাহলে তো ভালো। আর যদি তাওবা না করে তবে তাকে কতল করা হবে।

জাফর ইবনে বুরকান বলেন, উমর ইবনে আবদুল আযিয রহ. এর কাছে জনৈক বিদয়াতি ব্যক্তি কিছু বলতে চাইলে তিনি তাকে বলেন, তোমার জন্য আকিদার ওপর এমনভাবে দৃঢ় হওয়া আবশ্যক, যেমন মকতবের বালক ও গ্রামের সাধারণ লোক হয়ে থাকে। আর সেই দিন থেকে বাকি দিনের ব্যাপারে গাফেল হয়ে যাও। উমর ইবনে আবদুল আযিয রহ. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, তোমরা যখন দেখবে, কোনো দল সাধারণ মানুষের আড়ালে দীনের ব্যাপারে গোপন কোনো পরামর্শ বা কার্যক্রম চালাচ্ছে, তখন জেনে নেবে এরা কোনো ভ্রষ্ট পথের ভিত গড়ার চিন্তা-ভাবনা করছে।

সুফিয়ান সাওরি রহ. বলেন, আমার কাছে হজরত উমর রা. এর এই উক্তি পৌঁছেছে, তিনি তাঁর কিছু কর্মকর্তাকে লিখে পাঠিয়েছেন, আমি তোমাদের উপদেশ দিচ্ছি, তোমরা আল্লাহকে ভয় করো এবং সুন্নাতের অনুসরণ করো। যে সব বিদয়াত পরবর্তী লোকেরা আবিষ্কার করেছে তা থেকে দূরে থাকো। তোমরা জেনে রাখো, যে সুন্নাতের ইলম সম্পর্কে অবগত, সে খুব ভালোভাবে জানে সুন্নাতের বিরোধিতা ও এর ভেতর বাড়াবাড়ি-ছাড়াছাড়ি করার দ্বারা কী ধরনের ভ্রান্তি ও ভ্রষ্টতার মুখে পতিত হতে হয়। পূর্ববর্তী মনীষীগণ ইলম ও মারেফত থাকা সত্ত্বেও চুপ থেকেছেন। অন্য বর্ণনায় আছে, উমর ইবনে আবদুল আযিয রহ. বলেছেন, পূর্ববর্তী মনীষীরা এ সব ব্যাপার খোলাসা ও ব্যাখ্যা দেয়ার ব্যাপারে অধিক যোগ্য ছিলেন। যে ব্যক্তি কোনো বিদয়াত আবিষ্কার করল, সে ওই ব্যক্তি হবে যে তার বাতানো পথ ছেড়ে অন্য পথ অবলম্বন করেছে এবং নিজেই তার পথে বিতৃষ্ণ হয়ে পড়েছে। সুন্নাতে অবহেলা করে অনেকে নিজের ওপর জুলুম করেছে। অন্যদিকে বহু লোক এতে বাড়াবাড়ি করে পথভ্রষ্ট হয়ে গেছে।

সুফিয়ান সাওরি রহ. বলেন, তোমাদের জন্য ঘরের মহিলা এবং মকতবের বালকদের মতো আকিদা ও একিনেও অটল থাকা আবশ্যক। তারা বলে, ঈমান মুখে স্বীকার করা এবং আমল করার নাম।

গ্রন্থকার বলেন, যদি কেউ বলে, এটা তো স্বল্পবুদ্ধি ও দুর্বল লোকদের কাজ, পুরুষের কাজ নয়। উত্তরে আমরা বলব, আমরা শুরুতে এটা লিখে দিয়েছি এবং বলে দিয়েছি যে, আমলের ওপর স্থির থাকা আবশ্যক। কেননা যে সকল মুকাতাকাল্লিম সমুদ্রে সাঁতার কেটে ডুবে গেছেন, তারা কখনো এর প্রান্তসীমায় পৌঁছতে পারেননি, যা দ্বারা পিপাসার্তের তৃষ্ণা নিবারণ হয়। এ জন্য তিনি সবাইকে উপদেশ দিয়ে বলেছেন, তীরে অবস্থান করো। আমরা সে কথাই উল্লেখ করে এসেছি।

খারেজিদের ওপর ইবলিসের ফাঁদ

গ্রন্থকার আল্লামা ইবনুল জাওযি রহ. বলেন, খারেজি সম্প্রদায়ের সর্বপ্রথম ও সর্বনিকৃষ্ট ব্যক্তিটির নাম জুলখুয়াইসারা। আবু সাঈদ রা. হতে বর্ণিত, আলী রা. নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট ইয়ামেন থেকে কিছু স্বর্ণের টুকরো পাঠালেন যা মাটি মোড়ানো ছিল। তিনি তা চার ব্যক্তির মাঝে বণ্টন করে দিলেন। (১) আকরা ইবনে হাবিস (২) উআইনা ইবনে হাসান। (৩) যায়দ তায়ি, যিনি পরে বনি নাবহান গোত্রের ছিলেন। (৪) আলকামা ইবনে উলাসা। এতে কুরাইশ ও আনসারগণ অসন্তুষ্ট হলেন এবং বলতে লাগলেন, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নাজদবাসী নেতৃবৃন্দকে দিচ্ছেন আর আমাদেরকে দিচ্ছেন না। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আমি তো তাদেরকে আকৃষ্ট করার জন্য এমন মনোরঞ্জন করছি। তখন এক ব্যক্তি সামনে এগিয়ে আসল, যার চোখ দু'টি কোটরাগত, গণ্ডদ্বয় ঝুলে পড়া; কপাল উঁচু, ঘন দাড়ি এবং মাথা মোড়ানো ছিল। সে বলল, হে মুহাম্মাদ! আল্লাহকে ভয় করুন। তখন তিনি বললেন, আমিই যদি নাফরমানি করি তাহলে আল্লাহর আনুগত্য করবে কে? আল্লাহ আমাকে পৃথিবীবাসীর উপর আমানতদার বানিয়েছেন আর তোমরা আমাকে আমানতদার মনে করছ না। তখন এক ব্যক্তি তাঁর নিকট তাকে হত্যা করার অনুমতি চাইল। (আবু সাঈদ রা. বলেন) আমি তাকে খালিদ ইবনে ওয়ালিদ রা. বলে ধারণা করছি। কিন্তু নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে নিষেধ করলেন। অতঃপর অভিযোগকারী লোকটি যখন ফিরে গেল, তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, এ ব্যক্তির বংশ হতে বা এ ব্যক্তির পরে এমন কিছুসংখ্যক লোক হবে তারা কুরআন পড়বে কিন্তু তা তাদের কণ্ঠনালি অতিক্রম করবে না। দীন হতে তারা এমনভাবে বেরিয়ে

পড়বে যেমনি ধনুক হতে তির বেরিয়ে যায়। তারা ইসলামের অনুসারীদেরকে (মুসলিমদেরকে) হত্যা করবে আর মূর্তিপূজারিদেরকে হত্যা করা হতে বাদ দেবে। আমি যদি তাদের পেতাম তাহলে তাদেরকে আদ জাতির মতো অবশ্যই হত্যা করতাম।[১]

গ্রন্থকার বলেন, এমন শিষ্টাচারবহির্ভূত ও দাম্ভিক আচরণকারীর নাম জুলখুয়াইসারা তামিমি। অন্য এক বর্ণনায় আছে, সে এসে বলল, ইনসাফ করুন। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আরে তোমার ধ্বংস হোক, আমিও যদিই ইনসাফ না করি আর কে ইনসাফ করবে?[২]

গ্রন্থকার বলেন, দীন ইসলামে এ ব্যক্তিই প্রথম খারেজি ছিল। নিজের রায়কে প্রাধান্য দিতে গিয়ে সে নিজের ধ্বংস ডেকে এনেছে। কিছুটা ধৈর্য ধারণ করলে সে বুঝে নিতে পারত যে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর চেয়ে বড় রায় আর কারও হতে পারে না। এই খারেজির অনুসারীরা আমিরুল মুমিনীন হজরত আলী রা. এর সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হয়েছিল। এর ঘটনা হচ্ছে, হজরত আলী রা. ও হজরত মুয়াবিয়া রা. এর মাঝে দীর্ঘ সময় পর্যন্ত যুদ্ধাবস্থা বিরাজ করলে মুয়াবিয়া রা. এর অনুসারীগণ কুরআন মাজিদ উপরে তুলে ধরে আলী রা. এর অনুসারীদেরকে আহ্বান করলেন এই শর্তে যে, যা কিছু এই কুরআনে রয়েছে এর ওপর আমরা এবং তোমরা সন্তুষ্ট হয়ে যাব। আরও বলা হলো, তোমাদের পক্ষ থেকে একজন পাঠাও, আমাদের পক্ষ থেকেও একজন পাঠাব এবং এদের উভয়ের কাছ এই অঙ্গীকার নেয়া হবে যে, তোমরা আল্লাহর কালাম অনুযায়ী আমল করবে। সবাই সমস্বরে এতে রাজি হলেন।

কথামতো সিরিয়াবাসী হজরত আমর ইবনুল আস রা.-কে পাঠালেন। আর এদিকে ইরাকবাসী হজরত আলী রা.-কে বললেন, আপনি হজরত আবু মুসা আশয়ারী রা.-কে পাঠান। হজরত আলী রা. বললেন, আবু মুসা আশয়ারী রা.-কে পাঠানো আমার রায় নয়। কারণ তিনি সরল প্রকৃতির লোক। এখানে ইবনে আব্বাস রা. উপস্থিত আছেন। তাকে কেন পাঠাচ্ছেন না? লোকেরা বলল, আমরা এটা চাই না। কেননা তিনিও আপনার মতো, আপনার নিকটাত্মীয়। শেষে তিনি হজরত আবু মুসা আশয়ারী রা.-কে পাঠালেন। ফয়সালার নির্দেশ রমযান পর্যন্ত দীর্ঘ হলো। উরওয়া ইবনে

---

১ সহিহ বুখারি : হাদিস নং ৩৬১০; সহিহ মুসলিম : হাদিস নং ১০৬৪

২ সহিহ বুখারি : হাদিস নং ৬৯৩৩

উযাইনা বললেন, তোমরা আল্লাহর নির্দেশের ব্যাপারে মানুষকে বিচারক বানালে। আল্লাহ তায়ালা তো বলেছেন, إن الحكم إلا لله "বিচার একমাত্র আল্লাহর।"[১] (এই লোক তার অনুসারীদের নিয়ে 'খারিজ' হয়ে গেল অর্থাৎ বেরিয়ে গেল)।

হজরত আলী রা. সিফ্ফীন প্রান্তর হতে ফিরে কুফায় গেলে খারেজিরা তার সাথে কুফায় প্রবেশ করল না; বরং তারা কুফার পার্শ্ববর্তী এলাকা হারুরায় অবস্থান নিল। এভাবে সেখানে বারো হাজার খারেজি সমবেত হলো এবং বলতে লাগল لَا حُكْمَ إِلَّا لِلَّهِ 'আল্লাহ ছাড়া কারও বিচার মানি না।' এখান থেকেই খারেজিদের উৎপত্তি। তাদের বাহিনীর আহ্বানকারী বলল, যুদ্ধের সময় শাবিস ইবনে রিবয়ী তামিমি নেতা হিসেবে আছেন। আর নামায পড়াবেন আমাদের নেতা আবদুল্লাহ ইবনুল কুয়া ইয়াশকারী। উল্লেখ্য, খারেজিরা বহু ইবাদত-বন্দেগি করে থাকে। কিন্তু তাদের বিশ্বাস হচ্ছে, তারা হজরত আলী রা. এর চেয়ে আরও বেশি জ্ঞানের অধিকারী। আর এটা তাদের মারাত্মক আত্মঘাতী ব্যাধিতে পরিণত হয়।

হজরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. হতে বর্ণিত, খারেজিরা বিদ্রোহ শুরু করলে তারা একটি নির্দিষ্ট এলাকায় সমবেত হতে থাকে। এখানে তাদের সংখ্যা ছিল ছয় হাজার। সবাই ঐকমত্য পোষণ করল যে, তারা হজরত আলী রা. এর সাথে বিদ্রোহ ঘোষণা করবে। তারা একজন একজন, দু'জন দু'জন করে এসে এসে হজরত আলী রা.-এর কাছে বলতে লাগল, হে আমিরুল মুমিনীন রা.! এরা সকলে আপনার সাথে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছে। হজরত আলী রা. বললেন, তাদেরকে ছেড়ে দাও। আমি তাদের সাথে যুদ্ধ করব না, যতক্ষণ পর্যন্ত তারা আমার সাথে যুদ্ধ না করে। তারা অচিরেই এমনটি করবে। অতঃপর একদিন জোহরের নামাযের প্রাক্কালে আমি তাঁর খেদমতে আরয করে বললাম, হে আমিরুল মুমিনীন! আজ জোহরের নামায সামান্য শীতল হওয়া পর্যন্ত দেরি করুন। আমার ইচ্ছা, খারেজি গোত্রের কাছে গিয়ে তাদের সাথে আলোচনা করি। তিনি বললেন, আমি তো এখন তাদের থেকে তোমার ব্যাপারে অধিক ভয় করছি। আমি বললাম, জি না। আপনি আমার ওপর এমন ভয় করবেন না। আমি একজন সচ্চরিত্র ব্যক্তি। কাউকে কষ্ট দিতে চাই না। অবশেষে তিনি আমাকে অনুমতি দিলে আমি

---

১ সুরা আনআম : আয়াত ৫৭

তাদের কাছে পৌঁছি। তখন ছিল দুপুর বেলা। সেখানে আমি এমন লোকজনের দেখা পেলাম, যাদের থেকে অধিক ইবাদতকারী কাউকে দেখিনি। তাদের কপালে সিজদার আধিক্যের কারণে আঘাতের চিহ্ন পড়ে গিয়েছিল। তাদের হাত যেন উটের হাত। (মাটিতে সিজদা দেয়ার কারণে ধুলোয় ধূসরিত হয়ে পড়েছিল)। তাদের শরীরে ছিল অনুন্নত জামা। তাদের লুঙ্গিগুলো টাখনুর চেয়ে বহু উপরে উঠানো ছিল। রাত জেগে ইবাদতের ফলে তাদের চেহারা শুষ্ক হয়ে যায়।

আমি তাদেরকে সালাম দিলে তারা বলল, মারহাবা! ইবনে আব্বাস রা.! আপনি এমন সময়ে কী উদ্দেশ্য নিয়ে এলেন? আমি বললাম, আমি তোমাদের কাছে মুহাজির ও আনসারদের পক্ষ থেকে এসেছি এবং রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর জামাতার পক্ষ থেকে এসেছি। তাঁদের ওপর কুরআন অবতীর্ণ হয় এবং তাঁরা তোমাদের থেকে ভালো কুরআন বোঝেন। আমার কথাবার্তা শুনে তাদের দলের একজন বলে উঠল, (সে কুরাইশের অন্তর্ভুক্ত) তুমি কুরাইশের পক্ষ থেকে মুনাযারা কোরো না। কেননা আল্লাহ তায়ালা কুরাইশদের ব্যাপারে বলেছেন, بَلْ هُمْ قَوْمٌ خَصِمُونَ "তারা ঝগড়াটে জাতি।"[২] অতঃপর তাদের মধ্য থেকে দু-তিন ব্যক্তি বলল, না, আমরা মুবাহাসা ও বিতর্ক করব। আমি বললাম, তোমরা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর জামাতা এবং মুহাজির ও আনসারদের ওপর উত্থাপিত অভিযোগগুলো উপস্থাপন করো। অথচ তাঁদের ওপরই কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে। তাঁরা কুরআনের অর্থ ও ব্যাখ্যা তোমাদের চেয়ে বেশি বোঝেন। খারেজিরা বলল, আমাদের ৩টি প্রশ্ন আছে। আমি বললাম, ঠিক আছে, তা বলো। তারা বলল, ১. আলী আল্লাহর ব্যাপারে মানুষকে সালিশ (বিচারক) নির্ধারণ করেছে। অথচ আল্লাহ তায়ালা বলেছেন, إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ "বিচার একমাত্র আল্লাহর।"[৩] আল্লাহর এ ঘোষণার পর মানুষ কীভাবে বিচার করতে পারে? আমি বললাম, এটা একটা গেল। তারপর? তারা বলল—২. আলী মানুষের সাথে যুদ্ধ করেছেন। অথচ তিনি বিরোধী পক্ষের লোকজনকে দাস-দাসী বানাননি এবং তাদের ধন-সম্পদ গনিমতের সম্পদ হিসেবে গ্রহণ করেননি। আমি

---

২ সুরা যুখরুফ : আয়াত ৫৮

৩ সুরা আনআম : আয়াত ৫৭

তাদের জিজ্ঞেস করলাম, যাদের সাথে যুদ্ধ করা হয়েছে, তারা যেহেতু মুসলমান, তাই তাদের সম্পদ হালাল নয় এবং তাদেরকে দাস-দাসী হিসেবে গ্রহণ করা যায় না। ৩. তাদের তৃতীয় অভিযোগ– আলী সালিশী ফয়সালা লেখানোর সময় 'আমিরুল মুমিনীন' উপাধী নিজের নাম থেকে মিটিয়ে দেন। সুতরাং তিনি আমিরুল মুমিনীন না হয়ে আমিরুল কাফিরীন হয়ে গেলেন। অর্থাৎ কাফেরদের নেতা।

আমি বললাম, এগুলো ছাড়া আর কোনো অভিযোগ আছে? খারেজিরা বলল, এ অভিযোগগুলোই যথেষ্ট। আমি বললাম, তোমার প্রথম অভিযোগ হচ্ছে, আল্লাহর বিধানের ব্যাপারে আলী রা. মানুষকে বিচারক সাব্যস্ত করেছে। আচ্ছা, আমি যদি তোমাদেরকে আল্লাহর কালাম থেকে এমন আয়াত তেলাওয়াত করে শোনাই, যা দ্বারা তোমাদের অভিযোগ খণ্ডন হয়ে যায়, তাহলে কি তোমরা তোমাদের কথা থেকে ফিরে এসে তাওবা করবে? তারা বলল, হ্যাঁ। আমি বললাম, আল্লাহ তায়ালা একচতুর্থাংশ মূল্যমানের একটি খরগোশের ব্যাপারে দুই ব্যক্তির বিচারের ওপর তার ফয়সালা সাব্যস্ত করে দিয়েছেন। আমি এ আয়াত পড়লাম– لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنتُمْ حُرُمٌ 'ইহরাম বাঁধা অবস্থায় শিকার কোরো না।' অর্থাৎ এহরাম অবস্থায় শিকারকে খুন করতে নিষেধ করেছেন। যদি কেউ অন্যায় করে ফেলে, যেমন– একটি খরগোশ হত্যা করল, তখন বলেছেন, তোমরা দু'জন ন্যায় বিচারক পুরুষকে পশু হত্যার স্থলে নিয়ে গিয়ে তার মূল্যের ফয়সালা করবে।

অন্যদিকে আল্লাহ তায়ালা নারী এবং তার স্বামীর ব্যাপারে বলেছেন,

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا

"স্বামীর ভাইদের মধ্য থেকে একজন পুরুষ এবং স্ত্রীর ভাইদের পক্ষ থেকে একজন পুরুষ পাঠাও। তারা উভয়ে এ ব্যাপারে বিচার করবে।[১]"

এখন তোমাদেরকে আল্লাহর কসম দিয়ে বলছি, নিজেদের আত্মঘাতী পরিস্থিতিতে এবং রক্তারক্তি থেকে বিরত থাকতে পুরুষকে বিচারক সাব্যস্ত করা উত্তম নাকি একটি খরগোশের ব্যাপারে বা একজন নারীর ব্যাপারে পুরুষকে বিচারক সাব্যস্ত করা উত্তম? খারেজিরা বলল, হ্যাঁ।

---

১ সুরা নিসা : আয়াত ৩৫

আমি বললাম, তোমাদের দ্বিতীয় অভিযোগ– আলী রা. যুদ্ধ করেছেন অথচ বন্দি এবং গনিমত নেননি। আমি তোমাদের কাছে জানতে চাই, তোমরা কি উম্মুল মুমিনীন হজরত আয়শা রা.-কে বাঁদি বানাতে চাও? আল্লাহর কসম! তোমরা যদি বলো, তিনি তোমাদের মা নন, তাহলে তোমরা ইসলাম থেকে বেরিয়ে গেলে। আল্লাহর কসম! তোমরা যদি বলো, তাঁকে বাঁদি হিসেবে গ্রহণ করে তাঁকে অন্য নারীদের মতো বৈধ মনে করা হবে, তখনও তোমরা ইসলাম থেকে বের হয়ে যাবে। তোমরা দু'টি ভ্রান্তির মাঝামাঝি পতিত হয়েছ। আল্লাহ তায়ালা বলেন,

النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ

"মুমিনদের কাছে তাদের প্রাণের চেয়ে তাদের নবী অধিক প্রিয় এবং নবীর সহধর্মিণীবৃন্দ মুমিনদের মা হন।"[২] তারপরও যদি তোমরা বলো যে, তিনি তোমাদের মা নন; তাহলে তোমরা ইসলাম থেকে বের (খারিজ) হয়ে গেলে। তারা বলল, জি হ্যাঁ। আমি বললাম, তোমাদের তৃতীয় অভিযোগ– 'আমিরুল মুমিনীন' শব্দ তার নাম থেকে মিটিয়ে দেয়া হয়েছে। তাহলে আমি তোমাদের কাছে এমন ন্যায়পরায়ণ বিচারক সাক্ষী হিসেবে উপস্থাপন করছি, যাকে তোমরা মান্য করো। হুদাইবিয়ার সন্ধিকালে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুশরিকদের নেতা আবু সুফিয়ান সাখার ইবনে হারব ও সুহাইল ইবনে আমর প্রমুখের সাথে চুক্তিনামা লিখিয়েছিলেন এবং আলী রা.-কে বলেছেন, লেখো– هذا ما اصطلح عليه محمد رسول الله "এটি চুক্তিনামা। যা মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ এবং...।" মুশরিকরা বলল, আল্লাহর কসম! আমরা তো জানি না যে, তুমি আল্লাহর রাসুল। আমরা যদি তোমাকে আল্লাহর রাসুল হওয়ার ব্যাপারে মানতাম, তাহলে তোমার সাথে যুদ্ধ করতাম না। এ কথা শুনে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, اللَّهُمَّ إِنَّكَ تَعْلَمُ أَنِّي رَسُوْلُ اللهِ 'হে আল্লাহ! নিশ্চয় আপনি জানেন, আমি আল্লাহর রাসূল।' অতপর বললেন, হে আলী! এটা মুছে দাও। এভাবে লেখো– هذا ما اصطلح عليه محمد بن عبد الله "এটি চুক্তিনামা। যা মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল্লাহর পক্ষ থেকে ...।"[৩]

---

২ সুরা আহযাব : আয়াত ৬

৩ মুসনাদে আহমাদ : ১/৩৪২

এখন তোমরা দেখো– রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আলী রা. থেকে উত্তম। তিনি رسول الله শব্দটি মুছে দিয়েছিলেন। অথচ এ দ্বারা তিনি আল্লাহর রাসুল হওয়া থেকে বের হয়ে যাননি।[১]

ইবনে আব্বাস রা. বর্ণনা করেন, এই কথোপকথনের আলোকে দুই হাজার মানুষ তাওবা করে ফিরে এসেছে। আর অবশিষ্টরা নিজেদের ভ্রষ্ট পথের অনুসারী হয়ে মারা গেছে।

জুনদুব আলইজদী রা. বলেন, হজরত আলী রা.-এর সাথে আমরা খারেজিদের সাথে লড়াই করতে এসে তাদের সৈন্যবাহিনীর কাছাকাছি গিয়ে দেখলাম, সেখান থেকে মধু-মক্ষিকার বাসার মতো গুনগুন শব্দে তাদের কুরআন তেলাওয়াতের শব্দ বের হচ্ছে।

গ্রন্থকার আল্লামা ইবনুল জাওযি রহ. বলেন, আরেকটি বর্ণনায় আছে, হজরত আলী রা. সালিশী ফয়সালা বানালে খারেজিদের মধ্য থেকে যুরআ ইবনুল বারাজ আত্তায়ী এবং হারকুস ইবনে যুহাইর আস্‌সাদী– এরা উভয়ে হজরত আলী রা. এর কাছে এসে বলল, لا حكم إلا لله "বিচার একমাত্র আল্লাহর।" হজরত আলী রা. বললেন, হ্যাঁ, لا حكم إلا لله "বিচার একমাত্র আল্লাহর।" হারকুস বলল, আপনি আপনার গুনাহ থেকে তাওবা করুন এবং সালিশনামা থেকে ফিরে আসুন। আমাদেরকে নিয়ে শত্রুদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ুন। আমরা তাদের সাথে যুদ্ধ করব। এভাবে আমাদের প্রতিপালকের সাথে মিলিত হব। এর বিপরীতে আপনি যদি এসব লোকের ফয়সালা ছেড়ে না আসেন এবং আল্লাহর কিতাব দ্বারা বিচার না করেন, তাহলে আমরা একমাত্র আল্লাহকে রাজি খুশি করার জন্য আপনার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করব। অতঃপর তারা খারেজি আবদুল্লাহ ইবনে ওয়াহাব আররাসিবীর ঘরে সমবেত হলো। সে আল্লাহর হামদ ও সানা পড়ার পর বলল, যারা আল্লাহর ওপর ঈমান এনেছে আর কুরআন মতে আমল করে, তাদের জন্য জাগতিক কারণে সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধ ছেড়ে দেয়া কিছুতেই শোভা পায় না। এখন আমরা-তোমরা সকলে মিলে চলো রুখে দাঁড়াই। অবশেষে ফয়সালার পর হজরত আলী রা. তাদের উদ্দেশে লিখলেন– "পর সমাচার, এরা দুই ব্যক্তি যাদেরকে উভয় পক্ষের সন্তুষ্টিতে

---

১ সহিহ বুখারি : ২৭৩১, ২৭৩২; সহিহ মুসলিম : ১৭৮৩।

ফয়সালাকারী বানানো হয়েছিল, তাঁরা আল্লাহর কিতাবের বিপরীত করেছেন এবং প্রবৃত্তির অনুসরণ করেছেন। এখনকার অবস্থা আগের মতো বহাল।"

খারেজিরা উত্তরে লিখল, আপনি স্বীয় প্রতিপালকের সন্তুষ্টির জন্য এমন করেননি; বরং আপনার নিজের পক্ষ থেকে ক্রোধান্বিত অবস্থায় এ সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। এখন আপনি যদি নিজে নিজেকে সাক্ষী দিয়ে বলেন, আপনি কাফের হয়ে গেছেন এবং নতুনভাবে তাওবা করেন, তাহলে আমরা আমাদের এবং আপনার ব্যাপারে চিন্তা করে দেখতে পারি। অন্যথায় আমরা আপনার সাথে যুদ্ধ করার ঘোষণা দিয়ে রাখলাম।

একবার খারেজিরা রাস্তায় চলার সময় আবদুল্লাহ ইবনে খাব্বাব রহ. এর সাক্ষাত হলো। তারা আবদুল্লাহকে গ্রেফতার করে বলল, তুমি তোমার বাবার কাছে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পক্ষ থেকে যে হাদিস শুনেছ তা আমাদের বলো। আবদুল্লাহ বলল– হ্যাঁ, আমি আমার পিতার কাছে শুনেছি, তিনি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণনা করেছেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এমন ফিতনার পূর্বাভাস দিয়েছেন, যেখানে বসে থাকা লোক দাঁড়িয়ে থাকা লোকদের চেয়ে উত্তম হবে, আর দাঁড়িয়ে থাকা লোক চলন্ত লোক অপেক্ষা উত্তম হবে, আর চলন্ত লোক দৌড়ছে– এমন লোকদের চেয়ে উত্তম হবে। তুমি যদি এমন যুগ পাও, তবে তোমার জন্য বেঁচে থাকার চেয়ে মরে যাওয়া উত্তম হবে।[২] খারেজিরা বলল, এটা তোমার পিতা থেকে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হাদিস হিসেবে তুমি শুনেছ? আবদুল্লাহ বলল, হ্যাঁ। তারপর খারেজিরা তাকে নদীর তীরে নিয়ে দাঁড় করিয়ে খুন করল। নদীতে তাঁর রক্ত জুতার ফিতার মতো প্রবাহিত হচ্ছিল।

আবদুল্লাহর স্ত্রী ছিলেন গর্ভবতী। খারেজিরা পাশবিকভাবে তার পেট কেটে ফেলে । সামনে গিয়ে একজন জিম্মি খ্রিষ্টানের বাগানে উপনীত হলে তাদের একজন সেই বাগানের নিচে পড়ে থাকা ফল খেতে থাকল। এটা দেখে আরেকজন বলল, বিনা অনুমতিতে এবং মূল্য পরিশোধ না করে অন্যের বাগানের ফল খাচ্ছ? সে তৎক্ষণাত মুখ থেকে ফলটি ছুড়ে মারল। অতঃপর তাদের একজন কোষ থেকে তরবারি বের করল। সম্মুখ দিয়ে একটি শূকরকে হেঁটে যেতে দেখলে, তাকে তরবারির আঘাতে মেরে ফেলল। এটা

---

২ মুসনাদে আহমাদ : ৫/১১০; তাবারানি : ৩৬২৯-৩৬৩০; মুসনাদে আবি ইয়ালা : ৭২১৫; সুনানে আবি দাউদ : ৪২৫৯; সহিহ ইবনে হিব্বান : ১৮৬৯।

দেখে আরেকজন বলল, এটা দেশে ফাসাদের সৃষ্টি করবে। অর্থাৎ এটা হারাম। এ কথা শুনে সে শূকরের মালিকের কাছে গিয়ে শূকরের মূল্য পরিশোধ করে তাকে খুশি করে দিল।

আমিরুল মুমিনীন হজরত আলী রা. খারেজি সম্প্রদায়ের কাছে লোক পাঠিয়ে ঘোষণা দিলেন, আবদুল্লাহ ইবনে খাব্বাবের খুনীকে কেসাসের জন্য আমার কাছে পাঠাও। খারেজিরা উত্তরে বলল, আমরা সকলে মিলে তাকে খুন করেছি। আমিরুল মুমিনীন হজরত আলী রা. এভাবে তিনবার তাদেরকে এমন আহ্বান জানালে প্রত্যেকবার খারেজিরা একই উত্তর দিতে থাকে। অবশেষে আমিরুল মুমিনীন হজরত আলী রা. তার সৈন্যবাহিনীকে বললেন, এখন এই গোষ্ঠীর খবর নাও। কিছুক্ষণের মধ্যেই সব খারেজিকে মেরে ফেলা হলো। (এটা নাহরাওয়ানের ঘটনা)।

লড়াই আরম্ভ হলে খারেজিরা একে অন্যকে ওয়াজ করছিল যে, স্বীয় প্রতিপালকের সাথে মিলিত হওয়ার জন্য প্রস্তুত হও এবং চলো, জান্নাতে চলো। এরা মারা যাওয়ার পর আরও একটি দল খারেজি হতে থাকে। আমিরুল মুমিনীন হজরত আলী রা. একজন দলপতিকে তাদের সাথে যুদ্ধ করতে পাঠালে আবদুর রহমান ইবনে মুলজিম (খারেজি) এবং তার সাথিরা একত্র হয়। তারা তাদের যে ভাই নাহরাওয়ানে মারা গিয়েছিল তার জন্য রহমত পাঠায় এবং বলতে থাকে, দুনিয়ার প্রতি আমাদের আর কোনো আগ্রহ নেই। আমাদের ভাই মারা গেছে, যিনি আল্লাহর ব্যাপারে কোনো ধরনের অপবাদকে ভয় পেতেন না। এখন আমাদেরও উচিত, আল্লাহর কাছ থেকে প্রাণের বিনিময়ে জান্নাত ক্রয় করা। আমরা এখন সেই সুযোগের অপেক্ষায় আছি। সেই পথভ্রষ্ট শাসকদেরকে অলস পেলেই আমাদের ভাইয়ের রক্তের প্রতিশোধ হিসেবে তাদেরকে আমরা খুন করে আল্লাহর প্রকৃত বান্দা হিসেবে প্রশান্তি পাব।

মুহাম্মাদ ইবনে সাআদ তাঁর মাশায়েখ থেকে বর্ণনা করেন, খারেজিদের তিনজন নেতা এলাকায় থাকার ইচ্ছে পোষণ করেছিল। তাদের নাম– আবদুর রহমান ইবনে মুলজিম, বারাক ইবনে আবদুল্লাহ ও আমর ইবনে বকর তামিমি। এই তিনজন মক্কায় (হজের মৌসুমে) একত্র হয়ে পরস্পর অঙ্গীকার ও প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হলো, যে করেই হোক তিন ব্যক্তি অর্থাৎ হজরত আলী রা., হজরত মুয়াবিয়া রা. ও হজরত আমর ইবনুল আস রা.-কে খুন করবে। ইবনে মুলজিম বলল, আমি আলীকে খুন করার দায়িত্ব নিলাম। বারাক বলল, আমি মুয়াবিয়াকে খুন করব। আমর বলল, আমি আমর

ইবনুল আসকে খুন করব। সবাই প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হলো, কেউ যেন তাদের অঙ্গীকার থেকে ছুটে না আসে। ইবনে মুলজিম কুফায় অবস্থান করল। গভীর রাত হলে ইবনে মুলজিম আলী রা. এর পথে ওঁৎ পেতে থাকে। তিনি ফজরের নামায পড়ার জন্য মসজিদের দিকে অগ্রসর হলে মরদুদ ইবনে মুলজিম হজরত আলী রা.-কে তরবারি দ্বারা কপালে আঘাত করলে তা মগজে গিয়ে ঠেকে। তিনি চিৎকার দিলে সে আর পালাতে পারেনি। তাকে গ্রেফতার করা হয়। উম্মে কুলসুম (হজরত আলী রা. এর কন্যা) বললেন, হে আল্লাহর দুশমন! আমি আশা করছি, এই যখম দ্বারা হজরত আলী রা. এর কোনো ক্ষতি হবে না। ইবনে মুলজিম বলল, তাহলে তুমি কাঁদছ কেন? পরে আবার বলল, আল্লাহর কসম! আমি এই তরবারি একমাস যাবৎ বিষবিশ্রিত করে রেখেছি। এখনও যদি তার প্রতিক্রিয়া প্রকাশ না হয়, তাহলে আল্লাহ তার অমঙ্গল করুন।

হজরত আলী ইন্তেকাল করলে ইবনে মুলজিমকে জেলখানা থেকে খুন করার জন্য বের করা হয়। আবদুল্লাহ ইবনে জাফর তার হাত-পা কেটে ফেললেন। তারপরও সে কোনো প্রতিক্রিয়া (ওহ আহ শব্দ) ব্যক্ত করছে না। কিছু বলছে না। পরে গরম কাঁটা দ্বারা তার চক্ষু সেলাই করে দেয়া হলেও কোনো কথা বলছে না এবং কেবল خَلَقَ اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ، পড়ে যাচ্ছে। এমতাবস্থায় তার চক্ষু হতে রক্ত গড়িয়ে পড়ছে। অতঃপর তার জিহ্বা কাটার ইচ্ছে করা হলে সে ভয় পেয়ে যায়। তাকে জিজ্ঞেস করা হলে সে বলল, আমি এটা চাই না যে, দুনিয়াতে আল্লাহর জিকির বিনে আমার এমন এক মুহূর্তও কাটুক। ইবনে মুলজিম ধূসর আকৃতির ব্যক্তি– যার কপালে সিজদার গভীর চিহ্ন ছিল। (তার ওপর আল্লাহর লা'নত পড়ুক)।

গ্রন্থকার বলেন, হজরত হাসান ইবনে আলী রা. হজরত মুয়াবিয়া রা. এর সাথে সমঝোতা করতে চাইলে একজন খারেজিও তাঁর সাথে বের হয় এবং পথিমধ্যে তাঁকে তির নিক্ষেপ করে, এতে হাসান রা. রানে আঘাত পান। খারেজি বলল, তুমিও তোমার পিতার মতো শিরকে লিপ্ত হচ্ছ?

মোটকথা, খারেজিরা সর্বদা ইসলামি নেতৃবৃন্দের কাছ থেকে 'খারেজ' তথা বের হতে থাকত। এছাড়া এদের রয়েছে বহু মতবাদ।

নাফে' ইবনে আযরাক নামীয় খারেজি এই মতবাদ পোষণ করত যে, আমরা যতক্ষণ মুশরিকের দেশে অবস্থান করব, ততক্ষণ আমরা মুশরিক থাকব।

অন্যদিকে মুশরিকের দেশ থেকে বের হলেই আমরা মুমিন হব। তারা মনে করে যারা তাদের বিরোধিতা করে, তারা মুশরিক। কবিরা গুনাহে লিপ্ত ব্যক্তিও মুশরিক। যুদ্ধক্ষেত্রে যারা আমাদের পাশে থাকবে না তারা কাফির। এই খারেজি সম্প্রদায় মুসলিম শিশু ও নারীদের খুন করা বৈধ মনে করে এবং তাদেরকে মুশরিক বলে আখ্যায়িত করে থাকে। নাজদা বিন আমের সাকাফী এই গ্রুপেরই একজন। সে নাফে' ইবনে আযরাকের সাথে কেবল এটুকু মতভেদ করেছে যে, মুসলমানের প্রাণ ও সম্পদ হারাম। তার দাবি—তাদের সাথে একাত্মতা পোষণকারীদের মধ্যে যারা পাপিষ্ঠ তার জাহান্নামের আগুন ব্যতীত অন্য আগুন দ্বারা সাজাপ্রাপ্ত হবে। জাহান্নামে শুধু তাদের বিরোধিতাকারীরাই নিক্ষিপ্ত হবে।

ইবরাহিম আলখারেজির মতে, (অন্যান্য মুসলমান) জাতি কাফির। আমাদের জন্য তাদের সাথে বিয়ে-শাদী ও মিরাসের সম্পত্তির ভাগ নেয়া বৈধ; যেমন ইসলামের প্রাথমিক যুগে বৈধ ছিল। কোনো কোনো খারেজির মতে, কেউ যদি এতিমের সম্পদ থেকে দু'পয়সা খেয়ে ফেলে তবে তার জন্য জাহান্নামের আগুন ওয়াজিব হয়ে যাবে। কেননা আল্লাহ তায়ালা এতিমের সম্পদ ভক্ষণের ওপর জাহান্নামের অগ্নির হুঁশিয়ারি দিয়েছেন। কিন্তু যদি তাকে খুন করে ফেলা হয় বা তার হাত-পা কেটে অথবা পেট কর্তন করে পঙ্গু করে দেয়া হয় তাহলে সে জাহান্নামে যাবে না।

গ্রন্থকার বলেন, খারেজিদের ঘটনা দীর্ঘ। বিস্ময়ে ভরা তাদের মাযহাব। আমি তা উল্লেখ করা অত্যুক্তি মনে করছি। উদ্দেশ্য হচ্ছে কেবল এটুকু যে, ইবলিস কী অদ্ভুতভাবে তাদের ওপর ধোঁকা আর চক্রান্তের জাল বিস্তার করেছে—তার জানান দেয়া। কী অন্যায়ভাবে তারা লড়ে যাচ্ছে। হজরত আলী রা.-এর ব্যাপারে তারা ভুলের অপবাদ দিচ্ছে। অথচ তারা মনে করছে, এরাই সঠিক পথের অনুসারী। তারা শিশুহত্যা বৈধ ভাবছে, আবার মূল্য পরিশোধ করা ছাড়া ফল খেতে সংকোচ করছে। রাত জেগে এবাদত-বন্দেগিতে কষ্ট-ক্লেশ সহ্য করছে। খুনি পথভ্রষ্ট ইবনে মুলজিম তার জিহ্বা কাটার সময় ভীত হয়ে পড়ে, হায়! জিকির করার বুঝি আর সুযোগ মিলবে না! অথচ সে হজরত আলী রা.-কে খুন করা বৈধ মনে করেছিল। তারা মুসলমানের ওপর অস্ত্র চালিয়েছে। আল্লাহ এ সব কুলাঙ্গারদের খপ্পড় থেকে আমাদের নিস্তার দিন।

হজরত আবু সাঈদ খুদরি রা. হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসুলল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে বলতে শুনেছি, ভবিষ্যতে এমন-সব

লোকের আগমন ঘটবে, যাদের নামাযের তুলনায় তোমাদের নামাযকে, তাদের রোযার তুলনায় তোমাদের রোযাকে এবং তাদের আমলের তুলনায় তোমাদের আমলকে তুচ্ছ মনে করবে। তারা কুরআন পাঠ করবে, কিন্তু তা তাদের কণ্ঠনালির নিচে (অর্থাৎ অন্তরে) প্রবেশ করবে না। এরা দীন থেকে এমনভাবে বেরিয়ে যাবে যেমনভাবে নিক্ষিপ্ত তির ধনুক থেকে বেরিয়ে যায়। আর শিকারী সেই তিরের আগা পরীক্ষা করে দেখতে পায়, তাতে কোনো চিহ্ন নেই। সে তিরের ফলার পার্শ্বদেশে নযর করে; অথচ সেখানে কিছু দেখতে পায় না। শেষে ওই ব্যক্তি কোনো কিছু পাওয়ার জন্য তিরের নিম্নভাগে সন্দেহ পোষণ করে।[১] হজরত আবদুল্লাহ ইবনে আবি আউফা রা. রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণনা করেন, "খারেজিরা জাহান্নামের কুকুর।[২]"

খারেজিদের মতামত

গ্রন্থকার বলেন, খারেজিরা এই আকিদা পোষণ করে যে, ইমাম হওয়া এক ব্যক্তির জন্য নির্দিষ্ট নয়। যার ভেতর ইলম ও ইবাদতের সমন্বয় ঘটবে সে ইমাম হবে, যদিও সে অনারব কৃষক হয়। খারেজিদের এই অভিমত থেকে মুতাযিলা গোষ্ঠী এই কথা আবিষ্কার করেছে যে, ভালো-মন্দের বিধান আরোপ করা বিবেক-বুদ্ধির এখতিয়ার। বিবেক যেটাকে সমর্থন দেবে সেটাই ইনসাফ। এভাবে কাদরিয়া সম্প্রদায়ের উৎপত্তি। সে-সময় সাহাবায়ে কেরাম রা. জীবিত ছিলেন। মা'বাদ আলজুহানী, গাইলান দামেস্কী ও জায়াদ ইবনে দিরহাম কাদরিয়া এই মতবাদ পোষণ করতেন। মা'বাদ আলজুহানীর বানোয়াট মতাদর্শের ওপর ওয়াসেল ইবনে আতা ও আমর ইবনে ওবাইদও অটল ছিলেন। সে সময়ই মুরজিয়া সম্প্রদায়ের উৎপত্তি ঘটে। যাদের মতবাদ হচ্ছে, কাফের থাকা অবস্থায় যেমন কোনো ইবাদত কাজে আসত না, তেমনই ঈমান থাকলে গুনাহ দ্বারা কোনো ক্ষতি হয় না। এরপর মামুন আব্বাসির যুগে মুতাযিলা অনুসারী আবুল হাযিল আল্লাফ, নায্যাম, মা'মার ও জাহেয প্রমুখ লোকেরা দর্শনের বিভিন্ন গ্রন্থ অধ্যয়ন করে সেখান থেকে জাওহার, আরয, স্থান, কাল ইত্যাদি পরিভাষাকে শরিয়তের বিভিন্ন মাসআলায় মেলাতে থাকে।

---

১ সহিহ বুখারি : হাদিস নং ৩৬১০, সহিহ মুসলিম : হাদিস নং ১০৬৪

২ মিশকাত : হাদিস নং ৩৫৫৪, ইবনে মাজাহ : হাদিস নং ১৭৩।

প্রথমে তারা কুরআন মাজিদ মাখলুক হওয়ার মাসআলা আবিষ্কার করে। সে সময় এই শাস্ত্রের নাম রাখা হয় ইলমে কালাম। এই মাসআলার পাশাপাশি আল্লাহর গুণবাচক নামসমূহের মাসআলাও তারা আবিষ্কার করে। এক পক্ষ বলে, এ সব মহান আল্লাহর সত্তার ওপর বাড়তি অর্থ বহন করে। মুতাযিলারা এটাকে অস্বীকার করে বলে, তিনি তার সত্তার আলোকেই জ্ঞানী এবং স্বীয় সত্তার আলোকেই ক্ষমতাবান। আবুল হাসান আশয়ারী শুরুতে জুব্বায়ি মুতাযিলা অনুসারী ছিলেন। পরে সেখান থেকে বেরিয়ে যারা আল্লাহর সিফাতের পক্ষপাতি ছিলেন তাদের দলে চলে আসেন। অতঃপর তারা কোনো কোনো সিফাত সাব্যস্তকারী তা বস্তু হওয়ার আকিদা পোষণ করতে থাকে, কেউবা প্রত্যাবর্তন, উত্তরণ ইত্যাদি অতিরিক্ত গুণের আকিদা পোষণ করতে থাকে। আল্লাহ যাকে ইচ্ছা হেদায়াত দান করেন।

রাফেযিদের ওপর শয়তানের ধোঁকা

গ্রন্থকার আল্লামা ইবনুল জাওযি রহ. বলেন, ইবলিস খারেজিদের ধোঁকায় ফেললে তারা হজরত আলী রা. এর সাথে যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়। অনুরূপভাবে এর বিপরীতে ইবলিস আরও একটি জাতিকে ধোঁকায় নিমজ্জিত করে। যারা হজরত আলী রা.-কে ভালোবাসার ক্ষেত্রে এই পরিমাণ বাড়াবাড়ি করতে শুরু করে যা সীমার অতিরিক্ত হয়ে দাঁড়ায়। কোনো কোনো রাফেযি আলী রা.-কে বলতে থাকে আল্লাহ। কারও মতে তিনি নবীর চেয়ে উত্তম। শয়তানের প্ররোচনায় কিছু রাফেযি হজরত আলী রা.-কে হজরত আবু বকর রা. ও হজরত ওমর রা.-এর চেয়ে উত্তম বলে তাঁদের উভয়কে গালাগালি করতে থাকে। তাঁদের উভয়কে আবার কেউ কেউ কাফের বলে আখ্যায়িত করার ধৃষ্টতা প্রদর্শন করে। রাফেযিদের মাঝে এমন বেহুদা ও অদ্ভুত মিথ্যাচারধারী বহু মতবাদ রয়েছে। আমি কতটুকু আর এদের কাণ্ডের কথা বলব! আমার উদ্দেশ্য কেবল তাদের ক্ষেত্রে ইবলিসের ধোঁকাবাজিগুলো প্রকাশ করা। সে দৃষ্টিকোণে তার কিঞ্চিৎ উল্লেখ করা যাক।

ইসহাক ইবনে মুহাম্মাদ নখয়ি আহমার বলত, আলীই আল্লাহ। মাদায়েনের ইসহাকিয়া নামক ভ্রান্ত গোষ্ঠীটি তার থেকে আবিষ্কার। খতিব বলেন, আবু মুহাম্মাদ হাসান ইবনে ইয়াহইয়া নাওবখতির একটি কিতাব আমার হস্তগত হয়, যা রাফেযি গাজীদের খণ্ডনে লেখা হয়েছে। খোদ লেখক শিয়া মুতাকাল্লিমদের ইমামিয়া মতবাদের অনুসারী। তিনি অতিরঞ্জনকারী

রাফেযিদের বিভিন্ন মতবাদের কথা লিখতে আরম্ভ করেছেন। লেখার একপর্যায়ে তিনি স্বীকার করেন, আমাদের যুগে অতিরঞ্জনের পাগলামিতে ইসহাক ইবনে মুহাম্মাদ আহমার মারাত্মক বাড়াবাড়ি করে গেছেন। তার ধারণা—আলীই আল্লাহ। তিনিই সর্বদা প্রকাশমান। অতএব একবার তিনি হাসানের সুরতে আসেন, আবার হোসাইনের আকৃতিতে। তিনিই মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে নবী হিসেবে পাঠিয়েছেন।

গ্রন্থকার আল্লামা ইবনুল জাওযি রহ. বলেন, রাফেযিদের একটি গোত্রের বিশ্বাস হচ্ছে হজরত আবু বকর রা. ও হজরত ওমর রা. কাফের ছিলেন। কেউ কেউ বলেছে, না; বরং তাঁরা রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ইন্তেকালের পর মুরতাদ তথা ধর্মত্যাগী হয়ে গিয়েছিলেন। কারো কারো মতে আলী রা. ছাড়া সবাই বিদ্রোহ করেছিলেন। সহিহ সূত্রে আমাদের কাছে এই বার্তা পৌঁছেছে যে, শিয়ারা যায়েদ ইবনে আলীর কাছে আবেদন করল, আপনি তাদের ব্যাপারে বিদ্রোহ করুন যারা হজরত আলী রা. ইমামতের বিরোধিতা করেছিল। নতুবা আমরা আপনাকে ছেড়ে দেবো। যায়েদ ইবনে আলী তাদের এ আবেদন অস্বীকার করলে এ সব শিয়ারা তাঁকে ছেড়ে দেয়। তখন 'রাফেযি' নামে তারা পরিচিতি পায়। তাদের একটি দল মনে করে, ইমামত মুসা বিন জাফর পর্যন্ত ছিল। তারপর তার পুত্র আলীতে এসেছে, এরপর তার পুত্র মুহাম্মাদ আলীতে এসেছে, পরে তার পুত্র মুহাম্মদের ওপর, এরপর হাসান ইবনে মুহাম্মাদ আলআশকারীতে আসে, পরে তার পুত্র মুহাম্মদের ওপর—এই বারোজন 'মাহদি'। যাদের অপেক্ষা করা হয়েছিল। দলটির ধারণা—এরা মারা যাননি; বরং গোপন রয়েছেন। শেষ যুগে ফিরে আসবেন। তখন পৃথিবী ইনসাফে ভরে যাবে।

আবু মানসুর আলআজলী বলেন, মুহাম্মাদ ইবনে আলী আলবাকের-এর অপেক্ষায় রয়েছে। তাদের দাবিমতে, তিনি এমন খলিফা যাকে সরাসরি আকাশে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। সেখানে তার মাথার ওপর পরম করুণাময় হাত বুলিয়ে যাচ্ছেন।

রাফেযিদের একটি দলকে 'জানাহাই' সম্প্রদায় বলা হয়। যারা আবদুল্লাহ ইবনে মুয়াবিয়া ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে জাফর ইবনে যিল জানাহাইনের মুরিদ। তাদের অভিমত হচ্ছে, আল্লাহ তায়ালার আত্মা আম্বিয়াদের পিঠে ঘোরাফেরা করত, এভাবে তা উল্লেখিত আবদুল্লাহ পর্যন্ত পৌঁছে। এ ব্যক্তির মৃত্যু হয়নি; বরং তিনিই মাহদি—যার অপেক্ষা করা হচ্ছে।

তাদের একটি সম্প্রদায়ের নাম 'গারাবিয়া'। যারা তার ব্যাপারে নবুওয়তের অংশীদার বলে সাব্যস্ত করে থাকে। এদের একটি দলকে বলা হয় 'মুফাওয়াযা'। যারা বলে, আল্লাহ তায়ালা মুহাম্মাদকে সৃষ্টি করে অবশিষ্ট পৃথিবী সৃষ্টি করা তার এখতিয়ারে ছেড়ে দেন। তাদের আরও একটি গোত্রকে বলা হয় 'যুম্মামিয়া'। এরা হজরত জিবরীল রা. এর ওপর মিথ্যা অপবাদ আরোপ করে বলে, তিনি আলী রা. এর কাছে অহী পাঠানোর ব্যাপারে নির্দেশিত ছিলেন, অথচ তিনি তা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে প্রেরণ করেন। তাদের কেউ কেউ বলে, আবু বকর রা. হজরত ফাতিমা রা.-কে মিরাস না দিয়ে জুলুম করেছেন।

বর্ণিত আছে, সাফাহ আব্বাসি একদিন খুতবা শুরু করলে জনৈক ব্যক্তি—যে নিজেকে আলীর বংশধর বলে মনে করে, সে বলল, হে আমিরুল মুমিনিন! আমার ওপর অন্যায় করা হয়েছে। আমার প্রাপ্য আমাকে ফিরিয়ে দিন। সাফাহ বললেন, তোমার ওপর কে জুলুম করেছে? সে বলল, আমি আলীর বংশধর। আবু বকর ফাতেমা রা.-কে মিরাসের অংশ দেয়নি, সুতরাং আমি মজলুম। অর্থাৎ আমাকে মিরাসের অংশ দেয়া হোক। সাফাহ বললেন, আবু বকরের পর কে এসেছিলেন? সে বলল, ওমর। সাফাহ বললেন, তিনিও জুলুম করেছেন? সে বলল, হ্যাঁ। সাফাহ বললেন, তারপর কে খলিফা নির্বাচিত হয়েছেন? সে বলল, উসমান রা.। সাফাহ বললেন, তিনিও নিয়মমাফিক জুলুমের ওপর ছিলেন? সে বলল, হ্যাঁ। সাফাহ বললে, ওসমানের পর কে খলিফা হন? বর্ণনাকারী বলেন, এখন তার হুঁশ ফিরে এসেছে। উত্তর না দিয়ে সে এদিক-সেদিক তাকিয়ে পালাবার পন্থা খুঁজতে থাকে।

ইবনে আকিল বলেন, এটা স্পষ্ট কথা যে, যে ব্যক্তি রাফেযি মাযহাব উদ্ভাবন করেছে, তার মূল লক্ষ্য ছিল দীন ইসলামে এবং মূলত নবুওয়তে মুহাম্মদিকে অপদস্থ ও কালিমালিপ্ত করে ধ্বংস করে দেয়া। কেননা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে সকল বিশুদ্ধ আকিদা-বিশ্বাস নিয়ে এসেছিলেন, তা আমাদের চোখের আড়ালে। আমরা কেবল সালফে সালেহীন অর্থাৎ সাহাবা ও তাবেয়িদের পক্ষ থেকে সে সব কথা পেয়ে থাকি। কেননা তাঁরা খুবই নিখুঁতভাবে নবীর ওপর অর্পিত দীন ও আকিদা সম্পর্কে অধিক জ্ঞাত। রাফেযিরা এখানে এসেই বিশ্বাসে চিড় ধরাতে আপ্রাণ প্রচেষ্টা চালিয়ে যায়। তারা বিভিন্ন প্রোপাগান্ডা চালাতে থাকে, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ইন্তেকালের পর প্রথমে বলতে থাকে

তিনি তাঁর বংশে খেলাফতের ব্যাপারে অন্যায় করেছেন এবং নবীকন্যা ফাতেমাকে মিরাস না দিয়ে জুলুম করেছেন। সুতরাং নবুয়তের সময় যিনি সঠিক পথে ছিলেন, তাকে নবীর মৃত্যুর পর আর সঠিক পাননি। তাদের ধারণা—নবীর মৃত্যুর পর তাঁর বংশধরদের অগ্রাধিকার পাওয়ার কথা ছিল। সুতরাং তারা এমনভাবে অপপ্রচার চালাতে থাকে যে, নবীর মৃত্যুর পর দীনের সবকিছু সঠিকভাবে জাতি জানতে পারছে না। তাই সাহাবিদের কথার কোনো গ্রহণযোগ্যতা নেই। তাদের মূল এজেন্ডা ছিল, যাতে মুসলমানদের আকিদা নষ্ট হয়ে যায়, ঈমানের সাথে সংশ্লিষ্ট সকল বিষয়াশয়ে মানুষ সন্দেহ-সংশয়ে পতিত হয় এবং মুজিযাপূর্ণ বর্ণনাসমূহ থেকে তারা বিমুখ হয়ে পড়ে। চরম ধৃষ্টতাপূর্ণ আর ধোঁকাসর্বস্ব এই সম্প্রদায়ের ফিতনা ইসলামের জন্য মারাত্মক ক্ষতিকর প্রভাব বয়ে আনে।

গ্রন্থকার বলেন, রাফেযি সম্প্রদায় হজরত আলী রা. এর সাথে হৃদ্যতায় এমন বাড়াবাড়িতে ঠেকেছে যে, তারা তার মর্যাদার বর্ণনা দিতে গিয়ে বহু রেওয়ায়েত নিজেরা তৈরি করে নিয়েছে। তাদের এমন অজ্ঞতাপূর্ণ আচরণে হজরত আলী রা. নিজেই এদের তিরস্কার করেন। আমি 'কিতাবুল মাউযূয়াত' গ্রন্থে এ ধরনের অনেক বানোয়াট বর্ণনার কথা উল্লেখ করেছি। তাদের সে বানোয়াট উক্তিসমূহের কিছু হচ্ছে এমন—'সূর্য ডুবে যাচ্ছে আর হজরত আলী রা. এর আসরের নামায ছুটে যাবার উপক্রম। এমন সময় পুনরায় সূর্য উদিত হয়।' এই বর্ণনাটির অবস্থা এতই নাজুক যে, কোনো 'সেকা' তথা বিশ্বস্ত রাবি বা বর্ণনাকারী এটি বর্ণনা করেননি। অনুরূপভাবে অর্থের দিক দিয়েও কথাটি বাতিল বলে বিবেচিত। কেননা সূর্য ডুবে গেল তো আসরের সময় শেষ হয়ে যায়। পরে আবার সূর্য দেখা গেলে তখন নতুন সময় তৈরি হবে।

তাদের ভ্রান্ত বর্ণনার আরেকটি হচ্ছে, 'হজরত সাইয়্যিদাতুন নিসা ফাতেমা রা. এর নিজে গোসল করা। পরে মৃত্যুর সময় ঘনিয়ে এলে তাঁর অসিয়ত করা যে, এই গোসলই যথেষ্ট, পুনরায় আমাকে মৃতের গোসল দেবে না।' এ বর্ণনাটি উদ্ধৃতিসূত্রেও ডাহা মিথ্যা, যা প্রকাশেই দেখা যাচ্ছে। অর্থগত দিক দিয়েও এটি রাফেযি সম্প্রদায়ের চরম অজ্ঞতার পরিচায়ক। কেননা মৃত্যু সংঘটিত হলে গোসল ওয়াজিব হয়। সুতরাং মৃত্যুর পূর্বে গোসলে কী লাভ? এছাড়া তারা এমন অসংখ্য ভুয়া ও ধৃষ্টতাপূর্ণ বর্ণনা প্রচার করে থাকে, যার না আছে কোনো সনদগত ভিত্তি, না আছে অর্থগত সামঞ্জস্য।

ফিকাহর ক্ষেত্রেও এই মাযহাবের অদ্ভুত বিদয়াত পরিলক্ষিত হয়; যা 'ইজমা' তথা উম্মতের সর্বসম্মত মতের সম্পূর্ণ বিপরীত।

ইবনে আকিল রহ. এর পত্রে উল্লেখিত আছে, তিনি বলেন, আমি মুরতাযার গ্রন্থ থেকে এটা উল্লেখ করেছি। রাফেযি ইমামিয়াদের মতে, সরাসরি জমিন ও উদ্ভিদের ক্ষেত্র ছাড়া অন্যত্র সিজদা দেয়া বৈধ নয়। ঢিলা দ্বারা ইসতিঞ্জা করা শুধু মলত্যাগের বেলায় বৈধ, পেশাবের বেলায় বৈধ নয়। মাথা মাসেহ করা জায়েয নেই। তাদের মতে, যদি কোনো পুরুষ কোনো মহিলার সাথে ব্যভিচার করে—যার স্বামী রয়েছে, তাহলে এই মহিলা সেই ব্যভিচারকারীর ওপর চিরদিনের জন্য হারাম। তার স্বামী তাকে তালাক দিয়ে দিলেও উক্ত ব্যভিচারকারী তাকে বিয়ে করতে পারবে না। এই সম্প্রদায় আহলে কিতাবদের সাথে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হওয়াকে অবৈধ মনে করে। আরও বলে, কোনো শর্তারোপ করে তালাক দেয়া হলে, সেই শর্ত পতিত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত তালাক পতিত হবে না। শুধু তা-ই নয়, যতক্ষণ পর্যন্ত দুইজন ন্যায়পরায়ণ সাক্ষী পাওয়া না যাবে, ততক্ষণ তালাক পতিত হবে না। তাদের মতে, যে ব্যক্তি অর্ধরাত পর্যন্ত এশার নামায না পড়ে শুয়ে পড়ে তার ওপর কাযা ওয়াজিব হবে। নিদ্রা হতে জাগ্রত হলে এই ভুলের ক্ষতিপূরণ হিসেবে সকালে রোযা রাখবে। মহিলারা মাথার চুল কাটলে তার ওপর কাফ্ফারা ওয়াজিব হবে। কোনো ব্যক্তি নিজের কন্যা, স্ত্রী বা স্বামীর মৃত্যুর কাপড় ছিঁড়লে তার ওপর কসমের কাফফারা ওয়াজিব হবে। যে ব্যক্তি এমন নারীকে বিয়ে করে যার স্বামী আছে, অথচ সে তা জানে না, এমতাবস্থায় তার ওপর পাঁচ দিরহাম কাফ্ফারা ওয়াজিব হবে। মদ্যপকে দুইবার সাজা দেয়ার পর তৃতীয়বার তাকে হত্যা করা হবে। চুরির শাস্তিস্বরূপ চোরের আঙ্গুলের গোড়া থেকে কর্তন করা হবে এবং কব্জি অবশিষ্ট রাখা হবে। পুনরায় চুরি করলে তার বাঁ পা কাটা হবে। তৃতীয়বার চুরি করলে আজীবন জেলখানায় বন্দি করে রাখা হবে।

রাফেযিরা বাইম মাছ এবং আহলে কিতাবের জবাইকৃত জন্তুকে হারাম মনে করে। জবাই করার সময় তারা কিবলার দিকে মুখ ফিরিয়ে আরও বহু ধরনের নিয়ম-কানুনের কথা বলে থাকে—যা বর্ণনা করে আলোচনা দীর্ঘ করা অনর্থক। এগুলো সব উম্মতের সর্বসম্মত ঐকমত্যের বিপরীত। শয়তান তাদেরকে এমনভাবে প্ররোচনা দিয়েছে যে, তারা কোনো প্রকার সনদ ব্যতিরেকে কিয়াসবিরোধী এ-সব মতবাদ নির্ণয় করেছে। রাফেযিদের ভ্রান্ত মতবাদ অসংখ্য। তারা নামায থেকে বঞ্চিত, কেননা তারা অযুর সময়

পা ধৌত করে না। এরা জামাত থেকে বঞ্চিত, কারণ তারা নিষ্পাপ ইমাম সন্ধান করে। এছাড়া তারা সাহাবাদের গালমন্দ করে থাকে।

অথচ হাদিসে আছে, আবু সা'ঈদ খুদরি রা. হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন,

لَا تَسُبُّوا أَصْحَابِي، فَلَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ أَنْفَقَ مِثْلَ أُحُدٍ، ذَهَبًا مَا بَلَغَ مُدَّ أَحَدِهِمْ، وَلَا نَصِيفَهُ

'তোমরা আমার সাহাবিগণকে গালমন্দ করো না। তোমাদের কেউ যদি উহুদ পর্বত পরিমাণ সোনা আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় কর, তবুও তাদের এক মুদ বা অর্ধ মুদ-এর সমপরিমাণ সওয়াব হবে না।"[১]

অন্যত্র বর্ণিত আছে, হজরত আবদুর রহমান ইবনে সালেম হতে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,

إِنَّ اللَّهَ اخْتَارَنِي، وَاخْتَارَ لِي أَصْحَابًا، فَجَعَلَهُمْ لِي وُزَرَاءَ وَأَنْصَارًا وَأَصْهَارًا، فَمَنْ سَبَّهُمْ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، لَا يُقْبَلُ مِنْهُمْ صَرْفٌ، وَلَا عَدْلٌ

'আল্লাহ তায়ালা আমাকে নির্বাচিত করেছেন এবং আমার জন্য আমার সাহাবাদেরকে নির্বাচিত করেছেন। তাদেরকে আমার জন্য উজির, আনসার ও সৈন্য হিসেবে তৈরি করেছেন। যে ব্যক্তি তাদেরকে মন্দ বলবে, তার ওপর আল্লাহ তায়ালা, ফেরেস্তাগণ ও সমুদয় মানবজাতির অভিসম্পাত। আল্লাহ তায়ালা কেয়ামতের দিন তাদের ফরয নফল কোনো প্রকার ইবাদত কবুল করবেন না।'[২]

সুয়াইদ ইবনে গাফলাহ রা. বলেন, আমি কুফায় এমন একটি দলের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলাম, যারা হজরত আবু বকর রা. ও হজরত ওমর রা. এর সম্পর্কে কটূক্তি প্রকাশ করছে। অতঃপর আমি হজরত আলী রা. এর দরবারে গিয়ে তাঁর খেদমতে আরয করলাম, হে আমিরুল মুমিনীন! আপনার কিছু সৈন্যের পাশ দিয়ে অতিক্রমকালে দেখলাম তারা হজরত আবু বকর রা. ও হজরত ওমর রা. এর ব্যাপারে এমন কথোপকথন করছে, যা

---

১ সহিহ বুখারি : হাদিস নং ৩৬৭৩, সহিহ মুসলিম : হাদিস নং ২৫৪০

২ মুসতাদরাকে হাকিম : ৩/৭৩২

তাঁদের মর্যাদা ক্ষুণ্ন করে। সম্ভবত তারা আপনাকেও এমন ধারণা লালন করেন বলে মনে করেছে। নতুবা প্রকাশ্যে কী করে এমন ধৃষ্টতা দেখাতে পারে? হজরত আলী রা. বললেন, أعوذ بالله أعوذ بالله "আমি আল্লাহর কাছে পানাহ চাই।" আমি আল্লাহর কাছে এ জন্য পানাহ চাচ্ছি, কারণ আমার অন্তরে তাঁদের সম্পর্কে কোনো বিরূপ ধারণা নেই; বরং আমি তো তাঁদের প্রতি এমন ভালোবাসা লালন করি, যা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর প্রতি আমার ভালোবাসা রয়েছে। যে ব্যক্তি তাঁদের সম্পর্কে ভালো ও উত্তম ছাড়া মন্দ কোনো বিষয় মনে ঠাঁই দেবে, তাদের ওপর আল্লাহর লানত। তাঁরা উভয়ে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাহাবি, ভাই এবং উজির ছিলেন। আল্লাহ তায়ালা তাঁদের ওপর অনুগ্রহ করুন।

এর পর তিনি অশ্রুসিক্ত নয়ন নিয়ে ওঠে দাঁড়ালেন। মসজিদে গিয়ে মিম্বরে দাঁড়ালেন এবং সেখানে বসলেন। সে সময় তিনি তাঁর সাদা দাড়ি হাতে নিয়ে (দাড়ির প্রতি) তাকিয়ে রইলেন। এমতাবস্থায় লোকজন এসে তাঁর পাশে জড়ো হলো। তিনি দাঁড়িয়ে সংক্ষিপ্ত ও উন্নত ভাষায় আল্লাহ তায়ালার হামদ ও রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ওপর সানা পাঠ করে খুতবা দিলেন। অতঃপর বললেন, আমার কাছে অভিযোগ এসেছে, কোনো কোনো গোত্র কুরাইশ মুহাজিরীনদের নেতা এবং মুসলমানদের নেতা হজরত আবু বকর রা. ও হজরত ওমর রা. এর ব্যাপারে আপত্তিজনক মন্তব্য করছে। এতে আমি ভীষণ মর্মাহত। আপত্তিজনক মন্তব্য ও কুৎসা রটনাকারীদেরকে আমি শাস্তি দেবো। সাবধান হয়ে যাও! শপথ ওই মহান সত্তার—যিনি জমি থেকে শস্য উৎপন্ন করেন এবং মানুষ সৃষ্টি করেন, হজরত আবু বকর রা. ও হজরত ওমর রা.-কে ওই ব্যক্তি ভালোবাসে যে মুত্তাকি ও পরহেযগার। অন্যদিকে তাঁদের সাথে তারাই শত্রুতা পোষণ করে যারা পাপিষ্ঠ। তাঁরা উভয়ে পরিপূর্ণ সততার সাথে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহচর্য লাভ করেছেন। তাঁরা কখনো রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মতের বিপরীতে কোনো কর্মকাণ্ড করেননি। এভাবেই তাঁরা শিষ্টের লালন, দুষ্টের দমন করতেন, ক্রোধান্বিত হতেন এবং শাস্তি প্রদান করতেন। কিন্তু কখনো রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর রায়ের অতিরিক্ত কিছু করতেন না। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও হজরত আবু বকর রা. ও হজরত ওমর রা.-কে যেরূপ

ভালোবাসতেন, তেমন ভালোবাসা আর কারও প্রতি পোষণ করতেন না। তাঁদের উভয়ের প্রতি পূর্ণ সন্তুষ্ট থেকেই তিনি পরকালের সফরে পাড়ি জমিয়েছেন।

এভাবে হজরত আবু বকর রা. ও হজরত ওমর রা.ও পৃথিবী থেকে বিদায় নিয়েছেন, যে অবস্থায় সকল বিশ্বাসী মানুষ তাঁদের ওপর সন্তুষ্ট ছিল। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইন্তেকালের পূর্বে অসুস্থ হয়ে পড়লে হজরত আবু বকর রা.-কে নামায পড়াতে নির্দেশ দিলে তিনি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জীবিত থাকাবস্থায় নয়দিন মুমিনদের নামায পড়ান। পরে আল্লাহ জাল্লা শানুহু তাঁর প্রিয় হাবীবকে উঠিয়ে নিলে, জগদ্বাসীর জন্য তিনি আবু বকর রা.-কে পছন্দ করেন। সে মতে মুমিনরা তাঁকে নিজেদের অভিভাবক ও খলিফায়ে রাসুল মনোনীত করে। তারা আবু বকরের হাতে যাকাতের পণ্য অর্পণ করে খুশিমনে তাঁর হাতে হাত রেখে বায়য়াত গ্রহণ করতে থাকে। এখানে কোনো প্রকার জবরদস্তি ও প্রভাব বিস্তারের চিহ্নও ছিল না। আবদুল মুত্তালিব বংশের মধ্যে সর্বপ্রথম আমিই হজরত আবু বকর সিদ্দীক রা. এর হাতে হাত রেখে বায়য়াত গ্রহণের কার্যক্রম আরম্ভ করি। অথচ আবু বকর রা. নিজ থেকে খুশিমনে খেলাফত গ্রহণ করতে চাননি। তিনি চেয়েছিলেন আমাদের মধ্য থেকে কেউ একজন খেলাফতের দায়িত্বভার গ্রহণ করুক।

আবু বকর রা. এমন ব্যক্তি ছিলেন, যিনি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পর সবার চেয়ে উত্তম ও যোগ্য হিসেবে বিবেচিত হতেন। দয়া ও অনুগ্রহের গুণে তিনি ছিলেন অতুলনীয়। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পর সবচেয়ে বয়স্ক ছিলেন তিনি। ঈমান গ্রহণের বেলায় তিনিই ছিলেন সবার চেয়ে অগ্রগামী। দয়ার্ঘ ও বন্ধুত্বের ক্ষেত্রে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে ইবরাহিম খলিলুল্লাহর সাথে তুলনা করতেন। হজরত আবু বকর রা. রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পদাঙ্ক অনুসরণ করে চলতেন। এভাবেই তিনি অভীষ্ট লক্ষ্যপানে পাড়ি জমান। আল্লাহ তাঁর ওপর রহম করুন।

এরপর হজরত ওমর ইবনুল খাত্তাব রা. অভিভাবক ও খলিফা মনোনীত হন। আমি এমন ব্যক্তি, যে তাঁর খেলাফতের ব্যাপারে শুরু থেকেই সন্তুষ্ট ছিলাম। তিনিও হজরত রাসুলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং তাঁর অনুপম বন্ধু আবু বকর রা. এর পদাঙ্ক অনুসরণে অটল থাকেন।

প্রতিটি বিষয়ে তিনি পূর্বসূরিদ্বয়ের বাতানো ও দেখানো পথে চলতেন, যেভাবে উটের ছানা উটের পেছনে পেছনে চলতে থাকে। নিঃসন্দেহে আল্লাহর শপথ! হজরত ওমর ইবনুল খাত্তাব রা. এর এমন শান ছিল যে, তিনি দুর্বল মুমিনদের ওপর ভীষণ দয়া ও অনুগ্রহ রাখতেন এবং অন্যায় ও অত্যাচারীদের ওপর বজ্রকঠিন ছিলেন। আল্লাহ তায়ালার ব্যাপারে কোনো অপবাদকারীর অপবাদকে তিনি ভয় পেতেন না। সর্বদা তিনি হকের ওপর অটল ছিলেন। তাঁর কাছ থেকে সত্যের আলো বিচ্ছুরিত হতো। মানুষ ভাবত, আল্লাহর ফেরেশতার মুখ থেকে এমন হক কথা বের হচ্ছে। তিনি ইসলামধর্ম গ্রহণ করলে আল্লাহ তায়ালা ইসলামের মর্যাদা বাড়িয়ে দেন। মদিনায় তাঁর হিজরতের কারণে দীনের ভিত এত দৃঢ় হয় যে, মদিনার মুনাফিকরা তার ভয়ে ভীত হয়ে পড়ে এবং মুমিনের অন্তরে তাঁর প্রতি অকৃত্রিম ভালোবাসা জন্মে। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে হজরত জিবরাঈল আলাইহিস সালাম এর সাথে তুলনা দেন। তিনি আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের শত্রুদের ওপর ভীষণ কঠোর ছিলেন। আল্লাহ তায়ালা উভয় সাহাবার ওপর রহম করুন এবং আমাদেরকে তাঁদের দেখানো পথে মানযিলে মাকসুদ তথা অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছার তাওফিক দিন।

এখন বলো এ দু'জনের মতো আর কাউকে কি পাবে? মনে রেখো! যে ব্যক্তি আমাকে ভালোবাসে, সে নিশ্চয় ওই দুই মহান সাহাবিকে ভালোবাসে। আর যে ব্যক্তি তাদেরকে ভালোবাসবে না, সে নিশ্চয় আমার সাথে শত্রুতা পোষণ করে এবং আমিও তার ওপর অসন্তুষ্ট। আমি যদি পূর্ব হতেই তোমাদেরকে এই সংবাদ পৌঁছাতে পারতাম, তাহলে এখন যারা ওই দুই মহান সাহাবি সম্পর্কে কটূক্তি করছে, তাদেরকে শাস্তি দিতাম। এখন সাবধান হও! আগামীতে যদি এমন কোনো সংবাদ আমার কানে আসে এবং প্রমাণিত হয়, তাহলে তাকে কঠিন শাস্তির মুখোমুখি করব; যা অপবাদকারীদের দেয়া হয়। (অর্থাৎ নির্দোষ ও পবিত্র নারী-পুরুষের ওপর মিথ্যা অপবাদদাতার শাস্তি)। মনে রেখো, এই উম্মতের মধ্যে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পর সর্বোচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তি হচ্ছেন হজরত আবু বকর রা. ও হজরত ওমর রা.। তারপর কে উত্তম তা আল্লাহই ভালো জানেন।

আবু সুলাইমান হামদানি বলেন, হজরত আলী রা. হতে বর্ণিত, শেষ জমানায় এমন লোকদের দেখা যাবে, যারা আমাদের অনুসারী বন্ধুত্বের কথা প্রকাশ করবে, অথচ মনে কুধারণা পোষণ করবে। তাদেরকে রাফেযা বলা

হবে। তারা কখনোই আমাদের অন্তর্ভুক্ত নয়। তাদের চেনার উপায় হচ্ছে, তারা হজরত আবু বকর রা. ও হজরত ওমর রা. সম্পর্কে মিথ্যা অপবাদ আরোপ করবে। তোমরা তাদেরকে যেখানেই দেখবে হত্যা করবে। কেননা এরা মুশরিক।

বাতেনিয়া সম্প্রদায়ের ওপর ইবলিসের ধোঁকা

গ্রন্থকার আল্লামা ইবনুল জাওযি রহ. বলেন, বাতেনিয়া এমন একটি সম্প্রদায়, যারা ইসলামের পর্দায় নিজেদের প্রকৃত রূপ আড়ালে রেখেছে। এরা রাফেযিদের নিকটবর্তী। তাদের আকিদা-বিশ্বাস ও আমল সম্পূর্ণ ইসলামপরিপন্থী। বাতেনিয়া সম্প্রদায়ের মতবাদের সারসংক্ষেপ হচ্ছে, সৃষ্টিকর্তা বেকার। নবুয়ত বলতে কিছু নেই। ইবাদত অনর্থক। মৃত্যু-পরবর্তী পুনরুত্থান ও হাশর ইত্যাদি ধোঁকা। আশ্চর্যের বিষয় হচ্ছে এই সম্প্রদায়টি তাদের মতবাদের কথা শুরুতে কারও কাছে প্রকাশ করত না; বরং বাহ্যত আল্লাহ, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে হক বলত এবং দীনকে বিশুদ্ধ বলত। কিন্তু অন্তর থেকে এগুলো সব অস্বীকার করত। ইবলিস তাদেরকে তার অনুগত করতে সমর্থ হয়। তাদেরকে সম্পূর্ণ হাতের মুঠোয় নিয়ে বিভিন্ন ধরনের দীনবিধ্বংসী অদ্ভূত মতবাদ প্রচার করতে থাকে। বাতেনিরা আটটি দলে বিভক্ত।

১. الباطنية (বাতেনিয়া) : এ নামে তাদেরকে অভিহিত করার কারণ হচ্ছে, তারা বলে থাকে, কুরআন ও হাদিসের বাতেনি (গোপন) অর্থ আছে। আর এই বাতেনি অর্থই হচ্ছে তার মজ্জা ও সারগর্ভ। অন্যদিকে প্রকাশ্য অর্থ হচ্ছে কুরআন-হাদিসের চর্মসদৃশ। এগুলোর বাহ্যিক আকৃতি দেখে তার মাসআলার মধ্যে অজ্ঞ লোকেরা ফেঁসে গেছে। জ্ঞানীদের কাছে কুরআন-হাদিস বিভিন্ন রহস্য ও গোপন রহস্যের ইঙ্গিতবাহী বার্তা বিদ্যমান। যার জ্ঞান-বুদ্ধি সে পর্যন্ত পৌঁছেনি সে শরিয়তের প্রকাশ্য বিধি-বিধানের জালে আটকে পড়েছে। অন্যদিকে যারা ইলমে বাতেন পর্যন্ত উত্তীর্ণ হয়েছ, তাদের ওপর থেকে শরিয়তের সকল প্রকার বিধি-নিষেধ রহিত হয়ে গেছে। প্রমাণস্বরূপ তারা বলে থাকে— وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِم "এবং তাদের ওপর থেকে এমন সব বোঝা নামিয়ে দেয়, যা তাদের ওপর চাপানো ছিল আর এমন সব বাঁধন থেকে তাদেরকে মুক্ত করে যাতে

করে আবদ্ধ ছিল।"[১] দ্বারা এরাই উদ্দেশ্য। এই ভ্রান্ত সম্প্রদায়ের উদ্দেশ্য হচ্ছে, যখন শরিয়তের প্রকাশ্য সকল বিধি-বিধানের ব্যাপারে প্রশ্ন উত্থাপন সম্ভব হবে তখন শরিয়তকে নিশ্চিহ্ন করে দেয়া সহজতর হবে।

২. الإسماعيلية (ইসমাইলিয়া) : এই নামকরণের নেপথ্য কারণ হচ্ছে, তারা নিজেদেরকে মুহাম্মাদ ইবনে ইসমাইল ইবনে জাফরের দিকে সম্পর্কিত বলে দাবি করে। তাদের দাবি—ইমামতের পরিসমাপ্তি এই লোকের ওপরই ঘটেছে। কেননা তিনি সপ্তম পুরুষ। আর সপ্তম পুরুষে ইমামত শেষ হয়। এ কারণে আকাশের স্তর সাতটি, জমিনও সাত স্তরের, অনুরূপভাবে সপ্তাহে দিন সাতটি। সুতরাং ইমামের পরম্পরাও সাতটিতেই সীমাবদ্ধ। এমনইভাবে মনসুর আব্বাস পর্যন্ত পৌঁছেছে। আব্বাস, তারপর তার ছেলে আবদুল্লাহ, তারপর আলী ইবনে আবদুল্লাহ, তারপর মুহাম্মাদ ইবনে আলী, এরপর ইবরাহিম ইবনে মুহাম্মাদ, এরপর সাফাহ, তারপর মনসুর। অর্থাৎ মনসুরে এসে সপ্তম পরম্পরা সমাপ্ত হয়।

আবু জাফর তাবারি তাঁর ইতিহাসগ্রন্থে উল্লেখ করেন, আলী ইবনে মুহাম্মাদ তার পিতা থেকে বর্ণনা করেন, রাবেন্দিয়াদের মধ্যে এক ব্যক্তি তার কাছে এসে প্রত্যয় ব্যক্ত করল যে, তুমিই সেই রুহ, যা ঈসা আলাইহিস সালাম এর সম্পর্কে বলা হয়? ওই ব্যক্তিকে 'আবলাক' বলা হতো। কেননা তার শরীরের বিভিন্ন স্থানে বসন্তের দাগ পরিদৃষ্ট ছিল। এ ব্যক্তি বিদায় নিলে রাবেন্দিয়ার অন্যান্য লোকদেরকে সে পথভ্রষ্ট করতে থাকে এবং বলতে থাকে, যে আত্মা ঈসা ইবনে মারইয়ামের মাঝে দেখা যেত তা আলী ইবনে আবু তালিবের মধ্যে দেখা যাচ্ছে। এরপর একের পর এক ইমামের মাঝে তা দেখা যেতে থাকে। এভাবে তা ইবরাহিম ইবনে মুহাম্মদের ওপর এসে শেষ হয়।

এ দলটি মুহাররমা নারীদেরকে বৈধ মনে করে থাকে। এ কারণে তারা একটি দলকে দাওয়াত দিলে, তাদেরকে ঘরে এনে খাবার ও মদজাতীয় পানীয় পরিবেশন করে তাদেরকে নিজের ঘরের নারীদের কাছে পাঠিয়ে দেয়া হয়। এই সংবাদ আসাদ ইবনে আবদুল্লাহর কাছে পৌঁছলে সে তাদেরকে হত্যা করে শূলে চড়িয়ে রাখে। কিন্তু এখনও পর্যন্ত তাদের যে-সব অনুসারী অবশিষ্ট আছে, তারা এ নিয়মই পালন করছে। তারা আবু

---

১ সুরা আ'রাফ : আয়াত ১৫৭

জাফরের উপাসনা করে। তারা একটি সবুজ পাখায় হাত মেলে রাখে। যাতে তাদেরকে দেখে মানুষ মনে করে, এরা আকাশে উড়ে বেড়ায়, এখন নিচে নামছে কিন্তু পা এখনও মাটিতে পড়েনি। ইত্যবসরে সে মারা গেছে। দলটি অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হয়ে মানুষের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে এবং 'আবু জাফর, তুমি! তুমি!' বলে চিৎকার করতে থাকে।

৩. السبعية সাবয়িয়া : এ উপাধির দু'টি কারণ। প্রথমত তাদের বিশ্বাস—ইমামতের পরম্পরা সাত সাতটি। যেমন আমরা পূর্বে আলোকপাত করেছি। সপ্তমে এসে তার পরিসমাপ্তি ঘটে। এখন চলছে শেষ বেলা। কেয়ামত দ্বারা এটাই উদ্দেশ্য। পরম্পরা এভাবে অসীমের পানে চলতে থাকবে। আর প্রতি সাতজন অন্তর অন্তর কেয়ামত অনুষ্ঠিত হবে। কখনো তা শেষ হবে না।

নামকরণের দ্বিতীয় কারণ হচ্ছে, তারা মনে করে, এই ভূখণ্ডকে সাতটি নক্ষত্র নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। যথা—বুধ, বৃহস্পতি, মঙ্গল, সূর্য, মঙ্গল, শনি ও চন্দ্র।

৪. البابكية বাবকিয়া : এটা বাতেনিয়াদের একটি উপদলের নাম। এরা অগ্নিপূজারি বাবক খুররমীর অনুসারী, যে বাতেনিয়াদের অন্তর্ভুক্ত ছিল। তার অন্যতম বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, সে একজন জারজ সন্তান। সে ২০১ হিজরিতে আজারবাইজানের একটি পাহাড়ি এলাকা থেকে আত্মপ্রকাশ করে। বহু লোককে সে তার অনুসারী বানিয়ে ফেলে। নিষিদ্ধ বস্তুকে সে বৈধতা দিতে থাকে। কারও সুন্দরী বোন বা স্ত্রীর খবর পেলে সে তাকে উপস্থাপন করার নির্দেশ দিত। কথা মানলে তো ভালো কথা। অন্যথায় তাকে হত্যা করে তার বোন বা স্ত্রীকে আটকে রেখে ধর্ষণ করত। বিশ বছর ধরে সে পাহাড়ের গুহায় অবস্থিত আস্তানা থেকে নানা অপকর্ম করতে থাকে। সে দুই লাখ পঞ্চান্ন হাজার পাঁচশত (২,৫৫,৫০০) মানুষকে হত্যা করে। বাদশা তার সাথে যুদ্ধ করে। কিন্তু তার সাথে সৈন্যরা পেরে ওঠেনি। পরে বাদশাহ মু'তাসিম আফসিয়ান সর্দারকে তার সাথে যুদ্ধ করতে নির্দেশ দেয়। আফসিয়ান তাকে তার ভাইসহ ২২৩ হিজরিতে গ্রেফতার করে বাগদাদ অভিমুখে নিয়ে যায়। তখন তার ভাই তাকে বলেছিল, হে বাবক! তুমি এমন কাজ করেছ যা অন্য কেউ করতে পারেনি। এখন তোমাকে এমন ধৈর্যধারণ করতে হবে যা আর কেউ করেনি। বাবক বললে, হ্যাঁ, তুমি আমার ধৈর্যশক্তি পর্যবেক্ষণ করবে।

বাদশা মু'তাসিম তার হাত-পা কেটে ফেলতে নির্দেশ দিলে সে রক্ত দিয়ে তার মুখ রাঙিয়ে দেয়। তাকে এর কারণ জিজ্ঞেস করলে সে বলল, আমি চাই না আমার মুখ হলুদবর্ণ ধারণ করুক, যাতে কেউ ভাবতে পারে যে, বাবক মৃত্যুকে ভয় পেয়েছে। অতঃপর তার চার হাত-পা কর্তন করা হয়। গলা কাটা হয় এবং আগুনে পুড়িয়ে মারা হয়। তার ভাইয়ের ক্ষেত্রেও একই পরিণতি। এভাবে মারার পরও তাদের কারও মুখ দিয়ে কোনো প্রকার শব্দ বের হয়নি।

গ্রন্থকার বলেন, বাবকিয়াদের একটি গোত্র এখনও অবশিষ্ট রয়ে গেছে। তাদের মতবাদ হচ্ছে, বছরের একটি রাত তাদের আনন্দের জন্য নির্ধারিত। এ রাতে তারা নির্দিষ্ট একটি স্থানে নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সকলে সমবেত হয়ে মাঝ বরাবর বাতি জ্বালিয়ে দেয়। প্রত্যেক পুরুষ দৌড়ে এসে একজন নারী গ্রেফতার করে তার সাথে ব্যভিচার করে। এর তা'বীল তথা বানোয়াট ব্যাখ্যাস্বরূপ তারা বলে, ব্যভিচার নয়; এটি শিকার ভোগ করার মতো। কেননা শিকারকৃত বস্তু বৈধ।

৫. المحمرة। **মুহাম্মিরা :** এদেরকে এ নামে আখ্যায়িত করার কারণ হচ্ছে, বাবকের যুগ থেকে তারা লাল রঙে রাঙানো কাপড় পরিধান করে আসছে।

৬. القرامطة। **কারামিতা :** মুয়াখখিরীন তথা পরবর্তী ইতিহাসবিদদের মতে তাদের 'কারামিতা' নামকরনের নেপথ্যে দু'টি কারণ রয়েছে। যথা–

ক. খোরাসানের এক ব্যক্তি কুফার সাওয়াদ এলাকায় গিয়ে সেখানকার আবেদ ও যাহেদ তথা দুনিয়াবিমুখ ইবাদতকারী বনে যায়। সে মানুষজনকে আহলে বাইতের ইমামগণের দিকে ডাকতে থাকে। কারমাতিয়া নামক এক ব্যক্তি তার কাছে আসে। তাকে রাঙাচোখের কারণে কারমাতিয়া বলে সম্বোধন করা হতো। গ্রামাঞ্চলে তাকে এ নামেই ডাকা হয়। পরে ওই এলাকার সর্দার তাকে গ্রেফতার করে জেলখানা পাঠিয়ে জেলখানার তালার চাবি তার বালিশের নিচে রেখে দেয়। সর্দারের বাঁদি সদয় হয়ে চাবি নিয়ে জেলখানার তালা খুলে তাকে পালিয়ে যেতে সাহায্য করে। পরে সে জেলখানার তালা বন্ধ করে চাবি যথারীতি সর্দারের বালিশের নিচে রেখে দেয়। সকালে এই সংবাদ ছড়িয়ে পড়লে মানুষ অতি আবেগী হয়ে ফিতনায় পতিত হতে থাকে। উল্লেখিত ব্যক্তি সিরিয়ায় পৌঁছে যায়। সেখানকার আশ্রয়দাতাদের কাছে সে কারমাতিয়া নামে প্রসিদ্ধ হয়ে যায়। যাতে করে

কুফার সাওয়াদবাসীদের কাছে এ সংবাদ সহজে পৌছতে পারে। ধীরে ধীরে তার নাম কারমিতা হয়, এরপর কারামিতায় রূপ লাভ করে। শেষে তার বংশধর ও নিকটাত্মীয়রা ওখানে অবস্থান করতে থাকে।

খ. হামদান কারমাত নামীয় এক ব্যক্তির দিকে সম্পর্কিত করে কারামিতা সম্প্রদায়ের নামকরণ করা হয়। শুরুতে সে বাতেনিয়া সম্প্রদায়ের আহ্বানকারী ছিল। তার মতবাদ একটি দল মেনে নেয় এবং তাদেরকে কারামিতা নামে অভিহিত করা হয়। এ লোক শুরুতে বেশ দুনিয়াবিমুখ ও বৈরাগ্যের দিকে আকৃষ্ট ছিল, কিন্তু পাশাপাশি সে ছিল জাহেল তথা অজ্ঞ। বসবাস করত কুফা নগরীতে।

একবার তার পাশ দিয়ে বাতেনি সম্প্রদায়ের এক দায়ী একটি গ্রামের দিকে যাচ্ছিল, যার হাতে চিল একটি গরু। হামদান অপরিচিত এই লোককে দেখে বলল, আপনি কোথায় যাবেন? সে তার নির্দিষ্ট গ্রামের কথা বললে হামদান বলল, আমিও তো সেই গ্রামে যাব। আপনি গরুর পিঠে আরোহণ না করে পায়ে হেঁটে হেঁটে যাচ্ছেন কেন? বাতেনিয়া সম্প্রদায়ের দায়ী বলল, এ ব্যাপারে আমাকে নির্দেশ দেয়া হয়নি। হামদান জানতে চাইল, কে আপনাকে নির্দেশ দেয়নি? দায়ী বলল, যে আমার তোমার এবং সবার মালিক তিনি নির্দেশ দেননি। হামদান বলল, তিনি তো আল্লাহ রাব্বুল আলামীন। মিথ্যুক ও ধোঁকাবাজ বাতেনিয়া দায়ী জবাবে বলল, হ্যাঁ। তুমি সত্য বলেছ। হামদান বলল, যে গাঁয়ে আপনি যাচ্ছেন, সেখানে আপনার উদ্দেশ্য কী? দায়ী উত্তরে বলল, মানুষকে অজ্ঞতার অন্ধকার থেকে জ্ঞানের আলোর দিকে এবং পথভ্রষ্টতা থেকে হেদায়াতের দিকে আহ্বান করতে যাচ্ছি। তাদেরকে লাঞ্ছনা ও বঞ্চনা থেকে উদ্ধার করব। এমন সম্পদ দেবো যাতে তারা ধনী হয়ে যায়।

হামদান শুনে বলল, আল্লাহ আপনার মঙ্গল করুন। আমাকেও এই অন্ধকার থেকে আলোর পথে নিয়ে যাবেন এবং জ্ঞানদানে আমার প্রতি অনুগ্রহ করবেন। ধোঁকাবাজ দায়ী বলল, সবার কাছে রহস্যের উন্মোচন করতে আমাকে নির্দেশ দেয়া হয়নি। যতক্ষণ পর্যন্ত তার ওপর আস্থা রাখা না যাবে এবং তার কাছ থেকে শপথ নেয়া না হবে। হামদান বলল, আপনি আপনার অঙ্গীকারের কথা উল্লেখ করুন। আমি মনেপ্রাণে তা ধারণ করব। দায়ী বলল, তুমি আমার জন্য এবং এ সময়কার ইমামের জন্য স্বীয় প্রাণের ওপর আল্লাহ তায়ালার ওয়াদা ও প্রতিজ্ঞা ধারণ করো, তাহলে ইমামের যে রহস্য

আমি তোমার কাছে প্রকাশ করব, তা কাউকে বলতে পারবে না। আমার রহস্যের কথাও কাউকে বলতে পারবে না। হামদার সে মতেই প্রতিজ্ঞা করল। পরে দায়ী তাকে ভ্রান্ত শাস্ত্র শিক্ষা দিতে থাকে। এভাবে তাকে সঠিক পথ থেকে বিচ্যুত করে ফেলে। অবশেষে এই হামদানই একসময় ভ্রান্ত ও ভ্রষ্ট পথের একজন জাহেল নেতা বনে যায় এবং বিদয়াতের নিত্যনতুন উপাদান আবিষ্কার করতে থাকে। তার অনুসারীদেরকে কারামতিয়া বা কারামিতা বলে আখ্যায়িত করা হয়।

পরে তার বংশধর ও উত্তরসূরিরা এই ভ্রান্ত আকিদাকে আরও এগিয়ে নিয়ে যেতে থাকে। তাদের মধ্যে আবু সাঈদ কারমাতী নামের একজন পাষণ্ড ধোঁকাবাজ যোদ্ধা ২৮৬ হিজরিতে আত্মপ্রকাশ করে। সে বিপুল প্রতিপত্তি লাভ করতে থাকে। অসংখ্য মানুষকে সে হত্যা করেছে। বহু মসজিদ গুঁড়িয়ে দিয়েছে। শত শত কুরআন মাজিদ পুড়িয়ে দিয়েছে। হাজীদের বহু কাফেলায় সে লুটতরাজ করেছে। নিজের অনুসারীদের জন্য নিত্যনতুন পন্থা আবিষ্কার করতে থাকে এবং অগণিত অসম্ভব ও উদ্ভট কথা ছড়িয়ে দিতে থাকে। আবু সাঈদ মারা গেলে শয়তান তার কবরকে নিয়ে আরও নানা ধরনের বিদয়াত মানুষের মনে ছড়িয়ে দিতে থাকে। লোকেরা আবু সাঈদের নাম শুনে দরুদ পাঠ করত। কিন্তু রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নাম শুনলে দরুদ পড়ত না। ধৃষ্টতা দেখিয়ে বলত, আমরা আবু সাঈদের রিযিক ভক্ষণ করি, সুতরাং আবুল কাসেম (মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর ওপর দরুদ পড়ব কেন? আবু সাঈদের পর আবু তাহের তার স্থলাভিষিক্ত হয়। সেও পিতার মতো দুষ্কর্মে মনোযোগী হতে থাকে। এমনকি অতর্কিতে সে পবিত্র কাবায় আক্রমণ করে বসে। সেখানে যা কিছু পেয়েছে সব লুট করে নিয়েছে। হাজরে আসওয়াদ কাবার পাশ থেকে তুলে তার এলাকায় নিয়ে গিয়েছে। মানুষের মনে সে আল্লাহ হিসেবে প্রতিষ্ঠা পেতে চেয়েছে। (নাউযুবিল্লাহ)

৭. الخرمية। **(খুররমিয়া)** : খুররম অনারবি শব্দ। এর অর্থ মজাদার আনন্দ ও প্রশান্তিদায়ক বস্তু; যার প্রতি মানুষ আকৃষ্ট থাকে। এ নামের উদ্দেশ্য হচ্ছে, যাতে মানুষ সকল প্রকার ভোগ-বিলাস যেভাবে চায় সেভাবে অর্জন করতে পারে। শরিয়তে যে-সকল বিষয় মানুষের জন্য নিষিদ্ধ হিসেবে নির্ধারণ করা হয়েছে, তারা তা অগ্রাহ্য করে বৈধতা দিতে থাকে নির্দ্বিধায়। এ জন্য বাতেনিয়াদের এই সম্প্রদায়কে খুররমিয়া নামে অভিহিত করা হয়।

৮. التعليمية (তালীমিয়া) : এই উপাধিতে তাদের ভূষিত করার কারণ হচ্ছে, এই সম্প্রদায়ের মৌলিক উৎস হচ্ছে, বিবেক-বুদ্ধি দিয়ে কোনো কাজ করা যাবে না। যা কিছু তাদের নিষ্পাপ ইমাম বলবেন, বিনা বাক্যব্যয়ে তা মেনে নিতে হবে। তার শিক্ষার প্রতি মানুষকে দাওয়াত দিতে হবে। তার তালীম ব্যতীত জ্ঞানার্জন হবে না।

বাতেনিয়া সম্প্রদায় উদ্ভাবন ও এতে অংশগ্রহণের নেপথ্যে

গ্রন্থকার বলেন, বাতেনিয়া সম্প্রদায়ের লোকেরা শুরুতে দীন ও শরিয়ত থেকে বিচ্যুত হবার লক্ষ্যে অগ্নিপূজারি, সানাবিয়া ও গ্রীক দার্শনিকদের সাথে একত্র হয়ে পরামর্শ করতে থাকে। যাতে তারা এমন দুশ্চিন্তা থেকে মুক্ত হতে পারে, যা ইসলামধর্মে থাকার কারণে তাদের ওপর পতিত হয়েছে। কেননা ইসলামধর্মের অনুসারীরা অকাট্য যুক্তি-প্রমাণের ভিত্তিতে সৃষ্টিকর্তা, রিসালাত ও আখিরাতকে অস্বীকারের ব্যাপারে এসব কুলাঙ্গারের মুখ বন্ধ করে দিয়েছে। এই পথভ্রষ্টরা দেখল, নবুয়ত ও শরিয়তে মুহাম্মদির আওয়াজ পৃথিবীর আনাচে-কানাচে ছড়িয়ে পড়েছে। এরা কিছুতেই প্রকৃত মুসলমানদের কাবু করতে না পেরে নামধারী মুসলমানদের মধ্য থেকে এমন একটি দল বেছে নিল, যাদের বিবেক-বুদ্ধিতে, মতামতের ক্ষেত্রে বোধশক্তিহীনতা এবং অসম্ভব বিষয়কে মেনে নেয়া ও মিথ্যা কথা গ্রহণ করার মানসিকতা বিদ্যমান। এক্ষেত্রে তারা রাফেযি মাযহাবের অনুসারীদের বেছে নিল। তারা ফন্দি আঁটতে থাকে যে, বাহ্যিকভাবে এরা রাফেযি থাকবে, যাতে সাধারণ হত্যার আওতায় পড়তে না হয়। এভাবে তারা রাফেযি সম্প্রদায়ের পদলেহন করতে থাকে। রাফেযিদের কাউকে কুরআন পড়তে দেখলে তারা বলে, প্রকাশ্য শব্দাবলির ব্যাপারে ধোঁকা খেয়ো না। এর অন্তর্নিহিত রহস্য আসল। রাফেযিরা এদের কথায় আরও পথভ্রষ্ট হতে থাকে। কারণ বাতেনিয়া মতানুসারীরা এমন একজন নেতা বানিয়েছে, যে আহলে বাইতের সদস্য বলে নিজেকে প্রচার করে বেড়ায়। রাফেযিরা দলে দলে তার দলে ভিড়তে থাকে। সব উম্মত ওই নেতার অনুসরণ করাকে তারা ওয়াজিব হিসেবে বিবেচনা করে। তারা আরও দাবি করে, নবীদের মতো তাকেও নিষ্পাপ করা হয়েছে।

এ সব বিষয় দ্বারা এই ভ্রান্ত সম্প্রদায়ের উদ্দেশ্য হচ্ছে, মানুষের সম্পদ ও দেশের ওপর তাদের রাজত্ব কায়েম করা। সমকালীন মুসলমানদের সাথে

তাদের বাপ-দাদা হত্যার প্রতিশোধ হিসেবে যুদ্ধ করতে তারা ফন্দি আঁটতে থাকে। এটাই থাকে তাদের লক্ষ্যের আদি-অন্ত।

গ্রন্থকার বলেন, মানুষকে তাদের প্রতারণার জালে আটকাতে বাতেনিয়ারা বিভিন্ন হিলা-বাহানায় কোমর বেঁধে নামে। এভাবে তারা সদস্য সংগ্রহ অভিযান চালায়। যারা তাদের দলে ভিড়ে প্রথমে তাদের অভ্যাস-প্রকৃতি ভালোভাবে দেখে নেয়। যদি তার ভেতর ইবাদতের মানসিকতা ও দুনিয়াবিরাগী মানসিকতা দেখে, তাহলে তাকে আমানত রক্ষা ও সত্যবাদিতা অক্ষয়ের নিমিত্তে যৌন সংসর্গ ত্যাগ করার আহ্বান জানায়। অন্যদিকে যাকে বিবাহিত এবং যৌনতার দিকে ধাবিত দেখে, তাকে বলে ইবাদত অর্থহীন এবং তাকওয়া অসার। এর কোনো দাম নেই। এটা আহমকের কাজ। নিজেকে জাগতিক তৃপ্তিদায়ক বস্তু থেকে বিরত রাখার কোনো কারণ নেই। এভাবে যে যেমন মাযহাব লালন করে, তাকে সেই মাযহাবের অসারতা ও অনর্থকতার যুক্তি দিতে থাকে। এ ভ্রান্ত দলে নতুন যোগদানকারী মূর্খরা ভাবতে থাকে, হায়! আমরা এতদিন অন্ধকারে ছিলাম। নতুন সম্প্রদায়ের সন্ধান পেয়ে তারা খুশিতে উদ্বেল হয়ে যায়। নতুন যোগদানকারীরা হয়তো পাষাণ মনের অধিকারী হতো, নচেৎ প্রাক্তন ইরানী রাজা বা অগ্নিপূজারিদের বংশধর হতো। যাদের বাপ-দাদার রাজত্ব ইসলামের কারণে ছিনিয়ে নেয়া হয়েছিল। আরেক দল আগন্তুকের মনোবাসনা ছিল, কী করে একটি শহর বা প্রদেশের ওপর নিজের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করা যায়। কিন্তু যুগ ও সুযোগ তার অনুকূলে না থাকার কারণে সে সেই আকাঙ্ক্ষিত কর্তৃত্ব স্থাপন করতে পারছিল না। এরা বাতেনিদের সাথে স্বীয় ধন-সম্পদ ও প্রভাব-প্রতিপত্তি দিয়ে সহায়তা করার ব্যাপারে অঙ্গীকারবদ্ধ হয়। কেউ কেউ সাধারণ মানুষের কাছে নিজের মান-মর্যাদা বাড়াবার মনোবাসনা বাতেনিয়া সম্প্রদায়ে প্রবেশ করতে থাকে। তারা ভাবতে থাকে সময়ের পট পরিবর্তনে এদের সাথে যোগ দেয়া শ্রেয়। রাফেযি সম্প্রদায়ের যে-সব কুলাঙ্গার সাহাবায়ে কেরামকে গালি দেয়া ইবাদত বলে মনে করে তারাও সদলবলে বাতেনিয়া সম্প্রদায় যোগদান করতে থাকে। গ্রীক দর্শনে প্রভাবিত বা সানাবিয়ারাও এ দলে ভিড় করে। এভাবে যাদের কাছে শরিয়তের নিয়ম-নীতি কঠিন মনে হয় এবং অশ্লীলতা ও ব্যভিচারী কার্যকলাপ ভালো লাগে, তারা বাতেনিয়াদের ধোঁকার জালে আটকা পড়ে।

কুলাঙ্গার বাতেনিয়াদের কিছু ভ্রান্ত বিশ্বাসের বিবরণ

শায়খ আবু হামেদ তুসি বলেন, বাতেনিয়া এমন একটি দল, যারা মুখে ইসলামের দাবি করলেও তাদের বিশ্বাস ও কর্মকাণ্ড সম্পূর্ণ ইসলামবিরোধী ও সাংঘর্ষিক। প্রকাশ্যে তারা রাফেযিদের সাদৃশ্য গ্রহণ করে। এদের বিশ্বাস হচ্ছে, আদি সৃষ্টিকর্তা দু'জন। কালের বিবেচনায় তাদের অস্তিত্বের কোনো শুরু নেই। তথাপি একটির অস্তিত্বের জন্য আরেকটির অস্তিত্ব আবশ্যক। তারা বলে থাকে, যে সৃষ্টিকর্তা প্রাচীন তাকে আছে বলা যাবে না আবার নেইও বলা যাবে না। উপস্থিত বলা যাবে না, অনুপস্থিতও বলা যাবে না। জ্ঞাত বলা যাবে না, অজ্ঞাতও বলা যাবে না। গুণী বলা যাবে না, গুণহীনও বলা যাবে না। এই প্রাচীন সৃষ্টিকর্তা থেকেই আরেক সৃষ্টিকর্তার সৃষ্টি হয়েছে। এটাই সর্বপ্রথম অস্তিত্বশীল, পরে সামগ্রিক সত্তা অস্তিত্বশীল হয়েছে।

তাদের মতে, নবী এমন একজন ব্যক্তি, যার ওপর প্রথম খোদার কাছ থেকে দ্বিতীয় খোদার মাধ্যমে পূতঃপবিত্র শক্তির সমাবেশ ঘটেছে। তারা আরও বলে, জিবরাঈল ওই আকলকে বলে, যা নবীর ওপর অবতীর্ণ হয়েছে। তার কোনো সত্তা নেই। এরা আরও দাবি করে বেড়ায়, প্রতি যুগেই নবীর মতো নিষ্পাপ একজন ইমাম থাকেন, যিনি সত্যের ওপর অটল থাকেন। তিনি প্রকাশ্য সবকিছুর ব্যাখ্যা জানেন। তাদের ভ্রান্ত আকিদার অন্যতম হচ্ছে, আখিরাত ও কিয়ামত বলতে কিছু নেই। বরং 'মায়াদ' তথা শেষ প্রত্যাবর্তন মানে, কোনো বস্তু তার উৎসমূলে ফিরে আসা। অনুরূপভাবে মানুষের সত্তাও তার উৎসমূলে ফিরে আসে।

শরিয়ত সম্পর্কে তাদের দৃষ্টিভঙ্গি হচ্ছে, সাধারণত সকল কিছুই 'মুবাহ' ও বৈধ। যে-সব বিষয়কে হারাম বলে সাব্যস্ত করা হয় সেগুলোও বৈধ। কিন্তু তারা সুযোগ বুঝে একথা আবার অস্বীকার করে বসে। বলে, আমাদের ভাষ্যমতে, মানুষের জন্য তার উপযুক্ত হওয়া জরুরি। কিন্তু তারা যখন বস্তুর রহস্য সম্পর্কে অবগতি লাভ করবে এবং কুরআন-হাদিসের বাতেনি তথা অন্তর্নিহিত অর্থ সম্পর্কে ওয়াকিফহাল হবে, তখন তার ওপর শরিয়তের কোনো কিছুই আরোপ করা যাবে না।

এরা যেহেতু কুরআন-হাদিসের কোনো দলিল-প্রমাণ মানতে রাজি নয়, তাই যাচ্ছেতাই মতবাদ সৃজন করার স্পর্ধা তাদের বেড়ে যেতে থাকে। কিন্তু শুরুতে তারা তা অস্বীকার করেনি, কেননা তখন সাধারণ মানুষ তাদের

থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়ার আশঙ্কা ছিল। তারা বলে থাকে, 'জানাবাত'—যা দ্বারা গোসল ওয়াজিব হয়, তার মানে হচ্ছে, গ্রহণকারী তার রহস্য প্রকাশ করবে। গোসল দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে নতুনভাবে পাপ থেকে তাওবা করে অঙ্গীকার করা। ব্যভিচারের অর্থ হচ্ছে ইলমে বাতেনের বীর্য এমন ব্যক্তির পেটে নিক্ষেপ করা যার কাছ থেকে অঙ্গীকার নেয়া হয়েছে। রোযার অর্থ হচ্ছে রহস্য উন্মোচন থেকে বিরত থাকা। কা'বা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, তার দরজা হচ্ছেন আলী রা.। তুফান দ্বারা ইলমের তুফান উদ্দেশ্য, যাদেরকে সন্দেহে পতিত হওয়ার কারণে ডোবানো হয়েছে। 'সাফীনা' তথা জাহাজ এমন মরুভূমিকে বলা হয় যেখানে হজরত নুহ আলাইহিস সালাম তাঁর আহ্বানে সাড়াদানকারীদেরকে আটকে রেখেছিলেন। ইবরাহিম আলাইহিস সালাম এর আগুন দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে নমরূদের ক্রোধের আগুন। সেখানে প্রকৃত আগুন বোঝানো হয়নি। ইসহাক আলাইহিস সালাম-কে জবাই করার মানে হচ্ছে তার কাছ থেকে নতুন অঙ্গীকার নেয়া হয়েছিল। মুসা আলাইহিস সালাম এর লাঠি দ্বারা তার যুক্তি-প্রমাণ বোঝানো হয়েছে। ইয়াজুয-মাজুয বলা হয় প্রকাশ্যে বিশ্বাসী ওলামায়ে কেরামকে।

স্মর্তব্য, আবু মুহাম্মাদ ছাড়া অন্যরা বর্ণনা করেছেন, বাতেনিয়ারা বলে থাকে, সৃষ্টিকর্তা যখন আত্মাসমূহ সৃষ্টি করেছিলেন, তখন তিনি নিজেও সেখানে তাঁর আসল আকৃতিতে দৃশ্যমান হন। তখন এ ব্যাপারে কেউই সন্দেহ করেনি যে, ইনি আমাদের থেকে ভিন্ন কেউ। সর্বপ্রথম সালমান ফারেসী রা., মিকদাদ রা. ও আবু যর রা. তাঁকে চিনতে পারেন। সর্বপ্রথম তাকে ওমর রা. অস্বীকার করেছেন। তখন তার নাম হয় ইবলিস। (নাউযুবিল্লাহ)

এ ধরনের অসংখ্য ভ্রান্ত ও ভ্রষ্ট আকিদা-বিশ্বাস পোষণ করে থাকে এই কুলাঙ্গার বাতেনিয়ারা। এখানে বিস্তারিত উল্লেখ করে মূল্যবান সময় বিনষ্টের কোনো মানে হয় না। এরা যুক্তি-প্রমাণ ছেড়ে কোনো সন্দেহেও অটল থাকতে পারেনি, যাতে করে তাদের সাথে আলোচনা করার অবকাশ মিলতে পারে। হঠাৎ যদি তাদের সাথে কোথাও সাক্ষাৎ ঘটে, তখন তাদেরকে এসব বিষয় ও বিশ্বাস কোথায় পেয়েছে মর্মে কিছু জিজ্ঞেস করলে, এটা কি কোথাও দেখে পেয়েছে? নাকি কিছু অবলোকনের দ্বারা? নাকি কোনো মাসুম ইমাম বলেছে? যদি বলে, আমরা অন্যদের দেখে পেয়েছি, তাহলে তা বাতিল বলে গণ্য হবে। কেননা সুস্থ বিবেকসম্পন্ন

লোকেরা এমন আকিদা-বিশ্বাস পোষণ করতে পারেন না। তোমরা যদি নিজেদের মনগড়া হিসেবে এটাকে প্রকাশ্য বলে ভেবে থাকো তবে তা তোমাদের ব্যাপার। অন্যদিকে যদি বলো, অবলোকনের মাধ্যমে আমরা তা পেয়েছি, তবে তা তো তোমরা গোড়াতেই অস্বীকার করে থাকো। যদি বলো, এটা আমাদের নিষ্পাপ ইমাম বলেছেন। তাহলে বলো, কেন তোমরা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মত ও পথ ছেড়ে দিলে? যা মুজিযা ও ঐশী প্রমাণাদি দ্বারা সাব্যস্ত। এর বিপরীতে নিজেদের ইমামের কথা আকড়ে ধরলে কেন? যার নেই কোনো মুজিযা ও ঐশী প্রমাণ। এরপর তাদের বলা হবে, এই বাতেন ও রহস্য—যার দাবি তোমরা করে বেড়াও, এটাকে গোপন রাখা আবশ্যক নাকি প্রকাশ করা? যদি বলো, প্রকাশ করা আবশ্যক, তখন বলা হবে, তাহলে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কেন সেগুলো গোপন রাখলেন? আর যদি বলো গোপন রাখা আবশ্যক, তখন বলা হবে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ওপর যা গোপন রাখা আবশ্যক ছিল, তা তোমাদের জন্য প্রকাশ করা কী করে বৈধ হলো?

ইবনে আকিল রহ. বলেন, ইসলামে বাতেনিয়া ও জাহেরিয়া নামীয় উভয় সম্প্রদায় অসংখ্য ভ্রান্ত মতের আবিষ্কার করে। বাতেনিয়ারা ইসলামের লেবাস ধরে শরিয়ত ছেড়ে দিতে থাকে। নিজেদের ভ্রান্ত বাতেনী ব্যাখ্যার দাবি করে, যার কোনো দলিল নেই। এমনকি এরা শরিয়তের এমন কোনো বিষয় অবশিষ্ট রাখেনি, যার ভ্রান্ত ও মনগড়া ব্যাখ্যা তারা করেনি। এমনকি ওয়াজিব ও হারাম তথা আবশ্যক ও অবৈধ বলে তারা কিছুই আর অবশিষ্ট রাখল না।

এদিকে জাহেরিয়া গোষ্ঠী সর্বত্র কেবল প্রকাশ্য অর্থকেই গ্রহণ করতে থাকে। স্পর্শযোগ্য বিষয় দ্বারা তারা যা কিছু বুঝত তা-ই মান্য করত। উভয় দলই প্রকৃত ধর্মের বহুদূরে অবস্থান করতে থাকে। এদের কোনো ধর্মীয় গুরুর সাথে যদি কখনো আমার সাক্ষাৎ হতো, তাহলে তাদের সাথে ইলমী পন্থায় কথোপকথন না বলে কেবল তাদের বিবেক-বোধকেই তিরস্কার করতাম। উদাহরণস্বরূপ এমন বলতাম—দেখো, তোমরা বলে বেড়াও—রাজা-বাদশাদের জন্য বিশেষ বিশেষ পন্থা ও তদবির রয়েছে যাতে তারা তাদের অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছতে সক্ষম হয়। এমন করে তাদেরকে আশার পিদিম দেখাচ্ছ। এটা তোমাদের মারাত্মক মূর্খতা। জেনে নাও! ইসলাম এমন এক আলোকিত ধর্ম যার দ্যুতি ছড়িয়ে পড়েছে বিশ্বময়। এদের নাম নিয়েই

তোমরা শক্তি সঞ্চয় করে থাকো। নিজেদের অজ্ঞতা ও ধৃষ্টতার বলে ইসলামকে তোমরা বিগড়ে দিতে চাচ্ছ। অথচ ইসলামকেই আল্লাহ তায়ালা পরিপূর্ণ বিজয় দান করেছেন। প্রতি বছর আরাফার ময়দানের তাদের সর্বোচ্চ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। প্রতিদিন সহস্র মিনার থেকে أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله ধ্বনি ভেসে ওঠে।

পক্ষান্তরে তোমাদের অবস্থা খুবই সংকটাপন্ন। তোমাদের কর্মপরিধি কেবল কোনো গোত্রে নিজেদের মনগড়া কিছু মতবাদ প্রচার করে সেখানকার নেতা বনে যাওয়া। তোমাদের মৃত অন্তর বিপরীতধর্মী কিছু করতে চেষ্টা করলে তোমাদের হত্যা করে দেয়া হয় এবং কুকুরের মতো ব্যবহার করা হয়। তারপরও কী করে তোমরা বিজয়ের ব্যাপারে আশাবাদী হও? আমি তোমাদের থেকে অজ্ঞ আর কাউকে দেখি না। তাদের সাথে যদি যুক্তিপূর্ণ আলোচনার কোনো সুযোগ হতো, তাহলে এভাবেই বিতর্ক করতাম।

গ্রন্থকার আল্লামা ইবনুল জাওযি রহ. বলেন, পূর্বেকার বাতেনিয়াদের নানাবিধ ফাসাদের বিস্ফোরণ ঘটলে ৪৯৪ হিজরিতে সুলতান বুরকিয়ারুক বহু মানুষকে হত্যা করে। যাদের মধ্যে তিনশত বাতেনিয়া অনুসারী ছিল। তাদের সম্পত্তি লুট করে নেয়া হলে দেখা যায় সেখাতে তাদের সত্তরটি ঘরজুড়ে মুক্তোর ছড়াছড়ি। এ ব্যাপারে খলিফার কাছে লেখা হলে, তিনি বলেন, যাকেই বাতেনি মতদর্শের অনুসারী বলে সন্দেহ তবে তাকেই গ্রেফতার করবে।

এভাবে তারা গ্রেফতার হতে লাগল। মুক্তির ব্যাপারে তখন তারা কোনো সুপারিশ খুঁজে পাচ্ছিল না। কেননা সুপারিশকারীকেও একই মতাদর্শী হিসেবে সন্দেহ করা হতে পারে। সাধারণ মানুষ যাদেরকেই সন্দেহ করত তাদেরকেই ধরিয়ে দিত। তৎক্ষণাৎ তাদের হত্যা করা হতো এবং তার ঘর-বাড়ি লুট করে নেয়া হতো।

বহু যিন্দীক ও নাস্তিক—যারা মনে মনে ইসলামের সাথে শত্রুতা পোষণ করত, তারা ইসলাম থেকে বের হয়ে বাতেনি সম্প্রদায়ে যোগ দিয়েছিল এবং এতে তারা প্রচুর বাড়াবাড়ি করতে থাকে। যাদেরকে সামনে পেত, তাদেরকেই অনর্থক ও অযৌক্তিকভাবে এ ভ্রান্ত মতবাদের দাওয়াত দিত। তাদের উদ্দেশ্য ছিল, দীন ইসলামের গণ্ডি থেকে তাকে বের করে আনা। তারা ব্যভিচার, পাপাচারকে বৈধতা দিতে থাকে। তাদের একজন ছিল বাবুক খুররমী। এমন কোনো হীন ও নিকৃষ্ট কাজ নেই; যা সে করেনি। বহু

মানুষকে সে হত্যা করেছে এবং কষ্ট দিয়েছে। এছাড়া কারমাতি ও যঞ্জির মতো বাতেনি নেতারা বহু গোলামকে ফুসলিয়ে রাজত্ব দেয়ার প্রতিশ্রুতি দেয়। পরে তারা বসরাসহ অন্যান্য অঞ্চলে অসংখ্য লুটতরাজ করতে থাকে। এভাবে তারা দুনিয়া-আখিরাত ধ্বংস করে। যেমন ইবনে রাবেন্দী ও মুয়াররা ছিলেন।

আবুল কাসেম আলী ইবনে হোসাইন আত্তানুখী তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন, ইবনে রাবেন্দী শুরুতে রাফেযি ও মুলহিদদের কর্মচারী ছিলেন। এ ব্যাপারে মানুষ তাকে তিরস্কার করলে সে বলত, আমার উদ্দেশ্য হচ্ছে, এই সুযোগে তাদের মতবাদ সম্পর্কে অবগত হওয়া। এরপর তা খণ্ডন করে বিতর্ক মুনাযারা করব।

গ্রন্থকার বলেন, যে ব্যক্তি ইবনে রাবেন্দীর অবস্থা গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করেছে, সে নিশ্চয় জেনে থাকবে যে, এই লোক মস্ত বড় মুরতাদ ছিল। 'দামেগ' নামীয় একটি গ্রন্থ সে লিখেছে। সে এর মাধ্যমে ইসলামি শরিয়তকে কলঙ্কিত করতে চেয়েছিল। কিন্তু আল্লাহ তায়ালার মহান সত্তা পরম পবিত্র। তিনি তাকে উচিত শিক্ষা দিয়েছেন। এই কুলাঙ্গার কুরআনের ওপর অভিযোগ উত্থাপন করার ধৃষ্টতা দেখিয়েছে এবং তা সুসাহিত্যসম্পন্ন না হওয়ার দাবি করেছে। অথচ নিশ্চিতভাবে এ কথা প্রমাণিত যে, আরবের বড় বড় পণ্ডিত ও সাহিত্যিকরা কুরআন শুনে বিস্ময়াভূত হয়ে যেতেন। সেক্ষেত্রে একজন অনারব অপদার্থের আবার কী মূল্যায়ন থাকতে পারে?

এদিকে আবুল আলা আলমুয়াররা (যে রাফেযি দেলমীর বিখ্যাত কবি হিসেবে পরিচিত) তার কবিতার মাধ্যমে প্রকাশ্য নাস্তিকতা দেখিয়েছে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে শত্রুতার ক্ষেত্রে সে চরম অত্যুক্তি ও ধৃষ্টতা দেখিয়েছে। জীবনের পড়ন্ত বেলায় সে বেশ অপদস্থ ও লাঞ্ছনার শিকার হয়। কখনো নিজের ভুল বুঝতে পারে, আবার কখনো আম্বিয়া আলাইহিস সালামদেরকে অভিযুক্ত করতে থাকে। মোটকথা, সে উন্মাদের মতো আচরণ করতে থাকে এবং প্রতি মুহূর্তে খুন হওয়ার ভয়ে ভীতসন্ত্রস্তভাবে জীবন কাটাতে বাধ্য হয়। অবশেষে এ আশঙ্কাতেই সে কুপোকাত হয়।

এদের বংশধররা সব যুগেই তৎপর ছিল। কিন্তু তাদের ক্ষীণ শলাকা জ্বলার পূর্বে নিভে যায়। এখন তাদেরকে আর প্রকাশ্যে দেখা যায় না। গোপনে কেউ কেউ বাতেনিয়া মতবাদ পোষণ করে কিংবা গ্রীক দর্শনের প্রভাবে

পদচ্যুত হতে থাকে। পরিণতিতে এরা কঠিন দুর্দশায় ভুগতে থাকে। আমি এই সম্প্রদায়দ্বয়ের বিস্তারিত হাল-হাকিকত 'আলমুনতাযাম ফী তারীখিল মুলূক ওয়াল উমাম' গ্রন্থে আলোকপাত করেছি। সুতরাং এখানে সে আলোচনা আর দীর্ঘায়িত করলাম না।

ষষ্ঠ অধ্যায়

ইলমী বিষয়ে আলেমদের ওপর শয়তানের চক্রান্ত

গ্রন্থকার বলেন, বহু কূট-কৌশল খাটিয়ে শয়তান আলেমদের কাছে আসে। তার কিছু স্পষ্ট হলেও বহু বিষয় এমন রয়েছে যা অস্পষ্ট। তবে শয়তান আলেমদের ওপর তখনই তার প্রভাব বিস্তার করতে পারে, যখন তারা মনমতো প্রবৃত্তির চাহিদার অনুগামী হয়। এখানে আমি শয়তানের কিছু সূক্ষ্ম প্রতারণা, প্ররোচনা, ফাঁদ-ফন্দি ও ধোঁকার বিষয়ে ইঙ্গিত প্রদান করছি। এগুলো দ্বারা অন্যান্য ধোঁকা সম্পর্কেও ধারণা লাভ করা যাবে। সকল প্রকার শয়তানী চক্রান্তের কথা এখানে উল্লেখ করা দুষ্কর। আল্লাহ আমাদের ক্ষমাকারী ও হেফাজতকারী।

কারীদের ওপর শয়তানের চক্রান্ত

কারীদের ওপর শয়তানের চক্রান্তসমূহের একটি হচ্ছে 'শায' তথা অপ্রচলিত কেরাত পাঠ ও তা অর্জনের চেষ্টায় ব্যস্ত রাখা। ফলে তা সংগ্রহ করা, সংকলন করা ও তার পঠন-পাঠনে তাদের জীবনের অধিকাংশ সময় অতিবাহিত হয়ে যায়। আর এসব নিয়ে ব্যস্ত থাকার দরুন শরিয়তের ফরয-ওয়াজিবের জ্ঞানলাভ থেকে তারা বঞ্চিত হন। মসজিদের কিছু ইমামকে আমি দেখেছি, তারা মানুষকে কেরাত শিক্ষাদানের উদ্যোগ নেন; অথচ নামায নষ্ট হওয়ার কারণসমূহ কী কী—তা তারা জানেন না। অধিকাংশ ক্ষেত্রে নেতৃত্বদানের প্রবণতা তাদেরকে জ্ঞানলাভ থেকে বিরত রাখে, ফলে শরিয়তের বিধি-বিধান অজানা থাকা সত্ত্বেও আলেমদের শরণাপন্ন হয়ে তাদের থেকে জ্ঞানার্জনের প্রয়োজন তারা অনুভব করেন না। তারা যদি চিন্তা করতেন তাহলে বুঝতেন যে, কুরআন নাযিলের উদ্দেশ্য হচ্ছে তা বিশুদ্ধ উচ্চারণে তেলাওয়াত করা, তার আয়াতসমূহ মুখস্থ করা, আয়াতের মর্ম বুঝে তদনুযায়ী আমল করা, তারপর আত্মার পরিশুদ্ধি ও চরিত্র কলুষমুক্ত করার প্রতি মনোনিবেশ করা, অতঃপর শরিয়তের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াবলির জ্ঞানার্জনে ব্যস্ত হওয়া। এমন কাজে সময় ব্যয় করা যা গুরুত্বপূর্ণ নয়, এটাও ক্ষতির একটি মন্দ দিক।

হাসান বসরি রহ. বলেন, কুরআন নাযিল করা হয়েছে যেন তার বিধি-বিধান জেনে মানুষ আমল করে। কিন্তু মানুষ কুরআনের তেলাওয়াতকেই আমল হিসেবে গ্রহণ করেছে; অর্থাৎ তারা শুধু তেলাওয়াত নিয়েই ব্যস্ত থাকে, আমলের প্রতি মনোনিবেশ করে না।

কারীদের ওপর শয়তানের চক্রান্তসমূহের একটি হচ্ছে, তারা মেহরাবে উপবেশন করে অপ্রচলিত কেরাত পাঠ করে, আর মুতাওয়াতির তথা বিশুদ্ধ সূত্রে প্রাপ্ত প্রচলিত পরম্পরা ও প্রসিদ্ধ কেরাত পরিহার করে। অথচ ওলামাদের বিশুদ্ধ মতানুসারে এসব অপ্রচলিত তেলাওয়াত দ্বারা নামায শুদ্ধ হবে না। এসব অপ্রচলিত তেলাওয়াত মানুষকে শোনানোর উদ্দেশ্য হলো, মানুষের প্রশংসা লাভ করা এবং মানুষকে তার প্রতি আকৃষ্ট করা। অথচ অজ্ঞতাবশত সে ধারণা করে যে, আমি কুরআন তেলাওয়াতে ব্যস্ত। অনেক কারী এমন আছেন, যারা বিভিন্ন কেরাতকে একত্র করে বলেন, ملك مالك ملاك । অথচ এভাবে তেলাওয়াত করা জায়েজ নয়। কেননা এতে কুরআনের শব্দ প্রবাহ ও স্বাভাবিক বিন্যাসে বিচ্যুতি ঘটে।

কিছু কিছু কারীকে দেখা যায়, যারা সিজদার আয়াতসমূহ, তাহলীল ও তাকবীরের আয়াতসমূহ একত্রে তেলাওয়াত করেন, অথচ এটা মাকরুহ। আবার কারও অবস্থা এমন, যারা কুরআন খতমের উদ্দেশ্যে আলোকসজ্জা করেন—যা অপচয়। এতে সম্পদ নষ্ট হয়, অগ্নিপূজকদের সাদৃশ্য অবলম্বন এবং রাতে নারী-পুরুষের একত্রে সমবেত হওয়ার গুনাহসহ তারা বিভিন্ন গুনাহের সমাবেশ ঘটান। আর ইবলিস তাদেরকে ধারণা দেয় যে, এর মাধ্যমে ইসলামের মর্যাদা সমুন্নত হয়। অথচ এটা শয়তানের একটি মারাত্মক ধোঁকা। কেননা শরিয়াসিদ্ধ ব্যবস্থাপনাতেই ইসলামের মর্যাদা উড্ডীন হতে পারে। ভিন্ন ব্যবস্থাপনায় নয়। অনেক কারী এমনও আছেন যারা অধিক তেলাওয়াতের প্রতিযোগিতা করেন।

গ্রন্থকার আল্লামা ইবনুল জাওযি বলেন, আমি কারীদের কয়েকজন শায়খকে দেখেছি, তারা মানুষকে একত্র করে কুরআন খতমের জন্য এক ব্যক্তিকে দাঁড় করান। তিনি দাঁড়িয়ে দিনে তিনবার কুরআন খতম করেন। যদি দিনে তিন খতম তেলাওয়াত করতে অক্ষম হন তাহলে তাকে ভর্ৎসনা করা হয়, আর যদি তিন খতম পূর্ণ করেন তাহলে তার প্রশংসা করেন। আর ইবলিসও তাদের মনে এ ধারণা বদ্ধমূল করে যে, তেলাওয়াত যত বেশি হবে সাওয়াবের পরিমাণ ততই বৃদ্ধি পাবে। এসব কারীদের জেনে রাখা উচিত, তারা যা করছে তা ইবলিসেরই চক্রান্ত। কেননা কুরআন তেলাওয়াত আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের উদ্দেশ্যেই হওয়া উচিত, মানুষের প্রশংসা লাভের উদ্দেশ্যে নয়। তেলাওয়াত ধীরস্থিরভাবে করা উচিত, কেননা আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেছেন,

لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ

'কুরআন আমি নাযিল করেছি কিছু কিছু করে, যেন তুমি তা মানুষের কাছে পাঠ করতে পার ধীরে ধীরে।'[১]

অন্য আয়াতে আল্লাহ তায়ালা বলেন,

وَرَتِّلِ الْقُرْءَانَ تَرْتِيلًا

'আর স্পষ্টভাবে ধীরে ধীরে কুরআন তেলাওয়াত করো।'[২]

কোনো কোনা কারী গানের সুরে কুরআন তেলাওয়াত করেন। প্রথমদিকে এ রীতি স্বাভাবিক থাকা সত্ত্বেও ইমাম আহমদ বিন হাম্বল রহ. তা মাকরুহ বলেছেন। অবশ্য ইমাম শাফেয়ি রহ. গানের সাদৃশ্যতায় কুরআন তেলাওয়াতকে মাকরুহ বলেননি। সুতরাং তেলাওয়াতে গানের সাদৃশ্য যত বাড়বে, মাকরুহও তত বৃদ্ধি পাবে। তবে কোরআন তেলাওয়াতের স্বাভাবিক রীতি কেউ যদি লঙ্ঘন করে তাহলে তা হারাম বলে গণ্য হবে।

কারীদের একটি দল এমন আছেন, যারা কিছু পাপকে তুচ্ছজ্ঞান করেন। যথা—প্রতিপক্ষের গীবত করা। আবার এর চেয়ে বড় গুনাহও তাদের দ্বারা সংঘটিত হয়। তাদের দৃঢ় বিশ্বাস, কুরআন হেফজ করা তাদেরকে এসব গুনাহের আজাব থেকে রক্ষা করবে। প্রমাণ হিসেবে তারা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিম্নোক্ত হাদিস পেশ করেন,

لوجعل القرآن فِي إهاب مَا احترق

'যদি কুরআনকে চামড়ায় আবদ্ধ করে আগুনে নিক্ষেপ করা হয় তবে তা দগ্ধ হবে না।'[৩]

তাদের জেনে রাখা উচিত, তারা যা ধারণা করছে তা শয়তানের চক্রান্তের নির্যাস। কেননা শরিয়তের বিধি-বিধান সম্পর্কে অবগত ব্যক্তির শাস্তি অনবগত ব্যক্তির শাস্তি অপেক্ষা অধিক ভয়াবহ। যেহেতু ইলমের আধিক্য দলিলকে শক্তিশালী করে। উদাহরণস্বরূপ দু'টি আয়াত আমরা এখানে পেশ করেছি। আল্লাহ তায়ালা বলেন,

أَفَمَن يَعْلَمُ أَنَّمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ الْحَقُّ كَمَنْ هُوَ أَعْمَىٰ

---

১ সুরা বনি ইসরাঈল : আয়াত ১০৬

২ সুরা মুয্যাম্মিল : আয়াত ৪

৩ মুসনাদে আহমাদ : ৪/৩৫১

'যে ব্যক্তি জানে তোমার রবের পক্ষ থেকে তোমার প্রতি যা নাযিল হয়েছে, তা সত্য, সে কি তার মতো, যে অন্ধ?'[১]

অন্য আয়াতে আল্লাহ তায়ালা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর স্ত্রীদের ব্যাপারে বলেন,

مَنْ يَأْتِ مِنْكُنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ يُضَاعَفْ لَهَا الْعَذَابُ ضِعْفَيْنِ

'হে নবী–পত্নীগণ, তোমাদের মধ্যে যে কেউ প্রকাশ্য অশ্লীল কাজ করবে, তার জন্য আযাব দ্বিগুণ করা হবে। আর এটা আল্লাহর পক্ষে সহজ।'[২]

মারুফ কারখি বলেন, বকর বিন হুবাইস বলেছেন, জাহান্নামের একটি উপত্যকা রয়েছে, জাহান্নাম প্রতিদিন সে উপত্যকা থেকে সাতবার আশ্রয় চায়, আর সে উপত্যকায় একটি কূপ রয়েছে, উপত্যকা ও জাহান্নাম যে কূপ থেকে প্রতিদিন সাতবার আশ্রয় চায়। আর সে কূপে একটি সাপ রয়েছে। উপত্যকা, জাহান্নাম ও কূপে সর্বপ্রথম যাদের নিক্ষেপ করা হবে তারা হলেন পাপাচারে লিপ্ত কারী ও হাফেজগণ। নিক্ষিপ্ত হয়ে তারা বলবে, হে আমাদের প্রতিপালক! মূর্তিপূজারিদের পূর্বে কেন আমাদেরকে নিক্ষেপ করা হলো! তাদেরকে উত্তরে বলা হবে, যে জানে আর যে জানে না, উভয়ে সমান নয়।'

গ্রন্থকার বলেন, কারীদের বিষয়ে আমি আলোচনা আর দীর্ঘায়িত করছি না।

মুহাদ্দিসদের ওপর শয়তানের চক্রান্ত

এমন অনেক ব্যক্তি আছেন, যারা হাদিস শ্রবণ ও সংগ্রহ করতে বিভিন্ন দেশে সফর করেছেন। হাদিসের একাধিক সনদ সংগ্রহ, উন্নত সনদ সংগ্রহ ও দুষ্প্রাপ্য হাদিসসমূহ সংগ্রহ করার কাজে জীবনের মূল্যবান সময় ব্যয় করেছেন। তারা সাধারণত দু'শ্রেণির। প্রথমত : যাদের উদ্দেশ্য হচ্ছে, বিশুদ্ধ-অশুদ্ধ ও দুর্বল হাদিসের মাঝে পার্থক্য করার মাধ্যমে শরিয়তের হেফাজত ও সংরক্ষণ। এতে তারা অবশ্যই সাওয়াবের ভাগী হবে বলে আমরা আশা করতে পারি। কিন্তু বর্তমানে শয়তান এতে কিছু অসুবিধার সৃষ্টি করে রেখেছে। তারা এর পেছনে পড়ে ফরয বিষয় থেকে উদাসীন হয়ে পড়েছেন। জরুরি মাসআলা শিক্ষা করা এবং হাদিসের সঠিক মর্ম উপলব্ধি

---

১ সুরা রা'আদ : আয়াত ১৯

২ সুরা আহযাব : আয়াত ৩০

করে তা থেকে মাসআলা উদ্ঘাটন করার প্রতি মনোনিবেশ করেননি। অথচ শরিয়তের ওপর চলতে হলে এ সব বিষয়ের খুবই প্রয়োজন। কারণ হাদিসের সঠিক মর্ম উপলব্ধি করতে না পারলে তা দীন ও শরিয়তকে বিনষ্ট করে দেবে। যেমন এক হাদিসে আছে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন :

لَا يَحِلُّ لِامْرِئٍ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يَسْقِيَ مَاءَهُ زَرْعَ غَيْرِهِ

কেউ যেন তার পানি অন্যের ফসলে সেচন না করে।'[৩] এ হাদিস যখন ছাত্রদের সামনে পাঠ করা হলো, তখন ছাত্ররা বলল, আমরা তো নিজেদের জমি পানি পূর্ণ করার পর অতিরিক্ত পানি অন্যের জমিতে ছেড়ে দেই। অথচ এ হাদিসের মর্ম এটা নয়। হাদিসের মর্ম হলো, কয়েদী বাঁদিদের যারা অন্তঃসত্ত্বা, তাদের সাথে যেন প্রসবের পূর্বে কেউ সহবাস না করে।

খাত্তাবি বলেন, আমাদের এক শায়খ আমাদেরকে এ হাদিস শোনালেন,

أَنَّ النبي صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنِ الْحَلَقِ قَبْلَ الصَّلَاةِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ

তিনি হাদিসে বিবৃত الحَلَق শব্দটি 'লাম' এ সাকিন দিয়ে الحَلْق পড়লেন। যার অর্থ মাথা মুণ্ডন করা। এমতাবস্থায় হাদিসের অর্থ হবে—'রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জুমআর দিন নামাযের পূর্বে মাথা মুণ্ডন করতে নিষেধ করেছেন।' অতঃপর তিনি আমাকে বললেন, আমি চল্লিশ বছর যাবৎ কখনো জুমার নামাযের পূর্বে মাথা মুণ্ডন করিনি। আমি বললাম, এ শব্দটি الحَلَق যার অর্থ 'গোলাকার হয়ে বসা।' অর্থাৎ রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জুমার নামাযের পূর্বে মসজিদে গোলাকার হয়ে বসতে নিষেধ করেছেন, যাতে খুতবা শ্রবণে এবং নামাযে কোনো প্রকার ব্যাঘাত সৃষ্টি না হয়। শায়খ বললেন, তুমি আমাকে একটি সমস্যা থেকে উদ্ধার করলে। তিনি খুব ভালো লোক ছিলেন।

ইবনে সায়িদ একজন প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিস ছিলেন। কিন্তু তিনি ফকিহদের সাথে উঠাবসা না করার কারণে ফতোয়ার ব্যাপারে ভুল করে বসতেন। একবার তাঁর মজলিসে এক মহিলা এসে বলল, হে শায়খ! কূপের ভেতর একটি মুরগি পড়ে মারা গেছে। এখন কী করতে হবে? ইবনে সায়িদ বললেন, কূপে মুরগি পড়ল কীভাবে? মহিলা বলল, কূপের মুখ ঢাকা ছিল না। ইবনে

---

৩ সুনানে আবি দাউদ : হাদিস নং ২১৫৭ [আলবানি রহ. হাদিসটি 'সহিহ' বলেছেন]

সায়িদ বললেন, কূপের মুখ ঢাকলে না কেন? তাই তো মুরগি পড়েছে। উক্ত মজলিসে ফিকাহ বিশেষজ্ঞ আবহারী বলে দিলেন যে, যদি ওই কূপের পানি দুই কুল্লা (পরিমাণ-বিশেষ) হয়ে থাকে, তবে পানি নাপাক হয়নি; এর কম থাকলে নাপাক হয়ে গেছে।

গ্রন্থকার বলেন, ইবনে শাহিন নামীয় মুহাদ্দিস হাদিসের বহু কিতাব লিখেছেন। স্বল্পসংখ্যক ছিল 'জুয', আর অধিকাংশ ছিল তাফসির। 'জুয' এর পরিমাণ ছিল সহস্রাধিক। কিন্তু ফিকাহ-শাস্ত্রে তাঁর কোনো জ্ঞান না থাকায় তিনি মাঝে-মধ্যে এমন ফতোয়া দিতেন, যা হাসির খোরাক হতো। যেমন উত্তরাধিকার সম্বন্ধে তাঁর কাছে ফতোয়া চাওয়া হলে তিনি উত্তরে লেখেন, সে মতে বণ্টন করে নাও যেভাবে আল্লাহ তায়ালা ফারায়েযের নিয়ম বর্ণনা করেছেন।

ইবরাহিম আলহারাবি বলেন, আলী ইবনে দাউদ জাহেরি কোনো এক মজলিসে হাদিস বর্ণনা করছিলেন। মজলিসে উপস্থিতির সংখ্যা ছিল হাজারের অধিক। এমন সময় এক মহিলা এসে জিজ্ঞেস করল, আমি একটি লুঙ্গি সদকা করার কসম করেছিলাম। আলী ইবনে দাউদ জাহেরি জিজ্ঞেস করলেন, তুমি লুঙ্গিটি কত দিয়ে খরিদ করেছিলে? মহিলা বলল, বাইশ দিরহাম দিয়ে। জাহেরি বললেন, তাহলে তুমি বাইশটি রোযা রেখে দাও। ওই মহিলা চলে গেলে তিনি আফসোস করে বলতে লাগলেন, হায়! আমি তো যেহারের কাফ্ফারার বিধান বর্ণনা করলাম।

গ্রন্থকার বলেন, উপরোক্ত দু'টি ঘটনা দ্বারা বোঝা যায়, যারা কেবল হাদিসের শব্দের পেছনে সময় ব্যয় করেছেন এবং ফিকাহ বা ফকিহদের সাথে সম্পর্ক স্থাপন করেননি তারা ফতোয়াদানের ব্যাপারে এমন ভুলই করে বসেছেন। তারা আল্লাহর গুণবাচক নামসমূহের মর্ম বর্ণনা করেছেন নিজের খেয়ালখুশি মতো। অথচ ফিকাহ শাস্ত্রবিদদের সাথে সম্পর্ক রাখলে তারা জানতে পারতেন যে, মুতাশাবিহ আয়াতের অর্থ বুঝতে হলে মুহকাম আয়াতের সহায়তা নিতে হবে। আমি আমার সমকালীন বহু মুহাদ্দিসকে দেখেছি, তারা হাদিসের বহু কিতাব সংকলন করেছেন। একই হাদিস একাধিক সনদে শুনেছেন। কিন্তু সেগুলোর মর্ম বুঝতেন না। জরুরি মাসআলাও জানতেন না। এক্ষেত্রে শয়তানের সূক্ষ্ম প্রতারণা হলো অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় থেকে ফিরিয়ে গুরুত্বহীন কাজে ব্যস্ত করে দেয়া।

দ্বিতীয়ত : অনেক মুহাদ্দিস এমন আছেন, যারা বহু শায়খ থেকে হাদিস সংগ্রহ করেন। যাদের উদ্দেশ্য সঠিক ও ভুল হাদিসের মাঝে পার্থক্যকরণ নয়; বরং উদ্দেশ্য হলো উন্নত সনদ অর্জন করা, দুষ্প্রাপ্য ও বিরল বর্ণনা সংগ্রহ করা, যাতে গর্ব করতে পারেন যে, আমি অমুক অমুক শায়খ থেকে হাদিস শুনেছি। আমার কাছে এমন দুষ্প্রাপ্য বর্ণনা রয়েছে, যা অন্য কারও কাছে নেই।

বাগদাদ থেকে একবার এক জ্ঞানপিপাসু এসেছিল। সে শায়খকে নিয়ে রাক্কা এবং দজলা নদীর তীরবর্তী বাগানে গিয়ে হাদিস শুনত। এরপর লেখত যে, অমুক শায়খ আমার কাছে রাক্কায় হাদিস বর্ণনা করেছেন। এতে মানুষ এটা মনে করবে যে, সে সুদূর সিরিয়ার রাক্কা শহরে গিয়ে হাদিস সংগ্রহ করেছে। কখনো নহরে ঈসা ও ফোরাতের মধ্যস্থলে শায়খকে বসিয়ে হাদিস শুনত। এরপর লেখত যে, আমার কাছে শায়খ 'মাওয়ারাউন নাহার' এ হাদিস বর্ণনা করেছেন। যতে মানুষ মনে করে যে, সে হাদিস সংগ্রহের উদ্দেশে খোরাসান অতিক্রম করে মাওয়ারাউন নাহার নামীয় স্থানে সফর করেছে। কখনো সে লেখত, অমুক আমাকে দ্বিতীয় সফরে, অমুক আমাকে তৃতীয় সফরে হাদিস শুনিয়েছেন। যাতে মানুষ মনে করে, সে জ্ঞান অন্বেষণে বহু ত্যাগ স্বীকার করেছে। কিন্তু সেই জ্ঞানপিপাসুর কাজে বরকত হয়নি। ছাত্রাবস্থায়ই সে ইন্তেকাল করে।

অনেক মুহাদ্দিস আবার এমন আছেন, যারা কারও কোনো হাদিস পেয়ে সেটা গোপন রাখে। অতঃপর সে বর্ণনা করে, যাতে মানুষ মনে করে যে, এ হাদিস কেবল সে একাই বর্ণনা করেছে। অথচ বাস্তবে দেখা যায়, উভয়েই মারা যায়। অন্যেরা আর এ হাদিস সম্পর্কে কিছুই জানতে পারে না। অনেকে বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে সফর করে শুধু এমন শায়খের সন্ধানে, যার নামের শুরুতে ق বা ك রয়েছে। যাতে তার শায়খের তালিকায় ওই বর্ণের নামও উল্লেখ করতে পারে। অথচ এর চেয়ে বহু দরকারি বিষয় রয়ে গেছে যা সে এখনও পালন করেনি।

মুহাদ্দিসদের ওপর শয়তানের আরেকটি প্ররোচনা হলো, তাদের কেউ কখনো উপযুক্ত কারণ ছাড়া একে অপরের দোষ বর্ণনা করে। অথচ সে ব্যক্তি নিজ মাযহাবের হলে তার এ-জাতীয় দোষ গোপন রাখেন। পূর্বেকার মুহাদ্দিসগণ সঠিক অবস্থা তুলে ধরার জন্য আপন পিতার ব্যাপারেও শুদ্ধাশুদ্ধির ব্যাপারে ছাড় দিতেন না। যেমন আলী ইবনে মাদিনি তাঁর পিতা

থেকে হাদিস বর্ণনা করে বলে দিতেন, 'হাদিসটিতে অমুক রাবি আছেন, যিনি অবিশ্বস্ত।' তাদের উদ্দেশ্য নিছক সমালোচনা বা গীবত ছিল না। কারণ তারা গীবত তথা পরনিন্দার পরিণাম খুব ভালোভাবে জানতেন।

হারেস আলমুহাসিবীর কাছে গীবত সম্পর্কে জানতে চাওয়া হলে তিনি বলেন, অজ্ঞরা গীবত করে হিংসা ও কুধারণার বশবর্তী হয়ে। আর আলেমরা যদি গীবত করে তবে তাদের নফস তাদেরকে এ ধোঁকা দেয় যে, এটা তার মঙ্গলের জন্য করা হচ্ছে। হাফেজ ও আবেদদের অনেকে গীবত করে থাকে আত্মগরিমার বশবর্তী হয়ে। আর যাহেদ ও উস্তাদদের মাঝে অনেকে গীবত করেন দয়ার্দ্রতা প্রকাশের নিমিত্তে। তারা বলেন, অমুক বেচারা এ রোগে আক্রান্ত। অমুককে এমন পরীক্ষায় ফেলা হয়েছে। আল্লাহ তায়ালা আমাদের সবাইকে এসব বিপদ থেকে রক্ষা করুন। এ সবকিছু কৃত্রিমতা ও বানোয়াটি। প্রথমে দয়ার্দ্রতা প্রকাশ, তারপর দয়া—এগুলো সবই লৌকিকতা। গীবত সর্বাবস্থায় নিষিদ্ধ ও হারাম।

ফকিহ ও মুফতীদের ওপর শয়তানের চক্রান্ত

গ্রন্থকার বলেন, পূর্বেকার যুগে কুরআন ও হাদিসের পরিপক্ব আলেমদেরকে ফকিহ বলা হতো। অর্থাৎ যাদের ইজতেহাদের যোগ্যতা ছিল তারাই হতেন ফকিহ। এরপর তা কমতে কমতে এ পর্যায়ে ঠেকল যে, মুতাআখ্খিরীন তথা পরবর্তীরা বললেন, কুরআন ও হাদিস থেকে কেবল ওই সব অংশ জানা এবং বোঝা জরুরি যেগুলো দ্বারা শরীয়তের বিধান সাব্যস্ত হয়। এরপর তো এমন লোকও ইজতেহাদের দাবি করে, যে নিজেই আয়াতের মর্ম বোঝে না। সহিহ না যঈফ—এই বুঝ যার নেই, এমন লোকও হাদিসকে দলিল হিসেবে উপস্থাপন করে। হাদিস উপস্থিত থাকা সত্ত্বেও এর বিপরীতে কেয়াস প্রয়োগের চেষ্টা চালায়। কখনো কোনো ফকিহ কোনো এক মাসআলা বলেন, আর তার দলিল হিসেবে দুর্বল হাদিস পেশ করেন। অথচ সহিহ ও বিশুদ্ধ হাদিস রয়েছে। একটু কষ্ট করে হাদিসের কিতাবে সন্ধান করলেই অনায়াসে তা পেতেন।

ফকিহদের ওপর শয়তানের একটি চক্রান্ত হলো, তারা প্রতিপক্ষের সাথে তর্ক করার উদ্দেশ্যে সূক্ষ্ম মাসআলা বের করেন, তার দলিল-প্রমাণ জোগাড় করেন এবং প্রতিপক্ষকে কীভাবে ঘায়েল করা যায়, সে কৌশল বের করার পেছনে বহু মূল্যবান সময় নষ্ট করেন। অথচ জনসাধারণের দীনের জন্য

একান্ত প্রয়োজনীয় বহু সাধারণ মাসআলা সম্পর্কে তিনি থাকেন অজ্ঞ। তাদের ওপর শয়তানের আরেকটি চক্রান্ত হলো, কেয়াসকে হাদিসের বিপক্ষে অগ্রাধিকার দেয়া। এতে করে নিজের মনের ঘোড়াকে তারা খোলা মাঠে দৌড়ানোর প্রয়াস পায়। অথচ আদবের চাহিদা ও দাবি অনুযায়ী কোনো হাদিস সামনে এলে কেয়াসকে পেছনে রেখে হাদিসকে অগ্রাধিকার দেয়া উচিত এবং এটাকেই দলিল হিসেবে উপস্থাপন করা যুক্তিসংগত। অনেক ফকিহ পূর্ণ মনোযোগ ও সময় দিয়ে শুধু মাসআলা বের করার চিন্তায় বিভোর থাকেন। কিন্তু যে-সব বিষয়ের মাধ্যমে অন্তরে নম্রতা সৃষ্টি হবে, যেমন, কুরআন তেলাওয়াত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর জীবনী ও সাহাবায়ে কেরামের জীবনী অধ্যয়ন করা বা শ্রবণ করাকে নিজ কর্তব্য বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত বলে মনে করেন না। মাসায়েল জরুরি বিষয়—এতে কোনো সন্দেহ নেই। এসব কিছুর মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে অন্তরে নম্রতা, আল্লাহ ও পরকালের ধ্যান জাগরূক করা।

আত্মশুদ্ধি ও সুন্দর আখলাক বিনির্মাণে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও সাহাবায়ে কেরামের জীবনী অধ্যয়নও খুব জরুরি বিষয়। তাঁদের অবস্থা যখন আমাদের সামনে আসবে তখন আমাদের মন মেজায ওই দিকে আকৃষ্ট হবে, অন্যথায় যুগের পঙ্কিল স্রোতে ভেসে যাওয়ার সমূহ আশঙ্কা উড়িয়ে দেয়া যায় না। জনৈক মনীষী বলেন, কাজী শুরাইহ'র শত ফয়সালার চেয়ে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর একটি হাদিস উত্তম। কেননা এ দ্বারা আমার অন্তর নরম হয়। আর মন নরম হলে যে কোনো আমল-ইবাদত সহজতর হয়ে যায়।

কখনো দেখা যায়, বাদী-বিবাদী উভয় পক্ষের দাবিই সঠিক কিন্তু এক পক্ষের দাবি ইসলামের জন্য অধিক উপকারী। এমতাবস্থায় উচিত হলো, যে বিষয়টি অধিক উপকারী, সেটিই বেছে নেয়া। অথচ সমাজ বাস্তবতায় এর উল্টোটিকেই প্রাধান্য দেয়া হয়। কোনো কোনো সময় ফকিহদের পরস্পর মুনাযারা ও বিতর্কে একটি হক বিষয় প্রকাশ হওয়ার পরও তা মেনে নেয়া হয় না। এটি একেবারেই পরিত্যাজ্য। হক প্রকাশ ও প্রতিষ্ঠা করার উদ্দেশ্যেই তো মুনাযারা ও বিতর্ক।

ইমাম শাফেয়ি রহ. বলেন, কেউ যদি আমার সাথে মুনাযারা করে আর মুনাযারায় হেরে যায় অতঃপর হক বিষয় তার সামনে প্রকাশ হওয়ার পর তা গ্রহণ না করে, তবে সে ব্যক্তি আমার দৃষ্টিতে হেরে যায়। আর যে ব্যক্তি হক

বিষয় মেনে নেয়, তার মর্যাদা আমার কাছে বেড়ে যায় এবং আমি তার কাছে প্রভাবিত থাকি। আর কোনো মুনাযারায় যদি আমার প্রতিপক্ষ জয়ী হয়ে যায় এবং তার দলির হক বলে প্রমাণিত হয়, তবে আমি তার পক্ষ অবলম্বন করে ফেলি।

অনেক সময় দেখা যায়, মুনাযারার মাধ্যমে অন্তরে অহংকার সৃষ্টি হয়ে যায় এবং কখনো গীবতেরও পথ খুলে যায়। হক বিষয় প্রতিষ্ঠা করার জন্য মুনাযারা করার প্রয়োজন হয়, তবে এসব অপছন্দনীয় বিষয় থেকে বিরত থেকেই বিতর্ক চর্চা করতে হবে। ফকিহদের ওপর শয়তানের আরও একটি চক্রান্ত হলো, তাদের কেউ ফতোয়াদানের ব্যাপারে বেপরোয়া হয়ে যান। অনেক সময় সুষ্ঠু প্রমাণের বিপরীত ফতোয়া দিয়ে ফেলেন। অথচ জটিল বিষয় সামনে এলে সে ক্ষেত্রে অপেক্ষা করা উচিত।

আবদুর রহমান ইবনে আবি লায়লা বিখ্যাত মুহাদ্দিস ও মুফতী ছিলেন। তিনি বর্ণনা করেন, আমি একশ বিশজন সাহাবিকে পেয়েছি, যাঁদের কাছে হাদিস জিজ্ঞেস করলে তাঁরা বলতেন, হায়! আমার কোনো ভাই যদি এ হাদিসটি বলে দিত। অনুরূপভাবে ফতোয়া জিজ্ঞেস করা হলে একজন অপরজনের সোপর্দ করতে থাকতেন। শেষে পুনরায় সেই প্রথম ব্যক্তির কাছে চলে যেতে হতো।

ইবরাহিম নখয়ি রহ. ছিলেন বিখ্যাত একজন ফকিহ। একবার জনৈক ব্যক্তি তার কাছে মাসআলা জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন, ভাই! তুমি কি মাসআলাটি জিজ্ঞেস করার জন্য আর কাউকে পেলে না? ইমাম মালেক রহ. বলেন, ফতোয়া দেয়ার পূর্বে আমি ফতোয়া দেয়ার যোগ্য হয়েছি কি-না—এ ব্যাপারে সত্তরজন মাশায়েখকে জিজ্ঞেস করেছি। তাঁরা সবাই সম্মতি দিলে আমি ফতোয়া দেয়া শুরু করি। মানুষ জিজ্ঞেস করল, হুযুর! যদি মাশায়েখরা আপনাকে ফতোয়া দিতে নিষেধ করতেন, তবে কী করতেন? তিনি বললেন, তখন আমি ফতোয়া দেয়া থেকে বিরত থাকতাম। ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল রহ.-এর নিকট জনৈক ব্যক্তি এসে বলল, আমি কসম করেছিলাম, কিন্তু কী ধরনের কসম করেছিলাম, তা মনে নেই। ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল রহ. বললেন, আফসোস! যদি জানতে কী ধরনের কসম করেছিলে, তাহলে আমিও জানতাম যে কীভাবে ফতোয়া দেব। পূর্বেকার মনীষীদের এ রীতির কারণ হলো, তাঁদের অন্তর ছিল তাকওয়ায় পরিপূর্ণ।

শয়তানের প্ররোচনায় আকৃষ্ট হয়ে অনেক ফকিহ ধনী ও রাজা-বাদশাহদের কাছে যাতায়াত করেন। উদ্দেশ্য থাকে দুনিয়া অর্জন করা। কখনো তাদের সাথে দীনি ব্যাপারে বেশ শৈথিল্য প্রদর্শন করা হয়। অথচ এটা মোটেই বৈধ নয়। উক্ত আচরণের ফলে তিন প্রকার ব্যক্তি ফিতনার শিকার হয়। প্রথমত : ওই ধনী বা বাদশাহ। কেননা সে মনে করে, আমি সঠিক পথে আছি। আমি যা কিছু করছি—সব ঠিক, নতুবা ফকিহ আমার কাছে আসতেন না বা আমার সম্পদ গ্রহণ করতেন না। দ্বিতীয়ত : জনসাধারণ। জনসাধারণ মনে করবে, ওই ধনী ব্যক্তি খুব ভালো লোক। তার ধন-সম্পদ খুব হালাল। নতুবা ফকিহ কি তা গ্রহণ করতেন? তার কাছে কি আসা-যাওয়া করতেন? তৃতীয়ত : ফকিহ নিজে। কারণ ফকিহ নিজের দীনকে দুনিয়ার জন্য বিলিয়ে দিলেন। ইলমে দীনকে তুচ্ছ মনে করলেন। মানুষ এটাই মনে করবে যে, ইলমের চেয়ে ধন-সম্পদ ও টাকা-পয়সার মূল্য বেশি। এমন না হলে তো ফকিহ ধনীর কাছে আসতেন না।

শয়তান অনেক ফকিহকে প্রলোভন দেখিয়ে বলে, বাদশাহ ও ধনিক শ্রেণির কাছে যাও। তার মনে এ ধারণা সৃষ্টি করে আসো যে, আমি বাদশাহ ও ধনীর কাছে যাই মুসলমানদের জন্য সুপারিশ করার উদ্দেশ্যে। অথচ এটা প্রকৃত উদ্দেশ্য নয়। শয়তান প্রলোভন দেখিয়ে তাকে ধনী ও নেতাদের কাছে নিয়ে গিয়ে তাকে দুনিয়াদার ও ক্ষমতালিপ্সু হওয়ার প্রণোদনা দিতে থাকে। আবার অনেক ফকিহ শাসকশ্রেণির কাছে গিয়ে তাদের কাছ থেকে টাকা-পয়সা, সুযোগ-সুবিধা গ্রহণ করে বলে বেড়ায়, এতে আমাদেরও অধিকার আছে। অথচ ওই সম্পদ যদি হারাম পথে অর্জিত হয়ে থাকে, তাহলে তা গ্রহণ করা কী করে বৈধ হতে পারে? আর যদি তাতে হালাল কি না—এ বিষয়ে সন্দেহ থাকে, তবে তা বর্জন করাই উত্তম। আর যদি হালালও থাকে তবে ওই পরিমাণ গ্রহণ করা জায়েয, যতটুকু দীনি খেদমত আঞ্জাম দেয়ার কারণে বায়তুল মাল থেকে গ্রহণ করতে পারে। অনেক সময় সাধারণ মানুষ এই বিষয়গুলো দেখে সরকারি সম্পদ বেপরোয়াভাবে আত্মসাৎ করতে থাকে, যা কোনোমতেই তাদের জন্য বৈধ হতে পারে না।

আবার অনেক সময় কিছু আলেমকে শাসকদের কাছ থেকে সম্পূর্ণ পৃথক থাকতে দেখা যায়। আর যারা শাসকদের নিকট আসা-যাওয়া করেন তাদের গীবত ও পরচর্চা, দোষচর্চা করতে থাকেন। এতে দু'টি অসুবিধার কারণ আছে। একটি হলো গীবত ও কুৎসা, অপরটি হলো আত্মশ্লাঘা ও আত্মপ্রশংসা। যে সকল আলেম শাসকের কাছে যাওয়া-আসা করেন,

তাদের নিয়ত প্রথমে ভালো থাকলেও পরে খারাপে রূপান্তরিত হয়ে যায়। শুরুতে গিয়ে মনে করেন, তাদের কাছে গিয়ে হক কথা বলব। দীনের ব্যাপারে কোনো প্রকার ছাড় দেব না। কিন্তু যখন তাদের দেয়া উপহার-উপঢৌকন গ্রহণ করেন, তখন আর সেই নিয়ত ও প্রতিজ্ঞা ঠিক থাকে না।

সুফিয়ান সাওরি রহ. বলতেন, শাসকরা আমাকে অপমানিত করবে—এ আশঙ্কা আমি মনে করি না বা এর জন্য আমি ভয় করি না। আমার আশঙ্কা হচ্ছে, তারা আমাকে সম্মান করবে আর আমার অন্তর তাদের দিকে আকৃষ্ট হয়ে পড়বে। পূর্ববর্তী আলেম ও মুফতী-মুহাদ্দিসরা বাদশাহ ও শাসকদের থেকে দূরে থাকতেন। কারণ তারা শরিয়তবিরোধী কাজ করত। তখন শাসকরা আলেমদের খেদমতে উপস্থিত হয়ে ফতোয়া ও বিভিন্ন বিচার মীমাংসার ব্যাপারে আলোচনা করত। পরে কোনো এক সম্প্রদায়ের আবির্ভাব হয়, যারা দুনিয়ার প্রতি আকৃষ্ট ছিল। তারা এমন কিছু ইলম শেখে, যা বাদশাহ ও শাসকদের প্রয়োজন। অতঃপর তারা সেই ইলম নিয়ে বাদশাহর কাছে হাজির হয়, এতে তারা আর্থিক ও বৈষয়িকভাবে বেশ লাভবান হতে থাকে। শাসকরা যেহেতু ওয়াজ শুনতে ভালোবাসে, তাই তাদের নৈকট্য লাভের উদ্দেশ্যে ওয়াজের সংখ্যা খুব বেড়ে যায়। পক্ষান্তরে ফকিহদের সংখ্যা কমতে থাকে। কেউ কেউ মাদরাসার ওয়াকফ সম্পত্তি, যা একমাত্র ছাত্র-শিক্ষকের হক, তা ভোগ করে। অথচ এটা তার জন্য বৈধ নয়। হ্যাঁ, যদি ব্যক্তিও মাদরাসার কোনো বৈতনিক দায়িত্বে নিয়োজিত থাকে, তবে অবশ্য তার জন্য ওই সম্পদ ভোগ করা বৈধ।

শয়তানের ফাঁদে পড়ে অনেক ফিকাহ শিক্ষানবিশ ও নামধারী ফকিহ বিভিন্ন নিষিদ্ধ বিষয়ের দিকে পা বাড়িয়েছে। যেমন—সোনার আংটি পরা, রেশমি কাপড় পরিধান করা ইত্যাদি। এদের অনেকের আকিদা বিশুদ্ধ ছিল না। অন্তরে তারা কুফরী লুকিয়ে রাখত। আবার অনেকের আকিদা বিশুদ্ধ ছিল, কিন্তু নফস ও প্রবৃত্তির তাড়নায় এরূপ করেছে। আত্মশুদ্ধির মতো জ্ঞান তাদের না থাকায় বারবার হোঁচট খেয়েছে।

শয়তানের প্ররোচনায় আকৃষ্ট হয়ে অনেক ফকিহ নিজেকে অনেক বড় আলেম ও মুফতী মনে করেন। তারা মনে করেন, আল্লাহর শাস্তি থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য ইলমই যথেষ্ট। এ ধারণার বশীভূত করে গুনাহের কাজে শয়তান তাদেরকে লিপ্ত করায়। অথচ এটা সম্পূর্ণ ভুল ধারণা। জেনেশুনে

গুনাহ করা আরও মারাত্মক। হাসান বসরি রহ. বলেন, ফকিহ ওই ব্যক্তি যার অন্তরে আল্লাহর ভয় আছে।

ইবনে আকিল বলেন, আমি জনৈক খোরাসানি ফকিহের গায়ে রেশমি কাপড় এবং হাতে সোনার আংটি দেখে জিজ্ঞেস করলাম, এটা কী? তদুত্তরে সে বলল, এটা বাদশাহর পক্ষ থেকে উপঢৌকন আর শত্রুর অন্তরে আঘাত। আমি বললাম, কখনো নয়। এটা শত্রুর খুশির কারণ। কেননা এতে চিরশত্রু শয়তান খুশি হবে। যেহেতু এটা শরিয়ত হারাম ও নাজায়েয করে রেখেছে। শয়তানের চেয়ে বড় শত্রু আর কে হতে পারে? বাদশাহ তোমাকে যে পোশাক উপঢৌকন হিসেবে দিয়েছে, এতে সে তোমার কোনো উপকার করেনি; বরং এর মাধ্যমে তোমার ঈমানী পোশাক ছিনিয়ে নিয়েছে। অথচ উচিত ছিল, তুমি স্বীয় ইলম দ্বারা তার পরন থেকে ফাসেকীর পোশাক খুলে তাকে ঈমান ও তাকওয়ার পোশাক পরিয়ে দেওয়া। কিন্তু তুমি এর বিপরীতটাই করলে। এটা তোমার চরম দুর্ভাগ্য।

শয়তান চক্রান্তের মাধ্যমে ফকিহ, মুফতী ও আলেমদেরকে ওয়াজের মজলিসে যেতে বারণ করে। এতে তারা ওয়াজ-নসিহত শুনতে পায় না। যুক্তি হিসেবে তারা বলে বেড়ায়, ওয়ায়েজ শুধু কিসসা-কাহিনি বলে। এতে কি কোনো লাভ আছে? বাস্তবিকপক্ষে শয়তান তাদেরকে এমন বিষয় থেকে মুখ ফিরিয়ে রাখছে, যা দ্বারা অন্তর কোমল হতো। আর মন নরম হলে তা অনায়াসে আল্লাহর দিকে ঝুঁকবে। ওয়ায়েজরা যে নসিহত ও উপদেশের উদ্দেশ্যে কিসসা-কাহিনি বর্ণনা করেন, সেটা নাজায়েয নয়। কারণ স্বয়ং আল্লাহ তায়ালা কুরআনে কারীমে ইরশাদ করেছেন, 'হে রাসুল! আমি আপনাকে সর্বোত্তম কিস্‌সা শোনাই।'[১] কিস্‌সা যদি সত্য ও উপদেশমূলক হয়, তবে এতে অসুবিধার কিছু নেই; বরং এতে উপকারই রয়েছে। তবে মিথ্যা ও বানোয়াট কিস্‌সা বর্ণনা করা এবং কুরআন-হাদিস ও ইসলামি কথা বাদ দিয়ে শুধু কিসসা-কাহিনির পেছনে পড়ে থাকা চরম গর্হিত ও বর্জনীয়।

---

১ সুরা ইউসুফ : আয়াত ৩

ওয়ায়েজ ও বক্তাদের ওপর শয়তানের চক্রান্ত

আগেকার জমানার ওয়ায়েজরা ছিলেন বিজ্ঞ ওলামায়ে কেরাম ও ফক্বীহ সম্প্রদায়। উবাইদ বিন উমাইরের মজলিসে সাহাবি আব্দুল্লাহ বিন ওমর রা. উপস্থিত হতেন এবং ওমর বিন আবদুল আজীজও বিভিন্ন ওয়াজের মজলিসে উপস্থিত হয়ে ওয়াজ শ্রবণ করতেন। মানুষের দীনি শিক্ষা, আত্মশুদ্ধি ও চারিত্রিক সংশোধন ছিল এসব ওয়াজের মূল উদ্দেশ্য। তবে ক্রমান্বয়ে অজ্ঞ লোকেরাও ওয়াজ-নসিহতের কাজে নিজেদেরকে নিয়োজিত করলে এবং এ কাজকে নিজেদের পেশা হিসাবে গ্রহণ করার ফলে এসব মজলিসে আলেম-ওলামা ও নেক লোকদের উপস্থিতি ক্রমান্বয়ে হ্রাস পেয়ে সাধারণ জনগণ ও মহিলাদের উপস্থিতি বাড়তে থাকে। এসব বক্তারা শরিয়তের জ্ঞানার্জনে ব্যস্ত না হয়ে মূর্খ জনগণকে মুগ্ধ করার উদ্দেশ্যে গল্প বানানো ও ঘটনা বর্ণনায় নিজেদেরকে আত্মনিয়োগ করে।

এসব মূর্খ ওয়ায়েজ ও বক্তাদের কিছু হাল হাকিকত আমি 'কিতাবুল কিসাস ওয়াল মুযাক্কিরীন' গ্রন্থে উল্লেখ করেছি। এখানে আমরা কিছু বাছাই করা কথার আলোকপাত করব। এখনকার বক্তা ও ওয়ায়েজরা নেক কাজে উৎসাহদান ও অসৎকাজে ভীতি প্রদর্শনে নিজেদের বানানো কথাকে হাদিস বলে প্রচার করে। আর শয়তান তাদেরকে এ ব্যাপারে প্ররোচনা জোগাতে থাকে যে, তোমরা যা করছ তা তো অত্যন্ত মহৎকাজ। যেহেতু মানুষকে নেক কাজে উৎসাহদান এবং অসৎকাজে বাধা প্রদান তোমাদের মূল উদ্দেশ্য। তাদের জেনে রাখা উচিত যে, তারা যা করছে তা শরিয়তের প্রতি অন্যায় আচরণ। কেননা এ কাজ দ্বারা তারা মনে করছে, শরিয়ত অপূর্ণ, তা পূর্ণ করা প্রয়োজন। অথচ তারা ভুলে গেছে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বাণী :

مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّداً فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ

'যে আমার ওপর মিথ্যা বলল, সে যেন তার ঠিকানা জাহান্নাম বানিয়ে নেয়।'[১] বক্তাদের কতক এমনও আছেন, যারা ওয়াজে সুর সংযোজন করেন, যা মানুষের মন মুগ্ধ করে, হৃদয় আন্দোলিত করে। তারা বিভিন্ন ভঙ্গিমায় ওয়াজ করেন। আপনি দেখবেন, তারা প্রেম-ভালোবাসা ও মহব্বতের এমন মনমুগ্ধকর কবিতা শে'র পড়ে, মানুষের হৃদয়-মন যা দ্বারা

---

১ সহিহ বুখারি : হাদিস নং ১১০, সহিহ মুসলিমের মুকাদ্দামাহ : হাদিস নং ৩

আন্দোলিত হয়। তারা ইবলিসের ধোঁকায় প্রলুব্ধ হয়ে বলেন, আমাদের একমাত্র উদ্দেশ্য, আল্লাহর ভালোবাসা ও মহব্বতের জোয়ার মানুষের হৃদয়রাজ্যে প্রবাহিত করা। অথচ এ বিষয়টি দিবালোকের ন্যায় সুস্পষ্ট যে, তাদের মজলিসে ওই সকল মূর্খ জনগণই উপস্থিত হয়, প্রবৃত্তির ভালোবাসা যাদের মনে ভরপুর। ফলে বক্তা নিজেও পথভ্রষ্ট হয় এবং তাদের মজলিসে যারা আসে তারা আরও বেশি পথভ্রষ্ট হয়ে যায়।

অনেক ওয়ায়েজ এমন আছেন, যারা ওয়াজ-নসিহতের সময় আবেগ ও বিনয়ের এমন ভাব প্রকাশ করেন যা তাদের অন্তরে নেই। ফলে বিনয়ভাব ও চোখের অশ্রু বর্ষণে মানুষ তাদের প্রতি আকৃষ্ট হয়। সুতরাং যার আবেগ ও ক্রন্দন আল্লাহর জন্য নয়; সে তো আখিরাত ধ্বংস করল, আর যে এ বিষয়ে সত্যবাদী তার সত্যবাদিতাও রিয়ার বেড়াজালে আটকে গেল। কিছু কিছু বক্তা আল্লাহর ভালোবাসা ও দুনিয়াবিমুখতার নিগূঢ় তত্ত্ব বিশ্লেষণ করেন, আর ইবলিসও তাদেরকে প্ররোচনা দিয়ে বলে, তুমি তো এসব গুণে গুণান্বিত। কেননা এসব বিষয়ের জ্ঞানলাভের পর তদনুযায়ী আমল যদি না করতে তাহলে জানা সত্ত্বেও তুমি তার নিগূঢ় তত্ত্ব বর্ণনা করতে সক্ষম হতে না।

শয়তানের এহেন প্ররোচনার শিকার যদি কেউ হয় তাহলে মনকে এ বলে সতর্ক করবে যে, জানা বিষয় বর্ণনা করতে পারা এবং তা আমলে বাস্তবায়ন করা এক জিনিস নয়। তদুপরি একটি অর্জিত হলে যে অন্যটি অর্জিত হবে তা আবশ্যকও নয়। কেউ কেউ আবার কেয়ামতের এমন সব আলোচনা করেন শরিয়তে যার বর্ণনা পাওয়া যায় না। এসব আলোচনার প্রমাণস্বরূপ তারা বিভিন্ন প্রেমকাব্য আবৃত্তি করেন, মূর্খ লোকেরা যা দলিল বলে বিশ্বাস করে। এসব আলোচনার উদ্দেশ্য হলো, সাধারণ জনগণ যেন তা শুনে ভীত-বিহ্বল হয় এবং চিৎকার ক্রন্দনে তার ওয়াজের মাঠ গরম রাখে।

আবার কেউ কেউ ছন্দ আকারে এমনসব বাক্য বলেন, যা সম্পূর্ণ অর্থহীন। তাদের আলোচনার অধিকাংশ বিষয়বস্তু হলো, নবী মুসা, ইউসুফ ও জোলায়খার ঘটনা বর্ণনা করা। অথচ তারা শরিয়তের অতি গুরুত্বপূর্ণ ফরজ-ওয়াজিবের আলোচনা করেন না এবং মিথ্যা-পাপাচারের ভয়াবহতা বর্ণনা করে তা থেকে মানুষকে সতর্ক করেন না। যদি গল্প-ঘটনাই ওয়াজের মূল বিষয় হয়, তাহলে কখন যেনাকারী ব্যভিচার থেকে ফিরে আসবে, সুদখোর সুদগ্রহণ পরিহার করবে এবং স্ত্রী জানতে পারবে তার প্রতি রয়েছে

স্বামীর কী কী অধিকার! হায় আফসোস! এরা শরিয়তকে অগ্রাহ্য করেছে, ফলে নফসের তাবেদার মূর্খসমাজে তাদের চাহিদা বৃদ্ধি পেয়েছে। কেননা হক ভারী আর বাতিল হাল্কা; অর্থাৎ শরিয়তের আলোচনা বিস্বাদ লাগে, আর গল্প-ঘটনার প্রতি মানুষের থাকে আলাদা টান। এ সব শয়তানেরই প্ররোচনা।

বক্তাদের কতক এমন আছেন, যারা মানুষকে দুনিয়াবিমুখতা ও রাত্রিজাগরণে উদ্বুদ্ধ করেন, কিন্তু জনসাধারণের জন্য এসবের উদ্দেশ্য স্পষ্টভাবে বর্ণনা করেন না। ফলে তাদের কেউ তওবা করে ঘরের কোণে ইবাদতে নিমগ্ন হন অথবা নির্জন পাহাড়ে গিয়ে পরকাল সাধনায় আত্মনিয়োগ করেন; ফলে তাদের পরিবার হয় অভিভাবকশূন্য, তারা না পায় ক্ষুধা নিবারণের অন্ন, না পায় দেহ ঢাকার মতো প্রয়োজনীয় বস্ত্র। আবার অনেক ওয়ায়েজ আশা-প্রত্যাশার বয়ান করে মানুষকে বলেন, আপনারা আল্লাহর রহমতের আশা বেশি পরিমাণে করুন; কিন্তু এমন বিষয়ের আলোচনা করেন না, যা মানুষের দিলে আল্লাহর ভয় জাগ্রত করবে এবং গুনাহ থেকে বিরত রাখবে। ফলে দুনিয়ার প্রতি মানুষের ঝোঁক বেড়ে যায় এবং দ্রুতগামী যানবাহন, উন্নতমানের পোশাক ও রঙ-বেরঙের সুস্বাদু খাবার তাদেরকে মুগ্ধ করে, তাই এসব লাভের চেষ্টায় তাদের পরকাল বরবাদ হয়। এসব বক্তাদের কথা-কাজ মানুষের অন্তরকে বিনষ্ট করে। কিছু কিছু ওয়ায়েজের মজলিসে নারী-পুরুষ সবাই সমবেত হয়। মহিলারা প্রভাবিত হয়ে উচ্চৈঃস্বরে চিৎকার করতে শুরু করে। কিন্তু ওয়ায়েজ এতে বাধা দেন না, যাতে সবাই তার প্রতি আরও অধিকহারে মনোযোগী হয়।

পক্ষান্তরে বহু বিদগ্ধ আলেমের ওপর শয়তান চক্রান্তের ক্ষেত্রে এমন সূক্ষ্ম কৌশল অবলম্বন করে, আলেম ভাবতেও পারে না যে শয়তানের চক্রান্ত এমন হতে পারে। সে আলেমকে বলে, তোমার মতো অধম অন্যকে নসিহতের কী যোগ্যতা রাখে! নসিহত তো ওই ব্যক্তি করবে, যে মন্দকাজ থেকে পূর্ণ সতর্ক এবং সৎকাজের ব্যাপারে পূর্ণ সচেতন। শয়তানের এহেন চক্রান্তে আলেমের বাকরুদ্ধ হয়, ফলে ওয়াজ-নসিহত থেকে সে নিজেকে গুটিয়ে রাখে।

সাবেত বুনানি রহ. বলেন, কোনো এক মজলিসে হাসান বসরি রহ. উপস্থিত ছিলেন। তাঁকে বলা হলো, আপনি কিছু উপদেশমূলক কথা বলুন। তিনি বললেন, আমি কি উপদেশদানের যোগ্য হয়েছি? যা হোক পরে তিনি কিছু

উপদেশমূলক কথা বললেন। সাবেত বুনানি রহ. বলেন, তাঁর কথা আমার খুব পছন্দ হলো। হাসান বসরি রহ. বললেন, শয়তান জানত যে, তোমরা হাসান বসরি থেকে এ উপদেশ গ্রহণ করবে, যে কখনো ভালো কাজের আদেশ করেনি এবং মন্দ কাজে নিষেধ করেনি। তাই আমি তার মাধ্যমে ওয়াজ করিয়ে শয়তানের এ সুযোগটি বিনষ্ট করলাম।

সাহিত্যিক ও ভাষাবিদদের ওপর শয়তানের চক্রান্ত

অনেক লোক নাহ্ভ, সরফ ও সাহিত্য শেখার পেছনে জীবন কাটিয়ে দেন। কিন্তু শরিয়ত মোতাবেক জীবন পরিচালনা করতে যে জ্ঞানের প্রয়োজন, যা শিক্ষা করা প্রত্যেকের ওপর ফরজে আইন, তা শেখার প্রতি এবং শিষ্টাচার ও আত্মার পরিশুদ্ধির জন্য যা শিক্ষা করা তাদের জন্য উত্তম তারা তা শেখার প্রতি ভ্রুক্ষেপ করেন না। এছাড়া তারা কুরআন-হাদিসের ব্যাখ্যা ও ইসলামি আইনশাস্ত্রে পাণ্ডিত্য অর্জন থেকে বিমুখ হন, অথচ এসব বিষয়ে পাণ্ডিত্যর্জন তাদের জন্য অপরিহার্য ছিল। অথচ যা শিক্ষা করা ফরজ কিংবা যা শিক্ষা করা সর্বোত্তম তার প্রতি ভ্রুক্ষেপ না করে তারা জীবনের গোটা সময় এমন বিষয়ের জ্ঞানার্জনে ব্যয় করেন, যা শিক্ষা করা মুখ্য উদ্দেশ্য নয়; বরং তা শিক্ষা এ জন্যই করা হয় যেন তার মাধ্যমে জানা আবশ্যক বিষয়ের জ্ঞানার্জন সম্ভব হয়। সুতরাং কুরআন হাদিসের কোনো বিষয়ের অর্থ বোঝার সক্ষমতা যদি কেউ লাভ করে তাহলে তার কর্তব্য হলো, তার ওপর আমল করে পরকালের উন্নতি সাধন করা। যেহেতু ভাষার জ্ঞানার্জনের উদ্দেশ্যই হলো কোরআন-হাদিস থেকে শরিয়তের বিধি-বিধান আহরণ করে তদনুযায়ী আমল করা। অথচ এসব সাহিত্যিকদের অনেকেই এমন আছেন, শরিয়তের বিধি-বিধান ও শিষ্টাচার যাদের তেমন জানা নেই এবং আত্মার পরিশুদ্ধি ও চরিত্র সংশোধনের প্রতি যাদের কোনো ভ্রুক্ষেপ নেই।

তথাপি তারা অহংকারের জোয়ারে ভেসে বেড়ায়। ইবলিস তাদের মনে এ ধারণা বদ্ধমূল করে যে, তোমরা তো ইসলামের আলেমসমাজ, কেননা নাহ্ভ-সরফ ও সাহিত্য হচ্ছে ইসলামেরই জ্ঞান-বিজ্ঞান এবং তার মাধ্যমেই জানা যায় কুরআন-হাদিসের অর্থ ও মর্ম। আমার জীবনের শপথ করে বলছি, কুরআন হাদিসের অর্থ ও মর্মোদ্ধারে ভাষাজ্ঞানের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য; কিন্তু আরবি ভাষায় কথা বলার যোগ্যতা অর্জন এবং কুরআন-হাদিসের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ ও অর্থ বোঝার জন্য তো জীবনব্যাপী সাধনার

কোনো প্রয়োজন নেই; বরং সেজন্য অল্প সময় ব্যয় করাই যথেষ্ট। যে পরিমাণ ভাষাজ্ঞান না হলে কুরআন-হাদিসের মর্মোদ্ধার অসম্ভব সে পরিমাণ ভাষাজ্ঞান এবং সে জন্য প্রয়োজনমাফিক সময় ব্যয় অত্যন্ত জরুরি, আর যে ভাষাজ্ঞান প্রয়োজনের আওতামুক্ত তা অর্জনে জীবনের মূল্যবান সময় ব্যয় করার কোনো মানে হয় কি? সুতরাং যে বিষয়ের জ্ঞানলাভ অত্যাবশ্যক সেদিকে ভ্রুক্ষেপ না করে যা অর্জন অনাবশ্যক তা অন্বেষণে জীবনের মূল্যবান সময় ব্যয় করা এমন চরম ভুল যার কোনো ক্ষতিপূরণ নেই, আর কুরআন-হাদিসের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ ও ইসলামি আইনশাস্ত্র অধ্যয়নের ওপর আরবি ভাষাজ্ঞানকে প্রাধান্য দেয়া এমন লোকসান যার ওপর পরিতাপের কোনো সীমা নেই। যদি সকল বিষয়ে জ্ঞানার্জনের জন্য জীবন সংকুলান হতো তাহলে বড়ই উত্তম হতো। কিন্তু জীবন খুবই অল্প সময়ের সমষ্টি। তাই এ সময়ে গুরুত্বপূর্ণ এ শ্রেষ্ঠ বিষয়ের অন্বেষণে কাটানো বুদ্ধিমানের কাজ।

এ কারণে তারা ভুলকে অনেক সময় সঠিক মনে করে বসেন। আবুল হাসান ইবনে ফারেস বলেন, আরবের জনৈক ভাষাপণ্ডিতকে জিজ্ঞেস করা হলো–

هَلْ يَجِبُ عَلَى الرَّجُلِ إِذَا أَشْهَدَ الْوَضُوْءَ؟

যদি কেউ 'ইশহাদ' করে তাহলে কি তার ওপর ওজু ওয়াজিব হবে? সে উত্তরে বলল, হ্যাঁ।

গ্রন্থকার বলেন, এ-জাতীয় বহু মনগড়া ফতোয়া এই ভাষাসাহিত্যিকদের থেকে প্রকাশ পেয়েছে; তবে এ ভুলটি অতিশয় মারাত্মক। তার ফতোয়ার অশুদ্ধতা যাচাইয়ের পূর্বে আমদের জেনে নেয়া উচিত যে, 'ইশহাদ' এ আরবি শব্দটি কয়েকটি অর্থে ব্যবহৃত হয়। তার একটি অর্থ : স্বাক্ষর দেয়া, আরেকটি অর্থ—মযি নির্গত হওয়া। সুতরাং কোনো শব্দ যদি একাধিক অর্থে ব্যবহৃত হয় তাহলে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের পূর্বেই তার একটি অর্থ গ্রহণ করে তদনুযায়ী ফতোয়া দেয়া চরম অন্যায়। উদাহরণস্বরূপ—ফতোয়া তলবকারী ব্যক্তি যদি বলে, কোনো মহিলার 'কুরু' চলাকালীন সময়ে তার সাথে সংগম করার কী বিধান? ভাষাবিদদের নিকট 'কুরু' শব্দটি দুই অর্থে ব্যবহৃত হয়; এক অর্থ অনুযায়ী তা হায়েজ, অন্য অর্থ অনুযায়ী 'তুহুর' সুতরাং কোনো ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ ছাড়াই মুফতী সাহেব যদি 'কুরু' কে 'তুহুর' অর্থে গ্রহণ করে বলেন, 'কুরু' চলাকালীন স্ত্রী সাথে সংগম করা জায়েজ, অথবা 'কুরু'কে 'হায়েজ' অর্থে গ্রহণ করে বলেন, 'কুরু' চলাকালীন স্ত্রীর

সাথে সংগম করা জায়েজ নয় তাহলে তা মারাত্মক ভুল হবে। সুতরাং আরবের ভাষাসাহিত্যিক যে ফতোয়া দিয়েছেন তা দুই কারণে ভুল; প্রথমত সে 'ইশহাদ' শব্দটির অর্থসমূহ ব্যাখ্যা করেনি, দ্বিতীয়ত সে ফতোয়াদানের ক্ষেত্রে শব্দটির দূরবর্তী অর্থ গ্রহণ করেছে এবং প্রচলিত অর্থ পরিহার করেছে। তদুপরি ভাষাজ্ঞানের পুঁজি নিয়েই এসব ভাষাবিদরা নিজেদেরকে ফতোয়াদানে গ্রহণযোগ্য মনে করে। এতে কোনোই সন্দেহ নেই যে, শরিয়তের বিধি-বিধান সম্পর্কে জ্ঞানস্বল্পতাই তাদেরকে এরূপ পদস্খলনে উদ্বুদ্ধ করে।

যেহেতু ভাষাসাহিত্যিকদের মূল ব্যস্ততা জাহেলি যুগের কবিতা নিয়ে, হাদিস অধ্যয়ন ও পূর্বসূরি নেককারদের জীবনেতিহাস জানা তাদের নিকট নিষ্প্রয়োজন, তাই শয়তানের প্ররোচনা ও নফসের অনুসরণ তাদেরকে ধ্বংসের অতল গহ্বরে নিক্ষেপ করে। আপনি তাদের কম লোককেই দেখবেন যারা তাকওয়ার ওপর চলেন এবং খাবারের হালাল-হারামের প্রতি সজাগ দৃষ্টি রাখেন। কেননা ভাষাসাহিত্য এমন একটি বিদ্যা যা তার অন্বেষণকারীদেরকে রাজা-বাদশাহদের দ্বারস্থ হতে উদ্বুদ্ধ করে; ফলে তারা বাধ্য হন তাদের হারাম মাল ভক্ষণ করতে। যেমন : ভাষাসাহিত্যিক আবু আলী ফারেসী দ্বারস্থ হয়েছেন বাদশাহ আদুদ দাওলার এবং লালিত-পালিত হয়েছেন তার তত্ত্বাবধানে।

শরিয়তের বিধি-বিধান সম্পর্কে তাদের জ্ঞানস্বল্পতার দরুন তারা কোনো বিষয়কে জায়েয মনে করেন, অথচ শরিয়তে তা নাজায়েয। যেমন বিখ্যাত নাহ্ভবিদ যুজাজ আবু ইসহাক ইবরাহিম বিন সারী বলেন, আমি কাসেম বিন আবদুল্লাহকে সাহিত্য শিখাতাম। একদিন আমি তাকে বললাম, আপনি যদি আপনার বাবার স্থলাভিষিক্ত হয়ে উজিরত্ব লাভ করেন তাহলে উপহারস্বরূপ আমাকে কী দেবেন? তিনি জিজ্ঞেস করলেন, আপনি কী পছন্দ করেন? আমি বললাম, আমি পছন্দ করি যে, আপনি আমাকে বিশ হাজার দিনার দেবেন। তিনিও আমাকে তা দেয়ার ব্যাপারে ওয়াদাবদ্ধ হলেন এবং এটাই ছিল চূড়ান্ত আশা। কয়েক বছর অতিবাহিত না হতেই কাসেম উজিরত্ব লাভ করে এবং আমিও তার সাথে সার্বক্ষণিক সম্পর্ক বজায় রাখি; ফলে একপর্যায়ে আমি হই তার অন্তরঙ্গ বন্ধু। উজিরত্ব লাভের পর তাকে আমার সাথে কৃত ওয়াদার বিষয়টি স্মরণ করাতে মনস্থ হই। কিন্তু উজিরত্ব লাভের তৃতীয় দিন তিনি আমাকে বললেন, হে আবু ইসহাক! আমি দেখেছি, আপনি তো ওয়াদার বিষয়টি আমাকে স্মরণ করাচ্ছেন না! অমি বললাম,

আমি তো উজির মহোদয়কে এটা স্মরণ করিয়ে দেয়া প্রয়োজন আছে বলে মনে করি না, যেহেতু এটা তার নৈতিক দায়িত্ব। কাসেম বললেন, আপনি অবশ্যই সাহায্যপ্রাপ্ত। অতঃপর বললেন, আপনাকে এ বিশ হাজার দিনার একসাথে দেয়া আমার জন্য বড় বিষয় নয়, কিন্তু আমার আশঙ্কা হচ্ছে যে, এভাবে অর্থ প্রদান করলে মানুষ আমার সমালোচনা করবে। তবে তা পর্যায়ক্রমে গ্রহণের একটি উপায় আমি আপনাকে বলছি, আপনি তা অবলম্বন করুন। আমি বললাম, আপনি যা ভালো মনে করেন। তিনি বললেন, আপনি মানুষের সামনে বসে তাদের বড় ধরনের সমস্যাগুলো চিরকুটের মাধ্যমে আমার নিকট পেশ করুন এবং তাদের সমস্যা সমাধানের বিষয়ে আমার সাথে আপনার আলোচনার জন্য তাদের থেকে বিনিময় গ্রহণ করুন। আপনার সাথে আমার ওয়াদাকৃত সম্পদ যতদিন আপনার অর্জিত না হবে ততদিন এ পদ্ধতি অব্যাহত রাখুন।

তার কথামতো আমি কাজ শুরু করলাম। প্রয়োজনগ্রস্ত লোকদের একটি করে চিরকুট আমি প্রতিদিন উজিরের সামনে পেশ করতাম, আর তিনি তাতে সই করতেন; বিনিময়ে আমি গ্রহণ করতাম মোটা অঙ্কের অর্থ। মাঝে মাঝে তিনি আমাকে জিজ্ঞেস করতেন, আমার থেকে সই নেয়ার বিনিময়ে তারা আপনাকে কত দেবে? আমি একটি পরিমাণ উল্লেখ করলে তিনি বলতেন, এ তো খুবই কম; এর বিনিময় তো আরও অনেক বেশি। সুতরাং আপনি আরও বেশি দাবি করুন। আমি লোকদের নিকট গিয়ে আরও বেশি অর্থের দাবি করলে তারা আমাকে বাড়িয়ে দিত। তিনি বললেন, একদিন বড় ধরনের একটি কাজ উদ্ধারের জন্য আমি উজিরের স্বাক্ষর নেই, বিনিময়স্বরূপ তাদের থেকে যে অর্থ আমি লাভ করি তা দ্বারা আমার বিশ হাজার দিনার পূর্ণ হয়। এভাবে কিছুদিন অতিবাহিত হলে আমার আয় বহুগুণ বৃদ্ধি পায়।

কয়েক মাস পর কাসেম আমাকে বললেন, হে আবু ইসহাক! আপনার সাথে ওয়াদাকৃত বিশ হাজার দিনার কি আপনার অর্জিত হয়েছে? আমি উত্তরে নেতিবাচক জবাব দিলে তিনি চুপ রইলেন, ফলে আমার স্বাভাবিক রীতি অনুযায়ী স্বাক্ষর করানোর বিনিময়ে মানুষ থেকে অর্থ উপার্জনের ধারা অব্যাহত রইল। প্রতিমাসেই উজির মহোদয় আমাকে জিজ্ঞেস করতেন, ওয়াদাকৃত বিশ হাজার দিনার কি অর্জিত হয়েছে? আমি উত্তরে বলতাম, না; যেন মাল উপার্জনের এ ধারা বন্ধ না হয়। একপর্যায়ে সম্পদের পাহাড় আমার হস্তগত হলে কাসেম আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, ওয়াদাকৃত বিশ

হাজার দিনার অর্জিত হয়েছে? আমি এবার মিথ্যা বলতে লজ্জাবোধ করলাম, উজির মহোদয়ের অনুগ্রহে আমার তা অর্জিত হয়েছে। তিনি তখন বললেন, আল্লাহর কসম! আপনি আমার থেকে বিপদ দূর করেছেন। আপনার জন্য তা অর্জিত হওয়ার ব্যাপারে মানসিকভাবে আমি বেশ চিন্তিত ছিলাম। অতঃপর তিনি দোয়াত-কলম হাতে নিয়ে আমার জন্য তিন হাজার দিনারের চেক লিখে তার কোষাধ্যক্ষের নিকট পাঠালে আমি তার থেকে দিনারগুলো গ্রহণ করি।

পরদিন সকালে স্বাভাবিক রীতি অনুযায়ী তার সামনে উপবেশন করলে তিনি ইশারায় বললেন, চিরকুট নিয়ে আসুন, আমি তাতে সই করে দেই। আমি বললাম, আমি আজ কারও থেকে চিরকুট গ্রহণ করিনি। কেননা আপনার সাথে আমার যে ওয়াদা ছিল তা তো পূর্ণ হয়েছে; তাই আমার জানা নেই; কিসের ভিত্তিতে আমি উজির মহোদয় থেকে সই নেব। তিনি বললেন, হায় সুবহানাল্লাহ! আপনি মনে করেন যে, আমি আপনার কাছ থেকে এ দায়িত্ব ছিনিয়ে নেব! অথচ তা আপনার অভ্যাসে পরিণত হয়েছে এবং তার মাধ্যমে আপনার অবস্থান মানুষের মাঝে সুউচ্চ হয়েছে, আর ছড়িয়ে পড়েছে আপনার খ্যাতি-সুখ্যাতি দেশের চতুর্দিকে, তদুপরি সকাল-সন্ধ্যা মানুষ দ্বারস্থ হয় আপনার কাছে। আরেকটি বিষয় হচ্ছে, আপনার থেকে এ দায়িত্ব রহিত হওয়ার কারণ তো মানুষের জানা নেই, ফলে মানুষ ধারণা করবে, আমার নিকট আপনার খ্যাতি হ্রাস পাওয়া এবং আপনার মর্যাদা ক্ষুণ্ন হওয়ার কারণেই আপনার থেকে এ দায়িত্ব রহিত করা হয়েছে। সুতরাং আপনার পূর্ব রীতির ওপর আপনি বহাল থাকুন এবং মানুষ থেকে চিরকুট গ্রহণ করে বেহিসাব অর্থ উপার্জন করুন। তখন আমি তার হাত চুম্বন করে পরদিন সকালে মানুষের চিরকুট গ্রহণ করে উজির মহোদয় থেকে স্বাক্ষর নিয়ে অর্থ উপার্জনের পথে দিনদিন অগ্রসর হই। কাসেমের মৃত্যু পর্যন্ত আমি প্রতিদিন মানুষের প্রয়োজন সম্বলিত চিরকুট তার থেকে স্বাক্ষর করাই, বিনিময়ে অর্জন করি তাদের থেকে বিপুল সম্পদ এবং গড়ে তুলি সম্পদের বিশাল পাহাড়।

গ্রন্থকার বলেন, চিন্তা করুন! শরিয়তের বিধি-বিধান সম্পর্কে জ্ঞানস্বল্পতা মানুষের সাথে কীরূপ আচরণ করে। কেননা এ বিখ্যাত ব্যাকরণবিদ ও সাহিত্যিক যদি জানত যে, অর্থ উপার্জনের যে পন্থা সে অবলম্বন করেছে তা শরিয়তে বৈধ নয়, তাহলে সে গর্ব করে তা বর্ণনা করত না। কেননা জুলুমকারীর জুলুমের বিচার এবং রাষ্ট্রের ওইসব দায়িত্ব উজিরকে নিযুক্ত

করা হয়েছে তা পালন করা তার ওপর ওয়াজিব, তার বিনিময়ে কোনোরূপ ঘুষ গ্রহণ শরিয়তে বৈধ নয়। সুতরাং যে তার দায়িত্বে নিযুক্ত নয়, তার জন্য ঘুষ গ্রহণ কীভাবে বৈধ হবে! এর মাধ্যমেই অন্যান্য বিদ্যার ওপর ইসলামি আইনশাস্ত্রের মর্তবা স্পষ্টরূপে বুঝে আসে।

কবিদের ওপর শয়তানের চক্রান্ত

গ্রন্থকার আল্লামা ইবনুল জাওযি রহ. বলেন, কবিদের ওপর শয়তান এমন চক্রান্ত খাটাতে থাকে যে, তাকে প্রলোভন দিয়ে বলে, তোমরা কবি ও সাহিত্যিক। আল্লাহ তোমাদেরকে এমন যোগ্যতা দান করেছেন, যা অন্য কারও মধ্যে নেই। এটা তোমাদের অন্যতম বিশেষত্ব। অতএব তোমাদের ভুল ত্রুটিও আল্লাহ ক্ষমা করে দেবেন। অতঃপর কবিরা এ ধারণা নিয়ে পরনিন্দা ও নির্লজ্জ কথাবার্তা বলার সুযোগ পেতে থাকে। কোনো দ্বিধা ছাড়াই নিজেদের কুকর্মের কথা প্রকাশ করতে থাকে। ন্যূনতম কবিদের মধ্যে এটা সচরাচর দেখা যায় যে, যদি তারা কারও প্রশংসা করে, তাহলে প্রশংসিত ব্যক্তি পুনরায় আবার তার কুৎসা বর্ণনার শিকার হতে পারেন—এমন আশঙ্কায় তাকে অপারগ হয়ে উপহারাদি দিতে হয়, যাতে কবি খুশি থাকেন। কখনো জনসমাবেশে কারও প্রশংসা শুরু করে দেয়। তখন লজ্জায় পড়ে তাকে কিছু দিতে হয়। এটা জবরদস্তি ও জোরপূর্বক অন্যের সম্পদ ভোগ করার সমতুল্য।

কতেক কবিকে দেখা যায়, তারা মুখে যা বলে, কাজে ও বাস্তবতায় ঘটে তার বিপরীত। অথচ আল্লাহ তায়ালার কাছে তাকওয়াশূন্য শুধু ভাষার চাতুর্যের কোনো মূল্য নেই। অনেক কবিকে দেখা যায়, তারা প্রায়শ তাকদির, ভাগ্য ও যুগের কুৎসা বর্ণনা করে বেড়ান, যা কখনো কখনো কুফরীতে গিয়ে ঠেকে।

তাদের কাউকে আবার মানুষের কাছে হাত পেতে ভিক্ষা করতেও দেখা যায়। জনৈক কবি কবিতার মাধ্যমে তার অভাব-অনটনের অবস্থা প্রকাশ করেছে এভাবে :

لان سمت همتي فِي الفضل عالية * فَإِن حظي ببطن الأَرْض ملتصق

كم يفعل الدهر بي مَا لا أسر به * وكم يسيء زمان جائر حنق

'আমার আশা-আকাঙ্ক্ষা ও মনোবল যদিও সম্মানের দিক থেকে যথেষ্ট উন্নত, কিন্তু আমার ভাগ্য ভূগর্ভে নিমজ্জিত। জমানা আমার সাথে আমার চাহিদার বিপরীত আচরণ আর কতবার করতে পারবে? আর জালেম জমানা আত্মার সাথে আর কত দুর্ব্যবহার করতে পারবে?'

কবিরা ভুলে যান যে, পাপের কারণে রিযিকের দরজা সংকুচিত হয়ে আসে এবং তা হ্রাস পেয়ে থাকে। তারা কখনো চিন্তা করার সুযোগ পায় না যে, শরিয়তের নির্দেশ পালন করা অত্যাবশ্যক। তারা নিজেদের সম্বন্ধে জ্ঞানী বলে দাবি করছে, অথচ প্রমাণ দিচ্ছে চরম অজ্ঞতার।

দক্ষ আলেমদের ওপর শয়তানের চক্রান্ত

গ্রন্থকার আল্লামা ইবনুল জাওযি বলেন, কুরআন-হাদিসের দক্ষ আলেমদের নিকট শয়তান এসে অভিনব চক্রান্তের নিত্যনতুন দ্বার তাদের সামনে উন্মোচন করে। সে তাদের অর্জিত জ্ঞান ও অন্যের নিকট পৌছানোর অপরিসীম লাভের কথা তাদের সামনে তুলে ধরে নিজেদেরকে নিজেদের নিকট বড় করে তোলে। ফলে ইল্‌ম অন্বেষণে দীর্ঘ শ্রম ব্যয় করার কারণে, শয়তান আলেমের সামনে আরাম-আয়েশের বিষয়টি উত্তম করে তোলে। সে তাকে বলে, আর কতকাল এভাবে পরিশ্রম করবে? এখন সময় এসেছে, দুঃখ-কষ্ট ও ত্যাগ-তিতিক্ষা থেকে নিজেকে একটু বিশ্রাম দাও। মন যা চায় তা ভোগ করার জন্য নিজের একটু সুযোগ খুঁজে নাও। যদি কখনো তোমার স্খলন ঘটে যায় তাহলে শাস্তি হতে ইলম তোমাকে রক্ষা করবে। এভাবে শয়তান আলেমের সামনে স্বীয় শ্রেষ্ঠত্বের কথা বারবার তুলে ধরে। এমতাবস্থায় এ বান্দা যদি শয়তানের চক্রান্ত হতে রক্ষা পেতে ব্যর্থ হয় এবং শয়তানের চক্রান্তের ফাঁদে পা দেয়, তাহলে সে ধ্বংস হবে। আর যদি সে আল্লাহর অনুগ্রহে চক্রান্ত হতে রেহাই পায়, তবে শয়তানকে সোজাসুজি তিনটি কথা জানিয়ে দেয়া উচিত :

১. আলেমের শ্রেষ্ঠত্ব তার আমলের ওপর নির্ভরশীল। সুতরাং যদি ইল্‌ম অনুযায়ী আমল না থাকে তাহলে সে ইল্‌ম অর্থহীন। আমি যদি ইল্‌ম অনুযায়ী আমল না করি তাহলে তো আমি ওই ব্যক্তির মতো হয়ে যাব যে ইলমের উদ্দেশ্য বুঝতে অক্ষম। এছাড়া আমার দৃষ্টান্ত হবে ওই ব্যক্তির মতো, যে খাবার জমা করে ক্ষুধার্তদেরকে খাইয়েছে কিন্তু নিজে তা থেকে

ভক্ষণ করেনি, ফলে সে খাবার ক্ষুধা নিবারণে তার জন্য অনর্থক বলে বিবেচ্য।

২. আমলবিহীন আলেমের নিন্দা প্রকাশ করে যেসব হাদিস বর্ণিত হয়েছে তা স্মরণ করে শয়তানের বিরোধিতা করা। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন—'কেয়ামতের দিন সর্বাধিক কঠিন শাস্তি ওই আলেমের হবে, যে তার ইল্‌ম দ্বারা উপকৃত হয়নি।'[১] অন্য রেওয়ায়েতে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন—'কেয়ামতের দিন এক ব্যক্তিকে উপস্থিত করে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হলে তার নাড়িভুঁড়ি বের হয়ে জাহান্নামে পড়ে যাবে; তখন সে তার চতুষ্পার্শ্বে এমনভাবে ঘুরবে যেভাবে গাধা জাতাকলের চতষ্পার্শ্বে ঘোরে। তখন জাহান্নামবাসী তার নিকট সমবেত হয়ে বলবে, হে অমুক! তোমার এ অবস্থা কেন? তুমি না আমাদের সৎকাজের আদেশ করতে এবং অসৎকাজ থেকে বারণ করতে? সে তখন বলবে, আমি তোমাদেরকে সৎকাজের আদেশ করতাম কিন্তু নিজে তা করতাম না, আর তোমাদেরকে অসৎকাজ থেকে বারণ করতাম কিন্তু নিজেই তাতে লিপ্ত হতাম।'[২] হজরত আবুদ্দারদা রা. বলেন, 'যে জানে না তার ধ্বংস একবার, আর যে জানে কিন্তু আমল করে না তার ধ্বংস সাতবার।'

৩. ইলম থাকা সত্ত্বেও আমল না করার কারণে যেসব আলেম ধ্বংস হয়েছে তাদের শাস্তির কথা স্মরণ করা, যেমন—ইবলিস ও বালআম প্রমুখ। অবশ্য বেআমল আলেমের নিন্দা প্রকাশের জন্য আল্লাহ তায়ালার একটি উদাহরণই যথেষ্ট। আল্লাহ তায়ালা বলেন,

كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا

'যাদেরকে তাওরাতের দায়িত্বভার দেয়া হয়েছিল তারপর তারা তা বহন করেনি, তারা গাধার মতো! যে বহু কিতাবের বোঝা বহন করে।'[৩]

---

১ [খুব দুর্বল] আলবানি রহ. প্রণীত যঈফুল জামে : হাদিস নং ৮৬৮, আয্‌যাঈফাহ : হাদিস নং ১৬৩৪

২ সহিহ বুখারি : হাদিস নং ৩২৬৭, সহিহ মুসলিম : হাদিস নং ২৯৮৯

৩ সুরা জুমু'আ : আয়াত ৫

শয়তানের ধোঁকার ক্ষেত্রে আলেমদের শ্রেণি

যে সকল আলেম ইলম অনুযায়ী আমল করেন, তাদেরকেও শয়তান তার চক্রান্তের জালে আটকায়। তবে চক্রান্তের পদ্ধতি ভিন্নরকম। শয়তান তাদের মনে ইলমের কারণে অহংবোধ, সমকক্ষদের প্রতি কটাক্ষ ও বিদ্বেষভাব এবং নেতৃত্বলাভের জন্য আত্মপ্রদর্শনের প্রতি প্ররোচনা জোগাতে থাকে। কখনো সে তাদেরকে প্ররোচনা দিয়ে বলে, এটা তো তোমাদের প্রাপ্য অধিকার; আবার কখনো তা অর্জনের ভালোবাসা তাদের মনে দৃঢ়ভাবে গেঁথে দেয়। ফলে তা ভুল হওয়া সত্ত্বেও তা অর্জনের চেষ্টায় ফের তারা প্রয়াসী হয়ে ওঠে। এ থেকে পরিত্রাণের উপায় হলো, অহংকার, বিষোদ্গার, অবজ্ঞা, বিদ্বেষ ও আত্মপ্রচারের পরিণামফল গভীরভাবে চিন্তা করা এবং নিজেকে এ বিষয় মনোযোগী করা যে, এসব পাপের শাাস্তি প্রতিহত করার শক্তি ইলমের নেই, বরং ইলমের ভিত্তিতে দলিল-প্রমাণ দৃঢ় হওয়ার কারণে শাস্তির পরিমাণই কেবল বাড়াবে। আমাদের আকাবির আমলদার ওলামায়ে কেরামের জীবনাদর্শ গভীরভাবে চিন্তা করলে অন্তর অবশ্যই শান্ত হবে এবং অহংকার প্রদর্শন সে কিছুতেই করবে না। আর আল্লাহর মারেফত যে অর্জন করবে সে অবশ্যই রিয়া তথা আত্মপ্রদর্শনের নিন্দা করবে। আর যে এ বিষয়টি লক্ষ রাখে যে, মানুষের ভাগ্যের চাকা আল্লাহর ইচ্ছা অনুপাতে ঘোরে, সে কিছুতেই হিংসা করবে না।

অনেক আলেমের ওপর শয়তান ধোঁকার ক্ষেত্রে এমন কৌশলও অবলম্বন করে, যা অতি সূক্ষ্ম। সে তাদেরকে বলে, উচ্চ মর্যাদালাভের চেষ্টা তোমাদের জন্য অহংকার নয়; কেননা তোমরা হলে শরিয়তের প্রতিনিধি, ফলে তোমাদের মর্যাদা উঁচু হলে শরিয়তের মর্যাদাও বৃদ্ধি পাবে। সুতরাং উচ্চ মর্যাদালাভের জন্য তোমাদের চেষ্টা—এটা তো দীনেরই স্বার্থে; যা দ্বারা দীন শক্তিশালী হবে এবং বিদয়াত ধ্বংস হবে। শয়তান আলেমকে আরও প্রলুব্ধ করে বলে, ইসলামবিদ্বেষীর প্রতি ক্ষুব্ধ হয়ে তার সমালোচনায় নিজ জবান ব্যবহার করার ক্ষোভ তো নিজের স্বার্থে নয়; বরং তা শরিয়তের স্বার্থে, আর শরিয়ত তো এমন হিংসুকেরই নিন্দা করে যার হিংসা হয় নিজ স্বার্থ হাসিলের উদ্দেশ্যে। আর তোমরা যে বিষয়টি রিয়া মনে করছ তা মূলত রিয়া নয়, কেননা তোমরা যদি বিনয় ও ক্রন্দনের ভান করো তাহলে মানুষ তোমাদের অনুসরণ করবে, যেভাবে ডাক্তারের অনুসরণ করে। অর্থাৎ ডাক্তার যদি স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর বস্তু পরিহারের পরামর্শ দেন তাহলে

মানুষ তার কথার অনুসরণ যতটুকু করবে, তার চেয়ে বেশি অনুসরণ করবে যদি ডাক্তার নিজে তা পরিহার করেন।

উপরোক্ত ব্যাপারে শয়তানের ধোঁকা হওয়ার দলিল হলো, কোনো অহংকারী যদি অন্য আলেমের সাথে অহংকারসুলভ আচরণ করে এবং মজলিসে তার চেয়ে উঁচু আসনে বসে অথবা কোনো হিংসুক যদি তার মানহানি করে, তাহলে সে ওই পরিমাণ ক্ষুব্ধ হবে না যে পরিমাণ ক্ষুব্ধ হবে এসব আচরণ তার সাথে করা হলে। সুতরাং আলোচিত এ আলেম যদি শরিয়তের সত্যিকার প্রতিনিধি হতো তাহলে সে অন্য আলেমের মানহানিতেও ওই পরিমাণ ক্ষুব্ধ হতো যে পরিমাণ ক্ষুব্ধ নিজের মানহানিতে হয়; কেননা আলেমের মানহানি তো ইলমেরই মানহানি।

অন্যদিকে রিয়া বা আত্মপ্রচার তো এমন একটি বিষয়—শরিয়তে যার অবকাশ কোনো মুসলমানের জন্য নেই, আর মানুষকে নিজের প্রতি আকৃষ্ট করার জন্য রিয়ার পথ অবলম্বনও শরিয়তসম্মত নয়। আইয়ুব সাখতিয়ানির অবস্থা তো এমন, তিনি কোনো হাদিস বর্ণনা করলে ভীত-শঙ্কিত হয়ে চেহারা মুছতে বলতেন, কী ভীষণ ঠান্ডা। তদুপরি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর একটি হাদিসই শয়তানের জালে আটকে পড়ার জন্য যথেষ্ট। এছাড়া আমলের প্রতিদান নিয়তের ওপর নির্ভরশীল। এই শ্রেণির আলেমদের কতক এমনও আছেন, তাদের সামনে যখন অন্যের দোষ বর্ণনা করা হয় তারা মনে মনে আনন্দিত হন। অথচ এ কারণে সে তিন প্রকার গুনাহের সম্মুখীন হয়,

১. গীবতকারী থেকে নাফরমানি প্রকাশ পাওয়া সত্ত্বেও আনন্দিত হওয়া।
২. মুসলমানের সমালোচনায় আনন্দিত হওয়া এবং
৩. তার উপস্থিতিতে নাফরমানি হওয়া সত্ত্বেও প্রতিবাদ না করা।

আলেম লেখক ও গ্রন্থকারদের ওপর শয়তানের চক্রান্ত

অনেক প্রখ্যাত আমলদার আলেম রাত জেগে তাহাজ্জুদ পড়েন এবং সারাদিন লেখালেখি ও গ্রন্থ রচনার কাজে মগ্ন থাকেন। শয়তান তাদেরকে এই বলে ধোঁকা দেয় যে, এর দ্বারা তো দীনের বেশ প্রচার হচ্ছে। তবে ক্রমান্বয়ে শয়তান ধোঁকার কৌশল পরিবর্তন করে। ফলে তাদের অভ্যন্তরীণ উদ্দেশ্য হয় লোকসমাজে আলোচিত হওয়া, খ্যাতি-সুখ্যাতি উঁচু হওয়া,

নেতৃত্বের আসনে সমাসীন হওয়া এবং লেখকের নিকট দূরদূরান্ত হতে লোকজনের আগমন ঘটা।

শয়তানের এ ধোঁকা সম্পর্কে অবগত হওয়ার উপায় হলো, যদি মানুষ তার গ্রন্থ দ্বারা দ্বিধাহীনভাবে উপকৃত হয় কিংবা ইলমে তার সমকক্ষ কারও সামনে তা পড়ে শুনানো হয় এবং গ্রন্থকারের নাম উল্লেখ করা না হয় তবুও সে আনন্দিত হবে, যদি তার উদ্দেশ্য হয় ইলমের প্রচার-প্রসার। আমাদের আকাবির তথা মনীষীগণ বলেন, ইলমের কোনো অধ্যায় আমার জানা হলে আমি পছন্দ করি যে, মানুষ যেন তা আমার থেকে শিখে উপকৃত হয়, কিন্তু শিখার বিষয়টি আমার দিকে সম্পৃক্ত না করে।

এ ধরনের আলেম লেখকদের অনেকে এমনও আছেন, যারা অধিক অনুসারী দেখে আনন্দিত হন। আর শয়তানও তাদের মনে এ ধারণা দেয় যে, এই আনন্দ তো ইলম অন্বেষণকারীদের আধিক্যের কারণে, যা দূষণীয় নয়। অথচ তার অভ্যন্তরীণ উদ্দেশ্য হয় ছাত্রের আধিক্য দ্বারা তার খ্যাতি ও সুনাম যেন ছড়িয়ে পড়ে দিগ্বিদিক। এ ক্ষেত্রে শয়তানের ধোঁকা বোঝার উপায় হলো, যদি আগত ছাত্রদের কেউ তার চেয়ে অধিক ইলমের অধিকারী কোনো আলেমের দরবারে চলে যায় তাহলে তার মন ব্যথিত হয়; অথচ এটা কোনো মুখলিস তথা নিরেট ও নিষ্কলুষ শিক্ষকের বৈশিষ্ট্য হতে পারে না। কেননা মুখলিস শিক্ষকের উপমা হলো ওই চিকিৎসকের ন্যায় যারা আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের আশায় রোগীদের চিকিৎসা করেন। যদি কোনো রোগী তাদের অনুরূপ কোনো ডাক্তারের চিকিৎসায় সুস্থতা লাভ করে তাহলে অন্য ডাক্তারও এতে খুশি হন। একবার আবদুর রহমান ইবনে আবু লায়লা বলেন, আমি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর একশত বিশজন আনসার সাহাবির সাক্ষাৎ পেয়েছি, কোনো লোক যদি তাদের কাউকে কোনো বিষয়ে জিজ্ঞেস করত তাহলে তিনি মনে করতেন, এ বিষয়ে সমাধানের জন্য আমার আনসারি ভাই যথেষ্ট, আর যদি কোনো হাদিস বর্ণনা করতেন তাহলে সে মনে করতেন, এ হাদিস বর্ণনার জন্য আমার আনসারি ভাই যথেষ্ট।

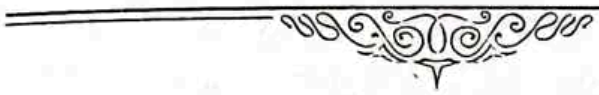
গ্রন্থকার আল্লামা ইবনুল জাওযি রহ. বলেন, কামেল আলেমগণ কখনো কখনো শয়তানের বাহ্যিক ধোঁকা হতে নিষ্কৃতি পান, কিন্তু শয়তান তাদেরকে সূক্ষ্ম কৌশলে ধোঁকা দেয়। সে তাদেরকে বলে, তোমার মতো মহান ব্যক্তি আমি দেখিনি। তুমি শয়তানের প্রতারণা খুব ভালো করে

বোঝে। শয়তানের এ কথায় যদি সে স্বস্তি অনুভব করে তাহলে দম্ভ-অহংকারে সেই আলেম ধ্বংসের অতল গহ্বরে নিক্ষিপ্ত হতে পারে।

সাররি সাকতি রহ. বলেন, যদি কোনো ব্যক্তি এমন বাগানে প্রবেশ করে যাতে আল্লাহর সৃষ্ট সকল প্রকার গাছ রয়েছে এবং ওইসব গাছের ডালে আল্লাহর সৃষ্ট সকল প্রকার পাখি রয়েছে এবং প্রত্যেক পাখি যদি নিজ নিজ ভাষায় তাকে বলে, আস্‌সালামু আলাইকা ইয়া ওলিয়্যাল্যাহ! আর তখন যদি সে তাদের কথায় স্বস্তি অনুভব করে তাহলে যেন সে শয়তানের খপ্পড়ে পড়ে গেল। আল্লাহ তায়ালাই হেদায়াত দেন তিনি ছাড়া কোনো মাবুদ নেই।

সপ্তম অধ্যায়

শাসক ও রাজা-বাদশাহদের ওপর শয়তানের চক্রান্ত



গ্রন্থকার আল্লামা ইবনুল জাওযি রহ. বলেন, শাসক ও রাজা-বাদশাহদেরকে শয়তান তার চক্রান্তে ফেলার জন্য বহু পন্থা অবলম্বন করে। এখানে শয়তানের বড় ধরনের কিছু চক্রান্তের উল্লেখ করা হচ্ছে :

প্রথম চক্রান্ত : তাদের মনে শয়তান এ প্ররোচনা দেয় যে, তারা আল্লাহর প্রিয় বান্দা, কেননা তারা যদি আল্লাহর প্রিয় না হতেন তাহলে আল্লাহ তাদেরকে নেতৃত্ব ও বাদশাহি দান করতেন না এবং বান্দাদের মাঝে নেতৃত্বদানের জন্য তাদেরকে আল্লাহর প্রতিনিধি মনোনীত করতেন না। এ ক্ষেত্রে শয়তানের ধোঁকা বোঝার উপায় হচ্ছে, তারা যদি প্রকৃতপক্ষে আল্লাহর প্রতিনিধি হয় তাহলে যেন শরিয়ত মোতাবেক দেশ পরিচালনা করে এবং আল্লাহর সন্তুষ্টির পথে চলে। তাহলে আল্লাহর আনুগত্যের কারণে তারা আল্লাহর প্রিয় বলে বিবেচিত হতে পারেন। অন্যদিকে দুনিয়ার নেতৃত্ব, বাদশাহি ও রাজত্ব এমন একটি বিষয়, যা আল্লাহ এমন অনেককে দিয়েছেন যাদেরকে তিনি ঘৃণা করেন। দুনিয়ার ধন-দৌলতের দ্বার এমন অনেকের জন্য খুলে দিয়েছেন যাদের প্রতি তিনি করুণার দৃষ্টিতে তাকান না। আবার এদের একদলকে ক্ষমতা দিয়েছেন আল্লাহর ওলী-আউলিয়াদের ওপর জুলুম-নির্যাতন করার, ফলে তারা তাদের অনেককে হত্যা করেছে, কাউকে আবার পরাভূত করেছে। ফলে আল্লাহপ্রদত্ত ক্ষমতা উপকারের পরিবর্তে তাদেরকে ধ্বংসের অতল গহ্বরে ঠেলে দিয়েছে। তদুপরি তারা আল্লাহর ঘোষিত পাপিষ্ঠদের দলভুক্ত হয়েছে। আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন,

إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُوا إِثْمًا

'আমি তো তাদেরকে অবকাশ দেই যাতে তারা পাপ বৃদ্ধি করে।'[১]

দ্বিতীয় চক্রান্ত : শয়তান তাদেরকে বলে, রাষ্ট্রপ্রধানের জন্য প্রভাব ও প্রতাপশালী হওয়া জরুরি। এই প্ররোচনায় পড়ে তারা অহংকারবশত ইলম অন্বেষণ ও আলেমদের সাহচর্য থেকে বিরত থেকে নিজেদের পরকাল বরবাদ করে। অথচ এ বিষয়টি তো পরিষ্কার যে, মানুষ যাদের সঙ্গ গ্রহণ করে তাদের গুণ-বৈশিষ্ট্য তার মাঝে প্রবেশ করে। সুতরাং যদি সে এমন ব্যক্তির সঙ্গ গ্রহণ করে যে দুনিয়ার ভোগ-বিলাসে প্রভাবিত, ধর্মের বিধি-বিধান সম্পর্কে অজ্ঞ, তাহলে তার মন্দ বৈশিষ্ট্যগুলো তার মাঝে প্রবেশ

---

১ সুরা আলে ইমরান : আয়াত ১৭৮

করবে। তদুপরি সে তাকে বলবে না এমন পথ অবলম্বনের যাতে তার কল্যাণ নিহিত এবং সতর্ক করবে না এমন পথে পরিচালিত হতে যা তার জন্য ক্ষতিকর, ফলে তার সঙ্গগ্রহণ হবে অনন্তকালের সুখবঞ্চিত হওয়ার অন্যতম কারণ।

তৃতীয় চক্রান্ত : রাজা-বাদশা ও নেতৃত্বস্থানীয় লোকদেরকে শয়তান শত্রুর ভয় দেখায় এবং নিরাপত্তা জোরদার করার নির্দেশ দেয়। এতে মজলুম জনসাধারণ তাদের কাছে নির্যাতনের কথা বলার সুযোগ পায় না এবং এসব রাজা-বাদশারা জুলুম বন্ধের কোনো উদ্যোগও গ্রহণ করে না। উপরন্তু তারা এমন বিপদের সম্মুখীন হয় যে সম্পর্কে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন—

مَنْ وَلَّاهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ شَيْئًا مِنْ أَمْرِ الْمُسْلِمِينَ فَاحْتَجَبَ دُونَ حَاجَتِهِمْ، وَخَلَّتِهِمْ وَفَقْرِهِمْ، احْتَجَبَ اللَّهُ عَنْهُ دُونَ حَاجَتِهِ وَخَلَّتِهِ، وَفَقْرِهِ

'আল্লাহ তায়ালা যাকে মুসলমানদের কোনো বিষয়ে কর্তৃত্ব অর্পণ করেছেন, সে যদি অবজ্ঞাবশত তাদের প্রতি ভ্রুক্ষেপ না করে, তাদের প্রয়োজন উপস্থাপনের পথে বাধা সৃষ্টি করে তাহলে কেয়ামতের দিন আল্লাহ তায়ালা তাদের প্রতি ভ্রুক্ষেপ করবেন না এবং তাদের কোনো প্রয়োজন পূরণ করবেন না।'[১]

চতুর্থ চক্রান্ত : শাসকবর্গ রাষ্ট্রের দায়িত্ব পালনে এমন লোক নিয়োগ দেয়ার নির্দেশ দেয়, যার দায়িত্ব পালনের যোগ্যতা নেই এবং শরিয়তের জ্ঞানও নেই। ফলে সাধারণ মানুষের ওপর অত্যাচার ও নির্যাতনের কারণে মানুষের বদদোয়া নেয়। ক্রয়-বিক্রয়ে শরিয়তপরিপন্থী নীতি নির্ধারণ করে তারা মানুষের জন্য হারাম রিযিকের ব্যবস্থা করে এবং এমন ব্যক্তির ওপর শাস্তি প্রয়োগ করে, যে শাস্তির উপযোগী ছিল না। অথচ এ সব শাসকবর্গ ধারণা করে, তারা জনগণের দায়িত্ব অন্যের ওপর ন্যস্ত করেই আল্লাহর কাছে জবাবদিহিতা থেকে নিষ্কৃতি পেয়েছে। এবার তার মনোনীত লোক ন্যায় করল নাকি অন্যায় করল, সেদিকে সে আর ভ্রুক্ষেপ করে না।

পঞ্চম চক্রান্ত : শয়তান তাদেরকে নিজেদের মনমতো কাজ করাকে নন্দিত করে দেখায়। এতে তারা এমন ব্যক্তির হাত কাটে, যা শরিয়তসম্মত নয়।

---

১ সুনানে আবি দাউদ : ২৯৪৮; তিরমিযি : ১৩৩২-১৩৩৩; মুসতাদরাকে হাকিম : ৪/৯৩, ৯৪; আলবানি রহ. সংকলিত সহিহুল জামে' : হাদিস নং ৬৫৯৫, আস্‌সাহীহ্ : হাদিস নং ৬২৯

এমন ব্যক্তিকে হত্যা করে, যাকে হত্যা করা তার জন্য বৈধ নয়। শয়তানের প্ররোচনায় তারা মনে করে রাজনীতির খাতিরে এমন করা বৈধ। তারা আরও মনে করে, শরিয়তে এ বিষয়ে অপূর্ণতা রয়েছে, তাই তা পূর্ণ করা প্রয়োজন। তারা এটাকে তাদের আওতাভুক্ত বলে ভেবে নিয়েছে। এসব শাসক ও ক্ষমতাসীনদের জেনে রাখা উচিত—তারা যা করছে এবং যা বাস্তবায়ন করছে তা শয়তানের জঘন্যতম চক্রান্ত। কেননা শরিয়ত হচ্ছে ঐশী নীতিমালা, আর আল্লাহর নীতিমালায় কোনোরূপ অপূর্ণতা থাকা কি সম্ভব? আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন,

مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ

'আমি কুরআনে মানুষের প্রয়োজনীয় কোনো বিষয় বর্ণনা করতে ত্রুটি করিনি।'[২] অন্য আয়াতে আল্লাহ তায়ালা বলেন,

لَا مُعَقِّبَ لِحُكْمِهِ

'আল্লাহর বিধানে হ্রাস-বৃদ্ধি করার ক্ষমতা কারও নেই।'[৩] সুতরাং যারা রাজনৈতিকভাবে কোনো নীতি নির্ধারণের পদক্ষেপ গ্রহণ করে তারা প্রকারান্তরে এ কথার দাবিদার যে, শরিয়ত অসম্পূর্ণ। অথচ তারা যা ধারণা করছে তা একপ্রকার কুফরি মতবাদ।

বাদশাহ আদুদ দাওলার ঘটনায় আমরা জানতে পারি—তিনি এক বাঁদির প্রতি আকৃষ্ট ছিলেন, ফলে সর্বদা মনে তার চিন্তা ঘুরপাক খেত। তাই একদিন তিনি বাঁদিকে চুবিয়ে মারার নির্দেশ দিলেন, যেন রাষ্ট্র পরিচালনায় তার মন উদাসীন না হয়। অথচ এটা এমন পাগলামি যার উপমা ইতিহাসে নেই। কেননা বিনা অপরাধে মুসলমান হত্যার বৈধতা শরিয়তে নেই, আর তা বৈধ মনে করা তো কুফরির নামান্তর। পক্ষান্তরে যদি তার অবৈধতা বিশ্বাস করে, কিন্তু রাষ্ট্রের জন্য কল্যাণকর বিবেচনায় তা বাস্তবায়ন করে তাহলে জেনে রাখা উচিত—শরিয়তের বিরোধিতায় কোনো কল্যাণ নেই।

ষষ্ঠ চক্রান্ত : শয়তান তাদেরকে সাধারণ মানুষের সম্পদ দ্বারা বিলাসী জীবনযাপন এবং আমোদ-প্রমোদে লিপ্ত হতে প্ররোচনা জাগায়। আর তাদের মনে এ ধারণা বদ্ধমূল করে যে, এসব সম্পদ তো তোমাদেরই

---

২ সুরা আনআম : আয়াত ৩৮
৩ সুরা রাআদ : আয়াত ৪১

আয়ত্তাধীন; সুতরাং তা ব্যবহারের স্বাধীনতা তোমাদের রয়েছে। নেতৃস্থানীয় এসব ব্যক্তিবর্গের জেনে রাখা উচিত—তারা যে ধারণার বশীভূত হয়ে জনগণের মাল আত্মসাৎ করেছেন তা শয়তানের গভীর চক্রান্ত। কেননা শরিয়ত নিজের সম্পদ ব্যবহারেও মিতব্যয়ী হওয়ার নির্দেশ প্রদান করে। তাহলে ওই ব্যক্তির অবস্থা কেমন হওয়া উচিত—জনগণের সম্পদ রক্ষণাবেক্ষণে যাকে নিযুক্ত করা হয়েছে! সুতরাং মনযোগ দিয়ে শুনুন, রাষ্ট্রের সম্পদ আপনি ততটুকু ভোগ করতে পারেন যতটুকু পরিশ্রম আপনার ব্যয় হয়, এতে বিলাসিতার সুযোগ শরিয়তে নেই।

ইবনে আকিল বলেন, হাম্মাদ রাভিয়া ওয়ালিদ ইবনে ইয়াযিদকে একবার কয়েক লাইন কবিতা শোনালে ওয়ালিদ তাকে উপহারস্বরূপ দু'টি বাঁদি ও পঞ্চাশ হাজার দিরহাম হাদিয়া দেয়। আল্লামা ইবনুল জাওযি বলেন, যদিও এ ঘটনাটি তার প্রশংসার উদ্দেশ্যে বর্ণনা করা হয় কিন্তু তার এ কাজটি জঘন্যতম অপরাধ, কেননা সে মুসলমানদের সম্পদকে চরম অপমানজনকভাবে অপচয় করেছে।

সপ্তম চক্রান্ত : শয়তান তাদেরকে অপকর্মের ক্ষেত্রে বেপরোয়া হতে প্রলুব্ধ করতে থাকে। সে তাদের মনে এ ধারণা বদ্ধমূল করে যে, দেশের নিরাপত্তা ও রাস্তা-ঘাটের সংস্কার তোমাদেরকে এসব গুনাহের শাস্তি থেকে রক্ষা করবে। তাদের এসব অমূলক ধারণার জবাব হলো, দেশের নিরাপত্তা ও রাস্তা-ঘাট সংস্কারের উদ্দেশ্যেই তাদেরকে নিযুক্ত করা হয়েছে, এসব দায়িত্ব পালন তো তাদের ওপর আবশ্যক। আর তারা যে বেপরোয়া পাপকর্মে লিপ্ত হয় সেটা শরিয়তে নিষিদ্ধ। সুতরাং যে দায়িত্ব পালন তাদের উপর ওয়াজিব তা কী করে তাদের গুনাহ মাফের কারণ হতে পারে?

অষ্টম চক্রান্ত : দেশের কেউ অপরাধ করলে কিংবা সম্পদে খেয়ানত করলে বেত্রাঘাত ও শাস্তি প্রয়োগের মাধ্যমে অপরাধ স্বীকার ও সম্পদ বের করতে শয়তান তাদেরকে উদ্বুদ্ধ করে। অথচ এটা শরিয়তসমর্থিত পন্থা নয়। শরিয়তের বিধান হলো, অপরাধী ও খেয়ানতকারীর বিপক্ষে যুক্তিসংগত প্রমাণ পেশ করা।

ওমর ইবনে আবদুল আযিযের সময় এক গভর্নর পত্রযোগে তাকে অবহিত করল, এখানকার এক সম্প্রদায় আল্লাহর মালে খেয়ানত করেছে। তাদের ওপর শাস্তি প্রয়োগ ব্যতীত সে মাল দখল করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। তখন পত্রের জবাবে ওমর লেখেন, তাদের রক্ত নিয়ে আল্লাহর সামনে

উপস্থিত হওয়ার চেয়ে আল্লাহর সামনে তাদের খেয়ানত পেশ করা অধিক প্রিয় বলে আমি মনে করি।

নবম চক্রান্ত : ইবলিস ক্ষমতাসীনদেরকে মানুষের সম্পদ জবরদখলের পর সদকা করতে উদ্বুদ্ধ করে এবং তাদের মনে এ ধারণা দেয় যে, আল্লাহর রাস্তায় তোমার সদকা করা সম্পদ জবরদখলের ক্ষতিপূরক হবে। আর সে এ কথাও বলে, আল্লাহর পথে এক দিরহাম সদকা করা দশবার জবরদখলের ক্ষতিপূরক। তাদের জেনে রাখা উচিত, শয়তান তাদের মনে যে ধারণা দেয় তা একটি অসম্ভব বিষয়। কেননা অন্যের সম্পদ জবরদখল এমন একটি গুনাহ যা সদকা দ্বারা মাফ হয় না, যতক্ষণ না হকদার তা মাফ করেন। আর সদকা যদি জবরদখলের মাল থেকে দেয়া হয় তাহলে তা কবুল হবে না, আর যদি হালাল সম্পদ থেকে দেয়া হয় তবুও তা জবরদখলের গুনাহের ক্ষতিপূরক হবে না। কেননা ফকিরকে দান করা অন্যের হক আদায়ের সমার্থক নয়। মানুষের সম্পদ অন্যায়ভাবে ভক্ষণ করা অন্যায়ভাবে প্রহার করা, গালি দেয়া, তাদের ওপর বাড়াবাড়ি করা, দুর্বলদের ওপর চড়াও হওয়া ও অন্যান্য যে সকল কাজে মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হয় তা সবই যুলুম। আল্লাহ্ জাল্লা শানুহূ বলেন,

وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ.

'অত্যাচারীরা শীঘ্রই জানবে তাদের গন্তব্যস্থল কোথায়।'[১] রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন—'তোমরা যুলুম করা থেকে বেঁচে থাকো, কারণ যুলম কেয়ামতের দিন গভীর অন্ধকারে পরিণত হবে।'[২]

দশম চক্রান্ত : শয়তান তাদেরকে অপকর্মে লেগে থাকার পাশাপাশি নেককারদের সাথে সাক্ষাৎ ও তাদের থেকে দোয়া নিতে উদ্বুদ্ধ করে, আর তাদের মনে এ ধারণা বদ্ধমূল করে যে, এসবের দ্বারা অপকর্মের গুনাহ মোচিত হবে। অথচ তাদের এ নেককর্ম তাদের বদকর্মের গুনাহ প্রতিহত করার ক্ষমতা রাখে না।

হুসাইন বিন যিয়াদ বলেন, আমি মানি'কে বলতে শুনেছি, এক ব্যবসায়ী কয়েকজন ট্যাক্স আদায়কারীর পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় তারা তার জাহাজ আটকে রাখে। ব্যবসায়ী মালেক বিন দিনারের নিকট গমন করে পূর্ণ ঘটনা

---

১ সুরা আশ-শু'আরা : ২২৭

২ সহিহ মুসলিম : হাদিস নং ৪৬৭৫

খুলে বললে তিনি পায়ে হেঁটে ঘটনাস্থলে উপস্থিত হন। লোকেরা তাকে দেখে বলল, হে আবু ইয়াহইয়া, (মালেক বিন দিনারের উপনাম) আপনার প্রয়োজনে আমাদের কাছে কাউকে পাঠালেই হতো! তিনি বললেন, আমার প্রয়োজন হচ্ছে তোমরা এই লোকের জাহাজ নিরাপদে ফিরিয়ে দাও। তারা বলল, আমরা আপনার কথা মানলাম এবং নিরাপদে তার জাহাজ ফিরিয়ে দিলাম।

এদের সাথে একটি মগ ছিল, মানুষ থেকে যে দিরহাম তারা ট্যাক্স হিসাবে নিত তা এই মগে জমা করত। তারা বলল, হে আবু ইয়াহইয়া! আমাদের জন্য দোয়া করুন। তিনি বললেন, মগের নিকট দোয়া চাও, মগ তোমাদের জন্য দোয়া করবে। তোমাদের জন্য আমি কীভাবে দোয়া করব? অথচ হাজার মানুষ তোমাদের জন্য বদদোয়া করছে! তোমরা কি মনে করো যে, আল্লাহ হাজার লোককে উপক্ষা করবেন করে এক ব্যক্তির ডাকে সাড়া দেবেন?

একাদশ চক্রান্ত : অনেক ক্ষমতাসীন ঊর্ধ্বতন নেতার আদেশে অন্যের উপর জুলুম করে, আর শয়তান তাদের মনে এ ধারণা দেয় যে, তুমি যুলুম-নিপীড়ন নিশ্চিন্তে চালিয়ে যাও, কেননা অত্যাচারের পাপ আদেশদাতার আমলনামায় জমা হবে—তুমি এ থেকে সম্পূর্ণ দায়মুক্ত। তাদের জেনে রাখা উচিত—শয়তান তাদের মনে যে ধারণা দেয় তা এক গভীর ষড়যন্ত্র; কেননা সে তো অত্যাচারের সহযোগী। আর নাফরমানিতে সাহায্যকারী প্রত্যেক ব্যক্তি নাফরমান হিসাবে গণ্য হবে। কেননা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়া সাল্লাম মদের ক্ষেত্রে দশ ব্যক্তির উপর লানত করেছেন, তাদের একজন হলো মদপানে সাহায্যকারী। অনুরূপভাবে যে ব্যক্তি যুলুমের সরঞ্জাম সরবরাহ করে সেও যুলম বাস্তবায়নে সাহায্যকারী হিসাবে গণ্য হবে।

জাফর বিন সুলাইমান বলেন, আমি মালেক ইবনে দিনারকে বলতে শুনেছি, কোনো ব্যক্তি খেয়ানতকারী হওয়ার জন্য বায়তুল মালের সম্পদ আত্মসাৎকারীদের সহযোগিতা করাই যথেষ্ট।

অষ্টম অধ্যায়

ইবাদতের ক্ষেত্রে আবেদদের ওপর শয়তানের চক্রান্ত

গ্রন্থকার আল্লামা ইবনুল জাওযি রহ. বলেন, মানুষের হৃদয়রাজ্যে শয়তানের অবগাহনের প্রধান দরজা হচ্ছে শরিয়তের বিধি-বিধান সম্পর্কে তাদের অজ্ঞতা। এ কারণে ধর্মীয় বিধি-বিধান সম্পর্কে অজ্ঞ ব্যক্তির হৃদয়কুঠরিতে শয়তান অনায়াসে প্রবেশের সুযোগ পায়। অন্যদিকে ধর্মীয় বিধি-বিধান সম্পর্কে ওয়াকিফহাল ও প্রাজ্ঞ ব্যক্তির হৃদয়ে খুবই সতর্কতার সাথে গোপনে অনুপ্রবেশ ঘটে শয়তানের। ধর্মীয় বিধি-বিধান সম্পর্কে জ্ঞানস্বল্পতার কারণেই শয়তান বহু আবেদকে ধোঁকায় ফেলার প্রয়াস পায়। ফলে অধিকাংশ আবেদ কেবল ইবাদত নিয়েই ব্যস্ত হয়ে পড়ে। তারা না ইলমের গভীরে প্রবেশ করেছে না প্রবেশ করার প্রয়োজন অনুভব করেছে। এ কারণেই রাবী' ইবনে হাইসাম বলেন,

تَفَقَّهْ ثُمَّ اعْتَزِلْ

'আগে ফিকাহ-শাস্ত্র অধ্যয়ন করো, তারপর নির্জনে ইবাদত করো।'

নফল ইবাদতকে ইলমের ওপর প্রধান্য দেয়ার কারণে ইবলিস আবেদদেরকে তার ধোঁকাসর্বস্ব চক্রান্তের ফাঁদে অবলীলায় আটকানোর সুযোগ লাভ করে। অথচ ইলম তথা জ্ঞান নফল ইবাদত অপেক্ষা উত্তম। শয়তান আবেদদেরকে এ ব্যাপারে আরও প্ররোচনা দিতে থাকে যে, ইলমের উদ্দেশ্য তো আমল। সুতরাং যে ব্যক্তি আমল করে তার জন্য ইলম অন্বেষণের প্রয়োজন নেই। ইবলিসের এমন প্ররোচনার পরিপ্রেক্ষিতে তারা আমল দ্বারা কেবল দৈহিক আমলকেই বুঝে থাকে। এ ব্যাপারে তাদের অবগতি নেই যে, প্রকৃত আমল হচ্ছে অন্তরের আমল। কেননা অন্তরের আমল দৈহিক আমল হতে বহু গুণে উত্তম ও শ্রেয়। মুতার্‌রিফ ইবনে আবদুল্লাহ বলেন,

"ইলমের মর্যাদা ইবাদতের মর্যাদা হতে উত্তম।"[১]

ইউসুফ ইবনে আসবাত বলেন,

"ইলমের একটি অধ্যায় শিক্ষা করা সত্তরটি জিহাদ হতে উত্তম।"

মুয়াফি ইবনে ইমরান বলেন,

"একটি হাদিস লেখা আমার নিকট সারারাত নফল নামায হতে প্রিয়।"

গ্রন্থকার আল্লামা ইবনুল জাওযি রহ. বলেন, আবেদরা শয়তানের পাতানো ফাঁদে পা রেখে যখন ইলমের ওপর শারীরিক ইবাদতকে প্রাধান্য দিতে

---

১ আল মু'জামুল আওসাত : ৩৯৬০।

থাকে, তখন ইবাদতের ধরন-পদ্ধতিতে নিত্যনতুনভাবে ধোঁকা দেয়া ইবলিসের জন্য সহজতর হয়ে যায়।

পেশাব-পায়খানার ক্ষেত্রে আবেদদের ওপর শয়তানের ধোঁকা

অনেক আবেদ এমনও রয়েছেন—যারা পবিত্রতা অর্জনের নিমিত্তে দীর্ঘ সময় বাথরুমে অবস্থান করেন। আর শয়তানও বিষয়টি তাদের দৃষ্টিতে উত্তম হিসেবে দেখাতে থাকে। অথচ বাথরুমে প্রয়োজন পরিমাণ সময়ই অবস্থান করা উচিত; প্রয়োজনাতিরিক্ত নয়। কেননা দীর্ঘ সময় বাথরুমে অবস্থান কলিজার জন্য ক্ষতিকর।

কিছুসংখ্যক আবেদ এমনও আছেন—যারা ইসতিঞ্জার পর হাঁটাহাঁটি, কাশাকাশি এবং উভয় পা উঠা-নামা করতে থাকেন। তাদের ধারণা—এসব পদ্ধতি অবলম্বন করলে পেশাব নেমে আসে। আসলে ব্যাপারটি এমন নয়। যারা এসব পদ্ধতি অবলম্বন করেন, তাদের ভালোভাবে জেনে রাখা উচিত—পানি অল্প অল্প করে মূত্রথলিতে জমা হয়। ফলে মানুষ পেশাবের জন্য প্রস্তুত হলে জমে থাকা পানিগুলো মূত্রনালি দিয়ে বেরিয়ে আসে। আর যখন সে হাঁটহাঁটি ও কাশাকাশিসহ অন্যান্য কৃত্রিম পদ্ধতি অবলম্বন করে, তখন নতুন পানি চুইয়ে পড়ে; জমে থাকা পানি নয়। ফলে এসব পদ্ধতি অবলম্বন যত দীর্ঘই হোক না কেন, চুইয়ে পড়া অব্যাহতই থাকবে। তাই মূত্রনালির পেশাব নিঃসরণের জন্য কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে দু'আঙ্গুলের মাঝে পুরুষাঙ্গ দোহন করে পানি ব্যবহার করাই যথেষ্ট।

অনেক আবেদ এমনও আছেন—যাদের কাছে শয়তান অধিক পরিমাণে পানি ব্যবহারের বিষয়টি উত্তম হিসেবে দেখাতে থাকে। অথচ চরমপন্থী মাযহাবের মতানুসারেও নাপাকি দেহ দূর হওয়ার পর নাপাকযুক্ত স্থান সাতবার ধৌত করাই যথেষ্ট। আর যদি কেউ পাথর ব্যবহার করে, আর নাপাকি মলদ্বার অতিক্রম না করে, তাহলে তিন পাথর দ্বারা নাপাকি দূরীভূত হলে তিনটি পাথর ব্যবহার করাই যথেষ্ট। আর শরিয়তনির্ধারিত রীতিনীতি যার মনঃপূত নয়, সে তো বিদয়াতি; সুন্নাতের অনুসারী নয়।

আবেদদের অযুতে শয়তানের ধোঁকাদানের বিবরণ

অনেক আবেদ এমন আছেন—যারা নিয়তের ব্যাপারে শয়তান কর্তৃক ধোঁকাগ্রস্ত হন। ফলে তারা অযুকালীন একবার বলেন, আমি নাপাকি দূর করছি। আবার বলেন, আমি নামাযের জন্য উপযুক্ত হচ্ছি। পুরনায় বলেন, আমি নাপাকি দূর করছি। শরিয়ত সম্পর্কে অজ্ঞতাই এসবের একমাত্র কারণ। তাদের জেনে রাখা উচিত—নিয়তের স্থান অন্তর; জবান নয়। সুতরাং জবানে উচ্চারণ একটি অনাবশ্যক বিষয়। আর নিয়ত যদি কেউ জবানে উচ্চারণ করে তবে একবার উচ্চারণই যথেষ্ট, বারবার উচ্চারণ অনর্থক ও অপ্রয়োজনীয়।

তাদের অনেকের অবস্থা এমন—যারা অযুর পানি নিয়ে দুশ্চিন্তায় ভোগেন। হতাশ হয়ে বলেন, এ পানিতে পবিত্র হওয়ার কী নিশ্চয়তা আছে? হতে পারে এতে নাপাকির সংমিশ্রণ ঘটেছে। এ-জাতীয় বহু অবান্তর ও অবাস্তব সম্ভাবনা তাদের মনে ঘুরপাক খেতে থাকে। তাদের জানা দরকার—যে পানি নাপাকির আলামত হতে মুক্ত, তা পবিত্র হিসেবেই গণ্য হবে। আর এটাই শরিয়তের মূলনীতি। সুতরাং সন্দেহের ভিত্তিতে এ মূলনীতি বর্জন করা বুদ্ধিমানের কাজ নয়।

আবেদদের কেউ কেউ অযুতে প্রচুর পানি ব্যবহার করে থাকেন। আর শয়তান তাদের নিকট এ বিষয়টি উত্তম করে তোলে। তাদের জেনে রাখা উচিত—প্রয়োজনের অধিক পানি ব্যবহার চারটি মাকরুহকে অন্তর্ভুক্ত করে।

১. পানির অপচয়,

২. এমন বিষয়ে জীবনের মূল্যবান সময় ব্যয়, যা ওয়াজিব কিংবা মুস্তাহাব নয়,

৩. শরিয়ত অল্প পানি ব্যবহারে তুষ্ট হওয়া সত্ত্বেও বেশি পানি ব্যবহার করে শরিয়তের প্রতি অতুষ্টি প্রকাশ করা ও

৪. (ক) অঙ্গসমূহ তিনের অধিক ধৌতকরণ নিষিদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও তা অমান্য করে গর্হিত কাজে লিপ্ত হওয়া।

(খ) অনেক সময় বেশি পানি ব্যবহারে অযু দীর্ঘ হওয়ার দরুন নামাযের ওয়াক্ত কিংবা নামাযের উত্তম ওয়াক্ত চলে যায় অথবা জামাত শেষ হয়ে যায়।

হজরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস রা. বলেন, হজরত সাআদ ইবনে আবি ওয়াক্কাস রা. এর অযুকালীন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে অতিক্রমকালে বললেন,

مَا هَذَا السَّرَفُ يَا سَعْدُ؟ " قَالَ: أَفِي الْوُضُوءِ سَرَفٌ؟ قَالَ: " نَعَمْ، وَإِنْ كُنْتَ عَلَى نَهْرٍ جَارٍ

'হে সাআদ, কেন এ অপচয়? হজরত সাআদ রা. বললেন, অপচয় কি অযুতেও? তখন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, হ্যাঁ, যদিও তুমি প্রবহমান নদীতে অযু করো।'[১]

হজরত উবাই ইবনে কা'আব রা. বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

لِلْوُضُوءِ شَيْطَانٌ يُقَالُ لَهُ: الْوَلَهَانُ، فَاتَّقُوهُ " أَوْ قَالَ: "فَاحْذَرُوهُ

'নিশ্চয় অযুতে এক শয়তান নিযুক্ত রয়েছে, যার নাম ওলাহান। সুতরাং পানির বিষয়ে তোমরা তার কুমন্ত্রণা এড়িয়ে চলো।'[২] 'ওলাহান' অর্থ হতভম্ব হওয়া। অযুর শয়তানকে ওলাহান বলার কারণ হচ্ছে, সে পানির বিষয়ে অযুকারীকে করে তোলে হতভম্ব ও দ্বিধাগ্রস্ত। ফলে সে অযুর পূর্ণতা ও অপূর্ণতার বিষয়ে সন্দিহান হয়ে পড়ে।

আবু নুয়ামাহ বলেন, আবদুল্লাহ ইবনে মুগাফ্ফাল তার ছেলেকে দোয়ায় اللَّهُمَّ إِنِي أَسأَلك الفردوس، وأَسأَلك 'হে আল্লাহ আমি আপনার নিকট জান্নাতুল ফেরদাউস এবং আপনাকে চাই'—বলতে শুনে বললেন, তুমি আল্লাহর নিকট জান্নাত চাও এবং জাহান্নাম থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করো। কেননা আমি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে বলতে শুনেছি—

سَيَكُونُ فِي هَذِهِ الأُمَّةِ قَوْمٌ يَعْتَدُونَ فِي الدُّعَاءِ وَالطَّهُور

'অচিরেই উম্মতের কিছু লোক দোয়া ও পবিত্রতার বিষয়ে সীমালঙ্ঘন করবে।'[৩]

হাসান বসরি রহ. একবার ইবনে সিরিন রহ.-কে টিপ্পনি কেটে বললেন, কী ব্যাপার? আপনার দরবারে এক মশক পানি দিয়ে অযু করা হয় এবং

---

১ সুনানে ইবনে মাজাহ : হাদিস নং ৪২৫

২ জামে' তিরমিযি : হাদিস নং ৫৭, ৪২১, ৯৪, ৪১৯

৩ সুনানে আবি দাউদ : হাদিস নং ৯৬, সুনানে ইবনে মাজাহ : হাদিস নং ৩৮৬৪

এতগুলো পানি দিয়ে চুবিয়ে চুবিয়ে গোসল করা হয়! এতে তো শরীর কষ্ট পায়। তাছাড়া এটা সুন্নাহসমর্থিতও নয়। জনৈক আরব বেদুইন মসজিদে পেশাব করে দিলে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেখানে এক বালতি পানি ঢেলে দেয়ার নির্দেশ দিয়েছিলেন।[৪] জনৈক মহিলা জিজ্ঞেস করেছিল, ইয়া রাসুলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! আমার কাপড়ের আঁচল দীর্ঘ। আমি নাপাক স্থান দিয়ে গমন করি। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছিলেন—ওই নাপাক জায়গার পরে পাক জায়গা আসে নাকি? ওই পাক জায়গা একে পাক করে দেবে।[৫]

গ্রন্থকার আল্লামা ইবনুল জাওযি রহ. বলেন, আসওয়াদ ইবনে সালেম একজন উঁচু মাপের বুযুর্গ ছিলেন। প্রথম দিকে তিনি অযুতে প্রচুর পানি ব্যবহার করা সত্ত্বেও পরে তা বর্জন করেন। কেউ তাকে বর্জনের কারণ জিজ্ঞেস করলে তিনি উত্তরে বলেন, এক রাতে ঘুমিয়ে পড়লে অদৃশ্য থেকে হঠাৎ কেউ আমাকে আওয়াজ দিয়ে বলল, হে আসওয়াদ! কেন এ অপচয়?

আযানের ক্ষেত্রে শয়তানের চক্রান্ত

শয়তান ইবাদতকারীদের মনে আযানে সুর সংযোজনের ব্যাপারে কুমন্ত্রণা দিতে থাকে। অথচ ইমাম মালেক ইবনে আনাসসহ অন্যান্য ওলামায়ে কেরাম তার তীব্র নিন্দা জানিয়েছেন। কেননা সুর সংযোজিত আযান গানের সাদৃশ্য লাভ করে। এতে আযানের মর্যাদা ও ভাবগাম্ভীর্য বিনষ্ট হয়।

অনেকে আযানের আগে ও পরে যিকির, তাসবিহ-তাহলিল এবং ওয়াজ নসিহত করে থাকেন। এতে আযানের সাথে এ-সবের সংমিশ্রণ ঘটে। অথচ বিজ্ঞ ওলামায়ে কেরাম আযানের সাথে কোনো কিছু সম্পৃক্ত করাকে মাকরুহ বলেছেন।

অনেক ইবাদতগুজার লোক অধিকাংশ সময় গভীর রাতে মসজিদের মিনারে আরোহণ করে কিংবা মাইকযোগে ওয়াজ-নসিহত, যিকির-আযকার ও উচ্চৈঃস্বরে কুরআন তেলাওয়াত করে থাকেন। এতে ঘুমন্ত ব্যক্তির ঘুমে বিঘ্ন ঘটে, নামাযরত ব্যক্তির একাগ্রতা বিনষ্ট হয় এবং তেলাওয়াতকারী বিভ্রান্তির

---

৪ সহিহ বুখারি : হাদিস নং ২২, ৬১২৮, সহিহ মুসলিম : হাদিস নং ২৮৪, ৩৮০, ১৪৭, ৫৬, ৫২৯

৫ সুনানে আবি দাউদ : হাদিস নং ৩৮৩, সুনানে ইবনে মাজাহ : হাদিস নং ৫৩১

শিকার হন। আফসোস লাগে, এরা কখনো অনুভব করার সুযোগ পায় না যে, এ দ্বারা শরিয়তের কী পরিমাণ ক্ষতি সাধিত হলো!

নামাযে শয়তানের বিভ্রান্তি ও ধোঁকা

ইবাদতকারীদেরকে শয়তান শরীরের পরিধেয় বস্ত্রের ব্যাপারে সন্দেহে পতিত করে। ফলে তাদের কাউকে পবিত্র কাপড় একাধিকবার ধৌত করতে দেখা যায়। আবার কোনো সময় যদি কোনো মুসলমান তার কাপড় স্পর্শ করে তাহলে তা ধৌত করা জরুরি মনে করে থাকেন। অনেকে আবার এমনও আছেন, যারা নিজেদের কাপড় নদীতে ধৌত করে থাকেন। বাড়িতে ধৌত করাকে তারা যথেষ্ট মনে করেন না। আবার কেউ ইহুদিদের মতো কূপের পানিতে কাপড় ঝুলিয়ে রাখেন। অথচ রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাহাবারা এর কোনোটাই করেননি। তারা তো পারস্য বিজয়ের পর পারস্যের কাপড় পরিধান করেছেন। তাদের ব্যবহৃত বস্ত্রসমূহ ব্যবহার করেছেন।

আবেদ তথা ইবাদতকারী কেউ কেউ এমনও আছেন—যদি ওপর থেকে তাদের গায়ে পানির ফোঁটা পড়ে, তাহলে পুরো কাপড় ধৌত করাকে তারা খুবই জরুরি মনে করেন। আবার কাউকে দেখা যায়, পানির ছিটা গায়ে পড়ার ভয়ে সামান্য বৃষ্টি হলেই আর জামাতে শরিক হন না। কারও মনে এমন ধারণা আসার কোনো সুযোগ নেই যে, আমরা পরিচ্ছন্নতা ও তাকওয়াবান হতে বারণ করছি; বরং সেই সীমালঙ্ঘন ও মূল্যবান সময় অপচয় থেকে বিরত থাকতে বলছি, কেননা তা শরিয়া অনুমোদিত নয়।

অনেক লোককে শয়তান নামাযের নিয়তের ব্যাপারে ধোঁকা দিতে থাকে। তাই সে তাকবীরের পূর্বে বলে, আমি অমুক নামায পড়ছি। অতঃপর নিয়ত ভেঙ্গে গেছে মনে করে পুনরায় বলে, আমি অমুক নামায পড়ছি। তাদের জেনে রাখা উচিত—নিয়ত কখনো ভাঙ্গে না। অন্তর হচ্ছে নিয়তের স্থান। সুতরাং ফরয নামাযের জন্য কারও দণ্ডায়মান হওয়া—এটাই নিয়তের জন্য যথেষ্ট। 'আমি অমুক নামায পড়ছি'—মুখে এ কথার উচ্চারণ একেবারেই নিষ্প্রয়োজন। যদি কেউ মুখে উচ্চারণ করে, তবে একবার উচ্চারণই যথেষ্ট। 'নিয়ত ভেঙ্গে গেছে'—এমন ধারণার ভিত্তিতে বারবার উচ্চারণ শয়তানের নিছক একটি প্ররোচনামূলক চক্রান্ত, যা কখনো ইসলাম সমর্থন করে না।

অনেককে দেখা যায়, তাকবীরের পর হাত বেঁধে তা ছেড়ে দেয়। পুনরায় তাকবির বলে হাত বেঁধে তা ছেড়ে দেয়। এমন করতে করতে ইমাম যখন রুকুতে যায়, তখন প্ররোচনার শিকার এ ব্যক্তিও ইমামের সাথে রুকুতে যায়। তাদের জন্য দুঃখ লাগে—এতক্ষণ নিয়ত উপস্থিত হয়নি মনে করে বারবার সে হাত বেঁধেছে আর হাত ছেড়েছে। এখন কিসে তার নিয়ত উপস্থিত করল? এ অসার কর্মকাণ্ডের একমাত্র কারণ, তেলাওয়াতের ফজিলত থেকে শয়তান তাকে বঞ্চিত করতে চেয়েছে। আর সেও শয়তানের প্রলোভনে এমন কাজে লিপ্ত হয়েছে নিজের অজান্তেই।

তাদের জেনে রাখা উচিত—শরিয়ত সহজ ও উদার। এসব আপদ-বিপদ ও সন্দেহের কোনো স্থান ইসলামি শরিয়তে নেই। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর সাহাবা রা.-এর কারও থেকে এমন আচরণ প্রকাশ পায়নি। আবু হাজামের ঘটনা—তিনি একবার মসজিদে প্রবেশ করলে শয়তান তাকে কুমন্ত্রণা দিয়ে বলল, আরে তুমি তো অযু ছাড়া নামায পড়ছ! তখন আবু হাজাম বলল, তোমার উপদেশ আমার কানও শ্রবণ করবে না, অন্তরও তাতে সায় দেবে না।

গ্রন্থকার আল্লামা ইবনুল জাওযি রহ. বলেন, এক লোক ইবনে আকীলের সাক্ষাতে এসে বলল, অযুতে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ধোয়া সত্ত্বেও আমার মনে হয় আমি তা ধৌত করিনি। নামাযে তাকবির বলা সত্ত্বেও মনে হয় আমি তা বলিনি। তখন ইবনে আকিল তাকে বললেন, তুমি নামায পড়া বন্ধ করো; কেননা নামায তোমার ওপর ফরয নয়। তখন লোকেরা তাকে বলল, আপনি তাকে এ কথা কীভাবে বলছেন? তখন ইবনে আকিল তাদের বললেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

أَنَّ الْقَلَمَ رُفِعَ عَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يُفِيقَ

"জ্ঞান ফিরে পাওয়া পর্যন্ত পাগল থেকে সকল বিধান রহিত করা হলো।"[১]

আর তাকবির বলা সত্ত্বেও যে বলে, 'আমি তাকবির বলিনি'—সে তো বোধশক্তিহীন ও পাগল। আর পাগলের ওপর নামায ফরয নয়।

গ্রন্থকার বলেন, মানুষ বিবেক-বুদ্ধির ভারসাম্যহীনতা এবং শরিয়ত সম্পর্কে অজ্ঞতার কারণেই নামাযের নিয়তের ব্যাপারে দ্বিধা, সন্দেহ ও শয়তানের

---

১ হাদিসটি ইমাম বুখারি রহ. তালাকের অধ্যায়ে বর্ণনা করেছেন। সুনানে আবি দাউদ : ৪৩৯৮; সুনানে নাসায়ি : ২/১০০; সুনানে দারেমি : ২/১৭১; সুনানে ইবনে মাজাহ : ২০৪১।

প্ররোচনায় পতিত হয়। এ কথা সহজে বুঝতে একটি উদাহরণ দেয়া যাক—যদি কারও বাড়িতে কোনো বড় আলেমের আগমন ঘটে, তাহলে সে ব্যক্তি আলেমের সম্মানার্থে দাঁড়িয়ে যায়। আর দাঁড়ানোর পূর্বে সে মনে মনে বলে, তিনি একজন বড় আলেম, সুতরাং তার সম্মানার্থে দাঁড়ানো উচিত। আর আলেমকে দেখামাত্র তার সম্মানার্থে দাঁড়ানোর বিষয়টি মনে উদিত হওয়ার নামই নিয়ত। তদ্রূপ ফরয পালনার্থে নামাযের জন্য দাঁড়ানো এমন একটি বিষয়, যার কল্পনা সে এক মুহূর্তেই করতে পারে। তাতে দীর্ঘ সময়ের প্রয়োজন হয় না; বরং সময় তো দীর্ঘ হয় কল্পনার বিষয়টি উচ্চারণের ক্ষেত্রে। আর নিয়ত মুখে উচ্চারণ করা কোনো জরুরি বিষয় নয়; বরং তা হচ্ছে একটি সন্দেহ ও দ্বিধা—মূর্খতাই যার উৎপত্তিস্থল। আর সন্দেহবাতিকপ্রবণ ও দ্বিধাগ্রস্ত লোক মনের বিষয় মুখে উচ্চারণের দ্বারা নিজেকে অনর্থক কষ্টের সম্মুখীন করে। অথচ আলেমের সম্মানার্থে দাঁড়ানোর সময় এই ব্যক্তিও লজ্জার দরুন এমনটি করতে অক্ষম হবে। এই উদাহরণ যার বুঝে এসেছে, আশা করি নিয়তের বিষয় তার নিকট পরিষ্কার ও স্পষ্ট হয়ে গেছে। অনুরূপভাবে নিয়ত তাকবীরের পূর্বে করাও বৈধ। সুতরাং নিয়তকে তাকবীরের সাথে মিলিয়ে অযথা নিজেকে কষ্টের মুখে ঠেলে দেয়ার কী যুক্তি! এটা তো বিনা কষ্টেই অর্জন করা সম্ভব।

সন্দেহবাতিক রোগে আক্রান্ত ও দ্বিধাগ্রস্ত এমন কিছু লোক আছেন, যারা বিশুদ্ধভাবে নিয়তের পর তাকবির বলেন। কিন্তু নামাযের বাকি বিষয়ে থাকেন চরম উদাসীন ও অসতর্ক। তাকবির হচ্ছে দরজার ন্যায়, যা দ্বারা নামায নামক গৃহে প্রবেশ করা হয়। সুতরাং দরজার প্রতি যত্নবান হয়ে ঘরের যত্ন ছেড়ে দেয়া কি বুদ্ধিমানের কাজ বলে বিবেচিত হতে পারে?

গ্রন্থকার বলেন, আমি শৈশবে আপন শায়খ আবু বকর দীনুরীর পেছনে নামায আদায় করতাম এবং অনুরূপ কাজ করতাম। তখন তিনি আমাকে বললেন, বৎস! ইমামগণ সুরায়ে ফাতিহা ওয়াজিব কিনা সে বিষয়ে দ্বিমত পোষণ করেছেন। আর সুবহানাকা সুন্নত হওয়ার ব্যাপারে কারও দ্বিমত নেই। অতএব তুমি উক্ত অবস্থায় সুন্নত বাদ দিয়ে ওয়াজিবে মগ্ন হয়ে যায়।

সুন্নত ছেড়ে দেয়ার ব্যাপারে শয়তানের চক্রান্ত

শয়তান কোনো কোনো আবেদকে প্ররোচনা ও ধোঁকা দিতে থাকলে সে বহু সুন্নত ছেড়ে দেয়। তাদের কারও অবস্থা হচ্ছে, নামাযে প্রথম কাতারে দাঁড়ান না। তাদের যুক্তি—পেছনের কাতারে দাঁড়ানো একাগ্রতার জন্য অধিক সহায়ক। তাই প্রথম কাতারে না দাঁড়িয়ে দ্বিতীয় কাতারে দাঁড়ানোই আমার জন্য উত্তম। আবার কেউ কেউ নামাযে হাত বাঁধেন না। তারা বলেন, নামাযের প্রতি এমন একাগ্রতার বহিঃপ্রকাশ আমার নিকট অপছন্দনীয়, যা আমার অন্তরে নেই।

গ্রন্থকার বলেন, কিছু কিছু প্রসিদ্ধ বুযুর্গ থেকেও এরূপ আমল প্রকাশ পেয়েছে। এটা নিঃসন্দেহে বলা যায়, জ্ঞানের স্বল্পতাই তাদেরকে এরূপ করতে উদ্বুদ্ধ করেছে। ইমাম বুখারি ও ইমাম মুসলিম রহ. তাঁদের বিশুদ্ধ গ্রন্থ সহিহ বুখারি ও মুসলিমে হজরত আবু হোরায়রা রা. এর সূত্রে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হাদিস নকল করেন, যা সুস্পষ্টভাবে তাদের আমলকে সুন্নতপরিপন্থী হিসেবে প্রমাণিত করে।

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, যদি মানুষ আযান ও প্রথম কাতারের ফজিলত জানত, তাহলে লটারির মাধ্যমে হলেও তা লাভের প্রাণান্তকর প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখত।[১]

সহিহ মুসলিমের অন্য রেওয়ায়েতে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

خَيْرُ صُفُوفِ الرِّجَالِ أَوَّلُهَا، وَشَرُّهَا آخِرُهَا

"প্রথম কাতার পুরুষের জন্য শ্রেষ্ঠতর আর শেষ কাতার তাদের জন্য নিকৃষ্টতর।"[২]

অনুরূপভাবে নামাযে হাত বাঁধা সুন্নত হওয়ার বিষয়টিও হাদিস দ্বারা প্রমাণিত।

وضع اليد على اليد من السنة

"নামাযে হাতের ওপর হাত রাখা সুন্নত।"[৩]

---

১ সহিহ বুখারি : হাদিস নং ৬১৫, সহিহ মুসলিম : হাদিস নং ৪৩৭

২ সহিহ মুসলিম : হাদিস নং ৪৪০

৩ সুনানে আবি দাউদ : ৭৫৪।

অন্য বর্ণনায় এসেছে– হজরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. নামাযে ডান হাতের ওপর বাঁ হাত রাখতেন। তখন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিষয়টি লক্ষ করে তাঁর বাঁ হাতের ওপর ডান হাত রেখে ভুল শুধরে দেন।[১]

প্রসিদ্ধ বুযুর্গদের উল্লেখিত আমলের প্রতি আমাদের নিন্দা দেখে আপনি আশ্চর্য হবেন না। কারণ, প্রকৃত নিন্দাকারী তো আমরা নই; শরিয়তের প্রমাণাদিই তাদের আমলের অসারতা প্রমাণ করে। আমরা শুধু আপনার নিকট তা পৌছে দেয়ার দায়িত্বটুকু পালন করছি।

জনৈক লোক ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল রহ.-কে বলল, ইবনুল মোবারক তো এমন এমন বলেন। তিনি তখন বলেছিলেন, ইবনুল মোবারক তো আকাশ থেকে অবতীর্ণ হননি। তাকে বলা হলো, ইবরাহিম ইবনে আদহামও এরূপ বলেন। তিনি বলেন, তোমরা এ বিষয়ে শরিয়তের দলিল উপস্থাপন করো, কেননা শরিয়তের অনুসরণই তোমাদের জন্য আবশ্যক। তাই স্বীয় হৃদয়রাজ্যে আসনগ্রহণকারী কোনো ব্যক্তির কথায় শরিয়তের অনুসরণ ছেড়ে দেয়া যাবে না। কেননা শরিয়ত সবার উপরে। সকলেই শরিয়তের অনুসারী, শরিয়ত কারও অনুসারী নয়। এমনও হতে পারে—এ বিষয়ক হাদিস তাঁর নিকট পৌঁছেনি।

মাখরাজের ব্যাপারে নামাযির ওপর শয়তানের ধোঁকা

বহু নামাযিকে শয়তান আরবি শব্দের মাখরাজ তথা আদায়ের উৎপত্তিস্থলের ব্যাপারে ধোঁকায় ফেলে থাকে। তাই তারা الحمد। الحمد। 'আলহামদু আলহামদু'—এভাবে বারবার উচ্চারণের দরুন নামাযের শিষ্টাচারজনিত নিয়ম-কানুন থেকে বের হয়ে যায়। আবার কখনো তাশদিদ উচ্চারণের ক্ষেত্রে ধোঁকায় ফেলে, কখনো-বা المغضوب। 'আল মাগদুবি' এর ض উচ্চারণের বেলায় ধোঁকায় পতিত করে থাকে।

আল্লামা ইবনুল জাওযি রহ. বলেন, আমি এমন ব্যক্তিকে দেখেছি, যে 'আল মাগদুবি আলাইহিম' উচ্চারণ করছে আর ض উচ্চারণে চাপ প্রয়োগের দরুন তার থুথু বের হচ্ছে। এসব লোকের জেনে রাখা উচিত—উচ্চারণের

---

১ দেখুন আলবানি রহ. প্রণীত 'সিফাতু সালাতিন নাবী (সাল্লাল্লহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) : পৃষ্ঠা ৮৭

ক্ষেত্রে এরূপ চাপ প্রয়োগ শরিয়াসমর্থিত নয়; বরং মাখরাজ থেকে প্রতিটি হরফকে সাবলীলভাবে উচ্চারণ করাই নামায বিশুদ্ধ হওয়ার জন্য যথেষ্ট।

শয়তান এ জাতীয় লোকদেরকে উচ্চারণের ক্ষেত্রে বাড়াবাড়ির দরুন শুদ্ধতার সীমা অতিক্রম করায়, আর উচ্চারণের ক্ষেত্রে অতিরঞ্জনের দরুন তাদেরকে তেলাওয়া বোঝা হতে বঞ্চিত করে। কুরআন-সুন্নাহর জ্ঞান যার রয়েছে, সে পরিষ্কারভাবেই বুঝতে পারবে যে, শয়তান কর্তৃক দ্বিধা-সন্দেহ ও প্ররোচনার কারণেই তারা এরূপ করে থাকে। প্রমাণস্বরূপ হজরত আনাস বিন মালেক রা. এর হাদিস এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে–

সাঈদ বিন আবদুর রহমান বিন আবিল আমইয়া বলেন, সাহল বিন আবু উমামা আমাকে বলেছেন, আমি ও আমার পিতা একবার সাহাবি হজরত আনাস রা. এর দরবারে উপস্থিত হই। তিনি তখন এত সংক্ষিপ্ত নামায পড়ছিলেন যে, মনে হলো তা মুসাফিরের নামায। তিনি সালাম ফিরিয়ে নামায শেষ করলে আমরা বললাম, আল্লাহ আপনার প্রতি রহম করুন। যে নামায পড়তে আমরা আপনাকে দেখেছি, তা কি ফরয নামায নাকি নফল নামায? যদি ফরয হয়ে থাকে, তাহলে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কি এভাবেই নামায পড়েছেন? তিনি বললেন, তা ফরয নামায এবং রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও এভাবেই নামায পড়েছেন।

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রায়ই বলতেন–

لا تُشَدِّدُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ فَيُشَدِّدَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَإِنَّ قَوْمًا شَدَّدُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ فَشَدَّدَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، فَتِلْكَ بَقَايَاهُمْ فِي الصَّوَامِعِ، وَالدُّيُورَاتِ رَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ

'তোমরা ইবাদত-বন্দেগিতে নিজেদের প্রতি কঠোরতা অবলম্বন করো না। তাহলে হতে পারে অচিরেই তোমাদের প্রতি কঠোরতা চাপিয়ে দেয়া হবে। ইতোপূর্বে এক সম্প্রদায় নিজেদের প্রতি কঠোরতা অবলম্বন করেছিল, ফলে আল্লাহ তাদের ওপর কঠোরতা চাপিয়ে দিয়েছিলেন। আল্লাহ তাদের

সম্পর্কে বলেছেন, তারা এমন সন্ন্যাসধর্ম আবিষ্কার করেছে, যা আমি তাদের ওপর ফরয করিনি।'[১]

عَنْ أَبِي الْعَلَاءِ، أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ أَبِي الْعَاصِ، أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ الشَّيْطَانَ قَدْ حَالَ بَيْنِي وَبَيْنَ صَلَاتِي وَقِرَاءَتِي يَلْبِسُهَا عَلَيَّ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «ذَاكَ شَيْطَانٌ يُقَالُ لَهُ خَنْزَبٌ، فَإِذَا أَحْسَسْتَهُ فَتَعَوَّذْ بِاللهِ مِنْهُ، وَاتْفِلْ عَلَى يَسَارِكَ ثَلَاثًا» قَالَ: فَفَعَلْتُ ذَلِكَ فَأَذْهَبَهُ اللهُ عَنِّي

উসমান ইবনে আবিল আস রা. বলেন, আমি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর খেদমতে আরজ করলাম, ইয়া রাসুলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! শয়তান আমার নামায, কেরাত এবং আমার মাঝে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, এটা এক শয়তান। এর নাম 'খিনযার'। এরূপ অনুভব হলে আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করবে এবং বাঁ দিকে থুথু দেবে। অতএব আমি এরূপ করাতে আল্লাহ তায়ালা এ অবস্থা দূরীভূত করে দিয়েছেন।[২]

শয়তানের এই ধোঁকার ফলে বহু মূর্খ আবেদ লম্বা লম্বা নামায পড়ে এবং বেশি পরিমাণে কেরাত পড়ে, কোনো সন্দেহ নেই যে, এটা অত্যন্ত প্রশংসনীয় কাজ। তবে আপত্তির বিষয় হলো, তারা এ সব ক্ষেত্রে নামাযের বহু সুন্নত ছেড়ে মাকরুহে লিপ্ত হয়।

গ্রন্থকার বলেন, আমি জনৈক আবেদের সাক্ষাতে উপস্থিত হয়ে দেখি, তিনি দিনের বেলা নফল নামায পড়ছেন এবং নামাযে উচ্চ শব্দে তেলাওয়াত করছেন। আমি তাকে বললাম, দিনের বেলা উচ্চ শব্দে তেলাওয়াত করা মাকরুহ। তখন সে আমাকে বলল, আমি ঘুম তাড়ানোর উদ্দেশ্যে উচ্চ শব্দে তেলাওয়াত করছি। আমি তাকে বললাম, ঘুম তাড়ানোর জন্য তো সুন্নত ছাড়া যাবে না। যখন ঘুম তোমাকে কাবু করবে, তখন তুমি ঘুমিয়ে নাও। কেননা তোমার ওপর তোমার নফসের হক রয়েছে। হজরত বুরাইদা রা. বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন :

---

১ [যঈফ] যঈফুল জামে' : হাদিস নং ৬২৩২; সুনানে আবি দাউদ : ৪৯০৪; মুসনাদে আবি ইয়ালা : ৩৬৯৪।

২ সহিহ মুসলিম : হাদিস নং ২২০৩

جهر بالقراءة في النهار فارجموه بالبعر

'যে ব্যক্তি দিনের বেলা উচ্চ শব্দে (নামাযে) কুরআন তেলাওয়াত করে তাকে গোবর নিক্ষেপ করো।"[৩]

রাতের বেলা দীর্ঘ নামায পড়া

একদল আবেদ আছেন, যাদের ওপর শয়তান এমন প্ররোচনা দিতে থাকে যে, তারা রাতের বেলা অধিক পরিমাণে নফল পড়ে, কেউ-বা সারারাত নফল ইবাদতের পর ফজরের পূর্ব মুহূর্তে ঘুমিয়ে পড়ে। ফলে তার ফজর নামায কাযা হয়ে যায় কিংবা জাগ্রত হয়ে নামাযের প্রস্তুতি গ্রহণের পূর্বেই জামাত শেষ হয়ে যায় অথবা জামাতের সাথে নামায পড়ে ঠিকই, কিন্তু রাত জাগরণের দরুন শারীরিক দুর্বলতার কারণে পরিবারের জন্য উপার্জনের ক্ষমতা হ্রাস পেতে থাকে।

গ্রন্থকার আল্লামা ইবনুল জাওযি রহ. বলেন, আমি হোসাইন কাযবিনী নামক এক বড় আবেদকে দেখেছি, যিনি দিনের বেলায় জামে' মানসূরের ভেতর অধিক পরিমাণে হাঁটতেন। আমি হাঁটার কারণ জিজ্ঞেস করলে আমাকে বলা হলো, ঘুম দূর করার জন্যই এ পদ্ধতি গ্রহণ করা হয়েছে। তখন আমি বললাম, শরিয়ত এবং বিবেক-বোধের দাবিমতে এটা মারাত্মক মূর্খতা ও অজ্ঞতার পরিচায়ক। শরিয়তের দৃষ্টিতে মূর্খতার প্রমাণ হলো, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন,

إِنَّ لِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقًّا فَقُمْ وَنُمْ

'তোমার ওপর তোমার নফসের হক রয়েছে। সুতরাং ইবাদতের পাশাপাশি বিশ্রাম গ্রহণ করো।"[৪]

তিনি আরও বলেন,

عَلَيْكُمْ هَدْيًا قَاصِدًا فَإِنَّهُ مِنْ يُشَادَّ هَذَا الدِّينَ يَغْلِبْهُ

'তোমাদের উচিত, সহজ পন্থা অবলম্বন করা। কেননা যে এই দীনের ব্যাপারে কঠোরতা অবলম্বন করবে সে পরাজিত হবে।"[১]

---

৩ [যঈফুন জিদ্দান] এটি কানযুল উম্মালে উল্লেখ আছে। হাদিসটির একজন রাবী 'মাতরূক'।

৪ সহিহ বুখারি : হাদিস নং ১৯৭৫, সহিহ মুসলিম : হাদিস নং ১১৫৯

হজরত আনাস ইবনে মালেক রা. বলেন,

دَخَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَسْجِدَ، وَحَبْلٌ مَمْدُودٌ بَيْنَ سَارِيَتَيْنِ فَقَالَ: " مَا هَذَا؟ " قَالُوا: لِزَيْنَبَ تُصَلِّي، فَإِذَا كَسِلَتْ أَوْ فَتَرَتْ أَمْسَكَتْ بِهِ، فَقَالَ: " حُلُّوهُ". ثُمَّ قَالَ: " لِيُصَلِّ أَحَدُكُمْ نَشَاطَهُ، فَإِذَا كَسِلَ أَوْ فَتَرَ فَلْيَقْعُدْ

'একদিন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মসজিদে প্রবেশ করে দুই স্তম্ভের মাঝে একটি রশি বাঁধা অবস্থায় দেখে জিজ্ঞেস করলেন, এটা কী? তখন উপস্থিত লোকেরা বলল, এটা যয়নব তৈরি করেছে। নামায পড়তে পড়তে যখন সে অলস কিংবা দুর্বল হয়ে যায়, তখন রশির সাথে নিজেকে বেঁধে রাখে। এ কথা শুনে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তোমাদের প্রত্যেকে যেন উদ্যমের সাথে নামায পড়ে, অলস কিংবা দুর্বল হয়ে পড়লে সে যেন বিশ্রাম নেয়।'[২]

হজরত আয়েশা রা. বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

إِذَا نَعَسَ أَحَدُكُمْ فَلْيَرْقُدْ، حَتَّى يَذْهَبَ عَنْهُ النَّوْمُ، فَإِنَّهُ إِذَا صَلَّى وَهُوَ يَنْعَسُ لَعَلَّهُ يَذْهَبُ يَسْتَغْفِرُ، فَيَسُبُّ نَفْسَهُ

'তোমাদের কারও তন্দ্রা এলে সে যেন শুয়ে ঘুমের চাহিদা পূরণ করে। আর যদি তন্দ্রাভাব নিয়ে নামায পড়ে তাহলে হতে পারে সে ইস্তেগফার করতে গিয়ে নিজেকেই গালমন্দ করবে।'[৩]

এটা হচ্ছে শরিয়তের প্রমাণ। অন্যদিকে বিবেক-বুদ্ধির দাবি—জাগ্রত অবস্থায় কর্ম সম্পাদনে ব্যয় হওয়া শক্তিতে ঘুম নতুনত্ব দান করে, ফলে সে হৃত শক্তি ফিরে পায় এবং কর্ম সম্পাদনের নতুন উদ্যম লাভ করতে পারে। তাই প্রয়োজনের মুহূর্তে যদি মানুষ ঘুম থেকে বিরত থাকে, তাহলে ঘুমের প্রভাব তার দেহে বিচরণ করে দেহ ও মস্তিষ্কের ব্যাপক ক্ষতি সাধন করে। এখন প্রশ্ন আসতে পারে, আগেকার যুগের মনীষীরা তো রাতব্যাপী ইবাদত করতেন এবং তা তাদের নিয়মিত আমলে পরিণত হয়েছিল। এ প্রশ্নের

---

১ সহিহ বুখারি : হাদিস নং ৩৯
২ সহিহ বুখারি : হাদিস নং ১১৫০, সহিহ মুসলিম : হাদিস নং ৭৮৪
৩ সহিহ বুখারি : হাদিস নং ২১২, সহিহ মুসলিম : হাদিস নং ৭৮৬

উত্তর—তারা প্রথমেই রাতব্যাপী ইবাদত করতে শুরু করেননি; বরং ধীরে ধীরে অল্প অল্প করে অনুশীলনের মাধ্যমেই রাত্রি জাগরণের সক্ষমতা অর্জন করেছেন। তাছাড়া এ সব মনীষী রাত জাগরণ সত্ত্বেও ফজরের নামায জামাতের সহিত আদায় করার ব্যাপারে নিজেদের প্রতি আস্থাবান ছিলেন। এ ছাড়া অল্প আহারে অভ্যস্ত হওয়ার দরুন দুপুরের সামান্য বিশ্রামেই তাদের ঘুমের চাহিদা মিটে যেত। সুতরাং রাত্রি জাগরণ সত্ত্বেও তারা ক্লান্ত হতেন না; বরং পূর্ণ উদ্যমের সাথেই নামায আদায়ের সৌভাগ্য লাভ করতেন। হাদিসের কোনো বাক্যে এমন নেই যে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোনো একটি রাতও না ঘুমিয়ে ইবাদত করেছেন। অতএব অনুসরণ করতে হবে একমাত্র রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সুন্নতকেই।

কিছু ইবাদতকারীর ক্ষেত্রে শয়তান এমন ফাঁদ পেতে থাকে যে, তারা রাতব্যাপী ইবাদত করে দিনে তা মানুষের নিকট বলে বেড়ায়। তবে বলার কৌশল হয় ভিন্ন ও চমকপ্রদ। কেউ বলে, আজ ফজরের আযান অমুক মুয়াজ্জিন দিয়েছে। এতে তার উদ্দেশ্য—মানুষ যেন বুঝতে পারে, আযানের সময় সে জাগ্রত ছিল। আর এ আচরণকে আমরা যদি রিয়ামুক্ত মেনেও নিই, তার ক্ষতির জন্য এটুকু যথেষ্ট যে, তার গোপন আমলের সাওয়াব প্রকাশ্য আমল দ্বারা রূপান্তরিত হলো। ফলে তার সাওয়াবের পরিমাণ কিছুটা হলেও হ্রাস পেয়েছে বলে বিবেচিত হবে।

অনেক ইবাদতকারী এমনও আছেন, যারা সর্বদা মসজিদে নফল ইবাদত ও যিকির-আযকার করে থাকেন। এতে এক পর্যায়ে ইবাদত-বন্দেগির ক্ষেত্রে তারা খ্যাতি লাভ করেন এবং ক্রমান্বয়ে লোকজন তাদের নিকট সমবেত হয়ে তাদের মতো নামায পড়া শুরু করেন। এভাবে তাদের ইবাদতের বিষয়টি দিগ্বিদিক ছড়িয়ে পড়ে। কোনো সন্দেহ নেই, এরা শয়তানের ফাঁদে পা দিয়েই এমনটি করে থাকেন। কেননা মানুষের মাঝে তাদের ইবাদতের বিষয়টি ছড়িয়ে পড়া এবং মানুষের মুখে তাদের উচ্চ প্রশংসার বিষয়টি জানতে পেরেই ইবাদত-বন্দেগিতে তাদের প্রবৃত্তি শক্তিশালী হয় এবং নফল ইবাদত অধিক পরিমাণে করা তাদের জন্য সহজ থেকে সহজতর হতে থাকে। তারা যা করছে, তা যে শয়তানের একটি চক্রান্ত, তা প্রমাণ করতে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর একটি হাদিসই যথেষ্ট।

হজরত যায়দ ইবনে সাবিত রা. বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,

إِنَّ أَفْضَلَ صَلَاةِ الْمَرْءِ فِي بَيْتِهِ إِلَّا الصَّلَاةَ الْمَكْتُوبَةَ

'পুরুষের জন্য ফরয নামায ব্যতীত অন্য সব নামাযের সর্বোত্তম স্থান হলো ঘর।'[১]

আমের ইবনে আবদে কায়েস—তার নামায পড়া মানুষ দেখুক—এটাও তিনি পছন্দ করতেন না। এ কারণেই তিনি কখনো মসজিদে নফল পড়তেন না। অথচ তার দৈনিক নফলের পরিমাণ ছিল এক হাজার রাকাত। ইবনে আবি লায়লার অবস্থা ছিল—তিনি নামায পড়াকালীন কেউ তার ঘরে প্রবেশ করলে তিনি তৎক্ষণাৎ শুয়ে পড়তেন।

কতেক ইবাদতকারীকে দেখা যায়, তারা দোয়াকালীন কান্না শুরু করলে যদি মানুষ তাদের নিকট সমবেত হয় তাহলে কান্নার গতি বাড়িয়ে দেন। অথচ নিঃশব্দে ক্রন্দন যার পক্ষে সম্ভব, সে যদি সশব্দে ক্রন্দন করে তাহলে সে নিজেকে রিয়াকার হিসেবে প্রকাশ করল। আসেম বলেন, আবু ওয়ায়েল ঘরে নামায পড়াকালে ফুঁপিয়ে কাঁদতেন। অথচ দুনিয়ার সমুদয় সম্পদের বিনিময়ে যদি কেউ তার কাঁদার দৃশ্য দেখার প্রস্তাব করত, তিনি তা কখনোই করতেন না। আইয়ুব সাখতিয়ানির কান্নার বেগ বেড়ে গেলে তিনি দাঁড়িয়ে যেতেন।

কতেক আবেদের অবস্থা তো এমন, যারা রাত-দিন নফল পড়েন, কিন্তু অন্তর সংশোধন কিংবা খাদ্যের হালাল-হারামের পরোয়া করেন না। অথচ নফলের আধিক্য হতে অভ্যন্তরীণ চরিত্র সংশোধনের প্রতি লক্ষ করা ছিল অধিক দরকারি।

কোরআন তেলাওয়াতের ব্যাপারে শয়তানের ধোঁকা

কিছু কারী অধিক পরিমাণে কুরআন তেলাওয়াত করেন, কিন্তু তারতিল তাযভিদের প্রতি ভ্রুক্ষেপ করেন না। অথচ এটা শরিয়াসিদ্ধ পন্থা নয়। এখন প্রশ্ন হতে পারে, পূর্ববর্তী ওলামাদের একদল তো দিনে এক খতম কিংবা প্রতি রাকাতে এক খতম কুরআন পড়তেন। এর জবাবে বলা যায়, তাদের

১ সহিহ বুখারি : হাদিস নং ৭৩১, সহিহ মুসলিম : হাদিস নং ৭৮১

থেকে এরূপ আমল কখনো কখনো প্রকাশ পেত। আর সর্বদা এভাবে তেলাওয়াত যদিও জায়েয, কিন্তু তারতিল ও তাযভিদ রক্ষা করে কুরআন তেলাওয়াত ওলামাদের নিকট মুস্তাহাব। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

لَا يَفْقَهُ مَنْ قَرَأَ الْقُرْآنَ فِي أَقَلَّ مِنْ ثَلَاثٍ

'যে তিন দিনের কমে কুরআন খতম করে, কোরআন বোঝা তার পক্ষে সম্ভব হয় না।'[২]

একদল কারীর অবস্থা তো এমন, যারা গভীর রাতে মসজিদের মিনারে আরোহণ করে উচ্চ আওয়াজে কুরআন তেলাওয়াত করে, আর শয়তানও এ বিষয়ে তাদেরকে উদ্বুদ্ধ করে। তাদের জেনে রাখা উচিত যে, এ ধরনের তেলাওয়াত দু' ধরনের গুনাহকে অন্তর্ভুক্ত করে।

১. মানুষের ঘুমে বিঘ্ন ঘটিয়ে কষ্ট দেয়ার গুনাহ।

২. তেলাওয়াতের উদ্দেশ্য লোকদেখানো হওয়ার রিয়াকারের গুনাহ। তাদের কেউ তো এমন, যারা লোকদেখানোর উদ্দেশ্যে আযানের সময় মসজিদে তেলাওয়াত করেন, কেননা তা হচ্ছে লোক সমাগমের সময়।

আল্লামা ইবনুল জাওযি বলেন, এসব কারীর যে বিষয়টি আমাকে অবাক করেছে তা হলো, এক কারী ইমাম জুমআর দিন ফজর নামাজের পর মুসল্লিদের অভিমুখী হয়ে সুরা ফালাক ও সুরা নাস পড়ে কুরআন খতমের দোয়া করতেন। উদ্দেশ্য হলো, মানুষ যেন মনে করে যে, তিনি কুরআন খতম করেছেন। এমন কারীদের জেনে রাখা উচিত, আমাদের পূর্বসূরিদের রীতিনীতি এরূপ ছিল না; বরং তারা তো ইবাদত করতেন অতি গোপনে। কেউ তাদের ইবাদত দেখুক কিংবা ইবাদত সম্পর্কে অবগত হোক, এটা তারা মোটেও পছন্দ করতেন না। রাবি বিন খুসাইম তো সব আমলই গোপনে করতেন। যদি দেখে কুরআন পড়াবস্থায় কেউ তার ঘরে প্রবেশ করত তাহলে কাপড় দিয়ে কুরআন ঢেকে ফেলতেন; যেন তার কুরআন তেলাওয়াতের বিষয়টি আগন্তুক বুঝতে না পারে। ইমাম আহমদ বিন হাম্বল তো অধিক পরিমাণে কুরআন পড়তেন, অথচ কখন তিনি কুরআন খতম করেন তা কেউ জানতেন না।

---

২ মুসনাদে আহমদ, আলবানি রহ. প্রণীত 'সিফাতু সালাতিন নাবী (সা) : পৃষ্ঠা ১১৯

গ্রন্থকার বলেন, এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা কারীদের ওপর শয়তানের চক্রান্তবিষয়ক অধ্যায়ে গত হয়েছে। আল্লাহই সঠিক জ্ঞাত এবং তিনিই তাওফিকদাতা।

রোযার ব্যাপারে শয়তানের ধোঁকা

কিছু লোকের অবস্থা তো এমন, শয়তান যাদেরকে সর্বদা রোযা রাখতে উদ্বুদ্ধ করে। এটা জায়েজ, যদি সে রোযা রাখতে গিয়ে নিষিদ্ধ দিনগুলোতে রোযা হতে বিরত থাকে। তবে আপত্তি আসে দুই কারণে।

১. অনবরত রোযা রাখার দরুন শরীর দুর্বল হওয়ায় পরিবারের রুজি উপার্জনের ক্ষমতা হারিয়ে ফেলে এবং স্ত্রী মিলনে অক্ষম হওয়ার দরুন স্ত্রীর চারিত্রিক পবিত্রতা নষ্ট হয়ে যায়। বুখারি ও মুসলিমের হাদিসে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

ان لزوجك عَلَيْكَ حَقًّا

'নিশ্চই তোমার ওপর আপন স্ত্রীরও হক রয়েছে।'[১]

সুতরাং এ নফলের দরুন কত ফরজ যে নষ্ট হয় তা গণনা করা দুষ্কর।

২. অনবরত রোযা রাখার দরুন সে রোযার সর্বোত্তম ফযিলত হাতছাড়া করে। কেননা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, "আল্লাহর নিকট সর্বাধিক প্রিয় রোযা দাউদ আলাইহিস সালামের রোযা, তিনি একদিন রোযা রাখতেন একদিন পানাহার করতেন।'[২]

হজরত আবদুল্লাহ বিন আমর বিন আস রা. বলেন, আমার ব্যাপারে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে বলা হলো যে, ইবনুল আস বলে, আমি যতদিন জীবিত থাকব ততদিন রাতভর নামায ও দিনভর রোযা রাখব। তখন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বললেন, তুমি কি এমনটি বলো? আমি তখন বললাম, ইয়া রাসুলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, আমি এমনটি বলেছি। তখন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তুমি কিছুতেই তা পারবে না। সুতরাং তুমি একদিন রোযা রাখো, একদিন পানাহার করো। রাতের কিছু সময় ঘুমাও,

---

১ সহিহ বুখারি : হাদিস নং ১৯৭৫, সহিহ মুসলিম : হাদিস নং ১১৫৯
২ প্রাগুক্ত

কিছু সময় নামায পড়ো। আর মাসের তিনদিন রোযা রাখো। কেননা ভালো কাজের প্রতিদান দশগুণ বৃদ্ধি করা হয়, আর দাউদ আলাইহিস সালাম এর রোযা এমনই ছিল। তখন আমর ইবনুল আস রা. বললেন, আমি এর চেয়ে বেশি রাখতে সক্ষম। তখন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তাহলে একদিন রোযা রাখো আর দুই দিন পানাহার করো। তখন আমর ইবনুল আস বললেন, ইয়া রাসুলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! আমি এর চেয়ে বেশি রাখতে সক্ষম। তখন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তাহলে একদিন রোযা রাখো একদিন পানাহার করো। আর এটাই দাউদ আলাইহিস সালাম এর রোযা এবং এ রোযাই সর্বাধিক ভারসাম্যপূর্ণ। তখন আমর ইবনুল আস রা. বললেন ইয়া রাসুলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! আমি এর চেয়ে বেশি রাখতে সক্ষম। তখন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, এর চেয়ে উত্তম কোনো রোযা নেই।'[৩]

কেউ যদি প্রশ্ন করে যে, পূর্ববর্তী বুযুর্গদের কেউ কেউ অনবরত সারা বছর রোযা রেখেছেন। আমরা বলব, তারা ধারাবাহিকভাবে রোযা রাখা সত্ত্বেও পরিবারের রুজি উপার্জনের সক্ষম ছিলেন। কিংবা এ সম্ভাবনাও রয়েছে যে, তাদের অধিকাংশের পরিবার ছিল না; ফলে তারা উপার্জনেরও মুখাপেক্ষী ছিলেন না। অবশ্য তাদের অধিকাংশই ধারাবাহিকভাবে রোযা রাখার আমলটি জীবনের শেষ সময়ে করেছেন। তদুপরি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কথা—لَا أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ 'এর চেয়ে উত্তম কোনো রোযা নেই' এর সামনে অন্য কারও কাজকে প্রমাণ হিসেবে উপস্থাপন করার কোনো সুযোগ নেই। এসব লোক স্বল্প পরিমাণে শুকনো খাবার ভক্ষণের দরুন দৃষ্টিশক্তি হারিয়ে ফেলে এবং মগজ-মস্তিষ্ক রুক্ষ হয়ে যায়। এটা নিজের প্রতি এমন জুলুম, শরিয়ত যার সমর্থন করে না।

অনেক ইবাদতকারী বছরব্যাপী অনবরত রোযা রাখেন এবং রোযার দরুন তাদের যশ-খ্যাতি লোকসমাজে ছড়িয়ে পড়ে। ফলে তারা কখনোই রোযা হতে বিরত হন না। আর যদি কখনো রোযা ভঙ্গ করেন তাহলে লোকচক্ষুর অন্তরালে পানাহার করেন, যেন তাদের যশ-খ্যাতি লোপ না পায়। এটা তো গোপন রিয়া। যদি তার মাঝে ইখলাস থাকত এবং নিজ আমল গোপনের সদিচ্ছা থাকত তাহলে সে ওই ব্যক্তির সামনে পানাহার করত, যে তার

---

৩ প্রাগুক্ত

রোযার বিষয়ে অবগত। অতঃপর পুনরায় সে এমনভাবে রোযা রাখত যেন কেউ বুঝতে না পারে। অনেকের অবস্থা তো এমন, যারা রোযার বিষয়ে মানুষের নিকট বলে বেড়ায়। তাই সে বলে, আজ বিশ বছর যাবৎ আমি রোযা ভাঙ্গিনি। আর শয়তানও এ বিষয়ে তাকে প্ররোচনা দিয়ে বলে, তোমার রোযা রাখার বিষয়টি মানুষকে বলা উচিত, যাতে মানুষ তোমার অনুসরণ করতে পারে। আল্লাহই মানুষের মনের খবর ভালো জানেন।

সুফিয়ান সাওরি রহ. বলেন, এক ব্যক্তি দীর্ঘ দিন একটি আমল গোপনে করতে থাকে। পরে শয়তানের প্রলোভনের জালে আটক হয়ে সে অন্যের নিকট তা প্রকাশ করে দেয়। ফলে সে গোপনীয়তা রক্ষাকারীর দল থেকে বের হয়ে রিয়াকারদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়। কিছু কিছু আবেদ আছেন, যারা স্বভাবত সোমবার ও বৃহস্পতিবার রোযা রাখেন। যদি সেদিন তাদেরকে কেউ দাওয়াত করে তাহলে তারা বলেন, আজ না বৃহস্পতিবার! এ কথার উদ্দেশ্য হল মানুষ যেন বুঝে নেয় যে, এ ব্যক্তি প্রতি সোম ও বৃহস্পতিবার নিয়মিত রোযার আমল করে থাকেন। অনেক ইবাদতকারী নিয়মিত রোযা রাখার দরুন অন্যকে তুচ্ছ জ্ঞান করে তার প্রতি বাঁকা দৃষ্টিতে তাকান। কেউ কেউ আবার নিয়মিত রোযা রাখা সত্ত্বেও না ইফতারিতে হালাল-হারামের যাচাই-বাছাই করেন, না রোযাবস্থায় গীবত-শেকায়েত, মহিলাদের প্রতি কুদৃষ্টি নিক্ষেপ এবং অশালীন কথাবার্তা থেকে বিরত থাকেন। আর শয়তানও তাদের মনে এ বিশ্বাস বদ্ধমূল করে যে, রোযাই তোমার এসব গুনাহ মিটিয়ে দেবে। অথচ এর সবই শয়তানের সূক্ষ্ম চক্রান্ত।

হজের ব্যাপারে শয়তানের চক্রান্ত

গ্রন্থকার বলেন, একবার হজ পালনের দ্বারাই মানুষের ওপর থেকে হজের ফরযিয়্যাত রহিত হয়ে যায়। এতৎসত্ত্বেও বহু লোক এমন আছেন, যারা হজ পালনের উদ্দেশ্যে মক্কা অভিমুখে সফর করেন। এটা যে পুণ্যের কাজ এ ব্যাপারে সন্দেহ পোষণ ও আপত্তি উত্থাপন এক মারাত্মক অন্যায়। কিন্তু আপত্তি তখনই আসে, যদি এ হজ পালন পিতা-মাতার অসন্তুষ্টির কারণ হয়, অথবা হজ পালকারী মাজলুম থেকে জুলুমের ক্ষমা না নিয়ে থাকে, অথবা হজ পালনের উদ্দেশ্য যদি হয় আনন্দ-বিনোদনে মন উৎফুল্ল করা, অথবা এমন মাল দ্বারা হজ করা যা সন্দেহযুক্ত, কিংবা এ উদ্দেশ্যে হজ পালন করা, যেন মানুষ তাকে হাজী সাহেব বলে। এদের অধিকাংশের

অবস্থা এমন, যারা হজের সফরে পবিত্রতা ও নামাজের ন্যায় গুরুত্বপূর্ণ ফরয নষ্ট করেন, আর কা'বার চারপাশে সমাবেত হন এমন অন্তর নিয়ে যা কলুষিত, এমন হৃদয় দিয়ে যা অপবিত্র। অথচ হজের উদ্দেশ্য হলো অন্তরের নৈকট্য; দেহের নৈকট্য নয়, আর অন্তরের নৈকট্য তো তাকওয়া বিনে অর্জন সম্ভব নয়।

কতেক হাজী বহুবার হজ করে মানুষের কাছে বলে, আমি বিশবার হজ করেছি। আবার কিছুলোক এমনও আছেন যারা কা'বার পাশাপাশি অবস্থান করা সত্ত্বেও অন্তর পবিত্র করার প্রতি মনোযোগ দেন না; বরং দম্ভ করে বলেন, আজ বিশ বছর যাবৎ কা'বার পাশে অবস্থান করছি। এসব বিষয় রিয়ার অন্তর্ভুক্ত।

অনেক হাজী নামায ছেড়ে দেয় এবং ওজনে কম দেয়, আর শয়তান তাদেরকে এই ধোঁকা দেয় যে, এসবের ক্ষতিপূরক হিসেবে হজই তোমার জন্য যথেষ্ট। শয়তানের প্ররোচনায় আকৃষ্ট হয়ে অনেক হাজী হজের পালনীয় কাজসমূহে এমন রীতি-নীতি আবিষ্কার করেন যার অস্তিত্ব শরিয়তে নেই। হাজীদের এক জামাতকে আমি দেখেছি, যারা এক কাঁধ হতে ইহরাম কাপড় খুলে দেন এবং দীর্ঘ সময় সূর্যের নিচে অবস্থান করেন, ফলে তাদের ত্বক নষ্ট হয়ে যায় আর মাথার চামড়া ফেটে যায় এবং এর মাধ্যমেই তারা মানুষদের নিকট নতুন বেশ ধারণ করেন। বুখারি শরিফের হাদিসে ইবনে আব্বাস রা. বলেন,

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ وَهُوَ يَطُوفُ بِالكَعْبَةِ بِإِنْسَانٍ يَقُودُ إِنْسَانًا بِخِزَامَةٍ فِي أَنْفِهِ، فَقَطَعَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِهِ، ثُمَّ أَمَرَهُ أَنْ يَقُودَهُ بِيَدِهِ

'রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক লোককে দেখলেন, সে মুখে লাগাম বেঁধে কাবা ঘর তাওয়াফ করছে, তখন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার লাগাম কেটে দেন। অন্য রেওয়ায়েতে এসেছে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দেখলেন, এক ব্যক্তি অন্য ব্যক্তির নাকে লাগামের আংটা লাগিয়ে তাওয়াফ করাচ্ছে, তখন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়াসাল্লাম তা কেটে দেন এবং লোকটিকে হাত ধরে তাওয়াফ করানোর নির্দেশ দেন।'[১]

গ্রন্থকার আল্লামা ইবনুল জাওযি রহ. বলেন, এ হাদিস ধর্মের বিষয়ে এমন কিছু উদ্ভাবনের নিষেধাজ্ঞাকে অন্তর্ভুক্ত করে, যার উপমা শরিয়তে নেই। যদিও সে ভালো উদ্দেশ্যে এটি করে থাকে।

তাওয়াক্কুলের ব্যাপারে শয়তানের চক্রান্ত

শয়তান একদলকে এমন চক্রান্তের জালে আটকায়, যারা তাওয়াক্কুলের দাবিদার, তাই তারা পাথেয় তথা টাকা-পয়সা ছাড়াই হজে বেরিয়ে যান। তাদের ধারণা এটাই প্রকৃত তাওয়াক্কুল। অথচ প্রকৃতপক্ষে এটা তাওয়াক্কুল নয়। তারা চরম ভ্রান্তিতেই নিমজ্জিত। এক ব্যক্তি ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল রহ.-কে বলল, আমি পাথেয় ছাড়া আল্লাহর ওপর ভরসা রেখে হজের উদ্দেশ্যে মক্কায় যেতে চাই। তখন ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল রহ. তাকে বলল, তাহলে কোনো কাফেলার সাথে শরিক হওয়া ব্যতীত একাকী সফর করো। তখন লোকটি বলল, কাফেলার সাথে শরিক হওয়া ব্যতীত একাকী সফর আমার পক্ষে সম্ভব নয়। তখন আহমদ ইবনে হাম্বল রহ. বললেন, তাহলে তো তুমি আল্লাহর ওপর তাওয়াক্কুল করোনি; কাফেলার ওপরই তোমার তাওয়াক্কুল। আমরা আল্লাহর কাছে তাওফিক প্রার্থনা করছি।

জিহাদের ক্ষেত্রে মুজাহিদদের ওপর শয়তানের চক্রান্ত

গ্রন্থকার বলেন, শয়তান মুজাহিদদের পিছুও ছাড়ে না। ফলে কারও উদ্দেশ্য হয় গৌরব-প্রতিযোগিতা ও আত্মপ্রদর্শন, যেন মানুষ তাকে গাজী কিংবা সাহসী বীর উপাধিতে ভূষিত করে। অথবা গনীমত লাভের আশা তাদেরকে জিহাদের প্রতি অনুপ্রাণিত করে। অথচ আমল নিয়তের ওপর নির্ভরশীল।

عَنْ أَبِي مُوسَى، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا القِتَالُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ؟ فَإِنَّ أَحَدَنَا يُقَاتِلُ غَضَبًا، وَيُقَاتِلُ حَمِيَّةً، فَرَفَعَ إِلَيْهِ

১ সহিহ বুখারি : হাদিস নং ১৬২১

رَأْسَهُ، قَالَ: وَمَا رَفَعَ إِلَيْهِ رَأْسَهُ إِلَّا أَنَّهُ كَانَ قَائِمًا، فَقَالَ: «مَنْ قَاتَلَ لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ العُلْيَا، فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ

হজরত আবু মুসা আশআরি রা. বলেন, এক ব্যক্তি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট এসে বলল, আচ্ছা বলুন তো হে আল্লাহর রাসুল, এক ব্যক্তি বীরত্ব প্রকাশের উদ্দেশ্যে লড়াই করে, এক ব্যক্তি অহংকার প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে লড়াই করে, আরেক ব্যক্তি আত্মপ্রদর্শনের উদ্দেশ্যে লড়াই করে; এদের ভেতর কে আল্লাহর রাস্তায় রয়েছে? তখন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আল্লাহর দীন পৃথিবীতে সমুন্নত হওয়ার উদ্দেশ্যে যে লড়াই করে সে আল্লাহর রাস্তায় রয়েছে।'[২]

হজরত ইবনে মাসউদ রা. বলেন, খবরদার! কেউ যদি জিহাদের ময়দানে মারা যায়, তবে এ কথা বলো না যে, অমুক শহিদ হয়েছে। কেননা জিহাদে অংশগ্রহণকারীদের নিয়ত বিভিন্ন রকম হয়ে থাকে। কেউ জিহাদ করে গনীমত লাভের আশায়, কেউ জিহাদ করে আলোচিত হওয়ার আশায়, আবার কেউ জিহাদ করে বীর উপাধির আশায়।

হজরত আবু হোরায়রা রা. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে বলতে শুনেছি, কেয়ামতের দিন যে তিন ব্যক্তির ফয়সালা হবে তাদের একজন হবেন শহিদ। তাকে উপস্থিত করে তার প্রতি আল্লাহপ্রদত্ত নেয়ামতরাজির কথা উল্লেখ করলে সে তা স্বীকার করবে। তখন আল্লাহ তাকে বলবেন, এ নেয়ামত ভোগ করে তুমি কী আমল করেছ? সে উত্তরে বলবে, তোমার রাস্তায় জিহাদ করে জীবন উৎসর্গ করেছি। তখন আল্লাহ বলবেন, তুমি মিথ্যা বলছ; বরং বীর উপাধি লাভের আশায় তুমি লড়াই করেছ এবং সে উপাধি তোমার লাভ হয়েছে। অতঃপর আল্লাহর নির্দেশে তাকে অধোমুখ করে টেনে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে।

দ্বিতীয় ব্যক্তি এমন, যে ইলম শেখার পর অন্যকে শিখিয়েছে এবং কুরআন তেলাওয়াত করেছে। তাকে উপস্থিত করে তার প্রতি আল্লাহর প্রতি নেয়ামতরাজির কথা উল্লেখ করলে সে তা স্বীকার করবে। তখন আল্লাহ তাকে বলবেন, এ নেয়ামত ভোগ করে তুমি কী আমল করেছ? সে উত্তরে বলবে, তোমার সন্তুষ্টির অর্জনের উদ্দেশ্যে ইলম শিখে অন্যকে তা শিখিয়েছি এবং নিয়মিত কুরআন তেলাওয়াত করেছি। তখন আল্লাহ তাকে বলবেন,

---

২ সহিহ বুখারি : হাদিস নং ১২৩, সহিহ মুসলিম : হাদিস নং ১৯০৪

তুমি মিথ্যা বলছ; বরং আলেম উপাধি লাভের আশায় তুমি ইলম শিখেছ এবং সে উপাধি তোমার লাভ হয়েছে, আর কারী উপাধি লাভের আশা তুমি কুরআন পড়েছ এবং সে উপাধিও তোমার লাভ হয়েছে। অতঃপর আল্লাহর নির্দেশে তাকে অধোমুখ করে টেনে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে।

তৃতীয় ব্যক্তি এমন, যাকে আল্লাহ বিপুল পরিমাণে সব ধরনের ধন-সম্পদ দান করেছেন। তাকে উপস্থিত করে তার প্রতি আল্লাহর প্রতি নেয়ামতরাজির কথা উল্লেখ করলে সে তা স্বীকার করবে। তখন আল্লাহ তাকে বলবেন, এ নেয়ামত ভোগ করে তুমি কী আমল করেছ? সে উত্তরে বলবে, আপনার পছন্দনীয় এমন কোনো খাত নেই যাতে আপনার সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে আমার সম্পদ ব্যয় হয়নি। তখন আল্লাহ তায়ালা বলবেন, তুমি মিথ্যা বলছ; বরং সম্পদ ব্যয় তুমি এজন্য করেছ, যেন মানুষ তোমাকে দানশীল বলে, আর তা বলাও হয়েছে। অতঃপর আল্লাহর নির্দেশে তাকে অধোমুখ করে টেনে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে।'[১]

আবু হাতেম রহ. বলেন, আমি আবদাহ ইবনে সোলাইমানকে বলতে শুনেছি, আমরা রোম দেশে আব্দুল্লাহ বিন মোবারকের সাথে এক অভিযানে ছিলাম। হঠাৎ আমরা এক শত্রু বাহিনীর সম্মুখীন হলাম। দু'দল মুখোমুখি হলে শত্রুপক্ষের এক ব্যক্তি বের হয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতার আহ্বান জানালে আমাদের একজন তার দিকে এগিয়ে গেল এবং কিছুক্ষণ তার সাথে লড়াই করে তাকে জাহান্নামে পাঠিয়ে দিল। অতঃপর অন্য ব্যক্তি এগিয়ে এলে তাকেও জাহান্নামে পাঠিয়ে দিল। এভাবে চার-পাঁচ জনকে জাহান্নামে পাঠানোর পর আমাদের লোকটি শত্রুপক্ষকে প্রতিদ্বন্দ্বিতার আহ্বান জানালে শত্রুপক্ষের এক ব্যক্তি বের হয়ে পরস্পর লড়াই শুরু করলে শত্রুপক্ষের লোকটি একপর্যায়ে আমাদের লোককে শহিদ করে দেয়। তখন লোকেরা তার লাশের পাশে ভিড় করলে আমি তাদের সাথে সমবেত হয়ে দেখতে পাই, তিনি জামার আস্তিন দ্বারা চেহারা ঢেকে রেখেছেন। তখন আমি তার আস্তিনের এক প্রান্ত ধরে হাত প্রসারিত করলে দেখতে পাই, তিনি আব্দুল্লাহ বিন মোবারক রহ.। তখন আমি বললাম (আল্লাহ তোমাদের প্রতি রহম করুন) তোমরা এ মুখলিস নেতাকে দেখো, মানুষ তাকে দেখে তার প্রশংসা করার ভয়ে কীভাবে সে নিজেকে গোপন করেছে। ইবরাহিম বিন আদহাম

---

১ সহিহ মুসলিম : হাদিস নং ১৯০৫

জিহাদ করতেন। যখন লোকেরা গনীমতের মাল ভাগ করত তিনি গনীমতের কোনো অংশ নিতেন না, যাতে অধিক সাওয়াব লাভ হয়।

গনীমতের মালের ব্যাপারে মুজাহিদদের ওপর শয়তানের ধোঁকা

শয়তান বহু মুজাহিদকে গনীমত লাভের পর ধোঁকায় পতিত করে। ফলে গনীমতের সম্পদ সে এ পরিমাণ গ্রহণ করে, যা তার অধিকারবহির্ভূত। এদের অনেকে অজ্ঞতার কারণে মনে করে, কাফেরদের সম্পদ যে যা নিতে পারবে তা তার জন্য বৈধ। অথচ তাদের জানা নেই যে, গনীমতের মাল আত্মসাৎ করা মারাত্মক গুনাহ।

হজরত আবু হোরায়রা রা. বলেন, আমরা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে খাইবারের যুদ্ধে বের হলাম। যুদ্ধের একপর্যায়ে আল্লাহ আমাদেরকে বিজয় দান করলে খাবার, জামা-কাপড় ও বহু আসবাবপত্র আমরা গনীমতস্বরূপ লাভ করি। তবে কোনো সোনা-রুপা আমাদের হস্তগত হয়নি। অতঃপর আমরা এক উপত্যকার দিকে যাত্রা শুরু করি। এ যাত্রায় রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মালিকাধিন এক গোলাম তার সাথে ছিল। আমরা উপত্যকায় যাত্রাবিরতি করলে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর গোলাম তার মালপত্র খোলার প্রস্তুতি নিলে এক তির এসে তার রুহ ছিনিয়ে নেয়। তখন আমরা বললাম, ইয়া রাসুলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! কী সৌভাগ্য তার! সে তো শাহাদাতের মৃত্যু লাভ করেছে। তখন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, কিছুতেই নয়; বণ্টনবিহীন যে আলখেল্লা খাইবারের যুদ্ধে যে আত্মসাৎ করেছে তার আগুনে সে অবশ্যই দগ্ধ হবে। এ কথা শ্রবণে উপস্থিত লোকেরা ভীত-সন্ত্রস্ত হলো। তখন এক ব্যক্তি জুতোর দু'একটি ফিতা এনে বলল, ইয়া রাসুলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! আমি তা খাইবারের দিন নিয়েছিলাম। তখন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, এ তো আগুনের ফিতা; অথবা বলেছেন, এ ফিতাদ্বয় তো আগুনের।[২]

---

২ সহিহ বুখারি : ৪২৩৪; সহিহ মুসলিম : ১১৫।

বণ্টনের আগে গনীমতের মাল গ্রহণ জায়েয নেই—এ কথা জানা সত্ত্বেও অনেক মুজাহিদ সম্পদের আধিক্য দেখে ধৈর্যহারা হয়ে মনে করেন, আমার জিহাদ মাল আত্মসাতের ক্ষতিপূরক হবে। এসব ক্ষেত্রেই ঈমান ও ইলমের নিদর্শন স্পষ্ট হয়ে যায়। আবু ওবায়দা আলআম্বরী বলেন, মুসলমানরা যখন মাদায়েন অবতরণ করে গনীমতলব্ধ মাল জমা করতে লাগল, তখন এক ব্যক্তি এসে তার নিকট বিদ্যমান গনীমতের মাল জমাকারীর নিকট জমা দিলে জমাকারীর সাথি বলল, এমন উদার দিল মানুষ তো আমি আগে দেখিনি। সে যা জমা দিয়েছে তার মূল্য তো আমাদের গনীমতলব্ধ সব সম্পত্তি ছাড়িয়ে যাবে। সে তখন বলল, তুমি কি এখান থেকে নিজের জন্য কিছু রেখেছ? লোকটি বলল, আল্লাহর কসম! যদি আল্লাহর ভয় আমার অন্তরে না থাকত তাহলে তোমাদের নিকট আমি তা কিছুতেই জমা দিতাম না। তারা তখন বুঝল যে, লোকটি বড় মাপের কোনো ব্যক্তি হবেন। তারা পরিচয় জানার উদ্দেশ্যে জিজ্ঞেস করল, কে আপনি? কী আপনার পরিচয়? সে বলল, আল্লাহর কসম! তোমাদের প্রশংসা লাভের উদ্দেশ্যে তোমাদেরকে আমার পরিচয় দেব না এবং তোমাদের উচ্চ প্রশংসা পাওয়ার আশায় তোমাদেরকে প্ররোচিতও করব না; বরং আমি আল্লাহর প্রশংসা করি এবং তার প্রতিদানেই আমি সন্তুষ্ট। তখন পরিচয় জানার উদ্দেশ্যে তারা এক ব্যক্তিকে তার পিছু পাঠায়। লোকটি নিজ সম্প্রদায়ের নিকট পৌঁছলে সে তার সাথিদেরকে তার পরিচয় জিজ্ঞেস করলে তারা বলল, ইনি আমের বিন আবদে কায়স রহ.।

সৎকাজে আদেশ ও অসৎকাজে বাধাদানকারীদের ওপর শয়তানের চক্রান্ত

এ ধরনের লোক দু'প্রকার—আলেম ও জাহেল। ইবলিস আলেমদেরকে দুই পদ্ধতিতে ধোঁকা দেয়।

১. শয়তান তার কাজে খ্যাতি ও আত্মশ্লাঘার স্পৃহা সৃষ্টি করে। আবু সোলাইমান বলেন, জুমার খুতবায় খলিফা আবু জাফর মানসুরকে কাঁদতে দেখে আমি ভীষণ রাগান্বিত হই। ফলে খুতবা শেষে নামার সময় দাঁড়িয়ে তার কৃতকর্মের ব্যাপারে তাকে নসিহত করার সংকল্প করি। কিন্তু মানুষের উপস্থিতিতে দাঁড়িয়ে কোনো খলিফাকে নসিহত করা আমার নিকট অপছন্দনীয় মনে হলো। কেননা এতে মানুষের দৃষ্টি আমার দিকে নিবদ্ধ

হবে এবং তা আমার খ্যাতি অর্জনের কারণ হবে। তাই আমি চুপ করে বসে রইলাম। কারণ আমার নিয়তে এখন ইখলাস নেই।

২. প্রবৃত্তির তাড়নায় ক্রোধান্বিত ও রাগান্বিত হওয়া। এ অবস্থা কখনো কখনো শুরুতেই সৃষ্টি হয়ে যায়। আবার কখনো আদেশ-নিষেধের মাঝে সৃষ্টি হয়। ফলে যে ক্রোধ আল্লাহর জন্য ছিল তা উল্টো নিজ স্বার্থ হাসিলের কারণ হয়ে যায়। এরূপ পরিস্থিতিতে আমাদের আকবিররা তো দণ্ড প্রয়োগ হতেও বিরত থাকতেন। হজরত ওমর বিন আব্দুল আজিজ রহ. এক ব্যক্তিকে বললেন, যদি আমি ক্রোধান্বিত না হতাম তাহলে তোমার ওপর শাস্তি প্রয়োগ করতাম। তার এ কথার মর্ম হলো, তুমি যেহেতু আমাকে ক্রোধান্বিত করেছ তাই আমার আশঙ্কা হলো যে, এ মুহূর্তে তোমাকে শাস্তি প্রদান করলে আল্লাহর জন্য উৎসারিত ক্রোধের সাথে নিজ ক্রোধের সংমিশ্রণ ঘটবে।

***

শিষ্টের লালন ও দুষ্টের দমনকারী ব্যক্তি যদি আলেম না হয় তাহলে শয়তান তাকে নিয়ে খেলা করে। ফলে তার আদেশ-নিষেধের দ্বারা সংশোধনের চেয়ে বিশৃঙ্খলা বেশি ছড়ায়। কারণ সে অজ্ঞতাবশত এমন বিষয়ে বাধা প্রদান করে যা সর্বসম্মতভাবে বৈধ। আর কখনো এমন বিষয়ে বিরোধিতা করে যাতে ব্যাখ্যার অবকাশ রয়েছে এবং কতক মাজহাবেও তার ওপর আমল রয়েছে। আবার কখনো দরজা ভেঙ্গে অথবা দেয়াল টপকিয়ে মন্দকর্ম সম্পাদনকারীদের মারধর করে তাদেরকে দোষারোপ করে। যদি তারা কোনো উত্তর দেয় তাহলে তা তাকে ভীষণ পীড়া দেয়। ফলে আল্লাহর জন্য উৎসারিত ক্রোধের ওপর নিজ ক্রোধ প্রাধান্য পায়। আবার কখনো সে এমন বিষয় প্রকাশ করে দেয় শরিয়ত যা গোপন করার আদেশ করেছে। ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বলকে এমন সম্প্রদায়ের ব্যাপারে জিজ্ঞেস করা হলো, যাদের সাথে রয়েছে ঢাকনাবৃত মদ। তিনি বললেন, যদি তা ঢাকনাবৃত হয় তাহলে তোমরা তা ভেঙ্গো না। তাকে আরেক ব্যক্তি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হয়, যিনি বাঁশি ও তবলার আওয়াজ শোনেন কিন্তু সে আওয়াজ কোথা হতে ভেসে আসে তা তার জানা নেই। তিনি বললেন, অদৃশ্য বিষয়ে অনুসন্ধান তোমার দায়িত্ব নয়, সুতরাং তার অনুসন্ধান হতে নিজেকে বিরত রাখো। আবার কখনো দুষ্টের দমনকারী এ ব্যক্তি মন্দকর্ম সম্পাদনকারীর বিষয়টি এমন ব্যক্তির নিকট পেশ করে, যে তার ওপর জুলুম করবে, অথচ ইমাম

আহমদ ইবনে হাম্বল রহ. বলেছেন, তুমি যদি জানো যে, এ ব্যক্তির মন্দ কর্মের বিষয়টি বাদশার নিকট পেশ করলে তিনি শরিয়ত মোতাবেক শাস্তিদান করবেন তাহলে তার নিকট তা পেশ করো।

দুষ্টের দমনকারীদেরকে শয়তান ধোঁকা দেয়ার আরেক পদ্ধতি হলো, সে যখন মন্দ কাজের বিরোধিতা করে তখন কোনো এক মজলিসে বসে মন্দ কাজের বিবরণ তুলে ধরে এবং তা নিয়ে সে গর্ববোধ করে। অতঃপর সে মন্দকর্ম সম্পাদনকারীদেরকে ক্রোধান্বিত ব্যক্তির ন্যায় গালিগালাজ করে তাদেরকে অভিশাপ দিতে থাকে। অথচ এমনও হতে পারে, যাদেরকে সে গালিগালাজ করে অভিশাপ দিচ্ছে—তারা কৃত মন্দকাজ হতে তাওবাহ করেছে। ফলে মন্দকর্মের ওপর অনুশোচনার দরুন তারা হয়ে যায় শ্রেষ্ঠ, আর বড়ত্ব প্রকাশের দরুন সে হয়ে যায় নিকৃষ্ট। আর মুসলমানদের দোষ প্রকাশ করে সে ওইসব লোকদের দলভুক্ত হয় যাদের সম্পর্কে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি মুসলমানদের দোষ অনুসন্ধান করবে আল্লাহ তার দোষ প্রকাশ করে দেবেন, আর আল্লাহ যার দোষ প্রকাশ করবেন তাকে তিনি লাঞ্ছিত করবেন, যদিও সে রুদ্ধদ্বার কক্ষে থাকুক। আমি দুষ্টের দমনকারীদের রীতিনীতি সম্পর্কে অজ্ঞ—এমন ব্যক্তি সম্পর্কে শুনেছি, সে ধারণার বশীভূত হয়ে মন্দ কর্মকারীদের ওপর অতর্কিত হামলা চালিয়ে তাদেরকে কষ্টদায়ক শাস্তি দেয়, তাদের পাত্রে কি রয়েছে তা নিশ্চিতভাবে জানার আগেই পাত্রসমূহ ভেঙ্গে ফেলে। এতে কোনোই সন্দেহ নেই যে, শরিয়তের বিধি-বিধান সম্পর্কে অজ্ঞতাই তাদেরকে এ রূপ করতে উদ্বুদ্ধ করে।

আমাদের পূর্বসূরিরা মন্দকাজে বাধাদানের ক্ষেত্রে কোমলতা প্রদর্শন করতেন। সিলাহ ইবনে আশাম কোন ব্যক্তিকে এক মহিলার সাথে কথা বলতে দেখে বললেন, দেখো, আল্লাহ কিন্তু তোমাদেরকে দেখছেন; আল্লাহ আমাদের এবং তোমাদের দোষ-ত্রুটি গোপন রাখুন।

আরেকদিন খেল-তামাসায় লিপ্ত এক সম্প্রদায়ের পাশ দিয়ে অতিক্রমকালে তাদেরকে বললেন, হে ভাইয়েরা! এমন ব্যক্তি সম্পর্কে তোমাদের কী মন্তব্য, যে দীর্ঘ পথ পাড়ি দেয়ার ইচ্ছা করেছে, অথচ রাত কাটে তার নিদ্রাবস্থায় আর দিন অতিবাহিত হয় খেল-তামাসায়। আচ্ছা বলো তো, এ ব্যক্তির সফর কবে শেষ হবে! তখন তাদের একজন সতর্ক হয়ে বলল, হে

সম্প্রদায়ের লোকেরা, এ ব্যক্তি তো আমাদেরকে শিখাচ্ছেন। সে তখন তাওবা করে তার সাহচর্য গ্রহণ করে।

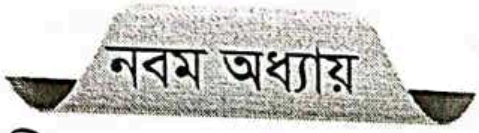
***

মন্দকাজের বিরোধিতার ক্ষেত্রে কোমল ব্যবহার লাভের সর্বাধিক হকদার রাজা-বাদশাহ ও নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ। তাই তাদেরকে হেকমতের সাথে এভাবে বলা, আল্লাহ আপনাদের মর্যাদা উঁচু করেছেন, আপনারা তার নেয়ামত লাভ করেছেন। তাই নেয়ামত ভোগের বিপরীতে আল্লাহর নাফরমানিতে লিপ্ত হওয়া তো অনুত্তম আচরণ।

***

ইবলিসের প্ররোচনায় পড়ে কিছু ইবাদতকারী এমনও আছেন, যারা কোনো মন্দ কাজ হতে দেখলে তার বিরোধিতা করেন না। তারা বলেন, সৎকাজে ও মন্দকাজে বাধাদান তো ওই ব্যক্তি করবে, যে সৎকর্মশীল ও পরিশুদ্ধ হৃদয়ের অধিকারী। আর আমি তো সৎকর্মশীল নই, তাই সৎকাজে আদেশ ও মন্দকাজে বাধাদান আমার জন্য শোভনীয় নয়। এমন ব্যক্তিদের জেনে রাখা উচিত, তারা যা ধারণা করেছে তা সম্পূর্ণ ভুল। কেননা সৎকাজে আদেশ ও মন্দকাজে বাধাদান তো প্রত্যেকের ওপর ওয়াজিব, যদিও মন্দকাজের এ প্রবণতা তাদের মাঝে থাকুক। তাই মন্দকাজে তার বাধাদানকারীর উচিত নিজেকে পরিশুদ্ধ করা, যেন তার বাধাদান মানুষকে প্রভাবিত করে।

ইবনে আকিল বলেন, আমাদের জমানায় আমি আবু বকর আকফালিকে খলিফা থাকাকালীন দেখেছি, তিনি যখন কোনো মন্দকাজে বাধাদানের প্রস্তুতি নিতেন তখন তার সাথে এমন বুযুর্গদের নিয়ে যেতেন যারা নিজ হাতে উপার্জিত খাদ্য দ্বারাই আহার করতেন। কারও কাছে হাত পাততেন না বা কারও হাদিয়ার আশায় থাকতেন না। আবু বকর খাব্বায রুটি তৈরি করতেন। তারা ইবাদতের ক্ষেত্রেও ছিলেন অধ্যবসায়ী। দিনে রোযা রাখতেন আর রাতে তাহাজ্জুদ পড়তেন।



নবম অধ্যায়

সংসারত্যাগীদের ওপর শয়তানের চক্রান্ত



অজ্ঞ সাধারণ লোকেরা কুরআন ও হাদিসে দুনিয়ার নিন্দার কথা শুনে সংসার বর্জন করে শয়তানের ধোঁকায় পড়ে পাহাড়-জঙ্গলে চলে যায়। ফলে জুমা, জামাত ও ইলম অর্জন থেকে বঞ্চিত হয়ে সে বন্য পশু-পাখির ন্যায় জীবন যাপন শুরু করে। আর ইবলিস তার দিলে এ বিশ্বাস বদ্ধমূল করে যে, প্রকৃতপক্ষে এটাই বৈরাগ্য ও দুনিয়াবিমুখতা। অন্যদের অবস্থা দেখিয়ে শয়তান তাকে প্রলোভন দিতে থাকে যে, অমুক পরকালের নাজাতের আশায় বন-জঙ্গল ও সাগর উপকূলে ঘুরে বেড়িয়েছেন, আর অমুক পাহাড়ের নির্জন গুহায় রাতদিন ইবাদত করেছেন। অথচ তাদের জানা নেই যে, এসব লোকদের অন্ধ অনুকরণে তাদের পরিবার ক্ষতিগ্রস্ত হয়, আর সন্তানের বিচ্ছেদ বেদনায় মা-বাবা অঝোরে কাঁদে। এদের অনেকে নামাজের বিধি-বিধান ভালোভাবে জানে না, আর কেউ কেউ অন্যের প্রতি অন্যায়-অত্যাচার করে মজলুমের কাছ থেকে ক্ষমা চায়নি। মূলত শরিয়তের বিধি-বিধান সম্পর্কে অজ্ঞতার কারণে শয়তান এদেরকে সহজে ধোঁকা দেয়ার প্রয়াস পায়। এসব লোকদের জেনে রাখা উচিত, তারা যতটুকু জানে তা নিয়ে নিজের প্রতি সন্তুষ্ট থাকা একপ্রকার মূর্খতা। শরিয়তের বিধি-বিধান সম্পর্কে বিজ্ঞ কোনো ফকিহের সাহচর্য লাভের সুযোগ যদি এদের হতো তাহলে ফকিহ তাদেরকে অবশ্যই শেখাতেন যে, দুনিয়া সত্তাগতভাবে নিন্দিত নয়। আর এমন বস্তু কীভাবে নিন্দিত হবে যাকে আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন এবং মানবজাতির অস্তিত্ব রক্ষায় যার প্রয়োজন অনস্বীকার্য। ইলম অর্জন ও ইবাদত পালনে যার সাহায্য একমাত্র উপায়।

চিন্তা করে দেখুন! বেঁচে থাকার জন্য খাবার-পানীয়, সতর ঢাকতে পোশাক-পরিচ্ছদ, ইলম অর্জন ও ইবাদত পালনে মাদরাসা-মসজিদ—এর কোনটি দুনিয়ার অংশ নয়? হ্যাঁ, দুনিয়ার নিন্দা দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, দুনিয়ার এমন বস্তু গ্রহণ করা যা বৈধ নয় কিংবা বৈধ বস্তুকে এমনভাবে গ্রহণ করা যা শরিয়তসম্মত নয় অথবা এ পরিমাণ গ্রহণ করা যা বৈধতার সীমা ছাড়িয়ে অপচয়ের গণ্ডিতে প্রবেশ করে। পক্ষান্তরে দুনিয়ার ভোগসামগ্রী প্রয়োজন অনুপাতে গ্রহণ করা শরিয়তের দৃষ্টিতে নিন্দনীয় নয়। আর ইবাদতের উদ্দেশ্যে নির্জন পাহাড়ে চলে যাওয়া তো শরিয়া-সমর্থিত নয়। কেননা–

ان النبي «صلى الله عليه وسلم» نهى أَنْ يَبِيتَ الرَّجُلُ وَحْدَهُ أَ

'রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একাকী রাত্রি যাপন হতে মানুষকে নিষেধ করেছেন।'[১]

আর পাহাড়ে অবস্থানের দরুন জুমার নামায ও জামাতে শরিক হওয়া থেকে নিজেকে বঞ্চিত রাখতে হয়।

জ্ঞানার্জন ও আলেম-ওলামাদের থেকে নিজেকে দূরে রাখার দরুন মূর্খতার প্রভাব শক্তিশালী হয়। পিতা-মাতা হতে এভাবে বিচ্ছিন্ন হওয়া অবাধ্যতার নামান্তর, আর পিতা-মাতার অবাধ্যতা অন্যতম কবিরা গুনাহ। যারা ইবাদতের নিমিত্তে পাহাড়ে অবস্থান করেছেন তাদের অবস্থা সম্ভাবনাযুক্ত, কেননা হতে পারে তাদের পরিবার-পরিজন ও পিতা-মাতা কেউ ছিল না। তাই তারা নির্জন পাহাড়ে গমন করে একত্রে সমবেত হয়ে আল্লাহর ইবাদতে লিপ্ত হয়েছেন। যদি তারা কারও হক পূরণ না করে এমন করে থাকেন, তাহলে বলতে হবে তিনি ভুলের ওপর ছিলেন। আগেকার মনীষীদের একজন বলেছেন, আমরা এক পাহাড়ে সমবেত হয়ে ইবাদতে লিপ্ত হলে সুফিআন সাওরি এসে আমাদেরকে তাড়িয়ে দেন।

সংসারবিরাগীদের ওপর শয়তানের ধোঁকা

শয়তান সংসারবিরাগীদেরকে ধোঁকায় ফেলার আরেক পদ্ধতি হলো, সে তাদেরকে দুনিয়াবিমুখতায় লিপ্ত রেখে ইলম অর্জন থেকে বিরত রাখে, ফলে সে উৎকৃষ্টের বিনিময়ে সাধারণকে গ্রহণ করে। ইলম অর্জনে লিপ্ত হওয়া দুনিয়াবিমুখতায় লিপ্ত হওয়ার চেয়ে শ্রেষ্ঠ হওয়ার দলীল হলো জাহেদের ইবাদতের উপকারিতা ইবাদতখানার চৌকাঠও অতিক্রম করে না। আর আলেমের ইলমের উপকারিতা সংক্রমণশীল; সে উপকারিতা ছড়িয়ে পরে বিশ্বময়। এতে পথহারা মানুষ খুঁজে পায় পথের সন্ধান, অজ্ঞ ব্যক্তি লাভ করে শরিয়তের জ্ঞান-বিধি-বিধান, অনন্তকাল এ সবের সাওয়াব ও প্রতিদান তার আমলনামায় যোগ হতে থাকে।

শয়তান সংসারবিরাগীদেরকে ধোঁকায় ফেলার আরেক পদ্ধতি হলো, সে তাদের মনে এ ধারণা বদ্ধমূল করে যে, দুনিয়াবিমুখতার নিদর্শন হলো বৈধ ভোগসামগ্রী বর্জন করা। ফলে অনেকে ফলের স্বাদ গ্রহণ থেকে নিজেকে বিরত রাখে। আর কেউ কেউ খুবই অল্প আহার করেন, ফলে ক্রমান্বয়ে

---

১ মুসনাদে আহমাদ : ২/১৯

তাদের দেহ শুকিয়ে যায়। কেউ আবার পশমি পোশাক পরিধান করে নিজেকে কষ্ট-ক্লেশের সম্মুখীন করেন। আবার কেউ শীতল পানি একেবারেই পান করেন না।

এদের খুব ভালো করে জেনে রাখা উচিত, তাদের এমন কর্মকাণ্ডের সাথে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, সাহাবায়ে কেরাম ও তাবেয়িগণ কারোই মিল নেই। বস্তুত তাঁদের সামনে যদি খাদ্য উপস্থিত হতো, যা পেতেন তা ভক্ষণ করে ক্ষুধার যন্ত্রণা লাঘব করতেন। আর রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তো গোস্ত খেতেন এবং তা পছন্দ করতেন। তিনি মুরগির গোস্ত খেতেন এবং রানের গোস্ত পছন্দ করতেন। তার জন্য সুমিষ্ট পানি সংগ্রহ করা হতো, তবে তিনি বাসি পানি পছন্দ করতেন, কেননা প্রবহমান তাজা পানি পাকস্থলিকে পীড়া দেয় এবং পানির তৃষ্ণা নিবারণে তা ভালো ভূমিকা পালন করে না।

হাসান বসরি রহ.-এর যুগে এক ব্যক্তি বলত, আমি খাবিস (খেজুর ও ঘি-মিশ্রিত একপ্রকার মিষ্টিদ্রব্য) খাব না, কেননা তার কৃতজ্ঞতা আদায় আমার দ্বারা সম্ভব নয়। একথা শুনে হাসান বসরি রহ. বললেন, এ-তো এক নির্বোধ লোক। খাবিস তো দূরের কথা, সে তো ঠান্ডা পানির কৃতজ্ঞতাও আদায় করে শেষ করতে পারবে না। পূর্ববর্তী মনীষীরা এলাকায় অবস্থানকালে এবং সফর-ভ্রমণেও উন্নতমানের খাবার খেতেন। বিখ্যাত বুযুর্গ সুফিয়ান সাওরি যখন সফর করতেন, সফরের খাবার হিসাবে ভুনা গোস্ত ও ফালুদা সাথে নিতেন।

জেনে রাখা কর্তব্য—আখিরাত নামক গন্তব্যে পৌঁছার জন্য দেহ হচ্ছে তার একমাত্র বাহন, সুতরাং তার সাথে কোমলতা প্রদর্শন মানুষের নৈতিক দায়িত্ব, যেন তার মাধ্যেমে উদ্দিষ্ট গন্তব্যে শান্তি-নিরাপত্তার সাথে পৌঁছা যায়। তাই দেহের খোরাক হিসেবে উপকারী খাবার গ্রহণ করা এবং দেহের জন্য ক্ষতিকর সব ধরনের খাবার বর্জন করা দুনিয়া ও আখিরাতে মানুষের জন্য কল্যাণকর হিসেবে বিবেচ্য। অবশ্য মানুষের স্বভাব-প্রকৃতি বিভিন্ন রকম। তাই আরব বেদুইনরা পশমি পোশাক পরিধান করে এবং খাদ্য হিসাবে দুধপানের ওপর সীমাবদ্ধ থাকে। তাই বলে আমরা তাদের নিন্দা করতে পারি না। কেননা তাদের দেহ-মন তা ধারণ করতে সক্ষম। অনুরূপভাবে আরব গ্রামবাসী যদি পশমি পোশাক পরিধান করে এবং শুধু আচারকে খাদ্য হিসাবে গ্রহণ করে তাহলে আমরা তাদের নিন্দা করতে পারি

না এবং তাদের ব্যাপারে এক কথা বলতে পারি না। কেননা অভ্যাসবশতই তারা এমন খাচ্ছে ও পরছে।

এদিকে দেহ যদি বিলাসিতাপূর্ণ হয়, যা প্রতিপালিত হয়েছে বিলাসিতার ওপর তাহলে সেই ব্যক্তির ওপর কষ্টদায়ক বিষয় চাপিয়ে দেয়া যাবে না। যদি সে কাম-বস্তু গ্রহণে অনাগ্রহ প্রকাশ করে প্রবৃত্তির চাহিদা বর্জনকে এ ভেবে প্রাধান্য দেয় যে, হালাল বস্তু গ্রহণের ক্ষেত্রে অপচয়ের সম্ভাবনা রয়েছে, যা শরিয়তে বৈধ নয়; কিংবা সুস্বাদু খাবার উদর পূর্ণ করে খেতে বাধ্য করে, শরিয়তে যা প্রশংসিত নয়। কেননা উদর পূর্ণ করে খাদ্যগ্রহণে ঘুমের প্রবণতা বৃদ্ধি পায় এবং অলসতা বাড়তে থাকে। সুতরাং কোন খাবার বর্জন স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর আর কোনটি বর্জন ক্ষতিকর নয়—এটা আগে জানতে হবে। যে ধরনের খাদ্য হতে নিজেকে বিরত রাখা স্বাস্থের জন্য ক্ষতিকর তা থেকে ওই পরিমাণ গ্রহণ করবে যা দ্বারা দেহ সবল থাকে। তবে এত অধিক গ্রহণ করা যাবে না যা সুস্থতার পরিবর্তে অসুস্থতা বয়ে আনে।

গ্রন্থকার বলেন, কেউ কেউ মনে করে, প্রয়োজন পরিমাণ খাদ্য হিসাবে তরকারিবিহীন শুকনো রুটিই যথেষ্ট, তবে এর ওপর সীমাবদ্ধ থাকা স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর। কেননা মানুষের দেহরস টক-মিষ্টি, ঠান্ডা-গরম, তরলতা ও কঠিনতার মুখাপেক্ষী এবং মানুষের দেহ সুস্থ থাকার ক্ষেত্রে এগুলো এক একটি বিশেষ উপাদান। যেমন—যদি কারও কফ শুকিয়ে যায় তাহলে দেহ দুধ পানের মুখাপেক্ষী হবে। কেননা দেহ-মন সবল রাখতে কফের অবদান অপরিসীম। আর কারও পিত্ত বেড়ে গেলে দেহ টকের চাহিদা অনুভব করবে। সুতরাং দেহ সবল থাকতে মানুষের দেহরস ওইসব খাবারের মুখাপেক্ষী। যদি এসব খাবার গ্রহণে কেউ নিজেকে বিরত রাখে তাহলে দেহ ক্ষতিগ্রস্ত হবে। অবশ্য উদর পূর্ণ করে তৃপ্তিসহকারে খাদ্যগ্রহণ, লোভ-লালসার বশীভূত হয়ে বিনা প্রয়োজনে খাবার আস্বাদন এবং যে খাদ্যগ্রহণ স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর, তা থেকে নিজেকে বিরত রাখার বিষয়টি ভিন্ন। তবে শুধু শুকনো রুটিকে খাদ্য হিসাবে গ্রহণ করে বাকি সব ধরনের খাবার থেকে নিজেকে বিরত রাখা অনুচিত। তবে সাবধান! হারেস মুহাসেবি ও আবু তালেব মক্কির ব্যাপারে যা বর্ণিত হয়েছে তার অনুসরণ থেকে নিজেকে বিরত রাখুন। কেননা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তার সাহাবাদের জীবনাচারই আমাদের আদর্শ।

দুনিয়াত্যাগী যাহেদদের ওপর শয়তানের চক্রান্তের আরেক পদ্ধতি হলো, সে তাদের মনে এ ধারণা বদ্ধমূল করে যে, নিম্নমানের খাবার ও পোশাক-পরিচ্ছদের প্রতি সন্তুষ্ট থাকার নামই দুনিয়াবিমুখতা। ফলে তারা এসব নিয়েই সন্তুষ্টি প্রকাশ করে। অথচ তাদের অন্তর নেতৃত্ব ও খ্যাতি লাভ করতে উদগ্রীব। তাই মাঝে মধ্যে তারা একান্তভাবে রাজা-বাদশাহ ও নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গের সাক্ষাতের অপেক্ষায় থাকে। ধনীদের প্রদি সম্মান প্রদর্শন করে, আর দরিদ্রদেরকে উপেক্ষা করে। মানুষের উপস্থিতিতে বিনয়ের এমন ভান করে, যেন সবেমাত্র খোদার দর্শন থেকে বের হয়েছে।

অনেক যাহেদ মানুষের হাদিয়া ফিরিয়ে দেন, যেন এ কথা কেউ না বলে যে, এ ব্যক্তির 'যুহদ' খতম হয়েছে, সে এখন দুনিয়ার ভোগ-বিলাসিতায় আসক্ত। তাদের ভাব-গাম্ভীর্যতায় অভিভূত হয়ে মানুষ তাদের সামনে বিনয়াবনত হয় এবং শ্রদ্ধার বশীভূত হয়ে তাদের হাত চুম্বন করে। আর ক্রমান্বয়ে তাদের মনমুকুরে এ ধারণা বদ্ধমূল হয় যে, আমরা যা করছি তা আল্লাহর নিকট পছন্দনীয় বলেই মানুষ আমাদের প্রতি আসক্ত। তাদের জেনে রাখা উচিত যে, খ্যাতিলাভ ও নেতৃত্বলাভের আশা-আকাঙ্ক্ষা তো দুনিয়াদারী মনোভাব। কেননা দুনিয়াদারের নিকট নেতৃত্ব ও পদ-পদবির চেয়ে বড় কোনো আকাঙ্ক্ষা নেই।

ইবাদতকারীদের ওপর শয়তানের ধোঁকা

শয়তান মানুষকে গোপন রিয়ার মাধ্যমে তার চক্রান্তের জালে বন্দি করে। যেমন—দেহের জীর্ণতা ও চেহারার হরিদ্রাবর্ণ প্রকাশ করা এবং চুল এলোমেলো রাখা, যেন মানুষ মনে করে যে, এ ব্যক্তি যাহেদ তথা দুনিয়াবিমুখ। অনুরূপভাবে বিনয় প্রকাশের উদ্দেশ্যে ছোট শব্দে কথা বলা, লোক-দেখানোর উদ্দেশ্যে নামায পড়া ও সদকা করা—এ সবগুলোই প্রকাশ্য রিয়ার অন্তর্ভুক্ত। যা কারও নিকট অস্পষ্ট নয়। আমাদের আলোচনা হচ্ছে গোপন রিয়ার বিষয়ে। যে দিকে ইঙ্গিত করে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ

'আমলের প্রতিদান নিয়্যাতের ওপর নির্ভরশীল।'[১]

---

১ সহিহ বুখারি : হাদিস নং ১, সহিহ মুসলিম : হাদিস নং ১৯০৭

সুতরাং আমলের উদ্দেশ্য যদি আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন না হয়, তাহলে আল্লাহর নিকট তা গ্রহণযোগ্য হয় না। মালেক বিন দিনার রহ. বলেন, ইবাদত-বন্দেগিতে যার উদ্দেশ্য সৎ নয় তাকে বলে দাও, অযথা পরিশ্রম করে দেহ ক্লান্ত কোরো না।

জেনে রাখুন! মুমিন আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের উদ্দেশ্যেই আমল করে। তবে ইবাদতকালে গোপন রিয়া তার অন্তরে প্রবেশ করে ইখলাস নষ্ট করে দেয়। এ গোপন রিয়া থেকে পরিত্রাণ পাওয়া দুষ্কর। ইয়াসার বলেন, আমাকে ইউসুফ বিন আসবাত বলেন, তোমরা অসুস্থ আমল পরিহার করে সুস্থ আমল শিখ, কেননা বাইশ বছর সাধনা করে আমি তা শিখেছি।

ইবরাহিম ইবনে আদহাম রহ. বলেন, আমি সুময়ান নামক জনৈক সংসারত্যাগী থেকে মারেফত শিখেছি। আমি একদিন তার গির্জায় প্রবেশ করে বললাম, হে সুময়ান, আপনি কতদিন যাবৎ এ গির্জায় অবস্থান করছেন? তিনি বললেন, সত্তর বছর যাবৎ। আমি বললাম, আপনার খাবার কী? তিনি বললেন, হে একনিষ্ঠ বন্ধু, কী প্রয়োজনে তুমি তা জানতে চাচ্ছ। আমি বললাম, আমার জানতে মন চায়। তিনি বললেন, প্রতিরাতে একটি মটরশুঁটি। আমি বললাম, খাদ্য হিসাবে এক মটরশুঁটির ওপর সীমাবদ্ধ থাকতে কোন জিনিস আপনাকে প্ররোচিত করল? তিনি বললেন, তুমি কি সামনে কাউকে দেখেছ? আমি বললাম, হ্যাঁ। তিনি বললেন, এরা বছরে একদিন আমার নিকট এসে আমার গির্জা সজ্জিত করে তার চতুষ্পার্শ্ব তাওয়াফ করে খাদ্য হিসাবে দিনে একটি মটরশুঁটির ওপর তুষ্ট থাকার কারণে আমার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে। ইবাদতে আমার দেহ যখন ক্লান্ত হয় তখন মনকে আমার সম্মানজনক এ মুহূর্তের কথা স্মরণ করালে দেহের ক্লান্তি দূর হয়ে যায়। আমি একদিনের সম্মান লাভের জন্য এক বছরের কষ্ট সহ্য করি। সুতরাং হে আমার একনিষ্ঠ বন্ধু, তুমি চিরকালের শান্তি লাভের জন্য কিছু দিনের কষ্ট সহ্য করো। ইবরাহিম ইবনে আদহাম রহ. বলেন, রাহেবের এ কথা শুনে আমার অন্তরে মারেফত বদ্ধমূল হয়। তিনি বললেন, আমি কি আরও কিছু তোমাকে বলব? আমি বললাম, হ্যাঁ, বলুন। তিনি বললেন, তুমি গির্জা থেকে নিচে অবতরণ করো। আমি তখন গির্জা থেকে নেমে এলে তিনি একটি ছোট বালতি আমার দিকে নামিয়ে দেন। পরে আমি গির্জায় প্রবেশ করলে তারা আমার চারপাশে সমাবেত হয়ে বলল, হে বন্ধু, শায়খ তোমাকে কী দিয়েছেন? আমি বললাম, তার দৈনিক খাবারের কিছু অংশ আমাকে দিয়েছেন। তারা বলল, তুমি তা দিয়ে কী করবে?

আমরাই তার বেশি হক্বদার। তুমি মূল্য নির্ধারণ করো, আমরা তা কিনে নেব। আমি বললাম, বিশ দিনারের বিনিময়ে আমি তা বিক্রি করতে পারি। তখন বিশ দিনার দিয়ে তারা আমার থেকে তা কিনে নেয়। আমি তখন রাহেবের নিকট ফিরে গেলে তিনি আমাকে বললেন, তুমি ভুল করেছ। তুমি তার মূল্য বিশ হাজার দিনার বললেও এ দামে তা বিক্রি করতে পারতে।

এটা এমন ব্যক্তির মর্যাদা—যে তার ইবাদত করে না। তাহলে ভেবে দেখো, তুমি যার ইবাদত করছ তার কাছে তুমি কেমন মর্যাদাবান হিসেবে বিবেচিত হবে।

গ্রন্থকার বলেন, রিয়ার ভয়ে সৎ লোকেরা আমল গোপন করতেন। ইবনে সিরিন দিনে হাসতেন আর রাতে কাঁদতেন। ইবরাহিম ইবনে আদহাম রহ. যখন অসুস্থ হতেন, তখন তার নিকট এমন খাবার দেখা যেত যা সুস্থ লোকেরা ভক্ষণ করে।

ওহাব ইবনে মুনাব্বিহ রহ. বলেন, এক ব্যক্তি তার যুগের শ্রেষ্ঠ বুযুর্গ ছিলেন। লোকেরা তার সাক্ষাতে এলে তিনি তাদেরকে বিভিন্ন নসিহতমূলক কথাবার্তা বলতেন। একদিন বহুসংখ্যক লোক তার নিকট সমাবেত হলে তিনি তাদেরকে বললেন, আমরা স্বেচ্ছাচারিতার ভয়ে দুনিয়ার বেড়াজাল থেকে বের হয়েছি এবং পরিবার-পরিজন ও ধন-সম্পদ থেকে পৃথক হয়েছি। কিন্তু এখন আমার আশঙ্কা হচ্ছে, দুনিয়াদাররা ধন-সম্পদের ক্ষেত্রে যেমন স্বেচ্ছাচারী হয় তার চেয়ে অধিক স্বেচ্ছাচারিতা আমাদের মাঝে প্রবেশ করেছে। কেননা আমি দেখছি, আমাদের প্রত্যেকেই নিজ প্রয়োজন পূরণ হওয়া এবং দ্বীনদারিতে প্রসিদ্ধ হওয়ার দরুন পণ্য ক্রয়ের সময় বিক্রেতার ঘনিষ্ঠ হওয়া পছন্দ করে। কারও সাথে সাক্ষাৎ করলে কেউ তার সাক্ষাতে এলে তার থেকে অভিবাদন পাওয়ার আশা করে এবং দ্বীনদারির উঁচু মাকাম অর্জিত হওয়ায় নিজেকে সম্মানিত মনে করে। তার এ নসিহত চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ল। একর্যায়ে বাদশাহর কানে তা পৌঁছলে বাদশাহ অত্যন্ত মুগ্ধ হন। তাকে সালাম দিয়ে এক পলক দেখার উদ্দেশ্যে বাদশাহ বাহনে আরোহণ করে তার দরবারে পৌঁছলে এক লোক তাকে বলল, আপনাকে সালাম দেয়ার উদ্দেশ্যে বাদশাহ আপনার নিকট এসেছেন। তিনি বললেন, সালাম দেয়ার পর বাদশাহ কী করবেন? সে বলল, যে নসিহত আপনি করেছেন তা আপনার জবান থেকে শ্রবণ করবেন। তিনি তখন খাদেমকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমার কাছে কোনো খাবার আছে? সে বলল,

আপনি গাছের যে ফল দিয়ে ইফতার করতেন তা থেকে কিছু ফল আছে। তিনি ফল উপস্থিত করার নির্দেশ দিলে খাদেম তা উপস্থিত করে তার সামনে পেশ করলে তিনি তা থেকে ভক্ষণ করা শুরু করেন। অথচ তিনি ছিলেন রোযাদার এবং সর্বদা রোযা রাখা ছিল তার অভ্যাস।

এমন সময়ে বাদশাহ তার দরজায় উপস্থিত হয়ে তাকে সালাম দিলে তিনি ছোট্ট শব্দে সালামের উত্তর দেন। বাদশাহ তাকে ফল খেতে দেখে জিজ্ঞেস করলেন, লোকটি কোথায়? লোকেরা বলল, ইনিই সেই ব্যক্তি। বাহশাহ বললেন, যাকে খেতে দেখছি ইনি কী সেই ব্যক্তি? লোকেরা বলল, হ্যাঁ। বাদশাহ বললেন, তাহলে তো এর মাঝে কোনো কল্যাণ নেই। অতঃপর বাদশাহ তার কাছ থেকে প্রস্থান করে রাজভবনে ফিরে আসেন। বাদশাহ চলে আসার পর লোকটি বলল, সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য যিনি আমার কাছ থেকে তোমাকে নিরাশ করে ফিরিয়ে নিয়েছেন।

উপরোক্ত ঘটনাটি ভিন্ন রেওয়ায়েতে এভাবে এসেছে : ওহাব ইবনে মুনাব্বিহ বলেন, বাদশাহ আগমন করলে লোকটি খাবার উপস্থিত করে শাক-সবজি দিয়ে এক বড় লোকমা তৈয়ার করে তেলের ভিতর তা চুবিয়ে জোর খাটিয়ে খাওয়া শুরু করলে বাদশাহ বললেন, হে লোক, তুমি কেমন বলো তো! সে বলল, আমি সাধারণ মানুষের মতোই, আমার বিশেষ কোনো বৈশিষ্ট্য নেই। বাদশাহ তখন ঘোড়ার লাগাম ঘুরিয়ে বললেন, এর মাঝে কোনো কল্যাণ নেই। বাদশাহ চলে আসার পর লোকটি বলল, সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য, যিনি তাকে আমার সম্পর্কে তিরস্কার করে এখান থেকে ফিরিয়ে নিয়েছেন।

আতা বলেন, ওয়ালিদ ইবনে আবদুল মালেক ইয়াযিদ বিন মারসাদকে গভর্নরের দায়িত্ব দিতে চেয়েছিলেন। ইয়াযিদের নিকট এ সংবাদ পৌঁছলে তিনি একটি পশমযুক্ত চামড়া গায়ে জড়ালেন। চামড়াটির পশমমুক্ত অংশ ছিল গায়ের সাথে, আর পশমযুক্ত অংশ ছিল দেহের বহিরাংশে। অতঃপর হাতে এক টুকরো রুটি ও গোস্তবিহীন হাড় নিয়ে চাদর, টুপি, জুতা ও মোজা পরিধান করা ব্যতীত বাজারে হেঁটে হেঁটে তা খেতে লাগলেন। তখন ওয়ালিদ বিন আবদুল মালেককে বলা হলো, ইয়াযিদ বিন মারসাদের বিবেক তো বিগড়ে গেছে। অতঃপর ইয়াযিদের আচরণ তার সামনে বললে তাকে গভর্নর নিযুক্ত করার চিন্তা বাদ দেন। এমন অনেক ঘটনার কথা ইতিহাসে লেখা আছে।

***

অনেক দুনিয়াবিরাগী প্রকাশ্য-গোপন উভয় অবস্থায় দুনিয়ার ভোগবিলাস থেকে দূরে থাকেন। কিন্তু তাদের অবস্থা হলো, তারা সাথি-সঙ্গী ও পরিবারের নিকট দুনিয়াবিমুখতার বিষয়টি আলোচনা করা অপরিহার্য মনে করেন, যেন দুনিয়ার ভোগবিলাসে নির্লিপ্ত থাকা তাদের জন্য সহজতর হয়। উপরে আমরা ইবরাহিম বিন আদহামের সাথে আলোচিত রাহেবের ঘটনা থেকে এটা আঁচ করতে পেরেছি।

দাউদ ইবনে আবু হিন্দ লাগাতার বিশ বছর রোযা রেখেছেন, অথচ ঘরের কেউ জানতেন না যে তিনি রোযাদার। তিনি ঘর থেকে খাবার নিয়ে বাজারে যাওয়ার পথেই সদকা করে নিতেন। ফলে বাজারবাসী ধারণা করত সে ঘরে খেয়েছে আর ঘরবাসী ধারণা করত সে বাজারে খেয়েছে। এমনই ছিলেন আমাদের পূর্বসূরি মনীষীরা।

যাহেদদের কিছু মতাদর্শ

অনেক যাহেদ নিরবচ্ছিন্নভাবে মসজিদে পড়ে থাকা এবং নিঃসঙ্গাবস্থায় পাহাড়ে অবস্থান করা—যাদের দৈনিক খাদ্য, তাদের নিঃসঙ্গতার কথা মানুষ জানুক এতেই তাদের তৃপ্তি। আবার কখনো সে নিঃসঙ্গ থাকার প্রমাণ দিয়ে বলে, আমার আশঙ্কা হয়, লোকালয়ে থাকলে মানুষ আমার গুনাহ বর্জনের বিষয়ে অবগত হবে। অথচ এসব কথা সে বিভিন্ন উদ্দেশ্যে বলে। তার উদ্দেশ্যসমূহের কয়েকটি হলো : নিজের বড়ত্ব প্রকাশ করা, মানুষকে তুচ্ছজ্ঞান করা, সেবা লাভের পরিমাণ হ্রাস পাওয়ার আশঙ্কা করা, তার রীতিনীতি ও নেতৃত্ব রক্ষা করা। আর মানুষের সংস্পর্শে এসবের অর্জন অসম্ভব। অথচ সে চায়, তার আলোচনা দীর্ঘকাল লোকমুখে চাউর হোক।

স্বীয় দোষ-ত্রুটি, মন্দস্বভাব ও ইলম সম্পর্কে অজ্ঞতার বিষয়টি জনগণ থেকে গোপন রাখার নিমিত্তেও সে মাঝে-মধ্যে এমন ভান করে থাকে। অগত্যা সে এ পন্থা অবলম্বন করে। তার সাথে মানুষ সাক্ষাৎ করুক এটা সে পছন্দ করে কিন্তু সে কারও কাছে যায় না। তার দরবারে রাজা-বাদশা ও মন্ত্রীর আগমন, দরজায় জনসাধারণের সমবেত হওয়া এবং তারা তার হাত চুম্বন করায় সে আনন্দিত হয়, অথচ রোগী দেখা ও জানাযায় শরিক হওয়া থেকে সে দূরে থাকে। এ ব্যক্তি যদি খাদ্য গ্রহণের মুখাপেক্ষী হয় তাহলে সে ক্ষুধার ওপর সবর করে, যেন খাবার কিনতে নিজেকে বাজারে যেতে না

হয়, কেননা মানুষের সাথে বাজারে হাঁটলে যশ-খ্যাতি কমে যেতে পারে। সে মনে করে যদি বাজারে গিয়ে প্রয়োজনীয় পণ্য খরিদ করি তাহলে খ্যাতি ভেস্তে যাবে। নিঃসন্দেহে নিজের উদ্ভাবিত রীতিনীতি রক্ষার উদ্দেশ্যে এ ব্যক্তির মনে এ অহংবোধ বিরাজ করে। অথচ রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বাজারে গিয়ে প্রয়োজনীয় পণ্য খরিদ করতেন এবং নিজে বহন করে তা বাড়িতে নিয়ে আসতেন। রাসুলের সাহাবি আবু বকর রা. বিক্রির উদ্দেশ্যে কাঁধে কাপড় বহন করে বাজারে নিতেন এবং প্রয়োজনীয় পণ্য খরিদ করে বাড়ি ফিরতেন।

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَنْظَلَةَ، أَنَّ عَبْدِ اللَّهِ بْنَ سَلَّامٍ، مَرَّ فِي السُّوقِ وَعَلَى رَأْسِهِ حُزْمَةُ حَطَبٍ، فَقَالَ: أَدْفَعُ بِهِ الْكِبْرَ، إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ مِنْ كِبْرٍ

'আবদুল্লাহ বিন হানযালা বলেন, আবদুল্লাহ বিন সালাম রা. মাথায় লাকড়ির আঁটি বহন করে রাস্তায় পথ চললে লোকেরা তাকে বলল, হে আবদুল্লাহ, কোন জিনিস তোমাকে এ কাজে বাধ্য করল? অথচ আল্লাহ তোমাকে সম্পদ দিয়েছেন! তিনি বললেন, আমি এর মাধ্যমে অহংকার দূর করছি। কেননা আমি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি—এমন বান্দা জান্নাতে প্রবেশ করবে না, যার অন্তরে বিন্দু পরিমাণ অহংকার রয়েছে।'[১]

***

গ্রন্থকার আল্লামা ইবনুল জাওযি রহ. বলেন, প্রয়োজনীয় পণ্য ক্রয়ের উদ্দেশ্যে বাজারে যাওয়া এবং নিজেকে বিলিয়ে দেয়ার যে উদাহরণ আমরা উল্লেখ করেছি তা ছিল আমাদের পূর্বসূরিদের অভ্যাস। অবশ্য সে অভ্যাস এখন পরিবর্তিত হয়েছে যেভাবে পরিবেশ ও পোশাক-পরিচ্ছদ পরিবর্তিত হয়েছে। তাই আলেমদের জন্য প্রয়োজনীয় পণ্য ক্রয়ের উদ্দেশ্যে বাজারে যাওয়া আমি এখন উত্তম মনে করি না। কেননা আলেমদের এ আচরণ বর্তমানে মূর্খদের অন্তরে ইলমের মর্যাদা কমিয়ে দেয়। অথচ ইলমের মর্যাদা মানুষের দিলে বিদ্যমান থাকা শরিয়তসম্মত বিষয়। আর যে জিনিস মূর্খদের অন্তরে ইলমের প্রতি ভক্তি-শ্রদ্ধা বৃদ্ধি করে, আলেমদের জন্য তা অবলম্বন

---

১ সহিহ মুসলিম : হাদিস নং ৯১

করা শরিয়তে নিষিদ্ধ। পূর্বসূরিদের যে আচরণ মানুষের মনে পরিবর্তন আনত না, বর্তমানেও তা পালন করা অবশ্যক নয়। ইমাম আওযায়ি বলেন, আমরা হাসাহাসি ও উপহাস করতাম। যখন মানুষ আমাদের অনুসরণ শুরু করল তখন নিজেদের জন্য আমরা তা অবৈধ মনে করলাম। ইবরাহিম ইবনে আদহামের সাথিরা একদিন রসিকতা করছিল, তখন এক লোক দরজায় কড়া নেড়ে তাদেরকে চুপ থাকার নির্দেশ দিলে তারা বলল, আমরা রিয়া শিখেছি। তখন সে তাদেরকে বলল, তোমাদের কাছ থেকে আল্লাহর অসন্তুষ্টিমূলক কোনো কর্মকাণ্ড প্রকাশ পাক—তা আমি চাই না।

***

অনেক দুনিয়াবিরাগীকে যদি মসৃণ পোশাক পরতে বলা হয় তারা কিছুতেই তা পরবেন না। যেন দুনিয়াবিরাগিতায় তাদের যশ কমে না যায়। আর তাদেরকে যদি মানুষের উপস্থিতিতে খাবার গ্রহণের অনুরোধ করা হয় তাহলে দেহ থেকে প্রাণবায়ু বের হয়ে গেলেও তারা মানুষের সামনে খাদ্য গ্রহণ করতে চান না। তারা হাসি চাপিয়ে রেখে মানুষের সামনে মুচকি হাসেন, আর ইবলিস তাদের মনে এ প্ররোচনা ঢালে যে, তুমি যা করছ তার উদ্দেশ্য হচ্ছে মানুষের আত্মশুদ্ধি। অথচ বাস্তবিকপক্ষে তা একটি জঘন্য রিয়া। কারো কারো মাথা সর্বদা অবনমিত থাকে, দুঃখের ছাপ তার চেহারায় সব সময় ভাসে, যেন সে পরকালের চিন্তায় অস্থির; অথচ মানুষ চলে গেলে আচার-ব্যবহারে হিংস্র প্রাণীর রূপ ধারণ করে।

***

দুনিয়াত্যাগী অনেক ভাই তার কাপড় ছিঁড়ে গেলে আর সেলাই করেন না। পাগড়ি নষ্ট হলে সংশোধন করেন না। দাড়ি এলোমেলো হলে তিনি তা আঁচড়ান না। তিনি এসব আচরণ দ্বারা দুনিয়ার কোনো বস্তুই তার নিকট উত্তম নয় বলে মানুষকে বোঝাতে চান। অথচ তিনি যা করছেন, তা একপ্রকার রিয়া। আর দুনিয়া ত্যাগের এ পদ্ধতি যদি সে সঠিক মনে করে, 'যেমন দাউদ তাঈকে যখন বলা হলো, আপনি কি দাড়ি আঁচড়াবেন না? তিনি উত্তরে বললেন, আখিরাতের ব্যস্ততার দরুন তা আঁচড়ানোর সময় কোথায়!' তাহলে তার জেনে রাখা উচিত—তার এ পদ্ধতি সঠিক নয়। কেননা এ পদ্ধতি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তার সাহাবাদের মধ্য থেকে কারও কাছে পাওয়া যায় না। বরং রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চুল আঁচড়াতেন। আয়নায় চেহারা

দেখতেন। মাথায় তেল ব্যবহার করতেন এবং শরীরে আতর লাগাতেন। অথচ আখিরাতের বিষয়ে তিনি ছিলেন সর্বাধিক ব্যস্ত। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাহাবি আবু বকর ও ওমর রা. মেহেদী দ্বারা দাড়ি খেযাব করতেন, অথচ তারা ছিলেন সর্বাধিক মুত্তাকি ও দুনিয়াবিমুখ সাহাবি। সুতরাং রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তার সাহাবিদের ওপর কোনো গুণ ও বৈশিষ্ট্যের দাবি যদি কেউ করে তাহলে সেদিকে ভ্রুক্ষেপ করা হবে না।

বহু যাহেদ সর্বদা চুপ থাকেন এবং পরিবারের সংস্পর্শ হতে বিরত থেকে নিঃসঙ্গ জীবন কাটান। ফলে তিনি মন্দ স্বভাব ও পরিবারের প্রতি বিষণ্নভাবাপন্ন হয়ে তাদেরকে কষ্টে নিপতিত করেন। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বাণী :

إِنَّ لِأَهْلِكَ عَلَيْكَ حَقًّا

'নিশ্চই তোমার ওপর তোমার স্ত্রীর হক রয়েছে'[১]—এ কথাকে ভুলে যায়। অথচ রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তো মজাক করে শিশুদের সাথে খেলা করতেন, স্ত্রীদের সাথে আলাপ করতেন এবং স্ত্রী আয়েশা রা.-এর সাথে দৌড় প্রতিযোগিতা করেছেন। হাদিসের অগণিত পাতা এ-জাতীয় কোমল আচরণের উদাহরণে ভরপুর।

এ সকল দুনিয়াত্যাগী মন্দ স্বভাব পরিবার হতে পৃথক থেকে সন্তানকে এতিমের মতো রাখে আর স্ত্রীকে বিধবার মতো রাখে। এসবের একমাত্র কারণ, সে মনে করে যে, পরিবারের প্রতি খেয়াল রাখা আখিরাত থেকে বিমুখ করে। অথচ জ্ঞানস্বল্পতার দরুন তাদের জানা নেই যে, পরিবারের প্রতি উদারহস্ত হয়ে তাদের সাথে আনন্দ করা আখিরাতের পথকে সুগম করে। বুখারি ও মুসলিমের হাদিসে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জাবের রা.-কে বলেছেন,

هَلَّا تَزَوَّجْتَ بِكْرًا تُلَاعِبُهَا وَتُلَاعِبُكَ

'তুমি যদি কুমারী মেয়ে বিবাহ করতে, তাহলে সে তোমার সাথে আনন্দ করত এবং তুমিও তার সাথে আনন্দ করতে।'[২] আবার কখনো এ

---

১ সহিহ বুখারি : হাদিস নং ১৯৭৫, সহিহ মুসলিম : হাদিস নং ১১৫৯

২ সহিহ বুখারি : হাদিস নং ২০৯৭, ৫০৮০, ৫৩৬৭, সহিহ মুসলিম : হাদিস নং ৭১৫

যাহেদগণের মনে শুষ্কদেহের অধিকারী হওয়ার চিন্তা প্রবল আকার ধারণ করে, ফলে সে স্ত্রী সহবাস বর্জন করে। নফল আদায়ে ফরজ বর্জন করে। অথচ এ ব্যাপারে শরিয়ত কাউকে উৎসাহিত করেনি।

অনেকে নিজ আমল দেখে মুগ্ধ হন। তাকে যদি বলা হয়, আপনি তো জমিনের খুঁটি, (অর্থাৎ আপনার কারণেই পৃথিবী টিকে আছে) তাহলে সে তা সত্য মনে করে। অনেক দুনিয়াত্যাগী আবার নিজের থেকে কারামত প্রকাশের অপেক্ষায় থাকে এবং মনে এ ধারণা জন্মায় যে, সে যদি পানির নিকটবর্তী হয় তাহলে সে পানির ওপর হাঁটতে সক্ষম হবে। যদি সে বিপদের সম্মুখীন হয়ে দোয়া করে এবং সে দোয়ার ফলাফল তৎক্ষণাৎ না পায় তাহলে সে অসন্তুষ্ট হয়। যেন সে শ্রমিক—যে তার কাজের বিনিময় দাবি করছে। যদি তার প্রকৃত বোধশক্তি থাকত তাহলে সে বুঝত যে, তার অবস্থান এক কৃতদাসের ন্যায়, আর কৃতদাস নিজ কাজের দ্বারা মনিবের ওপর অনুগ্রহ ফলাতে পারে না। আর যদি সে ভেবে দেখত যে, আল্লাহর তাওফিকেই আমি এ কাজ করতে পেরেছি, তাহলে সে আমল করতে পারায় কৃতজ্ঞতা প্রকাশকে জরুরি মনে করে আমলের ভুল-ভ্রান্তি থেকে ফিরে আসত।

মানুষের অবস্থা এমন হওয়াই কাম্য, আমলে ত্রুটি-বিচ্যুতির ভয় তা কবুল হওয়ার ব্যাপারে মনকে পেরেশান রাখবে। রাবেয়া বসরি রহ. বলতেন, আমি কথায় সততার স্বল্পতার কারণে আল্লাহর নিকট ক্ষমা চাই। কেউ তাকে জিজ্ঞেস করে বলল, এমন কোনো আমল কি আপনার আছে, যা কবুল হওয়ার ব্যাপারে আশাবাদী? তিনি উত্তরে বললেন, কোনো কোনো আমলের ব্যাপারে যদিও আশাবাদী, তবে তা কবুল না হওয়ার আশঙ্কাও আমার অন্তরে সদা জাগ্রত।

অল্প জ্ঞানের কারণে বহু যাহেদকে শয়তান এমন কাজে উদ্বুদ্ধ করে শরিয়তে যা নিন্দনীয়। এতে তার উদ্দেশ্য ভালো থাকা সত্ত্বেও সওয়াব লাভের পরিবর্তে সে পাপিষ্ঠ হিসেবে সাব্যস্ত হয়। যেমন—ইবনে আকিল বলেন, আবু ইসহাক খাজ্জার একজন নেককার বুযুর্গ ছিলেন। তিনি এমন ব্যক্তি যিনি আমাকে সর্বপ্রথম কুরআন শিখিয়েছেন। তার অভ্যাস ছিল রমযান মাসে কথা বলা হতে বিরত থাকা। তাই কথা বলার প্রয়োজন হলে তিনি কুরআনের আয়াত দ্বারা সেদিকে ইশারা করতেন। যেমন কাউকে অনুমতি প্রদানকালে তিনি বলতেন- ادْخُلُوا عَلَيْهِمُ الْبَابَ। 'দরজা দিয়ে তাদের কাছে

প্রবেশ করো।[১]" বাজার করার জন্য ছেলেকে বলতেন- مِن بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا [২] উদ্দেশ্য হলো, শাক-সবজি ক্রয়ের জন্য ছেলেকে আদেশ করা। ইবনে আকিল বলেন, বিষয়টি জানতে পেরে আমি তাকে বললাম, আপনি ইবাদত মনে করে যা করেছেন তা মূলত নাফরমানি। তখন আমার এ কথা মানতে তার কষ্ট হলে আমি তাকে বললাম, দুনিয়াবি প্রয়োজন পূরণের উদ্দেশ্যে তা ব্যবহার করা উচিত নয়। আপনার এ কাজের উদাহরণ তো কুরআনকে আপনার বালিশ হিসাবে ব্যবহার করার মতো। এতেও তিনি আমার কথার দিকে মনোযোগ দিলেন না।

গ্রন্থকার বলেন, স্বল্পজ্ঞানের কারণে অনেক যাহেদ লোকমুখে যা শোনেন সে অনুযায়ী অন্যকে ফতোয়া দেন। ফকিহ আবু হাকিম ইবরাহিম ইবনে দীনারের নিকট এক লোক ফতোয়া চেয়ে বলল, আপনি এমন মহিলার ব্যাপারে কি বললেন, যাকে তার স্বামী তিন তালাক দেয়ার পর সে একটি পুত্রসন্তান প্রসব করে। এ মহিলা কি তার স্বামীর জন্য হালাল হবে? তিনি বললেন, না। তখন শরিফ দুহালী নামে এক প্রসিদ্ধ যাহেদ তার নিকট উপস্থিত ছিল, জনগণের মাঝে সে ছিল বড় সম্মানিত ব্যক্তি। সে তখন ফকিহ আবু হাকেমকে বলল, আপনি এ কী ফতোয়া দিলেন! বরং এ মহিলা তার স্বামীর জন্য বৈধ হবে। আবু হাকেম বলেন, এরূপ ফতোয়া তো আজ পর্যন্ত কেউ দেয়নি। তখন শরিফ দুহালী বলল, আল্লাহর কসম; আমি এখান থেকে বসরা পর্যন্ত এই ফতোয়া দিয়েছি।

গ্রন্থকার বলেন, দেখুন! দীন সম্পর্কে অজ্ঞতা অজ্ঞ ব্যক্তির সাথে কীরূপ আচরণ করে—যেন মানুষ তাকে মূর্খ যাহেদ না ভাবে। অথচ আমাদের পূর্বসূরি ওলামায়ে কেরাম যাহেদদেরকে অগাধ জ্ঞানের অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও ফতোয়া দিতে নিষেধ করতেন। কেননা ফতোয়ার শর্তাবলি তাদের মাঝে বিদ্যমান নেই। ইসমাঈল ইবনে শিব্বাহ বলেন, আমি আহমদ বিন হাম্বলের দরবারে উপস্থিত হলাম, ইত্যবসরে আহমদ বিন হার্‌ব মক্কা থেকে এসে হাজির হলেন। আহমদ ইবনে হাম্বল রহ. বললেন, এ ব্যক্তি কে? আমি বললাম, ইনি একজন প্রসিদ্ধ যাহেদ ও পরহেজগার ব্যক্তি। তখন আহমদ বিন হাম্বল বললেন, যে নিজেকে যাহেদ বলে দাবি করে তার জন্য উচিত নয় ফতোয়ার কাজে মনোনিবেশ করা।

---

১ সুরা মায়িদা : আয়াত ২৩

২ সুরা বাকারা : আয়াত ৬১

আলেমদের নিন্দা ও কুৎসা

শয়তান যাহেদ তথা সংসারত্যাগীদেরকে এমনভাবে প্ররোচিত করে যে, তারা আলেমদেরকে তুচ্ছ দৃষ্টিতে দেখে এবং তাদের নিন্দা করে। তারা বলে, ইলমের উদ্দেশ্য আমল, সুতরাং যে আমল করে তার জন্য ইলমের প্রয়োজন নেই। অথচ তাদের জানা নেই যে, ইলম হচ্ছে নূর। শরিয়ত রক্ষায় আলেমদের মর্যাদা তারা যদি জানত, তাহলে বাকশক্তিসম্পন্ন ব্যক্তির সামনে বোবা ব্যক্তি এবং দৃষ্টিবানের সামনে দৃষ্টিহীন ব্যক্তি নিজেকে যেরূপ মনে করে, নিজেদেরকে তারা সে রকমই ভাবত। আলেমরা হলেন পথপ্রদর্শক, যাদের অনুসারী গোটা মানবজাতি।

وَعَن سهل بن سعد ان النبي «صلى الله عليه وسلم» قال لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه والله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خيرا لك من حمر النعم

'হজরত সাহল ইবনে সাআদ রা. বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হজরত আলী ইবনে আবি তালেব রা.-কে বলেছেন, আল্লাহর শপথ! তোমার মাধ্যমে আল্লাহ এক ব্যক্তিকে হেদায়েত দেয়া তোমার জন্য লাল উষ্ট্রী লাভ হওয়া থেকে উত্তম।'[৩]

আলেমদের যেসব বিষয়ে যাহেদদের আপত্তি

যাহেদরা যেসব বিষয়ে আলেমদের কুৎসা রটায় তন্মধ্যে একটি হলো, ইলম অর্জন ও শিক্ষাদানের নিমিত্তে শক্তিবর্ধক বৈধ খাবার গ্রহণ করা। অনুরূপভাবে তারা আলেমদের সম্পদ জমা করার বিষয়েও নিন্দা করে। তারা যদি বৈধতার সংজ্ঞা সম্পর্কে অবগত হতো, তাহলে বোঝত যে, শরিয়ত বৈধ কাজ সম্পাদনকারীর নিন্দা করে না। বৈধতার বিষয়ে সর্বোচ্চ এতটুকু বলা যায়, তা পরিহার করে তাকওয়ার পথ অবলম্বন করা উত্তম। আচ্ছা বলুন তো, যে সারারাত সফল পড়ছে তার জন্য কি ওই ব্যক্তির নিন্দা করা সমীচীন হবে, যে ফরজ আদায়ের পর সারারাত ঘুমিয়েছে? একটি ঘটনা দ্বারা বিষয়টি আরও স্পষ্ট হবে। মুহাম্মাদ বিন জাফর খাওলানী বলেন, আমার নিকট হাতেম আসাম্মের শাগরেদ আবু আবদুল্লাহ খাওয়াস বলেছেন, আমরা হাতেম বলখির সাথে রায় নগরীতে প্রবেশ করি। তার

---

৩ সহিহ বুখারি : হাদিস নং ২৯৪২, ৩৭০১, ৪২১০, সহিহ মুসলিম : হাদিস নং ২৪০৬

সাথে তার তিনশত বিশজন শিষ্য ছিল। তারা হজের উদ্দেশ্যে তার সাথে রওয়ানা হয়েছে। তাদের গায়ে ছিল পশমি পোশাক। তাদের কাছে না ছিল খাবার না ছিল থলে। আমরা এক ধার্মিক ব্যবসায়ীর বাড়িতে যাত্রাবিরতি করলাম। ব্যবসায়ী সে রাত আমাদের মেহমানদারী করেছেন। পরদিন সকালে ব্যবসায়ী হাতেমকে বলল, হে আবু আবদুর রহমান! আমাদের এলাকার আলেম সাহেব অসুস্থ, আমি তাকে দেখতে যাচ্ছি। আপনার ইচ্ছা হলে আমার সাথে চলুন। তখন হাতেম বলল, তোমাদের আলেম যদি অসুস্থ হন তাহলে তাকে দেখতে যাওয়া তো পূণ্যের কাজ, তদুপরি আলেমের দিকে তাকানো ইবাদতও বটে। আমি তোমার সাথে যাব। অসুস্থ আলেমের নাম ছিল মুহাম্মাদ বিন মুকাতিল—যিনি রায় নগরীর বিচারক ছিলেন। তখন ব্যবসায়ী বলল, আপনি আদেশ করলে আমরা রওয়ানা হতে পারি। আলেমের শানদার বাড়ি দেখে হাতেম চিন্তিত হয়ে বলল, হায় আল্লাহ! আলেমের বাড়ির এ অবস্থা! অনুমতি পেয়ে তারা বাড়ির ভেতর প্রবেশ করল। হাতেম তাকিয়ে দেখল বাড়িটি অত্যন্ত প্রশস্ত। তার আসবাবপত্র অত্যন্ত মূল্যবান। তার বিছানা অত্যন্ত কোমল এবং তার পর্দা অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক। হাতেম চিন্তিত মনে এসব দেখতে দেখতে ইবনে মুকাতিলের মজলিসে প্রবেশ করে দেখল যে, তিনি কোমল সুন্দর বিছানায় আরাম করছেন। কিছু লোক তার শিয়রে বসে বাতাস দিচ্ছে, আর কিছু লোক তার সাথে আলাপ করছে। অনুমতি পেয়ে ব্যবসায়ী বসল, কিন্তু হাতেম দাঁড়িয়ে রইল। তখন মুহাম্মাদ বিন মুকাতিল ইশারায় হাতেমকে বসতে বললে হাতেম বলল, আমি বসব না। তখন মুহাম্মাদ বিন মুকাতিল হাতেমকে জিজ্ঞেস করলেন, আপনার কি কোনো প্রয়োজন আছে? হাতেম বলল, একটি বিষয় আপনার নিকট জানতে চাই। মুহাম্মাদ বিন মুকাতিল বললেন, জিজ্ঞেস করুন। হাতেম বলল, আপনি আগে সোজা হয়ে বসুন, যেন আপনাকে জিজ্ঞেস করতে পারি। তখন মুহাম্মাদ বিন মুকাতিল খাদেমদেরকে নির্দেশ দিলে তারা তাকে হেলান দিয়ে বসায়। হাতেম বলল, আপনি ইলম কোথা হতে শিখেছেন? তিনি বললেন, রাসুলের সাহাবিদের থেকে। হাতেম বলল, রাসুলের সাহাবিরা কার থেকে শিখেছেন? তিনি বললেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে। হাতেম বলল, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তা কোথা হতে পেয়েছেন? তিনি বললেন, জিবরাঈল আলাইহিস সালাম থেকে, আর জিবরাঈল আলাইহিস সালাম আল্লাহ রাব্বুল আলামিন থেকে। হাতেম বলল, আচ্ছা জিবরাঈল

আলাইহিস সালাম আল্লাহর পক্ষ হতে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট যা কিছু পৌঁছিয়েছেন এবং রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবাদের নিকট যা কিছু পৌঁছিয়েছেন এবং সাহাবারা তাবেঈদের নিকট যা কিছু পৌঁছিয়েছেন এবং তাবেঈরা নির্ভরযোগ্য ওলামাদের নিকট যা কিছু পৌঁছিয়েছেন এবং নির্ভরযোগ্য ওলামায়ে কেরাম আপনাদের নিকট যা পৌঁছিয়েছেন তার কোথাও কি এমন পেয়েছেন, দুনিয়াতে যার বাড়ি উত্তম হবে, যার বিছানা নরম হবে এবং যার ভোগসামগ্রী বেশি হবে আল্লাহর নিকট সে ব্যক্তি সর্বাধিক মর্যাদাবান হবেন? সে উত্তরে বলল, না। হাতেম বলল, তাহলে কেমন পেয়েছেন? তিনি বললেন, বরং এভাবে পেয়েছি, যে দুনিয়ার ভোগ-বিলাসিতায় বিমুখ হবে, আখিরাতের বিষয়ে আগ্রহী হবে, মিসকীনদেরকে ভালোবাসবে এবং আখিরাতের জন্য সৎকাজ করবে সে হবে আল্লাহর নিকট মর্যাদাবান। লাভ করবে আল্লাহর নৈকট্য। হাতেম বলল, আপনি তাহলে কার অনুসরণ করেছেন? রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, তার সাহাবায়ে কেরাম, তাদের অনুসারী তাবেঈগণ ও তাদের থেকে শিক্ষাগ্রহণকারী নির্ভরযোগ্য ওলামায়ে কেরামের, নাকি ফেরাউন ও নমরুদের? কেননা তারাই প্রথম মানুষ যারা সিমেন্ট-বালি ও চুনা-সুরকি দিয়ে ইমারত নির্মাণ করেছেন। হে নিকৃষ্ট আলেমের দল, দুনিয়াদার মূর্খ মানবজাতি যারা দুনিয়ার ভোগ-বিলাসিতায় কুকুরের ন্যায় লালায়িত, তারা যদি তোমাদের হালত দেখে তাহলে মনে সংকল্প করবে যে, এরূপ যদি হয় আলেমদের বিলাসিতা তাহলে তো আমাকে আরও বিলাসী হতে হবে। হাতেম এসব কথা বলে তার দরবার থেকে চলে আসে। হাতেমের কথা শুনে মুহাম্মাদ বিন মুকাতিলের অসুস্থতা বেড়ে যায়।

হাতেম ও মুহাম্মাদ বিন মুকাতিলের মাঝে চলমান আলোচনা রায় নগরীতে ছড়িয়ে পড়লে নগরবাসী হাতেমকে বলল, কাযবিনের বিখ্যাত আলেম মুহাম্মাদ বিন ওবাইদ তানাফিসী তো তার চেয়ে অধিক ধন সম্পদের মালিক। তখন হাতেম তার সাক্ষাতে গিয়ে দেখেন, তিনি এক মজলিসে হাদিস বর্ণনা করছেন, আর লোকেরা মনোযোগের সহিত তার হাদিস শ্রবণ করছে। হাতেম মুহাম্মাদ বিন ওবাইদ তানাফিসীকে বলল, 'আল্লাহ আপনার প্রতি রহম করুন', আমি একজন অনারবী লোক, দীনের প্রাথমিক শিক্ষালাভের উদ্দেশ্যে আমি আপনার নিকট এসেছি। আপনি কি আমাকে ওজু করার পদ্ধতি শিখাবেন? মুহাম্মাদ বিন ওবাইদ তানাফিসী বললেন, হ্যাঁ,

অবশ্যই। তিনি এক খাদেমকে পানি আনার নির্দেশ দিলে খাদেম পানি উপস্থিত করে। তখন মুহাম্মাদ বিন ওবাইদ তানাফিসী বসে ওজু করলেন এবং প্রতিটি অঙ্গ তিনবার করে ধৌত করলেন। অতঃপর বললেন, ওজু এভাবে করতে হয়। হাতেম বলল, আল্লাহ আপনার প্রতি রহম করুন। দয়া করে আপনার স্থানে বসে আমাকে অজু করার সুযোগ দিন, যেন আমার উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন অধিক সহজতর হয়। তানাফিসী ওঠে দাঁড়ালে হাতেম তার স্থানে বসে ওজু শুরু করল। সে চেহারা তিনবার ধৌত করে বাহু চারবার ধুলে তানাফিসী বলল, আপনি তো অপচয় করেছেন। হাতেম বলল, কীভাবে অপচয় করলাম? তানাফিসী বলল, বাহু চারবার ধৌত করার মাধ্যমে। হাতেম বলল, সুবহানাল্লাহ। একমুষ্টি পানি বেশি ব্যবহার করেই অপচয়কারী হয়ে গেলাম, আর আপনি এতসব ধন-সম্পদ ভোগ করেও অপচয়কারী নন! তানাফিসী বুঝে গেলেন যে, এ ব্যক্তির শিক্ষালাভ উদ্দেশ্য নয়; বরং শিক্ষা দেয়া উদ্দেশ্য। অতঃপর তানাফিসী ঘরে প্রবেশ করে চল্লিশ দিন পর্যন্ত কারও সাথে সাক্ষাৎ করেননি।

হিজায হয়ে মদিনায় পৌঁছলে হাতেম মদিনার আলেমদের সাথে ঝগড়া করার ইচ্ছা করল। মদিনায় প্রবেশ করে হাতেম জিজ্ঞেস করল, হে মদিনাবাসী! এটি কোন শহর? লোকেরা বলল, এটি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর শহর। হাতেম বলল, তাহলে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর প্রাসাদ কোথায়? আমাকে তা দেখাবেন কি? যেন তাতে প্রবেশ করে দু'রাকাআত নামায পড়তে পারি। তারা বলল, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর তো কোনো প্রাসাদ ছিল না। বরং তার তো কাদামাটির প্রলেপযুক্ত সাধারণ ঘর ছিল। হাতেম বলল, তাহলে তার স্ত্রী-পরিবার ও সাথি-সঙ্গীদের প্রাসাদ কোথায়? তারা বলল, তাদেরও তো কোনো প্রাসাদ ছিল না; বরং তারাও কাদামাটির প্রলেপযুক্ত সাধারণ ঘরে বাস করতেন। হাতেম বলল, তাহলে তো এটা ফেরাউনের শহর। তখন লোকেরা তাকে গালমন্দ করে গভর্নরের নিকট নিয়ে যায়। তারা অভিযোগ করে বলল, এই অনারবী লোক বলে, এটা নাকি ফেরাউনের শহর। গভর্নর জিজ্ঞেস করলেন, আপনি এ রকম কেন বললেন? হাতেম বলল, গভর্নর সাহেব! আপনি আমার বিষয়ে তাড়াহুড়া করবেন না। আমি একজন মুসাফির লোক। আমি এ শহরে প্রবেশ করে জিজ্ঞেস করলাম, এটা কোন শহর? লোকেরা বলল, এটি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর শহর। আমি তাদেরকে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তার

সাহাবাদের প্রাসাদ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তারা বলল, তাদের তো কোনো প্রাসাদ ছিল না, তারা তো কাদামাটির প্রলেপযুক্ত সাধারণ ঘরে বাস করতেন। অথচ আল্লাহ তায়ালা কুরআনে বলেছেন :

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ

'নিশ্চয় আল্লাহর রাসুলের মাঝে রয়েছে তোমাদের জন্য উত্তম আদর্শ।'[১]

সুতরাং আপনারা কার আদর্শ গ্রহণ করেছেন; রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নাকি ফেরাউনের?

গ্রন্থকার বলেন, ওলামাদের কুৎসা ও নিন্দাকারী মূর্খ যাহেদদের জন্য আফসোস হয়; তারা অল্পজ্ঞানে তুষ্ট থেকে নফলকে ফরয মনে করে। কেননা হাতেম নামক এ যাহেদ যে বিষয়ের নিন্দা করেছে তা শরিয়তে বৈধ। আর বৈধ জিনিস গ্রহণের অনুমতি শরিয়তে বিদ্যমান। শরিয়ত কোনো বিষয়ে অনুমতি দিয়ে তার নিন্দা করে না। হায় আফসোস! মূর্খ লোকের আচরণ কত নিকৃষ্ট। সে যদি তাদেরকে বলত, সম্পদ ব্যবহারে আপনারা যদি মিতব্যয়ী হতেন, যেন মানুষ আপনাদের অনুসরণে ধন্য হয়, তাহলে তা কতই-না উত্তম হতো। এ ব্যক্তি যদি শুনত যে, সাহাবি আবদুর রহমান বিন আওফ, যোবায়ের বিন আওয়াম, আবদুল্লাহ বিন মাসউদ রা. প্রমুখ সাহাবাগণ মৃত্যুর সময় কী বিপুল সম্পদ রেখে গেছেন, তাহলে সে কী বলত বলুন তো? সাহাবি তামিম দারী একটি চাদর এক হাজার দিরহামে ক্রয় করেছেন এবং তার ওপর দাঁড়িয়ে রাতে তাহাজ্জুদ পড়তেন। তাই যাহেদদের ওপর ফরজ হলো প্রথমে আলেমদের থেকে শরিয়তের বিধি-বিধান শিক্ষা করা, আর যদি শিক্ষা গ্রহণের সৌভাগ্য তার না হয়, তাহলে কর্তব্য হলো এসব বিষয়ে চুপ থাকা।

মালেক বিন দিনার রহ. বলেন, শয়তান যাহেদদের নিয়ে এমনভাবে খেলা করে যেভাবে শিশুরা আখরোট নিয়ে খেলা করে থাকে। আল্লাহ আমাদের সঠিক পথে পরিচালনাকারী এবং তাঁর কাছেই আমাদের প্রত্যাবর্তন।

---

১ সুরা আহযাব : আয়াত ২১

দশম অধ্যায়

সুফিদের ওপর শয়তানের ধোঁকা

সুফি সম্প্রদায় মূলত যাহেদ তথা দুনিয়াবিরাগীদের একটি শ্রেণি। তবে কিছু গুণ ও বৈশিষ্ট্যের কারণে সুফিদেরকে যাহেদদের থেকে পৃথক বলে গণ্য করা হয়। তাই তাদের কথা ভিন্ন করে বর্ণনা করতে হচ্ছে। তাসাওউফ প্রথমে যুহদের সমার্থবোধক শব্দ ছিল। কিন্তু পরবর্তী সময়ে ওই সমস্ত লোক এর সাথে সম্বন্ধযুক্ত হয় যারা ছেমা—অর্থাৎ নাচ-গান ও বাদ্যযন্ত্র বাজিয়ে আধ্যাত্মিক গান গাওয়ার মজলিস কায়েমের অনুমতি দেয় এবং এটা বৈধ মনে করে। দু'শ্রেণির লোকই তাদের দলে ভিড়েছে। পরকাল-অন্বেষীরা এ জন্য ভিড়েছে যে, এদের মাঝে নাচ-গান রয়েছে এবং সহজতা ও শিথিলতা রয়েছে অনেক বিষয়ে।

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর যুগে এসব নাম ও পরিভাষা ছিল না। সে যুগে কেবল ঈমান ও ইসলামের সাথে সম্বন্ধ করা হতো। বায়তুল্লাহর খেদমতের উদ্দেশ্যে যে ব্যক্তি সর্বপ্রথম পরিবার-পরিজন থেকে বিচ্ছিন্ন হয় তার নাম ছিল গাউস ইবনে মুররাহ, আর উপাধী ছিল 'সুফা'। এরাও যেহেতু আল্লাহ এবং পরকালের উদ্দেশ্যে সংসার ত্যাগ করেছে তাই নিজেদেরকে ওই দিকে সম্বন্ধ করে 'সুফি' নামে আখ্যায়িত করা হয়।

আবু মুহাম্মাদ আবদুল গনী ইবনে সাঈদ আল হাফেজ রহ. বলেন, ওয়ালিদ ইবনুল কাসেমের কাছে সুফিদের এই উপাধির ব্যাপারে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন, জাহেলিয়াতের যুগে এক সম্প্রদায় আল্লাহর উদ্দেশ্যে সংসার ত্যাগ করে কা'বার সন্নিকটে বসতি স্থাপন করে। এদেরকে সুফা বলা হতো। তাই পরবর্তী সময়ে এরাও সুফি নামে উপাধিপ্রাপ্ত হয়। আবদুল গনি রহ. বলেন, তামীম ইবনে মার এর ভাই গাউস ইবনে মার'র বংশধরকে সুফি বলা হতো।

যুবাইর বলেন, আবু উবাইদা রহ. বলেন, বায়তুল্লাহর আসল মুতাওয়াল্লি ছাড়া অন্যদের মধ্য হতে যারা বায়তুল্লাহর কোনো খেদমতের জিম্মাদার হয় তাদেরক সুফা বা সুফান বলে অভিহিত করা হয়।

ইবনুস সায়িব আলকালবী বলেন, গাউস ইবনে মার'র সুফা নামকরণের প্রেক্ষাপট সম্পর্কে বলেন, গাউসের মায়ের কোনো ছেলে জীবিত থাকত না। তাই সে মান্নত করেছিল, যদি কোনো ছেলে জীবিত থাকে তবে তাকে বায়তুল্লাহর খেদমতে সোপর্দ করবে। অতঃপর গাউসের জন্ম হলে তার মাথায় সুফ তথা পশমি কাপড় বেঁধে বায়তুল্লাহর খেদমতের জন্য সোপর্দ

করে দেয়। এ জন্য সে সুফা নামে পরিচিত হয় এবং পরবর্তী সময়ে তার বংশধরও এ নামে ভূষিত হতে থাকে।

আক্কাল ইবনে শুবাহ বলেন, গাউসের মাতার অনেক মেয়ে সন্তান জন্মলাভ করেছিল। তার মাতা মানত করেছিল যে, যদি কোনো ছেলে জন্মলাভ করে তবে তাকে বায়তুল্লাহর খেদমতে নিয়োজিত করে দেবে। অতঃপর গাউস জন্মলাভ করে। তার মাতা মানত পূরণার্থে তাকে বায়তুল্লাহর কাছে রেখে আসে। তীব্র রৌদ্র ছিল। একবার তার মাতা গিয়ে দেখল যে, সে রৌদ্রে খুব কাতর হয়ে পড়েছে। তখন সে বলেছিল, এতো সুফা হয়ে গেছে। অর্থাৎ যেন পশমি কাপড়ের একটা টুকরা। এতে তার নাম হয়ে যায় সুফ। সে হজ মৌসুমে বিশেষ কিছু দায়িত্ব পালন করত। পরবর্তি সময়ে তার সন্তানরাও এ দায়িত্ব পালন করে।

গ্রন্থকার আল্লামা ইবনুল জাওযি রহ. বলেন, একটি গোষ্ঠী মনে করে, তাসাওউফ আহলে সুফ্ফার সাথে সম্বন্ধযুক্ত। সুফ্ফা মসজিদের আঙ্গিনার ছায়াবিশিষ্ট স্থানকে বলা হয়। মসজিদে নববীর এরূপ এক স্থানে যারা ঘর-বাড়ি ছেড়ে ইলমে দীন হাসিলের উদ্দেশ্যে পড়ে থাকতেন, তাদেরকে আহলে সুফ্ফা বলা হতো। পরিবার-পরিজন ও ঘর-বাড়ি থেকে বিচ্ছিন্নতা অবলম্বনের বিষয়ে উভয় শ্রেণির মধ্যে মিল রয়েছে। আহলে সুফফা দরিদ্র মুসলমান ছিলেন। তাদের ধন-সম্পদ বা স্ত্রী-সন্তান ছিল না। মুসলমানরা তাঁদের কাছে খাবার এনে পৌঁছাত। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মাঝে মধ্যে এসে তাদেরকে সালাম করতেন এবং তাঁদের অবস্থা জিজ্ঞেস করতেন।

হজরত আবু যর রা. বলেন, আমি আহলে সুফ্ফার অন্তর্ভুক্ত ছিলাম। বিকেলে আমরা সবাই রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দরজায় সমবেত হতাম। তিনি প্রত্যেককে এক একজন করে মেহমান হিসেবে নিয়ে যাওয়ার নির্দেশ দিতেন। এরপর যারা অবশিষ্ট থাকতাম, তারা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে নৈশভোজে শরিক হতাম। পানাহার থেকে অবসর হলে তিনি আমাদের বলতেন, যাও মসজিদে গিয়ে ঘুমিয়ে থাকো।

গ্রন্থকার বলেন, আহলে সুফ্ফা প্রয়োজনের তাগিদে মসজিদে খানা-পিনা করতেন এবং ঘুমাতেন। পরবর্তী সময়ে বিজয়ের কারণে মুসলমানদের সচ্ছলতা ফিরে এলে তাঁরা পৃথক বাসস্থানে চলে যান।

আহলে সুফ্ফার প্রতি সম্বন্ধ করে উক্ত সম্প্রদায়কে সুফি বলা যুক্তিযুক্ত নয়। কারণ এরূপ হলে তাদেরকে সুফ্ফী বলা হতো; সুফি নয়। কেউ কেউ বলে থাকে, সুফি 'সুফ' এর সাথে সম্বন্ধযুক্ত। সুফ আরবি শব্দ, এর অর্থ পশম। যেহেতু তারা কৃচ্ছ্রতা অবলম্বনার্থে পশমি কম্বল-চাদর ইত্যাদি ব্যবহার করত, তাই তাদেরকে সুফি বলা হতো। এটাও যুক্তিযুক্ত।

তাসাওউফের লক্ষ্য—চেষ্টা ও সাধনার মাধ্যমে নফসকে মন্দ চরিত্র যথা—অহংকার, হিংসা, লোভ ইত্যাদি থেকে পবিত্র করে উত্তম চরিত্র যথা—সবর, ধৈর্য, সততা, একাগ্রতা ইত্যাদি দ্বারা সুসজ্জিত করা। যা দ্বারা দুনিয়াতে প্রশংসা ও আখিরাতে সাওয়াব পাওয়া যায়।

জুনাইদ ইবনে মুহাম্মাদের কাছে তাসাওউফ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন, সকল প্রকার মন্দ থেকে বেরিয়ে আসা এবং একটি উত্তম চরিত্রে প্রবেশ করাকে তাসাউফ বলে। রুয়াইম রহ. বলতেন, সকল সৃষ্টি তো রসম-রেওয়াজে বসে আছে, আর এই সকল সুফিরা হাকিকতের ওপর উপবিষ্ট রয়েছে। সকল মাখলুক নিজের পক্ষ থেকে শরিয়তের বাহ্যিক বিধি-বিধান পালনে ব্যস্ত, অন্যদিকে এই দলটি নিজের পক্ষ থেকে তাকওয়ার হাকিকত ও সত্যে অবিচল থাকার ব্যাপারে বদ্ধপরিকর।

আল্লামা ইবনুল জাওযি রহ. বলেন, পূর্বেকার সুফিরা এমনই ছিলেন। কিন্তু পরবর্তীকালে শয়তান বিভিন্ন ধোঁকার মাধ্যমে তাদেরকে ভ্রান্ত পথে নিয়ে যায়। শয়তান তাদেরকে ধোঁকা দিয়ে যে সব ক্ষতি করেছে তণ্মধ্যে একটি হলো, তাদেরকে ইলম থেকে সরিয়ে রেখেছে। ইলম হচ্ছে নূর বা আলো। সে আলো না থাকার কারণে তারা অন্ধকারে পথ অতিক্রম করতে থাকে। শয়তান তাদেরকে ধোঁকা দিয়েছে যে, আসল উদ্দেশ্য হচ্ছে দুনিয়ার ভোগ-বিলাস সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করা। তাদের কেউ কেউ টিকে থাকার উপকরণও পরিত্যাগ করে বসেছে। ধন-সম্পদকে তারা সর্প-বিচ্ছুর সাথে তুলনা করেছে। কিন্তু তারা এ কথা চিন্তা করেনি যে, আল্লাহ তায়ালা এসব কিছু কোনো এক কল্যাণেই সৃষ্টি করেছেন। তারা আপন নফস ও আত্মাকে এতো কষ্ট দেয় যে, কেউ কেউ শয়নও করেন না।

তাদের মূল উদ্দেশ্য ভালোই ছিল। কিন্তু আফসোসের বিষয়—তারা শরিয়তের পন্থাকে বাদ দিয়ে ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছে। অনেকে মাওযূ (অবাস্তব) হাদিসের প্রতি আমল করতে দ্বিধাবোধ করছে না। তারা মনগড়া মতবাদ আবিষ্কার করছে। তারা নিজেদের অবস্থাকেই একপ্রকার ইলম মনে

করছে। তাই তারা ইলমকে দু'ভাগে ভাগ করেছে। তাদের অবস্থাকে ইলমে বাতেনি ও শরিয়তের ইলমকে ইলমে যাহেরী বলে সাব্যস্ত করছে।

অনেক সুফি অনাহারে থাকার কারণে বিকৃত মানসিকতার মুখে পতিত হয়েছে। আর এ অবস্থাকেই তারা 'ইস্তেগরাক' ও 'মাহভ' বলে দাবি করছে। অর্থাৎ আল্লাহর ধ্যানে নিজ সত্তা বিস্মৃত হয়ে যাওয়ার অবস্থার মুখোমুখি বলে সাব্যস্ত করছে। এমতাবস্থায় কেউ কুফরে পতিত হয়েছে, কেউ-বা বিদয়াতের করালগ্রাসে আক্রান্ত। আকিদার ক্ষেত্রেও নানাবিধ ভ্রান্তিতে নিমজ্জিত।

আবু আবদুর রহমান সালামী তাদের জন্য সনদবিহীন হাদিসের কিতাব রচনা করেছে এবং তাদের ভিত্তিহীন তাফসিরও সংকলন করেছে। মুহাম্মাদ ইবনে ইউসুফ কাত্তান নিশাপুরী বলেন, আবু আবদুর রহমান সালামী 'সিকাহ' তথা বিশ্বস্ত ও নির্ভরযোগ্য ব্যক্তি নয়। আসাম্ম থেকে সে খুব কম হাদিসই শুনেছে। হাকিম আবু আবদুল্লাহ ইবনুল বাই'য়ের ইন্তেকালের পর আবু আবদুর রহমান আসাম্ম থেকে *তারিখে ইয়াহইয়া ইবনে মাঈন* এবং অন্যান্য কিছু বর্ণনা রেওয়ায়াত করেছে। সে সুফিদের জন্য হাদিস তৈরি করত বলেও অভিযোগ রয়েছে।

গ্রন্থকার বলেন, আবু নাসার সিরাজ সুফিদের জন্য 'লুমাউস সুফিয়া' নামে একটি কিতাব লিখেছে। তাতে সে বহু অবান্তর কথা সন্নিবেশিত করেছে। আবু তালেব মক্কিও সুফিদের জন্য 'কূতুল কুলূব' নামে একটি কিতাব রচনা করেছে। তাতে সে ভিত্তিহীন হাদিসসমূহ সংকলন করেছে। মুহাম্মাদ ইবনে আল্লাফ বলেন, আবুল হাসান ইবনে সালেমের মৃত্যুর পর আবু তালেব মক্কি বসরায় গমন করে। সেখানে সে ওয়াজ-মাহফিলের আয়োজন করে। সে মাহফিলগুলোতে বহু মানুষের সমাগম হতো। সে বক্তৃতার একপর্যায়ে বলে, সৃষ্টির জন্য স্রষ্টার চেয়ে অধিক অনিষ্টকর আর কেউ নয়। এ কথা শোনার পর মানুষ তার প্রতি আস্থা হারিয়ে ফেলে এবং তাকে বিদয়াতিদের কাতারে দাঁড় করায়। খতিব বলেন, 'কূতুল কুলূব' গ্রন্থটি সুফিদের স্বার্থে লেখা হয়েছে এবং তাতে আল্লাহ তায়ালার গুণাবলি সম্পর্কে খুবই মারাত্মক ভ্রান্তিজনক উদ্ধৃতি পেশ করা হয়েছে।

গ্রন্থকার আল্লামা ইবনুল জাওযি বলেন, আবু নুয়াইম ইস্পাহানী সুফিদের উদ্দেশ্যে 'কিতাবুল হিলইয়া' লিখেছেন। তাতে তিনি হজরত আবু বকর, উমর, উসমান, আলী রা., কাজী শুরাইহ, হাসান বসরি, সুফিয়ান সাওরি

প্রমুখের নামও উল্লেখ করেছেন। সুলামী সুফিদের মাঝে ফুযাইল, ইবরাহিম ইবনে আদহাম এবং মারূফ কারখির নাম উল্লেখ করেছেন। যদি তাদের নাম উল্লেখ করার উদ্দেশ্য এটা হয় যে, তাদের মধ্যে যুহদ ছিল, তবে কোনো আপত্তি নেই। কেননা তাসাউফে যুহদ সম্পর্কেও বিরাট ভূমিকা রয়েছে। নচেৎ তাদেরকে সুফি বলা মোটেই সমীচীন হবে না।

আবদুল কারিম কুরাইশি সুফিদের জন্য *কিতাবুর রিসালাহ* লিখেছেন। তাতে তিনি বাকা, ফানা, কবয, বস্ত, ওয়াজ্দসহ বহু পারিভাষিক শব্দ উল্লেখ করেছেন, যা ভিত্তিহীন। শরিয়তে এগুলোর কোনো ভিত্তি নেই। মুহাম্মাদ ইবনে তাহের মুকাদ্দেসিও *সাফওয়াতুত্ তাসাউফ* নামে একটি কিতাব রচনা করেছেন। তাতে তিনি এমনসব কথা বর্ণনা করেছেন, যা যে কোনো বিবেকবান মানুষের কাছে লজ্জাজনক বিষয় হিসেবে বিবেচিত। আবু হামেদ রচিত তাসাওউফ সম্পর্কিত কিতাবেও বহু দুর্বল হাদিস বিদ্যমান। সেগুলোর মধ্যে যার আলোচনা প্রয়োজন হবে আমরা ইনশাআল্লাহ তা আলোকপাত করব।

আমাদের শায়খ আবুল ফযল ইবনে নাসির হাফিয বলতেন, ইবনে তাহের বৈধতার মতবাদী ছিলেন। তিনি একটি কিতাব লেখেন। যেখানে তিনি সুদর্শন বালকদের দিকে তাকানোকে বৈধ সাব্যস্ত করেছেন। তিনি ইয়াহইয়া ইবনে মাঈন থেকে একটি ঘটনার উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন, তিনি বলেছেন, আমি মিশরে একজন অনিন্দ্য সুন্দর বালিকা দেখেছি, আল্লাহ তার ওপর রহম করুন। লোকেরা বলল, আপনি তার ওপর আল্লাহর রহমত কেন চাচ্ছেন? তিনি উত্তরে বললেন, আল্লাহ তাদের ওপর রহম করেন যারা সুদর্শনদের কল্যাণ কামনা করে থাকে। শায়খ ইবনে নাসির বললেন, ইবনে তাহের ওই লোকদের অন্তর্ভুক্ত নয়—যাদের কথা প্রমাণস্বরূপ উল্লেখ করা যেতে পারে।

আবু হামেদ গাযালি এসে সুফি মতাদর্শীদের জন্য *এহইয়াউল উলুম* গ্রন্থ রচনা করলেন। এতে তিনি বহু বাতিল হাদিস সন্নিবেশ করেছেন। যেগুলোর বাতিল হওয়া সম্পর্কে তিনি অবগত ছিলেন না। ফিকাহ্র গণ্ডি থেকে বেরিয়ে তিনি উন্মুক্ত জ্ঞানের আলোকে বিশ্লেষণ করেছেন। সেখানে তিনি লিখেছেন, ওই সকল গ্রহ-তারা, চন্দ্র-সূর্য যা হজরত ইবরাহিম আলাইহিস সালাম দেখেছিলেন, তা দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে ওই নূর যা আল্লাহ তায়ালার পর্দা। এগুলো দৃশ্যমান চন্দ্র-সূর্য নয়। গাযালির কথা বাতেনিয়াদের কথার অনুরূপ প্রতীয়মান হয়। এছাড়া তিনি তাঁর কিতাব 'আল মুফাস্সাহ বিল

আহওয়াল' নামক গ্রন্থে লেখেন : সুফিরা জাগ্রত অবস্থায় ফেরেশতা এবং নবীদের পুণ্যাত্মা প্রত্যক্ষ করে থাকে এবং তাঁদের শব্দ শুনে থাকে। সেখান থেকে তারা উপকার ভোগ করে। এসব দ্বারা উপকৃত হওয়ার পর তারা এমন পর্যায়ে পৌছতে সক্ষম হয়, যার অবস্থা বর্ণনা করা কারও পক্ষে সম্ভব নয়।

সুফিদের নিয়ে লিখিত এ সকল গ্রন্থাদি কোনো ইলমী বিশুদ্ধ সূত্রের আলোকে রচিত হয়নি। কেবল সুফিদের কিছু কিছু ঘটনা থেকে চয়ন করে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। আর এর নাম রাখা হয়েছে ইলমে বাতেন। ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল রহ. এর নিকট নফসের বিভিন্ন অবস্থা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেছিলেন, এ ব্যাপারে সাহাবায়ে কেরাম ও তাবেয়িগণ কোনো আলোচনা করেননি। হারেস মুহাসেবি সুফির কথা শুনে ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল তার আপন এক সাথিকে বলেছিলেন, তার সাথে উঠা-বসা করা তোমার জন্য আমি বৈধ মনে করি না।

ইমাম আবু যুর'আর নিকট হারেছ মুহাসেবি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেছিলেন, সাবধান! তোমরা তার কিতাবাদি থেকে দূরে থাকবে। এ সকল কিতাব বিদয়াতে টইটম্বুর। তোমরা হাদিসকে আঁকড়ে ধরো। হাদিসে এমন বিষয় পাবে—যা এ সকল কিতাবে কখনো পাবে না।

আবু আবদুর রহমান সালামি বলেন, সর্বপ্রথম যে ব্যক্তি নিজের শহরে বেলায়াতের মর্যাদা ও হালতের ক্ষেত্ররূপ সম্পর্কে কথোপকথন শুরু করেন তিনি হচ্ছেন যুন্নুন মিসরি। আবদুল্লাহ ইবনে আবদুল হিকাম—যিনি মিসরের প্রশাসক ও মালেকি মাযহাব অনুসারী ছিলেন, তিনি যুন্নুন মিসরির কথাকে অস্বীকার করেন। এ বিষয়টি জানাজানি হয়ে গেলে যুন্নুন মিসরি এমন ইলম আবিষ্কার করেন যার ব্যাপারে মনীষীরা কোনো কথা বলে যাননি। এমতাবস্থায় মিসরের আলেমরা তার অনুসরণ ছেড়ে দেয়। এমনকি তাকে ধর্মদ্রোহী বলে অভিযুক্ত করা হয়।

সালামি বলেন, আবু সুলায়মান দারানিকে দামেস্ক থেকে বের করে দেয়া হয়। লোকেরা বলাবলি করত, এই লোকের ধারণা হচ্ছে, আমি ফেরেশতাদের দেখি, ফেরেশতারা আমার সাথে কথাবার্তা বলে থাকে। আহমদ ইবনুল হাওয়ারী সম্পর্কেও মানুষজন এ ব্যাপারে সাক্ষ্য দিত যে, তিনি অলীদেরকে নবীদের ওপর প্রাধান্য দিতেন। এ কারণে তিনি দামেস্ক থেকে মক্কা অভিমুখে পালাতে বাধ্য হন। বোস্তামবাসী আবু ইয়াযীদের

মতামতসমূহ অস্বীকার করত। এমনকি তিনি বলেন, হোসাইন ইবনে ঈসা বলতেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মতো আমারও মিরাজ হয়েছে। এ কারণে তাকে বোস্তাম থেকে বের করে দেয়া হয়। কয়েক বছর মক্কায় অবস্থান করে জুরজানে বসবাস করতে থাকেন। অতঃপর হোসাইন ইবনে ঈসার ইন্তেকালের পর আবু ইয়াযিদ পুনরায় বোস্তামে ফিরে আসেন।

ধন-সম্পদ বর্জনের ক্ষেত্রে সুফিদের ওপর শয়তানের চক্রান্ত

প্রথম যুগের সুফিদের দুনিয়া ত্যাগের বিষয়ে নিয়ত সৎ থাকায় শয়তান তাদের সামনে ধন-সম্পদ ও টাকা-পয়সার দোষ তুলে ধরার চেষ্টা চালায়। ফলে তারা ধন-সম্পদ ও টাকা-পয়সা বর্জন করে দরিদ্র জীবন অবলম্বন করতে থাকে। তাদের উদ্দেশ্য সৎ থাকলেও কম জ্ঞানের কারণে তাদের মাঝে বিচ্যুতি ঘটে। এটা ছিল প্রথম যুগের সুফিদের ওপর শয়তানের চক্রান্তের নমুনা। অপর দিকে বর্তমান কালের সুফিদের ওপর শয়তান ধোঁকার পট পরিবর্তন করে নিয়েছে। কেননা পূর্বেকার যুগের সুফিদের অনুসরণ করতে গিয়ে তারা পরিবার-পরিজন ও নিজেদেরকে ধ্বংসের মুখে নিক্ষেপ করে তার মালিকানাধীন সকল ধন-সম্পদ ও টাকা-পয়সা সদকা করে দেয়।

আবু নাসর তুসি বলেন, আমি রায় নগরীর কয়েকজন বুযুর্গকে বলতে শুনেছি, আবু আবদুল্লাহ মাকরি ওয়ারিসসূত্রে তার পিতা থেকে স্থাবর সম্পত্তি ছাড়াও পঞ্চাশ হাজার দিনার লাভ করেন। এরপর যাবতীয় সম্পদ গরিবদের মাঝে খরচ করে তিনি একদম শূন্য হয়ে যান।

এ ধরনের আরও বহু ঘটনা কিতাবের পাতায় পাতায় ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে। যারা এমনটি করে থাকেন আমরা গড়পড়তা তাদের সমালোচনা করব না। যদি তারা পরিবার-পরিজন ও নিজের খরচ বাবদ প্রয়োজনমতো ধন-সম্পদ ও টাকা-পয়সা রেখে অতিরিক্ত সম্পদ আল্লাহর রাস্তায় খরচ করে দেন, অথবা তার যদি এমন পেশা থাকে, যা দ্বারা তার মানুষের দ্বারস্থ হতে হয় না, অথবা তার ধন-সম্পদ ও টাকা-পয়সা যদি সন্দেহযুক্ত হয় এবং সে তা গরিব-দুঃস্থদের মাঝে সদকা করে দেয়, তাহলে সে শরিয়তের আলোকে ভালো ও প্রশংসিত কাজ করেছে বলেই বিবেচিত হবে। কিন্তু সে যদি তার সন্দেহমুক্ত ও সম্পূর্ণ হালাল সব ধন-সম্পদ ও টাকা-পয়সা দান করে

পরিবারকে অভাবের মুখে ঠেলে দিয়ে নিজেও মানুষের দ্বারস্থ হয়, তাহলে আমরা তার এ কাজের নিন্দা জানাতে বাধ্য হব। কেননা এর দ্বারা সে আত্মীয়-স্বজনদের অনুগ্রহ, তাদের দান-সদকার মাল ভক্ষণ অথবা দুষ্কৃতকারীদের সন্দেহযুক্ত ধন-সম্পদ ও টাকা-পয়সার মুখাপেক্ষী হবে—শরিয়তে এ ব্যাপারে কঠোর নিষেধাজ্ঞা রয়েছে। অবশ্য যে সব সুফি জ্ঞানস্বল্পতার দরুন এমনটি করেন, তাদের বিষয় আশ্চর্যের কিছু নয়; বরং আশ্চর্যের বিষয় হলো, ওই সকল সুফিদের বিষয়—যারা বুদ্ধিমান, বিবেকবান ও শরয়ি বিধি-বিধান সম্পর্কে জ্ঞাত হওয়া সত্ত্বেও মানুষকে এ বিষয়ে উৎসাহ দেন এবং তাদেরকে তা বাস্তবায়নের নির্দেশ দেন।

হারেস মুহাসেবি এ ব্যাপারে নাতিদীর্ঘ আলোচনা করেছেন। আবু হামেদ গাযালি রহ. এর মতো বিখ্যাত আলেম তার সমর্থন দিয়ে ব্যাপারটিকে আরও জোরালো করেছেন। অবশ্য আমার মতে হারেস মুহাসেবির তুলনায় আবু হামেদ গাযালি ছিলেন অধিক প্রাজ্ঞ। কেননা গাযালি শরয়ি বিধি-বিধান সম্পর্কে হারেস মুহাসেবি থেকে অনেক এগিয়ে। তবে গাযালি রহ. তাসাওউফশাস্ত্রে অনুপ্রবেশের কারণে হারেস মুহাসেবিকে সমর্থন দিয়েছেন বলে অনুমিত হচ্ছে।

ধন-সম্পদ ও টাকা-পয়সার বিষয়ে হারেস মুহাসেবি মুফতী সাহেবানদের উদ্দেশ্য করে বলেন, হে মুফতী সম্প্রদায়! আপনারা যে ধন-সম্পদ ও টাকা-পয়সার বিষয়ে বলেন, হালাল মাল জমা করা তা বর্জন করা থেকে ভালো—এ কথার দ্বারা তো আপনারা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও অন্যান্য নবী-রাসুলদের অবজ্ঞা করছেন। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে উম্মতের কল্যাণকামী মনে করছেন না। কেননা ধন-সম্পদ ও টাকা-পয়সা জমা করা তাদের জন্য উত্তম হওয়া সত্ত্বেও তিনি তাদেরকে তা জমা করতে বারণ করেছেন। এছাড়া আপনারা এ দাবিও করছেন যে, স্বয়ং আল্লাহ রাব্বুল আলামীনও তার বান্দার কল্যাণ চান না, যেহেতু তিনিও ধন-সম্পদ ও টাকা-পয়সা জমা করতে বান্দাকে নিষেধ করেছেন। অথচ এগুলো বান্দার জন্য উপকারী ছিল।

হারেস মুহাসেবি আরও বলেন, সাহাবাদের সম্পদ দ্বারা প্রমাণ পেশ করা আপনাদের জন্য শোভা পায় না। কেননা সাহাবি আবদুর রহমান ইবনে আউফ রা. অঢেল সম্পদের মালিক ছিলেন। তার ইন্তেকালের পর রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কয়েকজন সাহাবি বললেন,

আবদুর রহমান ইবনে আউফ রা. এর রেখে যাওয়া সম্পদের কারণে তার ব্যাপারে আমাদের আশঙ্কা হয়। তখন কা'আব রা. বললেন, সুবহানাল্লাহ! তোমরা আবদুর রহমান ইবনে আউফের ব্যাপারে কিসের আশঙ্কা করছ? তিনি তো বৈধ পথে ধন-সম্পদ ও টাকা-পয়সা উপার্জন করেছেন এবং আল্লাহর পথে খরচ করেছেন। হজরত কা'আব রা. এর এ কথা সাহাবি হজরত আবু যর গিফারি রা. এর কানে পৌঁছলে তিনি ক্রুদ্ধ হয়ে কা'আব রা. এর সন্ধানে বের হন। চলার পথে উটের চোয়ালের হাড় পেয়ে তিনি তা নিয়েই কা'আব রা. এর সন্ধানে হাঁটতে থাকেন। তখন হজরত কা'আব রা.-কে বলা হলো, আবু যর রা. আপনাকে খুঁজছেন। এ কথা শুনে কা'আব রা. দ্রুত পালিয়ে হজরত ওসমান রা. এর ঘরে উপস্থিত হয়ে তার কাছে সাহায্য চান এবং পুরো ঘটনা বিস্তারিত খুলে বলেন। এদিকে আবু যর রা.ও কা'আব রা. এর অনুসরণ করতে করতে সোজা চলে যান হজরত ওসমান রা. এর ঘরে। আবু যর ঘরে প্রবেশ করলে কা'আব রা. তাঁর ভয়ে ওসমান রা. এর পেছনে অবস্থান নেন। তখন আবু যর তাঁকে বললেন, হে ইহুদির বাচ্চা, তুমি নাকি আবদুর রহমান ইবনে আউফ রা. এর রেখে যাওয়া সম্পদে কোনো সমস্যা নেই বলে দাবি করেছ? ভালো করে শুনে রাখো :

خرج رسول الله «صلى الله عليه وسلم» يوما فقال الْأَكْثَرُونَ هُمُ الْأَقَلُّونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ قَالَ ذَلِكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ إِلَّا مَنْ قَالَ هَكَذَا وَهَكَذَا ثم قال يا أبا ذر وأنت تريد الأكثر وأنا أريد الأقل

'একদিন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘর থেকে বের হয়ে বললেন, দুনিয়াতে যার সম্পদ বেশি আখিরাতে সে নিঃস্ব হবে, তবে যে গরিব ও দুঃস্থদের মাঝে সম্পদ খরচের নির্দেশ দেবে তার বিষয়টি আলাদা। তারপর বললেন, হে আবু যর! তুমি অধিক সম্পদের আশা করো, আর আমি স্বল্প সম্পদের আশা করি।'[১]

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ধন-সম্পদ ও টাকা-পয়সার ব্যাপারে এ কথা বলেছেন, আর হে ইহুদির বাচ্চা! তুমি আবদুর রহমান ইবনে আউফ যা রেখে গেছেন তাতে কোনো সমস্যা নেই বলে দাবি করছ। তুমি মিথ্যাবাদী, আর যারা তোমার মতো মন্তব্য করে তারাও মিথ্যাবাদী।

---

১ সহিহ বুখারি : হাদিস নং ২৩৮৮

পরে আবু যর রা. সেখান থেকে চলে আসেন, কিন্তু হজরত কা'আব রা. এ সব কথার কোনো উত্তর না দিয়ে চুপিসারে বসে থাকেন।

হারেস মুহাসেবি বলেন, আবদুর রহমান ইবনে আউফ রা. এত বড় মহান সাহাবি হওয়া সত্ত্বেও কেয়ামতের ময়দানে তাঁকে দাঁড় করিয়ে রাখা হবে এবং মুহাজির গরিব সাহাবিদের সাথে জান্নাতে প্রবেশ করা থেকে বাধা প্রদান করা হবে, তিনি তাঁদের পেছনে হামাগুড়ি দিয়ে চলবেন। এর একমাত্র কারণ, তিনি নিজেকে মানুষের মুখাপেক্ষী হওয়া থেকে রক্ষা করেছেন এবং মঙ্গলজনক খাতে ব্যয় করার জন্য ধন-সম্পদ ও টাকা-পয়সা উপার্জন করেছেন। অন্যান্য সাহাবাদের অবস্থা ছিল অন্য রকম। তারা আহারের জন্য কোনো কিছু না পেলে খুশি হতেন। আর তুমি দরিদ্রতার ভয়ে ধন-সম্পদ ও টাকা-পয়সা সঞ্চয় করছ। আল্লাহর প্রতি মন্দ ধারণা ও রিযিকের ব্যাপারে আল্লাহর জিম্মাদারির প্রতি আস্থা না থাকার কারণে তুমি শয়তানের এ ফাঁদে আটকা পড়েছ। ধন-সম্পদ ও টাকা-পয়সা জমা করার আরেকটি ক্ষতিকর দিক হচ্ছে, তুমি দুনিয়ার ভোগ-বিলাস, আমোদ-প্রমোদের উদ্দেশ্যে সম্পদ জমা করলে, পরে দেখা গেল যে কোনো কারণে তা তোমার হাতছাড়া হলে তোমার আক্ষেপ আর আফসোসের শেষ থাকে না। অথচ রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন,

'যে ব্যক্তি দুনিয়ার সম্পদ হাতছাড়া হওয়ার পর তার ওপর আফসোস করবে, সে এক বছরের রাস্তা পরিমাণ জাহান্নামের নিকটবর্তী হয়ে যাবে।'[১] অথচ তোমরা সম্পদ হাতছাড়া হওয়ার পর তার ওপর আফসোস করে আল্লাহর শাস্তির প্রতি উদাসীনতা দেখাচ্ছ। তোমরা কি সাহাবায়ে কেরামের যুগের মতো হালাল সম্পদ পাবে? সুতরাং হালাল সম্পদই যখন দুষ্প্রাপ্য, তখন তুমি তা কী করে জমা করবে? মনোযোগ দিয়ে শোনো, আমি তোমাদেরকে ভালো উপদেশ দিচ্ছি। তুমি প্রয়োজনমাফিক সম্পদের প্রতি সন্তুষ্ট থাকবে। মঙ্গলজনক খাতে ব্যয় করার উদ্দেশ্যেও ধন-সম্পদ ও টাকা-পয়সা জমা করবে না। কেননা জনৈক প্রখ্যাত আলেমের কাছে সৎকাজে ব্যয় করার উদ্দেশ্যে ধন-সম্পদ ও টাকা-পয়সা জমা করার কথা বলা হলে তিনি বলেন, মাল বর্জন করা জমা করা থেকে উত্তম।

হারেস মুহাসেবি বলেন, একদল বৈধ ধন-সম্পদ ও টাকা-পয়সা সঞ্চয় করার পর আল্লাহর রাস্তায় খরচ করে মৃত্যুবরণ করেছে, পক্ষান্তরে আরেক

---

১ [যঈফ] আলবানি সংকলিত 'যঈফুল জামে' : হাদিস নং ৫৪১৩

দল ধন-সম্পদ ও টাকা-পয়সা অন্বেষণ করেনি এবং আল্লাহর রাস্তায় খরচও করেনি—এমন দু'টি দল সম্পর্কে তৎকালীন বিখ্যাত তাবেয়িদের কাছে জানতে চাইলে তাঁরা বললেন, আল্লাহর শপথ! যে ব্যক্তি ধন-সম্পদ ও টাকা-পয়সা উপার্জন থেকে বিরত রয়েছে, সে-ই শ্রেষ্ঠ। আর শ্রেষ্ঠত্বের দিক দিয়ে উভয়ের মাঝে পূর্ব ও পশ্চিম মেরু বরাবর ব্যবধান রয়েছে।

গ্রন্থকার বলেন, এতক্ষণ যা আলোচিত হলো, তা হারেস মুহাবেসির বক্তব্য। তার এ বক্তব্য আবু হামেদ গাযালি রহ. উল্লেখ করেছেন এবং তার সমর্থন করেছেন। হজরত সা'লাবা রা. এর হাদিস দ্বারা তার মন্তব্যকে আরও পোক্ত করেছেন। কেননা সা'লাবা রা. অঢেল সম্পদের মালিক হওয়া সত্ত্বেও সম্পদের যাকাত দেননি। অথচ তিনি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর একজন সাহাবি ছিলেন।

আবু হামেদ গাযালি রহ. বলেন, যে ব্যক্তি আম্বিয়ায়ে কেরাম ও পূর্ববর্তী মনীষীদের অবস্থার দিকে চিন্তা-ভাবনা করবে, সে নির্দ্বিধায় এ কথা স্বীকার করতে বাধ্য হবে যে, ধন-সম্পদ ও টাকা-পয়সা সঞ্চয় করার চেয়ে তা হাতছাড়া করা উত্তম, তা যদিও মঙ্গলজনক খাতে ব্যয় হোক না কেন। কেননা ধন-সম্পদ ও টাকা-পয়সার ব্যস্ততা মানুষকে আল্লাহ হতে গাফেল করে দেয়। তাই ভক্ত-মুরিদানদের উচিত—প্রয়োজনাতিরিক্ত সম্পদ আল্লাহর রাস্তায় খরচ করে ধন-সম্পদ ও টাকা-পয়সার বেড়াজাল থেকে মুক্ত হওয়া। কেননা তার নিকট যদি একটি টাকাও অবশিষ্ট থাকে, যার দিকে মন আকৃষ্ট হয়, তাহলে সে আল্লাহর রহমত থেকে দূরে সরে যাবে।

গ্রন্থকার বলেন, আবু হামেদ গাযালির এ বক্তব্য শরিয়তবিরোধী ও বিবেকবর্জিত। এ ছাড়া তিনি ধন-সম্পদ ও টাকা-পয়সার মন্দ উপলব্ধির শিকার হয়েছেন।

ধন-সম্পদবিরোধী এ মতবাদের প্রমাণভিত্তিক অসারতা

উপরোল্লিখিত বক্তব্যের খণ্ডনে আমাদের মনে রাখতে হবে আল্লাহ তায়ালা ধন-সম্পদ ও টাকা-পয়সার মর্যাদা বর্ণনা করেছেন এবং তা সংরক্ষণের আদেশ দিয়েছেন। যেহেতু মানুষের উপজীব্য হিসেবে আল্লাহ তায়ালা ধন-সম্পদ ও টাকা-পয়সাকে নির্ধারণ করেছেন, বিহিত কারণে এর মর্যাদা থাকা বাঞ্ছনীয়। আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেন,

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا

'আর তোমরা নির্বোধদের হাতে তোমাদের ধন-সম্পদ দিও না, যাকে আল্লাহ তোমাদের জন্য করেছেন জীবিকার মাধ্যম।'[১]

অন্য আয়াতে আল্লাহ তায়ালা নির্বোধদের হাতে ধন-সম্পদ অর্পণের ব্যাপারে নিষেধ করতে গিয়ে বলেন,

فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ

'যদি তাদের মাঝে ভালো-মন্দ বিচার করতে পারার জ্ঞান দেখতে পাও, তাহলে তাদের সম্পদ তাদেরকে ফিরিয়ে দাও।'[২]

হাদিসে আছে,

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ إِضَاعَةِ المَالِ

'রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ধন-সম্পদ নষ্ট করতে নিষেধ করেছেন।'[৩]

হজরত সাআদ রা.-কে উদ্দেশ্য করে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

إِنَّكَ أَنْ تَذَرَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ، خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَذَرَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ

'তুমি তোমার ওয়ারিসদেরকে সচ্ছল অবস্থায় রেখে যাওয়া তাদেরকে দরিদ্রাবস্থায় রেখে যাওয়া থেকে উত্তম। যাতে তাদের মানুষের দ্বারস্থ হতে না হয়।'[৪]

অন্য হাদিসে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,

مَا نَفَعَنِي مَالٌ قَطُّ مَا نَفَعَنِي مَالُ أَبِي بَكْرٍ

'আবু বকরের ধন-সম্পদ আমাকে যতটুকু উপকৃত করেছে, অন্য কারও ধন-সম্পদে আমি সেই পরিমাণ উপকৃত হইনি।'[৫]

---

১ সুরা নিসা : আয়াত ৫

২ সুরা নিসা : আয়াত ৬

৩ সহিহ বুখারি : হাদিস নং ২৪০৮, সহিহ মুসলিম : হাদিস নং ৫৯৩

৪ সহিহ বুখারি : হাদিস নং ১২৯৫, ২৭৪২, সহিহ মুসলিম : হাদিস নং ১৬২৮

৫ জামে' তিরমিযি : হাদিস নং ৩৬৬২, সুনানে ইবনে মাজাহ : হাদিস নং ৯৪, সহিহ মুসলিম : হাদিস নং ২৩৮২

অন্য হাদিসে আছে, হজরত আমর ইবনুল আস রা. বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লোক মারফরত আমাকে ডেকে বললেন,

آخُذَ عَلَيَّ ثِيَابِي وَسِلَاحِي، ثُمَّ آتِيَهُ قَالَ: فَفَعَلْتُ، ثُمَّ أَتَيْتُهُ وَهُوَ يَتَوَضَّأُ فَصَعَّدَ فِيَّ النَّظَرَ، ثُمَّ طَأْطَأَ، ثُمَّ قَالَ: " يَا عَمْرُو إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَبْعَثَكَ عَلَى جَيْشٍ فَيُغْنِمُكَ اللهُ وَيُسْلِمُكَ، وَأَرْغَبُ لَكَ رَغْبَةً صَالِحَةً مِنَ الْمَالِ "، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي لَمْ أُسْلِمْ رَغْبَةً فِي الْمَالِ، وَلَكِنْ أَسْلَمْتُ رَغْبَةً فِي الْإِسْلَامِ وَأَنْ أَكُونَ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لِي: " يَا عَمْرُو: نِعْمَ الْمَالُ الصَّالِحُ لِلرَّجُلِ الصَّالِحِ

'তুমি বর্ম ও অস্ত্র ধারণ করে আমার কাছে এসো। আমি তখন তা পরিধান করে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দরবারে উপস্থিত হলে তিনি আমাকে বললেন, আমি তোমাকে এক সেনাদলের উদ্দেশে পাঠাতে চাই। তুমি সেখানে পৌঁছলে আল্লাহ তায়ালা তোমাকে বিজয়ী করবেন এবং গনীমত দান করবেন। আর ভালো উদ্দেশ্যে আমি তোমার জন্য ধন-সম্পদ কামনা করি। তখন আমি বললাম, ইয়া রাসুলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! আমি তো ধন-সম্পদ লাভের আশায় ইসলাম গ্রহণ করিনি। আল্লাহর আনুগত্য করার জন্য ইসলাম গ্রহণ করেছি। জবাবে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, হে আমর! ভালো মানুষের জন্য হালাল ধন-সম্পদ কতই-না উত্তম!'[৬]

হজরত আনাস ইবনে মালেক রা. বলেন,

ادْعُ اللَّهَ لَهُ، قَالَ: «اللَّهُمَّ أَكْثِرْ مَالَهُ، وَوَلَدَهُ، وَبَارِكْ لَهُ فِيمَا أَعْطَيْتَهُ

'রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার জন্য সকল প্রকার দোয়া করেছেন। আর দোয়ার শেষভাগে ছিল, হে আল্লাহ! তার ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি বাড়িয়ে দিন এবং তাকে বরকত দান করুন।'[৭]

উবাইদুল্লাহ ইবনে কা'আব বলেন, আমি কা'আব বিন মালেক রা.-কে তাঁর তাওবাহ'র হাদিস বর্ণনা করতে শুনেছি। হাদিসের একাংশে তিনি বলেন, আমি বললাম, ইয়া রাসুলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! আমার কৃত

---

৬ মুসনাদে আহমাদ : ৪/১৯৭, [আলবানি রহ. হাদিসটি সহিহ বলেছেন]

৭ সহিহ বুখারি : হাদিস নং ১৯৮২, সহিহ মুসলিম : হাদিস নং ২৪৮১

অপরাধের তাওবাহস্বরূপ আমার সমস্ত সম্পদ আল্লাহর রাস্তায় সদকা করব। তখন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন,

أَمْسِكْ عَلَيْكَ بَعْضَ مَالِكَ، فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ

'তুমি কিছু সম্পদ রেখে দাও, কেননা এগুলো তোমার জন্য মঙ্গলজনক।'[১]

গ্রন্থকার বলেন, উপরোল্লিখিত হাদিসগুলো হাদিসের বিশুদ্ধ গ্রন্থ থেকে চয়ন করা হয়েছে। এগুলো সুফিদের আকিদার বিপরীত প্রমাণ হিসেবে যথেষ্ট। তাদের দৃষ্টিতে ধন-সম্পদের আধিক্য আল্লাহর রহমতের পথে বাধা সৃষ্টি করে। সুফিরা ধন-সম্পদ সংরক্ষণ ও সঞ্চয়কে তাওয়াক্কুল পরিপন্থী হিসেবে বিবেচনা করে থাকে।

এতে অস্বীকারের কোনো সুযোগ নেই যে, ধন-সম্পদের আধিক্যের কারণে ফিতনায় পতিত হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। এ কারণে পূর্ববর্তী বহু মনীষী ধন-সম্পদকে এড়িয়ে চলতেন। একদিকে যেমন ধন-সম্পদ জমা করা উত্তম, অন্যদিকে ধন-সম্পদের আধিক্যের কারণে ফিতনায় পড়ে যাওয়ার ঝুঁকিকেও উড়িয়ে দেয়া যায় না। ধন-সম্পদ ও টাকা-পয়সার আধিক্যের কারণে পরকালের চিন্তা-ফিকিরও মনে লালন করা দুরূহ ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়। এ জন্য এর ফিতনাকে ভয় করা হয়ে থাকে।

দেহ সবল রাখা পরিমাণ বৈধ ধন-সম্পদ ও টাকা-পয়সা উপার্জন একটি আবশ্যিক বিষয়। অন্যদিকে কেউ যদি বৈধ ধন-সম্পদ ও টাকা-পয়সা জমা করা এবং তা বৃদ্ধি করার ইচ্ছা করে, তখন তার উদ্দেশ্য যাচাই করতে হবে। যদি তার উদ্দেশ্য হয় গর্ব, অহংকার ও প্রতিযোগিতা, তাহলে ধন-সম্পদ ও টাকা-পয়সা জমা করা নিকৃষ্ট বিষয় হিসেবে বিবেচিত হবে। আর যদি অন্যের মুখাপেক্ষী হতে পরিবার-পরিজন ও নিজেকে পবিত্র রাখা, তাদের বিপদ-আপদে খরচ করা, আত্মীয়-স্বজনের সহযোগিতা করা এবং জনকল্যাণমূলক খাতে ব্যয় করা উদ্দেশ্য হয়, তাহলে তার নিয়ত অনুযায়ী সে সাওয়াব পাবে। এ উদ্দেশ্যে ধন-সম্পদ ও টাকা-পয়সা সঞ্চয় ও সংরক্ষণ করা বহু নফল ইবাদত অপেক্ষা উত্তম বলে বিবেচিত হবে। ধন-সম্পদ ও টাকা-পয়সা সংরক্ষণ করার ক্ষেত্রে এক জামাত সাহাবায়ে কেরামের নিয়ত নিষ্কলুষ ছিল। ভালো নিয়তে তারা ধন-সম্পদ ও টাকা-পয়সা বৃদ্ধির প্রার্থনা করেছেন।

---

১ সহিহ বুখারি : হাদিস নং ৪৪১৮, সহিহ মুসলিম : হাদিস নং ২৭৬৯

عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقْطَعَ الزُّبَيْرَ حُضْرَ فَرَسِهِ، بِأَرْضٍ يُقَالُ لَهَا: ثُرَيْرٌ، فَأَجْرَى الْفَرَسَ حَتَّى قَامَ، ثُمَّ رَمَى بِسَوْطِهِ، فَقَالَ: «أَعْطُوهُ حَيْثُ بَلَغَ السَّوْطُ

হজরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর রা. বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হজরত যুবাইর রা. এর সারসার নামীয় একখণ্ড জমি দান করেন। তিনি তাঁকে বললেন, তোমার ঘোড়া দৌড়াও। যেখানে গিয়ে ঘোড়া থামবে, তুমি সে পর্যন্ত জমির মালিক হবে। তিনি ঘোড়া দৌড়ানো শুরু করলে একপর্যায়ে ঘোড়া থেমে যায়। এরপর তিনি চাবুক নিক্ষেপ করেন। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তার চাবুক যেখানে গিয়ে পড়েছে, সে পর্যন্ত জমিও তাকে দিয়ে দাও।'[২]

হজরত সাআদ ইবনে উবাদাহ রা. তাঁর দোয়ায় বলতেন اللّٰهُمَّ وسع علي 'হে আল্লাহ! আপনি আমাকে সচ্ছলতা দান করুন।'

গ্রন্থকার বলেন, এর চেয়ে আশ্চর্যের বিষয় হলো, ইয়াকুব আলাইহিস সালাম-কে তাঁর সন্তানেরা যখন বলল, وَنَزْدَادُ كَيْلَ بَعِيرٍ[৩] বিনইয়ামীনকে আমাদের সাথে পাঠালে আমরা এক উট রসদ বেশি লাভ করতে পারব। তখন তিনি রসদের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পুত্র বানইয়ামীনকে তাদের সাথে পাঠাতে অনুমতি দেন। আইয়ুব আলাইহিস সালাম সুস্থতা লাভ করলে তাঁর দিকে স্বর্ণের ফড়িং নিক্ষেপ করা হলে তিনি বেশি পাওয়ার আশায় সেগুলো কাপড়ে জড়াতে থাকেন। তখন তাকে বলা হলো, তুমি কি তৃপ্ত হওনি? তিনি বললেন, কে এমন আছে, যে আপনার অনুগ্রহে তৃপ্ত হয়?[৪]

ধন-সম্পদের প্রতি স্বভাবতই মানুষ আকৃষ্ট হয়ে থাকে। এর সঞ্চয় ও সংরক্ষণ যদি ভালো উদ্দেশ্যে হয়, তাহলে তা কল্যাণকর ও মঙ্গলজনক হিসেবেই বিবেচিত হবে।

থেকে গেল হারেস মুহাসেবির বক্তব্যের অসারতা। তিনি অজ্ঞতা ও কম জ্ঞানের দরুন ভুলে পতিত হয়েছেন। তার বক্তব্যমতে আল্লাহ তায়ালা ও রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ধন-সম্পদ জমা করতে নিষেধ

---

২ সুনানে আবি দাউদ : হাদিস নং ৩০৭২

৩ সুরা ইউসুফ : আয়াত ৬৫

৪ এমন হাদিস বুখারিতেও রয়েছে : হাদিস নং ২৭৯

করছেন—এটা একটা অসম্ভব বিষয়। কেননা ধন-সম্পদ জমা করা ওই সময় নিষেধ, যখন উদ্দেশ্য হয় মন্দ কিংবা অবৈধ পন্থায় তা সঞ্চয় ও সংরক্ষণ করা হয়। অন্যদিকে ধন-সম্পদ বৈধ হলে এবং ভালো নিয়তে তা জমা করা হলে, শরিয়ত এ ব্যাপারে অনুমতি দেয়। সুতরাং শরিয়ত অনুমোদিত বিষয়ের নিন্দা করা অনুচিত। হজরত কা'আব ও আবু যর রা. এর ঘটনা হারেস মুহাসেবি উল্লেখ করেছেন, তা সম্পূর্ণ বানোয়াট—যার কোনো ভিত্তি নেই। অবশ্য এ ঘটনাটি সূত্র ছাড়া অন্যভাবেও বর্ণিত হয়েছে :

মালেক বিন আবদুল্লাহ যিয়াদি বলেন, হজরত আবু যর রা. উসমান রা. এর বাড়িতে এসে প্রবেশের অনুমতি চান। অনুমতি পেয়ে হাতে একটি লাঠি নিয়ে ঘরে প্রবেশ করেন। তখন হজরত কা'আব রা.-কে সম্বোধন করে উসমান রা. বললেন, হে কা'আব! আবদুর রহমান তো ইন্তেকাল করেছেন এবং মৃত্যুকালে অনেক সম্পদ রেখে গেছেন। এ বিষয়ে তোমার অভিমত কী? হজরত কা'আব রা. বললেন, তিনি যদি ধন-সম্পদের ক্ষেত্রে আল্লাহর হক আদায় করে থাকেন, তাহলে কোনো সমস্যা নেই। এ কথা শুনে হজরত আবু যর রা. লাঠি দ্বারা কা'আব রা.-কে প্রহার করেন এবং বলেন, আমি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে বলতে শুনেছি, যদি আমার জন্য এ পাহাড়কে স্বর্ণে রূপান্তর করা হয় এবং তা থেকে আমি আল্লাহর পথে খরচ করি এবং আমার দান কবুল করা হয়, তবুও আমি তা পছন্দ করব না যে, মৃত্যুর সময় ছয় আউকিয়া (বাহাত্তর দিরহাম) রেখে যাব। অতঃপর হজরত আবু যর রা. বললেন, হে উসমান! আল্লাহর শপথ করে বলছি, আপনি কি এ হাদিস শুনেছেন? তিনি এভাবে তিনবার জিজ্ঞেস করলে হজরত ওসমান রা. বললেন, হ্যাঁ, শুনেছি।[১]

গ্রন্থকার বলেন, উপরোক্ত হাদিসটি ভিত্তিহীন। এর রাবি ইবনে লাহিয়াহ 'মাতউন' তথা অভিযুক্ত। ইয়াহইয়া বলেন, তার হাদিস প্রমাণ হিসেবে পেশ করার যোগ্য নয়। ইতিহাসের বিশুদ্ধ বর্ণনানুসারে হজরত আবু যর রা. পঁচিশ হিজরিতে ইন্তেকাল করেন, অন্যদিকে আবদুর রহমান ইবনে আউফ রা. ইন্তেকাল করেন বত্রিশ হিজরিতে। সে মতে আবু যর রা. এর পরেও আবদুর রহমান ইবনে আউফ রা. সাত বছর জীবিত ছিলেন বলে প্রতীয়মান হয়। সুতরাং আবদুর রহমান ইবনে আউফ রা. এর মৃত্যুর ব্যাপারে আবু যর

১ মুসনাদে আহমাদ : ১/৬৩

রা. এর জিজ্ঞাসা-সংক্রান্ত হাদিসটি বানোয়াট বলে প্রমাণিত হয়। সাহাবায়ে কেরাম রা. হজরত আবদুর রহমান ইবনে আউফ রা. এর ব্যাপারে কীভাবে আশঙ্কা করতে পারেন! অথচ হালাল ধন-সম্পদ জমা করা সর্বসম্মতভাবে বৈধ। শরিয়া কর্তৃক প্রমাণিত বিষয়ের ওপর তাঁরা কিসের আশঙ্কা করবেন? এছাড়া সাহাবাদের নিন্দার বিষয়টি আবদুর রহমান ইবনে আউফ রা. এর সাথে সীমাবদ্ধ করে রাখার অর্থ হচ্ছে, তিনি সাহাবাদের আদর্শ অনুসরণ করেননি। অথচ বিখ্যাত সাহাবি হজরত তালহা রা. মৃত্যুর সময় তিনশত বোঝা ধন-সম্পদ রেখে যান। প্রতি বোঝায় সম্পদের পরিমাণ ছিল তিন কিনতার, আর প্রতি কিনতার সম্পদের পরিমাণ প্রায় এককোটি দিনার। আরেক বিখ্যাত সাহাবি হজরত যুবাইর রা. এর ধন-সম্পদের পরিমাণ ছিল পঞ্চাশ কোটি দুই লক্ষ দিরহাম। হজরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. মৃত্যুর সময় নব্বই হাজার দিরহাম রেখে যান। এভাবে অধিকাংশ সাহাবি সম্পদ উপার্জন করেছেন এবং মৃত্যুর সময় তা ওয়ারিসদের জন্য রেখে গেছেন। কিন্তু এ ব্যাপারে তাদের কাউকে অন্যের নিন্দা করতে দেখা যায়নি।

হারেস মুহাসেবির কথা—'আবদুর রহমান ইবনে আউফ রা. এতবড় মহান সাহাবি হওয়া সত্ত্বেও কেয়ামতের ময়দানে তাঁকে দাঁড় করিয়ে রাখা হবে এবং মুহাজির গরিব সাহাবিদের সাথে জান্নাতে প্রবেশ করা থেকে বাধা প্রদান করা হবে, তিনি তাঁদের পেছনে হামাগুড়ি দিয়ে চলবেন'—তার এ কথাই প্রমাণ করে যে, তিনি হাদিস সম্পর্কে যথেষ্ট অজ্ঞ। হতে পারে এ ধরনের হাদিস তিনি স্বপ্নে প্রাপ্ত হয়েছেন, বাস্তবে নয়। হজরত আবদুর রহমান ইবনে আউফ রা. এর মতো সাহাবি কেয়ামতের দিন হামাগুড়ি দিয়ে চলবেন! কতবড় স্পর্ধার কথা! আমরা এমন কথা থেকে আল্লাহ কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করছি। তাঁর মতো সাহাবি যদি হামাগুড়ি দিতে হায়, তাহলে জান্নাতে প্রবেশের অগ্রগামী আর কে হতে পারেন? অথচ তিনি ছিলেন জান্নাতের সুসংবাদপ্রাপ্ত দশজন সাহাবির অন্যতম। তিনি বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছেন, যাঁদের ব্যাপারে ক্ষমার ঘোষণা এসেছে। এছাড়াও আহলে শুরার অন্যতম সাহাবি ছিলেন হজরত আবদুর রহমান ইবনে আউফ রা.।

অভিযুক্ত হাদিসটির রাবি আম্মারাহ সম্পর্কে ইমাম বুখারি রহ. বলেছেন, তার অধিকাংশ হাদিস মুযতারিব। ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল রহ. বলেন, সে হজরত আনাস রা. থেকে বহু মুনকার হাদিস বর্ণনা করেছে। আবু

হাতেম রাযি বলেন, তার হাদিস দলিল হিসেবে উপস্থাপন করা যায় না। দারাকুতনী রহ. বলেন, সে একজন দুর্বল রাবী।

হারেস মুহাসেবি আরও বলেছেন, 'বৈধ ধন-সম্পদ বর্জন করা তা সঞ্চয় ও সংরক্ষণ করা অপেক্ষা উত্তম।' ব্যাপারটি আসলে এমন নয়। নিয়ত ভালো থাকলে আলেমদের সর্বসম্মত ঐকমত্যের ভিত্তিতে তা সঞ্চয় ও সংরক্ষণ করা উত্তম বলে বিবেচিত হবে। অনুরূপভাবে হারেস মুহাসেবি ধন-সম্পদ হাতছাড়া হওয়ার পর আক্ষেপ করলে এক বছরের রাস্তা পরিমাণ জাহান্নামের নিকটবর্তী হওয়ার ব্যাপারে যে কথাটি উল্লেখ করেছেন, তা হাদিস নয়। কেননা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এমন কথা কখনো বলেননি। হারেস মুহাসেবি সাহাবায়ে কেরামের যুগের মতো হালাল ধন-সম্পদ পাওয়া যাবে না বলে যে মন্তব্য করেছে—তাও অর্থহীন। কেননা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন :

الحَلاَلُ بَيِّنٌ، وَالحَرَامُ بَيِّنٌ

'হালালও স্পষ্ট, হারামও স্পষ্ট।'[১] আপনার কি মনে হয় হালাল দ্বারা স্বর্ণ যে অবস্থায় বের হয়েছে সে অবস্থায় বহাল থাকাকে বোঝানো হয়েছে? এটা দ্বারা অবৈধ বেচাকেনা হলে তার বৈধতার গুণ কমে যাবে? এটা কখনো সম্ভব নয়। শরিয়তের কথা হচ্ছে, কোনো মুসলমান ইহুদির নিকট কোনো পণ্য বিক্রয় করলে ফকিহদের মতানুসারে বিক্রিত মূল্য মুসলমানের জন্য বৈধ বলে বিবেচিত হবে। হারেস মুহাসেবির এমন জঘন্য কথা শুনে আবু হামেদ গাযালি কী করে নীরবতা পালন করলেন—এটা ভাবতেই আমি আশ্চর্য হই। উল্টো তিনি হারেসের সমর্থন করে গেলেন। আর তিনি কীভাবে বললেন যে, মঙ্গলজনক খাতে ব্যয় করা সত্ত্বেও ধন-সম্পদ হাতছাড়া হওয়া তা লাভ করা অপেক্ষা উত্তম! তিনি এর বিপরীত ইজমা দাবি করলে তা বিশুদ্ধ বলে সাব্যস্ত হতো। তাসাওউফকে প্রাধান্য দিতে গিয়ে তিনি ফতোয়া পাল্টাতে বাধ্য হয়েছেন। মারুযির বর্ণনামতে, আমি এক ব্যক্তিকে আবু উবাইদুল্লাহর এর নিকট হতে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন, আমার ব্যক্তিগত খরচ চালানোর সামর্থ্য আছে। তিনি বললেন, বাজারে গিয়ে ব্যবসা করো এবং উপার্জিত অর্থ দ্বারা আত্মীয়-স্বজনের সহযোগিতা করো। অসুস্থ ব্যক্তিদের সেবা-যত্নে মনোযোগী হও।

---

১ সহিহ বুখারি : হাদিস নং ৫২, সহিহ মুসলিম : হাদিস নং ১৫৯৯

পক্ষান্তরে আবু হামেদ গাযালি রহ. এর কথা—'সমস্ত ধন-সম্পদ ত্যাগ করা মুরিদদের কর্তব্য।' আমরা এর জবাব পূর্বে আলোকপাত করেছি। সাহাবি হজরত সা'লাবা রা. এর ব্যাপারে যে অভিযোগ তোলা হয়েছে, আসলে ধন-সম্পদ তাঁকে ক্ষতিগ্রস্ত করেনি; বরং ধন-সম্পদের যাকাত আদায়ে কৃপণতা প্রদর্শন তাঁকে ক্ষতিগ্রস্ত করে থাকতে পারে।

নবীদের ব্যাপারে তার অভিযোগও ভিত্তিহীন। কেননা ইবরাহিম আলাইহিস সালাম, শুয়াইব আলাইহিস সালাম ও অন্যান্য আম্বিয়ায়ে কেরামের যেমন সম্পদ ছিল, তেমন কৃষিজাত জমি ও খামারও ছিল। হজরত সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যাব মৃত্যুর সময় চারশত দিনার রেখে যান। আর মৃত্যুর সময় সাহাবায়ে কেরামের রেখে যাওয়া সম্পদের বিবরণ পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। সুফইয়ান সাওরি রহ. মৃত্যুর সময় দুইশত দিরহাম রেখে যান। তিনি বলতেন, এ যুগের ধন-সম্পদ একটি হাতিয়ার। আমাদের পূর্বসূরি মনীষীরা ধন-সম্পদের প্রশংসা করতেন। পাশাপাশি বিপদ-আপদ ও গরিব-দুঃস্থদের সাহায্য-সহযোগিতার জন্য তা সঞ্চয় ও সংরক্ষণও করতেন। তবে তাঁদের কেউ কেউ একান্তে ইবাদত ও চিন্তা-ফিকিরে গভীরতা লাভের জন্য ধন-সম্পদ থেকে নিরাপদ দুরত্ব বজায় রাখতেন এবং অল্প রিযিকের ওপর তুষ্ট থাকতেন। হারেস মুহাসেবি যদি ধন-সম্পদ জমা করাকে পাপের স্তরে না পৌঁছিয়ে কম সম্পদ গ্রহণ করা উত্তম বলত, তাহলে তার কথা কিছুটা ঠিক বলে গণ্য করার অবকাশ ছিল। কিন্তু সে অত্যুক্তি করেছে। সুতরাং তার পরিত্যাজ্য।

দরিদ্রতা ও অসুস্থতায় ধৈর্যধারণ

জেনে রাখা উচিত—দরিদ্রতা একটি রোগ। সুতরাং যে তাতে আক্রান্ত হবে এবং তার ওপর ধৈর্যধারণ করবে, সে অবশ্যই সবরের সাওয়াব পাবে। এ কারণে দরিদ্ররা ধনীদের পাঁচশত বছর পূর্বে জান্নাতে যাবে। সম্পদ যেহেতু নেয়ামত, তাই সম্পদশালীর জন্য শোকর আদায় করা কর্তব্য। তার দায়িত্ব হচ্ছে, আল্লাহর নির্দেশিত পথে তা ব্যয় করা। এ কারণে সম্পদের হিসাব দিতে গিয়ে ধনীরা বিলম্বে জান্নাতে যাবে। আবু আবদুর রহমান সালামী তাঁর প্রণীত 'সুনানুস্ সূফিয়্যাহ' গ্রন্থে দরিদ্র ব্যক্তি মৃত্যুর সময় কোনো সম্পদ রেখে যাওয়া মাকরুহ সংক্রান্ত একটি হাদিস উল্লেখ করেছেন, যেখানে উল্লেখ আছে, হজরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. বলেন, আহলে সুফ্ফার

জনৈক ব্যক্তির ইন্তেকাল হলে তার জুব্বার মাঝে দু'টি দিনার পাওয়া যায়। এ বিষয়ে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে অবহিত করা হলে তিনি বললেন, 'এ-তো জাহান্নামের দু'টি দাগ।'[১]

গ্রন্থকার বলেন, উপরোক্ত হাদিস দ্বারা মৃত্যুর সময় ধন-সম্পদ রেখে যাওয়া মাকরুহ হওয়াকে বোঝায় না। এর পটভূমি ভিন্ন। কেননা আহলে সুফ্ফার এ দরিদ্র লোক সদকা গ্রহণ ও সম্পদ সঞ্চয়ের ব্যাপারে দরিদ্রদের সাথে বাদানুবাদ করতেন। তাই রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর জমাকৃত সম্পদের বিষয়ে বলেছেন, 'এ-তো জাহান্নামের দু'টি দাগ।' ধন-সম্পদ রেখে যাওয়া মাকরুহ হলে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হজরত সাআদ ইবনে আবি ওয়াক্কাস রা.-কে সম্পদ রেখে যাওয়ার ব্যাপারে নির্দেশনা দিতেন না। হজরত সাআদ রা.-কে উদ্দেশ্য করে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

إِنَّكَ أَنْ تَتْرُكَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَتْرُكَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ

'তুমি তোমার ওয়ারিসদেরকে সচ্ছল অবস্থায় রেখে যাওয়া তাদেরকে দরিদ্রাবস্থায় রেখে যাওয়া থেকে উত্তম। যাতে তারা মানুষের দ্বারস্থ হতে না হয়।'[২]

হজরত ওমর ইবনে খাত্তাব রা. বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে সদকার বিষয়ে উদ্বুদ্ধ করলে আমি আমার অর্ধেক সম্পদ নিয়ে আসি। তখন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন,

'তোমার পরিবারের জন্য কী রেখে এসেছ? আমি বললাম, অনুরূপ সম্পদ রেখে এসেছি। তখন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ বিষয়ে আমার নিন্দা করেননি।'[৩]

ইবনে জারির তাবারি বলেন, এ হাদিসটি জাহেল সুফিদের বক্তব্যের বিরুদ্ধে যথার্থ। কেননা তারা মনে করে, আগামী দিনের জন্য কোনো কিছু অবশিষ্ট রাখা বৈধ নয়। এমন করা আল্লাহ তায়ালার রিযিকের জিম্মাদারির ব্যাপারে অনাস্থা প্রকাশ করার নামান্তর। এটাকে তারা তাওয়াক্কুলপরিপন্থী হিসেবেও

---

১ এ-সংক্রান্ত হাদিস ইমাম আহমদ রহ. তাঁর 'মুসনাদ' এ সংকলন করেছেন।
২ সহিহ বুখারি : হাদিস নং ১২৯৫, ২৭৪২, সহিহ মুসলিম : হাদিস নং ১৬২৮
৩ [হাসান] সুনানে আবি দাউদ : হাদিস নং ১৬৭৮

বিবেচনা করে। ইবনে জারির বলেন, অনুরূপভাবে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন,

اتَّخِذُوا الْغَنَمَ فَإِنَّ فِيهَا بَرَكَةً

'তোমরা ছাগল প্রতিপালন করো। কেননা এটা বরকতময় প্রাণী।'[৪]

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর এ বাণী এ সকল সুফিদের বক্তব্য প্রত্যাখ্যান করে, যারা বলে, আল্লাহর ওপর বান্দার তাওয়াক্কুল তখনই বিশুদ্ধ হবে, যখন সকালবেলা তার কাছে সম্পদ বা খাবার কিছু থাকবে না, অনুরূপভাবে বিকালও এভাবে কাটাবে। অথচ হাদিসে আছে,

'রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বীয় স্ত্রীদের জন্য এক বছরের খাবার মজুদ রেখেছেন।'[৫]

***

কোনো কোনো সুফি এমনও আছেন, যারা তার মালিকানাধীন সকল প্রকার ধন-সম্পদ সদকা করে মানুষের কাছে হাত পাতে। এর কারণ হচ্ছে, মানুষের চাহিদা অপরিসীম। এ জন্য বুদ্ধিমানরা ভবিষ্যতের জন্য সঞ্চয় করে। হাদিসে আছে, আবু হোসাইন তাদের খনি থেকে এক টুকরো স্বর্ণ নিয়ে আসেন। অতঃপর তা দ্বারা ঋণ পরিশোধের পর কবুতরের ডিম পরিমাণ কিছু স্বর্ণ থেকে গেলে তিনি তা নিয়ে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর এর দরবারে উপস্থিত হয়ে বলেন, ইয়া রাসুলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! আপনি যা ভালো মনে করেন, তদনুযায়ী তা ব্যয় করুন। তিনি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ডান পাশে এলে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুখ ফিরিয়ে নেন। অতঃপর সে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বাম পাশে এলে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুখ ফিরিয়ে নেন। অতঃপর সে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সামনে এলে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর মাথা মোবারক নিচু করে রাখেন। স্বর্ণ গ্রহণের ব্যাপারে তার পীড়াপীড়ির মাত্রা বেড়ে গেলে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার হাত থেকে নিয়ে টুকরোটি এমনভাবে নিক্ষেপ করেন, যদি তার গায়ে আঘাত লাগত, সে নির্ঘাত মৃত্যুবরণ করত।

---

৪ সহিহুল জামে' : হাদিস নং ৮২

৫ সহিহ বুখারি : হাদিস নং ৪০৩৩, সহিহ মুসলিম : হাদিস নং ১৭৫৭

অতঃপর রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে উদ্দেশ্য করে বললেন, তোমাদের কারও অবস্থা তো এমন যে, তার সম্পদের পুরো অংশ সদকা করার পর নিঃস্ব হয়ে মানুষের কাছে হাত পাতে। হে বেকুব! সদকা তো সচ্ছলতার সাথে করতে হয়, আর সদকার সর্বাধিক হকদার হচ্ছে তোমার পরিবার। সুতরাং তাদেরকে দিয়ে শুরু করো।'[১]

أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ، يَقُولُ: " دَخَلَ رَجُلٌ الْمَسْجِدَ، فَأَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَطْرَحُوا ثِيَابًا فَطَرَحُوا، فَأَمَرَ لَهُ بِثَوْبَيْنِ ، ثُمَّ حَثَّ عَلَى الصَّدَقَةِ، فَجَاءَ، فَطَرَحَ أَحَدَ الثَّوْبَيْنِ، فَصَاحَ بِهِ، وَقَالَ: «خُذْ ثَوْبَكَ

'হজরত আবু সাঈদ খুদরি রা. হতে বর্ণিত, একবার জনৈক ব্যক্তি মসজিদে প্রবেশ করল। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মানুষকে কাপড় সদকা করার জন্য উদ্বুদ্ধ করলেন। তারা বেশ কিছু কাপড় সদকা করল। এসব কাপড় থেকে দু'টি কাপড় রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওই ব্যক্তিকে দান করলেন। কিছুক্ষণ পর আবার সদকার জন্য উদ্বুদ্ধ করলেন। তখন ওই ব্যক্তিও কাপড় দু'টি সদকা করে দিল। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তোমার কাপড় নিয়ে নাও।'[২]

***

অনেক সুফি এমন আছেন—যাদের হাতে কোনো মাল থাকলে তারা তা খরচ করে বলেন, আমি আল্লাহ ছাড়া কারও ওপর নির্ভর করতে চাই না। অথচ শরিয়ত সম্পর্কে স্বল্প জ্ঞানের কারণেই তারা এমনটি বলে থাকেন। কেননা তারা মনে করে, তাওয়াক্কুলের অর্থই হচ্ছে আসবাবমুক্ত হওয়া এবং ধন-সম্পদ থেকে দূরে থাকা।

হাফেজ আবু নুয়াইম বলেন, জাফর খুলদি তার কিতাবে লেখেন, আমি জুনাইদ বাগদাদিকে বলতে শুনেছি, আমরা একবার দলবদ্ধ হয়ে আবু ইয়াকুব যাইয়্যাতের বাড়িতে গিয়ে দরজায় কড়া নাড়লে তিনি বললেন, আল্লাহর ইবাদতে কি এমন ব্যস্ততা নেই, যা তোমাদেরকে আমার নিকট আসতে বাধা দেয়? তখন আমি বললাম, আপনার নিকট আমাদের আগমন তো আল্লাহর ইবাদতে ব্যস্ততারই অংশবিশেষ। তখন আমরা তাকে

---

১ [আলবানির মতে হাদিসটি যঈফ] যঈফুল জামে' : হাদিস নং ৬৪০৮

২ সুনানে আবি দাউদ : হাদিস নং ১৬৭৫

তাওয়াক্কুল বিষয়ে জিজ্ঞেস করলে তিনি সাথে থাকা একটি দিরহাম দান করে আমাদেরকে তাওয়াক্কুলের সঠিক বর্ণনা দিয়ে বললেন, আমার কাছে সম্পদ বিদ্যমান থাকাবস্থায় তোমাকে তাওয়াক্কুলের ব্যাখ্যা দিতে আমি লজ্জাবোধ করছি।

গ্রন্থকার বলেন, সুফিরা তাওয়াক্কুলের অর্থই বোঝে না। তাই তারা মাল থেকে পৃথক হয়ে যায়। সাহাবায়ে কেরাম রা. সম্পদ অর্জন করেছেন। এ কথা কি বলা যাবে যে, তাদের তাওয়াক্কুল কম ছিল? তাদের যদি তাওয়াক্কুল না থাকে, তবে আর কার তাওয়াক্কুল থাকবে? হজরত আবু বকর রা. যখন খলিফা নিযুক্ত হন এবং খিলাফতের দায়িত্ব পালনের দরুন ব্যবসা বন্ধ হয়ে যায়, তখন বলেছিলেন, যদি আমার ব্যবসা বন্ধ হয়ে যায়, তবে আমার পরিবারের ভরণ-পোষণ চলবে কীভাবে? হজরত আবু বকর রা. এক্ষেত্রে মালের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেছেন। তাহলে সুফিদের মতে আবু বকর রা. এর কথা (নাউযুবিল্লাহ) তাওয়াক্কুলপরিপন্থী হয়েছে? এটা কখনো হতে পারে না। মাল হলো আসবাব ও উপকরণ। উপকরণ অবলম্বন করার পরও আল্লাহর ওপর তাওয়াক্কুল করতে হবে। আর উপকরণ অবলম্বন তাওয়াক্কুলের পরিপন্থী নয়। অনেক সুফি বলেন, অমুক জিনিস ক্ষতি করেছে—এ কথা বলা ঠিক নয়। কেননা ক্ষতি ও উপকারের মালিক একমাত্র আল্লাহ। আর তারা এ ব্যাপারে একটি ঘটনাকে প্রমাণ হিসেবে উপস্থাপন করে। আবু তালেব রাযি. বলেন, আমি আমার সঙ্গীদের সাথে কোনো এক স্থানে অবস্থান করছিলাম। সেখানকার লোকেরা কিছু দুধ নিয়ে এল এবং আমাকে দুধ পান করতে বলল। আমি বললাম, আমি দুধ পান করব না। কেননা দুধ আমার জন্য ক্ষতিকর। এ ঘটনার চল্লিশ বছর পর আমি একবার মাকামে ইবরাহীমিতে নামায আদায় করে আল্লাহর কাছে দোয়া করে বললাম, হে আল্লাহ! আপনি জানেন, আমি এক মুহূর্তের জন্যও কখনো আপনার সাথে কাউকে শরিক করিনি। তৎক্ষণাৎ এক আওয়াজ এল, দুধের দিন কি শরিক করোনি?

গ্রন্থকার বলেন, এ ঘটনার সত্যতার ব্যাপারে প্রশ্ন রয়েছে। 'অমুক জিনিস ক্ষতিকর'—এর অর্থ হচ্ছে, এটা ক্ষতির কারণ। এর অর্থ এই নয় যে, এটা আল্লাহর হুকুম না হলেও ক্ষতি করতে পারবে। হজরত ইবরাহিম আলাইহিস সালাম বলেছিলেন–

رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ

'মূর্তিরা বহু লোককে পথভ্রষ্ট করে ফেলেছে।'[১]

হাদিসে আছে, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন :

مَا نَفَعَنِيْ مَالٌ كَمَالِ أَبِيْ بَكْرٍ

'আবু বকরের ধন-সম্পদ আমাকে যতটুকু উপকৃত করেছে, অন্য কারও ধন-সম্পদে আমি সেই পরিমাণ উপকৃত হইনি।'[২]

বিশুদ্ধ সনদে বর্ণিত আছে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে খাইবারে জনৈকা ইহুদি মহিলা বিষমিশ্রিত গোশত খাইয়েছিল এবং তার প্রতিক্রিয়া পরেও বাকি ছিল। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলতেন, 'বিষমিশ্রিত লোকমার প্রতিক্রিয়া প্রকাশ পাচ্ছে। এমনকি তা আমার দিলের রগগুলোও কেটে ফেলেছে।'[৩]

এটা সর্বজনবিদিত বিষয় যে, নবুয়তের স্তর সর্বোচ্চ মর্যাদাপূর্ণ স্তর। সকল নবীদের সর্দার রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উপকারকে মালের দিকে আর ক্ষতিকে খাবারের দিকে সম্পৃক্ত করেছেন। সুতরাং তাঁর স্বভাব-চরিত্র ও আচার-ব্যবহারকে ডিঙিয়ে শরিয়তবিরোধী অসার মন্তব্য ও কর্মকাণ্ড সাধনকারীদের ব্যাপারে কোনো তোয়াক্কা করা যাবে না।

সম্পদ ত্যাগের ব্যাপারে সুফিদের মতবাদ

গ্রন্থকার আল্লামা ইবনুল জাওযি রহ. বলেন, ইতোপূর্বে আমরা উল্লেখ করেছি যে, প্রথম যুগের সুফিরা দুনিয়ার প্রতি অনাসক্তির কারণেই ধন-সম্পদ, টাকা-পয়সা জমা করা থেকে বিরত থেকেছেন। এক্ষেত্রে তাদের নিয়ত তথা উদ্দেশ্য ভালো ছিল। তবে উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে তাদের বিচ্যুতি ঘটেছে। পূর্বের বর্ণনাগুলোতে তাদের বিবেকবর্জিত কর্মকাণ্ড থেকে আমরা তা আঁচ করতে পেরেছি। অন্যদিকে পরবর্তী যুগের সুফিদের অবস্থা সম্পূর্ণ বিরপীত ছিল। তারা দুনিয়ার প্রতি ঝুঁকে পড়েছে। বৈধ-অবৈধের বাছ-বিচার ব্যতিরেকে ধন-সম্পদ, টাকা-পয়সা সঞ্চয় ও সংরক্ষণে মনোনিবেশ করেছে। যাতে করে দুনিয়াতে বিলাসী জীবনযাপন ও ভালো করে প্রবৃত্তির অনুসরণ করা যায়। তাদের কারও অবস্থা হচ্ছে এমন—এরা উপার্জনে

---

১ সুরা ইবরাহীম : আয়াত ৩৬

২ জামে' তিরমিযি : হাদিস নং ৩৬৬২, সুনানে ইবনে মাজাহ : হাদিস নং ৯৪, সহিহ মুসলিম : হাদিস নং ২৩৮২

৩ সহিহ বুখারি : হাদিস নং ৪৪২৮

সক্ষম হওয়া সত্ত্বেও কাজ করে না। তারা মসজিদে অথবা উপাসনালয়ে বসে মানুষের সদকার ওপর নির্ভর করে। দরজার কড়া নাড়ার দিকে তাদের মন পড়ে থাকে। অথচ এটা জানা কথা—ধনী ও উপার্জনে সক্ষম ব্যক্তির জন্য সদকা জায়েয নয়। কার কাছ থেকে এই ধন-সম্পদ, টাকা-পয়সা আসছে—এ ব্যাপারে তারা পরোয়া করে না। অত্যাচারী বা ট্যাক্স আদায়কারী তাদের নিকট কিছু পাঠালে তারা তা ফিরিয়ে দেন না। আরও ব্যাখ্যাস্বরূপ বলেন, আমাদের রিযিক তো আমাদের কাছে পৌঁছবেই। অথবা বলে, এ মাল তো আল্লাহর পক্ষ থেকেই এসেছে। সুতরাং তা ফিরিয়ে দেয়া উচিত নয়। অথচ তারা যা করছে, এর সবগুলোই শরিয়তবিরোধী এবং পূর্ববর্তী আকাবিরদের জীবনাচারের বিপরীত। কেননা হাদিসে আছে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন,

الْحَلَالَ بَيِّنٌ، وَالْحَرَامَ بَيِّنٌ، وَإِنَّ بَيْنَ الْحَلَالِ وَالْحَرَامِ مُشَبَّهَاتٍ، لَا يَدْرِي كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ أَمِنَ الْحَلَالِ هِيَ، أَمْ مِنَ الْحَرَامِ، فَمَنْ تَرَكَهَا، اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ

'হালাল ও হারামের বিষয় সুস্পষ্ট। আর এ উভয়ের মাঝে বহু সন্দেহযুক্ত বিষয় বিদ্যমান, অধিকাংশ মানুষ সে বিষয়ে অনবগত। সুতরাং আল্লাহর ভয়ে, এ সব সন্দেহযুক্ত বিষয় যে পরিহার করবে সে তার দীন ও সম্মান রক্ষায় চেষ্টা করল।'[৪]

হজরত আবু বকর রা. সন্দেহযুক্ত খাবার পেটে গেলে বমি করে তা বের করে আনেন। পূর্বেকার মহান মনীষীরা কোনো অত্যাচারীর দান গ্রহণ করতেন না এবং যার ধন-সম্পদ, টাকা-পয়সা সন্দেহযুক্ত—তার দান-অনুদান ও অনুকম্পাও গ্রহণ করতেন না। আবু বকর মারুযী বলেন, আমি আবু আবদুল্লাহর নিকট এক মুহাদ্দিসের আলোচনা তুললে তিনি বললেন, আল্লাহ তার প্রতি রহম করুন—যদি তার মাঝে একটি স্বভাব না থাকত, তাহলে যোগ্যতা ও গুণাবলিতে তিনি থাকতেন অতুলনীয়। অতঃপর কিছুক্ষণ নীরব থাকার পর আমি তাকে বললাম, তিনি কি সুন্নাতের অনুসারী ছিলেন না? তিনি বললেন, আল্লাহ কসম! আমি তাঁর থেকেও হাদিস লিখেছি, কিন্তু তাঁর একটি বদস্বভাব হলো, তিনি কার কার কাছ থেকে ধন-সম্পদ, টাকা-পয়সা গ্রহণ করছেন—এ বিষয়ে ভ্রুক্ষেপ করতেন না।

---

৪ সহিহ বুখারি : হাদিস নং ৫২, সহিহ মুসলিম : হাদিস নং ১৫৯৯

গ্রন্থকার বলেন, আমরা এ বার্তা পেয়েছি যে, জনৈক সুফি কোনো এক আমিরের দরবারে প্রবেশ করে আমিরকে ওয়াজ শোনালে আমির তাকে দানস্বরূপ কিছু সম্পদ বের করে এবং সে তা আগ্রহ-সহকারে গ্রহণ করে। তখন আমির বললেন, আমরা সবাই শিকারি, তবে শিকারের ফাঁদ বিভিন্ন রকম।

***

গ্রন্থকার বলেন, পূর্বেকার যুগের সুফিরা ধন-সম্পদ, টাকা-পয়সা অর্জনের বিষয়ে চিন্তা করতেন এবং তাদের খাবারের বিষয়ে খোঁজ নিতেন। ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল রহ.-কে বিখ্যাত সুফি সাররি সাকতি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন, তিনি হালাল খাদ্য গ্রহণের বিষয়ে একজন প্রসিদ্ধ বুযুর্গ। সাররি সাকতি বলেন, জিহাদের উদ্দেশ্যে আমি এক দলের সাথে শরিক হলাম। তখন আমরা একটি ঘর ভাড়া নিয়ে তাতে আমি একটি চুলা তৈরি করলে আমার সাথিরা সেই চুলার রুটি খেতে ইতস্ততবোধ করে। গ্রন্থকার বলেন, আমি এক সুফির নিকট তার শায়খের সন্ধান চাইলে সে আমাকে বলল, শায়খ তো অমুক আমিরের দরবারে গিয়েছেন। আমির আজ শায়খকে এক সম্মানসূচক পোশাক দ্বারা অভিবাদন জানাবেন, অবশ্য আমিও আমীরের কাছ থেকে এরূপ পোশাক পেয়েছি। অথচ সেই আমির জালেম হিসেবে বেশ প্রসিদ্ধ। তখন আমি বললাম, তোমাদের জন্য আফসোস হয়। তোমরা কেন ব্যবসার উদ্দেশ্যে দোকান খুলছ না? মাথায় পণ্য বহন করে ধন-সম্পদ, টাকা-পয়সা উপার্জন করছ না? উপার্জনে সক্ষম হওয়া সত্ত্বেও কেন তা থেকে বিরত থেকে মানুষের সদকা ও উপঢৌকনের ওপর নির্ভর করছ? কোথা হতে এই ধন-সম্পদ, টাকা-পয়সা আসছে, কে পাঠাচ্ছে—এ ব্যাপারে কিছুরই পরোয়া করছ না? তোমরা দুনিয়ার প্রতি আসক্ত হয়ে রাজা-বাদশা ও ক্ষমতাসীনদের দুয়ারে ঘুরছ এবং তাদের অনুদান লাভের আশায় তাদের কাছে যাচ্ছ? আল্লাহর শপথ! তোমরা ইসলামের গায়ে বিরাট কলঙ্ক লেপন করছ।

***

গ্রন্থকার বলেন, অনেক সুফি শায়খ আছেন—যারা ধন-সম্পদ, টাকা-পয়সার আধিক্য থাকা এবং তা সঞ্চয় ও সংরক্ষণের লোভ অন্তরে থাকা সত্ত্বেও সে দুনিয়াবিমুখিতার দাবি করে। কেউ কেউ আছেন—ধন-সম্পদ, টাকা-পয়সা অঢেল থাকা সত্ত্বেও অভাব প্রকাশ করেন। তারা যাকাত

গ্রহণের ব্যাপারে দুঃস্থ-গরিবদেরকে বাধা দেয় এবং তাদের সাথে ঝগড়া-বিবাদ করে, কিন্তু নিজে তা ভালো করেই জমা করে। আবুল হাসান বুসতামী নামক এক সুফি শীত-গ্রীষ্ম উভয়কালে পশমি পোশাক পরতেন। তার উদ্দেশ্য ছিল, মানুষ যেন তার জুব্বা দ্বারা বরকত পেতে পারে। অথচ এই সুফি মৃত্যুর সময় চার হাজার দিনার রেখে যান।

গ্রন্থকার বলেন, এটা চরম গর্হিত কাজ। হজরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. বলেন, আহলে সুফ্ফার জনৈক ব্যক্তির ইন্তেকাল হলে তার জুব্বার মাঝে দু'টি দিনার পাওয়া যায়। এ বিষয়ে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে অবহিত করা হলে তিনি বললেন, 'এ তো জাহান্নামের দু'টি দাগ।'[১]

পোশাকের ব্যাপারে সুফিদের ওপর শয়তানের চক্রান্ত

গ্রন্থকার আল্লামা ইবনুল জাওযি রহ. বলেন, সুফিরা যখন শুনতে পেল,

كان صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يرقع ثوبه

'রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তালিযুক্ত কাপড় পরিধান করেছেন!'[২]

এবং হজরত আয়েশা রা.-কে বলেছেন,

لَا تَخْلِعِيْ ثَوْبًا حَتّٰى ترقعِيْهِ

'কাপড়ে তালিযুক্ত করার পূর্বে তা পরিধান থেকে বিরত হয়ো না।'[৩]

তারা আরও শুনল যে, হজরত উমর রা. এর কাপড় তালিযুক্ত ছিল। অনুরূপভাবে ওয়াইস কারনী স্বীয় পোশাকে তালি লাগিয়েছেন। তখন সুফিরাও নিজ পোশাকে তালি লাগাতে শুরু করে, যদিও তা নতুন কাপড় হোক না কেন। নতুন কাপড় ছিঁড়ে সেলাই করে নেয়। এটাকে তারা সুন্নত মনে করে। অথচ যাঁদের কথা উল্লেখ করা হয়েছে, তাঁরা অভাবের কারণেই তালি লাগিয়েছিলেন; নতুন কাপড় ছিঁড়ে তালি লাগাননি। মাসলামা ইবনে আবদুল মালেক বলেন, আমি একদিন হজরত ওমর ইবনে আবদুল আযিয রহ. এর ঘরে প্রবেশ করে তাঁকে ময়লা কাপড় পরিহিত অবস্থায় দেখতে

---

১ এ সংক্রান্ত হাদিস ইমাম আহমদ রহ. তাঁর 'মুসনাদ' এ সংকলন করেছেন।

২ মুসনাদে আহমাদ : ৬/১৬৭

৩ জামে' তিরমিযি : হাদিস নং ১৭৮০ [আলবানি রহ. হাদিসটিকে যঈফ বলেছেন]

পেয়ে তাঁর স্ত্রী ফাতেমাকে বললাম, আমিরুল মুমিনিনের জামাটি ধুয়ে দাও। তখন ফাতেমা বলল, আল্লাহর কসম! এ জামা ছাড়া তাঁর অন্য কোনো জামা নেই। সুতরাং জরাজীর্ণ অবস্থা যার পছন্দ নয় এবং যে আর্থিকভাবেও অসচ্ছল নয়, তার জন্য তালিযুক্ত কাপড় পরার কোনো সার্থকতা থাকতে পারে না।

পোশাকের ক্ষেত্রে যুহদ

গ্রন্থকার বলেন, বর্তমান যুগের সুফিদের অবস্থা হচ্ছে, তারা বিভিন্ন রঙের দু'তিনটি কাপড় কিনে সেগুলোর বিভিন্ন স্থানে ফুটো করে তাতে তালি দেয়। সুফিদের এরূপ কাপড় পরিধান করার দু'টি সার্থকতা রয়েছে। ১. মনের খাহেশ পূরণ করা, ২. খ্যাতি অর্জন করা। কারণ এ ধরনের কাপড় পরিধান করলে যাহেদ ও সুফি হিসেবে পরিচিত হওয়া যাবে এবং প্রসিদ্ধি লাভ করা যাবে।

হজরত উমর রা. সম্পর্কে বর্ণিত আছে, তিনি বায়তুল মুকাদ্দাস গমন করলে সেখানকার খ্রিস্টান পুরোহিতরা জিজ্ঞেস করল, তোমাদের আমির কে? তখন সাহাবায়ে কেরাম সেনাদলের আমির আবু ওবায়দা ইবনুল জাররাহ রা., খালিদ ইবনে ওয়ালিদ রা. ও অন্যান্যদেরকে তাদের সামনে পেশ করলে তারা বলল, আমাদের নিকট আমিরের যে বৈশিষ্ট্য বর্ণিত হয়েছে, এরা তো সেই ব্যক্তি নয়। তারা বলল, তোমাদের কি আমির আছেন, নাকি নেই? সাহাবারা বললেন, এরা ছাড়াও আমাদের একজন আমির আছেন। তারা বলল, তিনি কি এসব আমিরদেরও আমির? সাহাবারা বললেন, হ্যাঁ, উনি হজরত উমর ইবনুল খাত্তাব রা.। তারা বলল, তোমরা তাঁকে আসতে বলো, আমরা তাঁকে দেখব। যদি তিনি আমাদের নিকট বর্ণিত গুণের অধিকারী ব্যক্তি হন, তাহলে বিনা যুদ্ধে আমরা বায়তুল মুকাদ্দাস তোমাদের নিকট হস্তান্তর করব। আর যদি তিনি উক্ত গুণের অধিকারী না হন, তাহলে আমরা তোমাদের নিকট তা হস্তান্তর করব না। আর তোমরা যদি আমাদেরকে অবরুদ্ধ করে রাখো, তাহলে কিছুতেই আমাদের সাথে পারবে না। তখন মুসলমানরা হজরত উমর ইবনুল খাত্তাব রা.এর নিকট লোক পাঠিয়ে তাঁকে বিষয়টি জানালে তিনি তাদের সামনে উপস্থিত হন। তখন যে কাপড়টি তাঁর পরনে ছিল, তাতে ছিল সতেরটি তালি—যার একটি ছিল চামড়ার। খ্রিস্টান পুরোহিতরা তাদের কাছে বর্ণিত গুণাবলি হজরত উমর

রা.-এর মাঝে দেখতে পেয়ে বিনা যুদ্ধে বায়তুল মুকাদ্দাস তাঁর কাছে হস্তান্তর করল। কোথায় তিনি আর কোথায় এ যুগের মূর্খ সুফিরা!

***

গ্রন্থকার বলেন, পূর্বেকার মহান মনীষী ও আকাবিররা সাধারণত মধ্যম পর্যায়ের পোশাক পরতেন। তবে ঈদ, জুমা এবং মানুষের সাথে সাক্ষাৎকালে উত্তম পোশাক পরতেন। উত্তম পোশাক পরিধান করা তাঁদের কাছে কোনো নিন্দনীয় বিষয় ছিল না। মুসলিম শরিফের হাদিসে আছে, হজরত উমর রা. একবার মসজিদের কাছে রেখাবিশিষ্ট উত্তম জোড়া (লুঙ্গি-চাদর) বিক্রি হতে দেখে বললেন, ইয়া রাসুলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! আপনি যদি জুমার দিন এবং বহিরাগত প্রতিনিধিদলের সামনে পরিধান করার জন্য এ জোড়াটি খরিদ করে নিতেন, তবে খুবই ভালো হতো। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, এ পোশাক তারাই পরে, যাদের পরকালে কোনো হিস্যা নেই।[১]

উক্ত হাদিসে রেশমি পোশাক হওয়ার কারণে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর অস্বীকৃতি ছিল। নচেৎ হজরত উমর রা. এর কথা দ্বারা উত্তম পোশাক পরিধান করার বৈধতাই নয়; বরং বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে তার শ্রেষ্ঠত্বও প্রমাণিত হয়।

মুহাম্মাদ ইবনে সিরিন রহ. বলেন, তামিম দারি রা. এক হাজার দিরহাম দিয়ে একটি জোড়া (চাদর-লুঙ্গি) ক্রয় করেছিলেন। তিনি তা পরে তাহাজ্জুদ পড়তেন। ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল রহ. প্রায় এক দিনার মূল্যমানের এক একটি কাপড় কিনতেন। এমনইভাবে পূর্বেকার বহু মনীষীর সম্পর্কে বর্ণিত আছে, তাঁরা সাধারণত মধ্যম পর্যায়ের পোশাক পরিধান করতেন আর বাইরে বের হলে উত্তম পোশাক পরতেন।

আহওয়াস বর্ণনা করেন, আমার পিতা বলেছেন, আমি একবার রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর খেদমতে হাজির হলাম। আমার জীর্ণশীর্ণ অবস্থা দেখে জিজ্ঞেস করলেন, তোমার কাছে সম্পদ আছে কি? আমি বললাম, জি হ্যাঁ। জিজ্ঞেস করলেন, কী ধরনের সম্পদ আছে? আমি বললাম, সব ধরনের সম্পদই আছে। আল্লাহ তায়ালা আমাকে উট, ঘোড়া, ছাগল, গোলাম—সকল ধরনের সম্পদই দান করেছেন। তখন রাসুলুল্লাহ

---

১ সহিহ বুখারি : হাদিস নং ৮৮৬, ৩০৫৪, ৫৮৪১, ৫৯৮১, সহিহ মুসলিম : হাদিস নং ২০৬৮

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আল্লাহ তায়ালা যেহেতু তোমাকে সম্পদ দান করেছেন, তাই তোমাকে সম্পদশালী হিসেবে প্রকাশ করা উচিত।

একবার হজরত আলী রা. রবী' ইবনে যিয়াদের অসুস্থতার সংবাদ শুনে তাকে দেখতে গেলেন। রবী' বললেন, আমিরুল মুমিনীন! আমি আপনার কাছে আমার ভাই আসেমের ব্যাপারে একটি অভিযোগ করছি। হজরত আলী রা. জিজ্ঞেস করলেন, কিসের অভিযোগ? রবী' বললেন, আসেম উত্তম পোশাক পরিত্যাগ করে জীর্ণশীর্ণ পোশাক পরছে। ফলে তার স্ত্রী ও সন্তানেরা খুব চিন্তিত হয়ে পড়েছে। হজরত আলী রা. আসেমকে ডেকে তার প্রতি লক্ষ্য করে হাস্যোজ্জ্বল মুখে বললেন, তুমি জানো না যে, আল্লাহ তায়ালা তোমাদের জন্য দুনিয়াকে হালাল করে দিয়েছেন। তিনি তোমার থেকে দুনিয়া ছিনিয়ে নিতে চান না। আল্লাহর কসম! আল্লাহর নেয়ামত কথায় প্রকাশ করার চেয়ে আমার কাছে কাজে প্রকাশ করা অধিক পছন্দনীয়। তখন আসেম বললেন, আমিরুল মুমিনীন! আপনাকে দেখছি, আপনি মোটা কাপড় পরছেন এবং মোটা খাবার খাচ্ছেন। হজরত আলী রা. দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, আসেম! আল্লাহ তায়ালা ন্যায়পরায়ণ ইমামদের ওপর জনসাধারণের অবস্থার সাথে সামঞ্জস্য বজায় রেখে চলা আবশ্যক করে দিয়েছেন, যাতে দারিদ্র্য বেড়ে না যায়।

যদি কেউ মনে করে যে, উত্তম পোশাক পরাতে নফসানি খাহেশ পূরণ করা হয় অথচ নফস দমন করার চেষ্টা করা জরুরি। অনুরূপভাবে উত্তম পোশাক পরে সাজসজ্জা করা রিয়ার অন্তর্ভুক্ত। আর রিয়া বা লৌকিকতা চরম গর্হিত কাজ। এর জবাবে বলা যাবে—নফসের যে কোনো খাহেশ পূরণ করা নিন্দনীয় নয়। নিন্দনীয় তো সেটি, যা শরিয়তে নিষিদ্ধ এবং দীনের জন্য ক্ষতিকর। অনুরূপভাবে যে কোনো সাজসজ্জা নিন্দনীয় নয়। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আয়না দ্বারা মুখ দেখেছেন এবং মাথার চুলে সিঁথি কেটেছেন। দাড়ি আঁচড়িয়েছেন।

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: " كَانَ نَفَرٌ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْتَظِرُونَهُ عَلَى الْبَابِ فَخَرَجَ يُرِيدُهُمْ، وَفِي الدَّارِ رَكْوَةٌ فِيهَا مَاءٌ، فَجَعَلَ يَنْظُرُ فِي الْمَاءِ وَيَسْرِي شَعْرَهُ وَلِحْيَتَهُ ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَأَنْتَ تَفْعَلُ

هَذَا؟ قَالَ: «نَعَمْ، إِذَا خَرَجَ الرَّجُلُ إِلَى إِخْوَانِهِ فَلْيُهَيِّئْ مِنْ نَفْسِهِ، فَإِنَّ اللَّهَ جَمِيلٌ يُحِبُّ الْجَمَالَ

হজরত আয়েশা রা. বলেন, কিছু লোক ঘরের বাইরে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর জন্য অপেক্ষা করছিল। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘর থেকে বের হওয়ার সময় ওই পাত্রে চেহারা দেখে মাথার চুল ও দাড়ি মোবারক বিন্যস্ত করেন। আমি জিজ্ঞেস করলাম, ইয়া রাসুলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! আপনিও এমন করেন। উত্তরে বললেন, নিজ ভাইদের কাছে গেলে সেজেগুজে যাওয়া উচিত। কেননা আল্লাহ তায়ালা সুন্দর, তিনি সৌন্দর্যকে ভালোবাসেন।'[১]

মুহাম্মাদ ইবনে আবদুর রহমান হতে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর একটি ইয়ামেনী চাদর ও একটি ওমানী লুঙ্গি ছিল। এ দু'টি কাপড় তিনি জুমা ও ঈদের দিন পরিধান করতেন। পরে ভাঁজ করে রেখে দিতেন।

পানাহারের ব্যাপারে সুফিদের ওপর শয়তানের চক্রান্ত

গ্রন্থকার বলেন, প্রথম যুগের সুফিদেরকে শয়তান এমন চক্রান্তের জালে আটকিয়েছে যে, তাদেরকে শুকনা ও মোটা খাবার খেতে বাধ্য করেছে। তারা ঠান্ডা পানি পান করত না। তবে পরবর্তী সুফিদের ক্ষেত্রে শয়তান তার কৌশল পরিবর্তন করেছে। এতে করে সুফিরা কষ্ট-মুজাহাদা থেকে বিতৃষ্ণ হয় এবং অধিক আহার ও বিলাসী জীবনযাপনে তারা অভ্যস্ত হয়ে পড়ে।

পানাহারের ব্যাপারে প্রথম যুগের সুফিদের কিছু কর্মকাণ্ড ও তার জবাব

গ্রন্থকার আল্লামা ইবনুল জাওযি রহ. বলেন, অনেক সুফি কয়েক দিন ধরে না খেয়ে থাকত। আবার কেউ কেউ প্রতিদিন অল্প অল্প করে কিছু খেত, যাতে জীবন টিকে থাকে। সাহাল ইবনে আবদুল্লাহ শুরুর দিকে এক দিরহাম মূল্যের খেজুরের রস, এক দিরহাম মূল্যের ঘি ও এক দিরহাম

---

১ [মুনকার] হাদিসটির শেষাংশ সহিহ মুসলিমের হাদীসে দ্বারা প্রমাণিত

মূল্যের আটা এক সাথে মিশিয়ে তিনশ ষাট ভাগ করে রেখে দিতেন। প্রতিদিন সন্ধ্যায় এক এক ভাগ দ্বারা ইফতার করতেন। আবু হামেদ তুসি বর্ণনা করেন, সাহাল ইবনে আবদুল্লাহ দীর্ঘদিন শুধু গাছের পাতা খেয়ে দিনাতিপাত করতেন। এরপর শুধু ভুসি খেয়ে দিন কাটাতেন। গোটা বছর তিনি মাত্র তিন দিরহাম মূল্যের খাদ্য গ্রহণ করেছেন।

আবু জাফর হাদ্দাদ বলেন, একবার আমি এক পানির হাউজের তীরে উপবিষ্ট ছিলাম। এমতাবস্থায় আমার কাছে আবু তুরাব এসে উপস্থিত। আমি ষোলদিন যাবৎ কিছুই খাইনি। সে আমাকে জিজ্ঞেস করল, তোমার কী অবস্থা? তুমি এখানে বসে আছ কেন? উত্তরে আমি বললাম, ইলম ও ইয়াকিনের শ্রেষ্ঠত্বের পরীক্ষা চালাচ্ছি। দেখব কোন্‌টি জয়ী হয়। যে জয়ী হবে, আমি তারই অনুসরণ করব। আবু তুরাব বলল, অচিরেই তুমি উচ্চ মর্যাদার অধিকারী হতে পারবে।

ইবরাহিম ইবনে বান্না বাগদাদি বলেন, আমি একবার আখইয়াম থেকে ইস্কান্দরিয়া পর্যন্ত যুন্নুন মিসরির সাথে ছিলাম। পথিমধ্যে ইফতারের সময় হলে আমি রুটির টুকরো ও লবণ বের করে তার কাছে গিয়ে বললাম, আসুন, ইফতার করুন। তিনি বললেন, তোমার লবণ কি পেষা ও চূর্ণিত? আমি বললাম, হ্যাঁ। তিনি বললেন, তুমি সফল হতে পারবে না। অতঃপর আমি তার খাদ্য-থলে সন্ধান করে দেখি, সামান্য কিছু যবের ছাতু আছে। তিনি ওই ছাতুটুকু খেয়ে নিলেন।

সাহাল ইবনে আবদুল্লাহ বলতেন, আমি মানুষের জন্য আল্লাহর হুজ্জত বা প্রমাণ। তাকে জিজ্ঞেস করা হলো কীভাবে? তিনি বললেন, আমি হালাল খাদ্য গ্রহণ করি। এসো আমরা সবাই মিলে হালাল খাবার চিনে নিই। তাঁকে জিজ্ঞেস করা হলো, আপনি কি হালাল খাবার চিনে নিয়েছেন? তিনি বললেন, হ্যাঁ। জিজ্ঞেস করা হলো কীভাবে চিনতে পারলেন? তিনি বললেন, আমি আপন জ্ঞান, মারেফত ও শক্তিকে সাত ভাগ করি এবং এভাবে রেখে দিই। যখন কেবল একটি অবশিষ্ট থাকে, আর ছয়টিই বিলীন হয়ে যায়, তখন একটিও হয়তো বিলীন হয়ে যাবে এবং মৃত্যু এসে যাবে—এ আশঙ্কায় তাকে বেঁচে রাখা পরিমাণ খাবার দিই, যাতে ওই ছয়টিও ফিরে আসে।

আবু আবদুল্লাহ ইবনে মুফলিহ তার পিতার সূত্রে বর্ণনা করেন, আমাকে আবু আবদুল্লাহ ইবনে যায়েদ বলেছেন, আমি আজ চল্লিশ বছর যাবৎ এমন

অবস্থায় উপনীত হওয়ার আগে খাদ্য গ্রহণ করি না, যে অবস্থায় উপনীত হলে শরিয়ত মৃত প্রাণী খাওয়ার অনুমতি দেয়।

ঈসা ইবনে আদম বলেন, জনৈক ব্যক্তি সুফি আবু ইয়াযিদের কাছে এসে বলল, জনাব! আমি আপনার এ স্থানে বসতে চাই। মেহেরবানি করে একটু অনুমতি দিন। আবু ইয়াযিদ বলল, তুমি এ স্থানের যোগ্য নও। সে আবারও অনুরোধ জানালে আবু ইয়াযিদ তাকে অনুমতি দেন। একদিন অনাহারে থাকার পর দ্বিতীয় দিন বলল, জনাব! আমার খাদ্যের প্রয়োজন। আবু ইয়াযিদ বলল, বৎস! আমাদের এখানে খাদ্য হলো আল্লাহর যিকির। সে বলল, তাহলে আমাকে এমন জিনিস দান করুন, যা দ্বারা আমার দেহ টিকে থাকে এবং সর্বদা আল্লাহর ইবাদত করতে পারি। আবু ইয়াযিদ বলল, বৎস! দেহ আল্লাহর যিকির দ্বারাই টিকে থাকবে।

ইবরাহিম খাওয়াস বলেন, আবু তুরাবের সাহচর্য লাভ করেছে—এমন এক ব্যক্তি আমার নিকট বর্ণনা করেছেন, একদিন আবু তুরাব জনৈক সুফিকে তরমুজের খোসার দিকে হাত বাড়াতে দেখে বলল, তুমি তাসাওউফের যোগ্য নও, এখনই তোমার বাজারে চলে যাওয়া উচিত।

আবুল কাসেম কিরওয়ানী বলেন, আমার এক সাথিকে বলতে শুনেছি, আবুল হাসান নাসিবী হারাম শরিফে কিছু সাথি নিয়ে অবস্থান করেন। তাঁরা সাতদিন অনাহারে থাকার পর এক সাথি পবিত্রতা অর্জনের উদ্দেশ্যে বের হয়ে সামনে এক তরমুজের খোসা দেখতে পেয়ে সেটি উঠিয়ে ভক্ষণ করলে এক লোক তা দেখে ফেলে। তখন লোকটি আরও কিছু তরমুজের খোসা তার সামনে হাজির করলে সে তা নিয়ে সাথিদের সামনে বিনয়ের সাথে পেশ করে। খোসা দেখে শায়খ আবুল হাসান নাসিবী বললেন, তোমাদের কে এই অপরাধ করেছে? সে তখন বলল, আমি। আবুল হাসান বললেন, যাও, তুমি তোমার অপরাধসহ থেকে যাও এবং এ খাবার সামলিয়ে রাখো। শায়খ আবুল হাসান নাসিবী তার সাথিদের নিয়ে হারাম শরিফ থেকে বের হলে সে লোকটিও তাদের অনুসরণ করে। তখন শায়খ নাসিবী বলেন, আমি কি তোমাকে তোমার অপরাধের সাথেই থাকতে বলিনি? লোকটি বলল, আমার অপরাধ থেকে আমি আল্লাহর কাছে তাওবাহ করেছি। পরে শায়খ বললেন, তাওবাহ করলে আমাদের সাথে থাকতে পার।

বুনান ইবনে মুহাম্মাদ বলেন, আমি মক্কায় হারাম শরিফে অবস্থান করছিলাম। সেখানেই ইবরাহিম খাওয়াসের সাথে সাক্ষাৎ হয়। লাগাতার

কয়েকদিন আমি অনাহারে ছিলাম। মক্কায় মুযাইন নামক এক ক্ষৌরিক ছিল। সে ফকিরদেরকে অত্যন্ত ভালোবাসত। যে কোনো ফকির তার কাছে শিঙ্গা লাগাতে গেলে তাকে সে গোশত ও রুটি খাইয়ে দিত। আমিও শিঙ্গা লাগানোর জন্য তার কাছে গেলাম। সে গোশত কিনে রুটি তৈরি করার নির্দেশ দিয়ে আমার শিঙ্গা লাগানোর কাজ শুরু করল। তখন আমার নফস আমাকে বলতে লাগল, রুটি গোশত রান্না হচ্ছে। শিঙ্গা লাগানোর কাজ থেকে অবসর হলেই মজা করে রুটি-গোশত খেতে পারবে। তৎক্ষণাৎ আমার চৈতন্য ফিরে আসে। আমি মনে মনে আল্লাহর সাথে অঙ্গীকার করে ফেললাম যে, ক্ষৌরিকের খাবার হতে বিন্দুমাত্রও আমি খাব না। কাজ সমাপ্ত হলে আমি ওঠে চলে আসতে লাগলাম। ক্ষৌরিক বলল, এ কী করছেন? আমার রীতি সম্পর্কে আপনি জানেন না? আমি বললাম, আমি কিছুই খাব না—এ ব্যাপারে আল্লাহর সাথে আমি অঙ্গীকারবদ্ধ। এর পর আমি হেরেম শরিফে চলে এলাম। ওই দিন খাওয়ার কিছুই মেলেনি। পরের দিনও আসর পর্যন্ত কিছু না খেয়ে কেটে গেল। আসরের নামাযের জন্য বের হলে হঠাৎ বেহুঁশ হয়ে মাটিতে পড়ে যাই। মানুষে এসে আমার কাছে ভিড় করল। ইবরাহিম খাওয়াসও এলেন। তিনি আমার কাছে বসে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কিছু খাবে কি? আমি বললাম, এখন তো রাত ঘনিয়ে এসেছে। ইবরাহিম বলল, হ্যাঁ। শাবাশ, এ অবস্থার ওপরই অটল থাকো, তাহলে নাজাত পাবে। অতঃপর ইবরাহিম খাওয়াস ওঠে চলে গেলেন। এশার নামাযের পর তিনি আমার জন্য দু'টি রুটি ও এক পেয়ালা মসুরের ডাল হাতে করে নিয়ে এলেন। আমি সেগুলো খেলাম। তারপর তিনি জিজ্ঞেস করলেন, আরও ক্ষুধা আছে কি? আমি বললাম, হ্যাঁ। তিনি আরও এক পেয়ালা ডাল ও দু'টি রুটি নিয়ে এলেন। আমি সেগুলো খেয়ে বললাম, এবার পেট ভরে গেছে। খানা খাওয়ার পর ঘুমিয়ে গেলাম। ভোর পর্যন্ত ঘুমালাম। ওই রাতে কোনো নামাযও পড়িনি, তাওয়াফও করিনি।

মানসূর ইবনে আবদুল্লাহ বলেন, আমি আবু আলী রুযবারীকে বলতে শুনেছি, কোনো সুফি যদি পাঁচদিন উপবাসের পর বলে যে, আমি ক্ষুধার্ত, তাহলে তাকে জোরপূর্বক বাজারে পাঠিয়ে রুজি উপার্জনের নির্দেশ দাও।

ইবনে বাকুইয়া বলেন, আমি আবু আহমদ সগীরকে বলতে শুনেছি, আবু আবদুল্লাহ খাফিফ আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন, আমি যেন তাকে ইফতার করার জন্য প্রতিরাতে তার সামনে দশটি কিশমিশ উপস্থিত করি। আমি অনুগ্রহ করে এক রাতে তার জন্য পনেরটি কিসমিস পেশ করলে তিনি

আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, তোমাকে এ নির্দেশ কে দিয়েছে? তিনি তা হতে কিশমিশের দশটি দানা খেয়ে অবশিষ্টগুলো রেখে দেন।

আবদুল্লাহ ইবনে খাফিফ বলেন, আমি যখন মুবতাদী তথা তাসাওউফের প্রাথমিক পর্যায়ে ছিলাম, তখন চল্লিশ মাস এভাবে কেটেছে যে, রাতে শুধু এক মুষ্টি ছাতু দ্বারা ইফতার করতাম। একদিন আমি শিঙ্গা লাগালাম। শরীর থেকে কেবল কিছু পানি বের হলো। ক্ষৌরিক বলল, এমন রক্তশূন্য শরীর আর কখনো দেখিনি।

পানি পান ও গোশত ভক্ষণের ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা

গ্রন্থকার বলেন, সুফিদের এক সম্প্রদায় গোশত খায় না। তারা বলে, এক টুকরো গোশত খেলে চল্লিশ দিন পর্যন্ত অন্তর কঠিন হয়ে থাকে। অনেকে আবার উন্নতমানের খাবার থেকে নিজেদেরকে দূরে রাখত। প্রমাণ হিসেবে তারা পেশ করে : হজরত আয়েশা রা. হতে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,

أحرموا أنفسكم طيب الطعام فانما قوي الشيطان أن يجري في العروق بها

'তোমরা উন্নতমানের খাদ্য থেকে নিজেদেরকে বিরত রেখো। কেননা এ ধরনের খাদ্যগ্রহণের কারণে শয়তান মানুষের শিরা-উপশিরায় বিচরণের শক্তি পায়।'[১]

তাদের অনেকে আবার ঠন্ডা পানি পান করেন না। তারা এক কলস পানি ভরে মাটির নীচে রেখে দেয়। পরে সেই পানি গরম হলে তা পান করে। আবার কেউ কেউ স্বচ্ছ পানি পান করত না। কেউ আবার দীর্ঘ সময় পানি পান হতে বিরত থেকে নিজেকে কষ্টের মাঝে পতিত করত।

ঈসা ইবনে মুসা বোস্তামি তার পিতার সূত্রে বর্ণনা করে বলেন, আমি আমার চাচা আবু ইয়াযিদের খাদেমকে বলতে শুনেছি, মানুষ সাধারণত যা খায়, আমি চল্লিশ বছর যাবৎ তা ভক্ষণ করিনি। আমি একবার আমার নফসকে আমার জন্য কল্যাণকর বিষয় পালনের আহ্বান জানালে নফস তা প্রত্যাখ্যান করে। তাই আমি এক বছর যাবৎ পানি পান না করার প্রতিজ্ঞা করে এক বছর ধরে পানি পান থেকে বিরত থাকি।

---

১ [মাউযূ'] আলবানি রহ. প্রণীত 'আস্‌সিলসিলাতুস যঈফাহ' : ১৮৭৯

আবু হামেদ গাযালি বলেন, আমি আবু ইয়াযিদকে বলতে শুনেছি, আমি আমার নফসকে আল্লাহর নির্দেশ পালনের আহ্বান জানালে নফস তা প্রত্যাখ্যান করে। তাই আমি নফসের ওপর ক্ষুব্ধ হয়ে এক বছর পানি পান না করার ও এক বছর বিশ্রাম না করার প্রতিজ্ঞা করলে আমার প্রতিজ্ঞা পূরণ করা সম্ভব হয়।

***

গ্রন্থকার বলেন, আবু তালেব মক্কি সুফিদের জন্য খাবারের নিয়ম বাতলিয়ে বলেন, শিষ্য ও মুরিদানদের জন্য মুস্তাহাব হলো—রাত-দিন দু'টি রুটির বেশি না খাওয়া। অনেক সুফি মেপে মেপে আহার গ্রহণ করেন এবং প্রতিদিন খাবারের পরিমাণ অল্প অল্প করে কমাতে থাকেন। এদিকে আবার অনেকে শুরুতে দিনে একবার খাদ্য গ্রহণ করেন, পরে কিছুদিন অতিবাহিত হলে দু'দিন পর একবার খাবার খেয়ে থাকেন—এভাবে ধীরে ধীরে তাদের খাবারের তালিকা হ্রাস পেতে থাকে। তাঁদের বক্তব্য হলো, ক্ষুধা অন্তরের রক্ত হ্রাস করে মনকে সাদা করে। আর মন সাদা হলে তাতে নূর বিরাজ করে। এছাড়াও ক্ষুধা মনের চর্বি গলায়। এতে মন নরম হয়। আর মন নরম হলে আল্লাহর মারেফতের পথ খুলে যায়।

গ্রন্থকার বলেন, সুফিদের জন্য আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মাদ ইবনে আলী তিরমিযি *রিয়াযাতুন্‌নুফূস* নামে একটি গ্রন্থ রচনা করেন। এতে তিনি লেখেন—তাসাওউফের নবীন শিক্ষানবীশদের উচিত হলো, আল্লাহর কাছে তাওবাহস্বরূপ একাধারে দুই মাস রোযা রাখা। অতঃপর রোযা পরিহার করে প্রতিদিন অল্প পরিমাণে আহার করা। আরও উচিত—তারা তরকারি, ফলমূল, সুস্বাদু খাবার, সাথিদের সাথে উঠাবসা ও কিতাব অধ্যয়ন পরিহার করবে। কেননা এতে নফস প্রভাবিত হয়ে গাফেল হয়ে পড়ে।

উল্লেখিত কর্মকাণ্ডের অসারতা বিষয়ক প্রমাণপঞ্জি

গ্রন্থকার বলেন, সাহাল ইবনে আবদুল্লাহর যে রীতি উপরে বর্ণনা করা হয়েছে, তা শরিয়াসমর্থিত নয়। কেননা সে তার ধারণক্ষমতার বাইরের বস্তুকে নিজের জন্য জরুরি মনে করে নিয়েছে। এছাড়া আল্লাহ তায়ালা রিযিকস্বরূপ মানুষকে গম দ্বারা সম্মানিত করেছেন। এর খড়কুটো চতুষ্পদ জন্তুর জন্য নির্ধারণ করেছেন। অতএব মানুষের জন্য খড়কুটো ভক্ষণ করে জীব-জন্তুর সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা বেমানান। আবু হামেদ গাযালি রহ.

সাহাল ইবনে আবদুল্লাহ থেকে তার মতামত তুলে ধরে বলেন, ক্ষুধার তীব্রতায় যে ব্যক্তি দুর্বল হয়েছে তার বসে নামায পড়া ওই ব্যক্তির দাঁড়িয়ে নামায থেকে উত্তম, যে খাদ্য গ্রহণের কারণে দাঁড়াতে পেরেছে।

গ্রন্থকার বলেন, উপরোক্ত মন্তব্য সম্পূর্ণ ভুল। আহার করে যদি দাঁড়ানো সম্ভব হয়, তাহলে তার আহার করাও ইবাদত হিসেবে গণ্য। কেননা আহার করলে মানুষ ইবাদত করতে সক্ষম হয়। কেউ যদি খাদ্য গ্রহণে সক্ষম হওয়া সত্ত্বেও আহার করা থেকে বিরত থাকার দরুন ক্ষুধার যন্ত্রণায় বসে নামায পড়ে, তাহলে তার পানাহার থেকে বিরত থাকা ফরয ছেড়ে দেয়ার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। তাই খাদ্য গ্রহণে সক্ষম থাকলে, তা পরিহার করা শরিয়তে নিষেধ। ক্ষুধার তীব্রতায় মানুষের জন্য মৃত প্রাণী ভক্ষণ ত্যাগ করাও জায়েয নয়। সুতরাং এমন পরিস্থিতিতে হালাল খাবার ত্যাগ করা তার জন্য কী করে বৈধ হতে পারে?

জাফর হাদ্দাদ বলেছে—'ইলম ও ইয়াকিনের শ্রেষ্ঠত্বের পরীক্ষা চালাচ্ছি। দেখব কোন্‌টি জয়ী হয়। যে জয়ী হবে, আমি তারই অনুসরণ করব'—এটা মারাত্মক মূর্খতাজনিত কথা। কেননা ইলম ও ইয়াকিনের মাঝে কোনো ব্যবধান নেই। ইলমের সর্বোচ্চ স্তরের নামই 'ইয়াকিন'। আর ক্ষুধার্ত হলে খাবার-দাবার বর্জনের কথা ইলম বা ইয়াকিনের কোথাও নেই। এরা এমন দল—যারা নিজেদের আবিষ্কৃত বিষয়ে কঠিনকে বেছে নিয়েছে। এদের কঠোরতা কুরাইশদের মতো। এই কঠোরতার কারণেই কুরাইশদেরকে 'হুমস' বলা হয়। তারা মৌলিক বিষয়কে অস্বীকার করে শাখাগত বিষয়ে কঠোরতা অবলম্বন করেছে। যুন্নুন মিসরির কথা—'তোমার লবণ কি পেষা ও চূর্ণিত? আমি বললাম, হ্যাঁ। তিনি বললেন, তুমি সফল হতে পারবে না'—এটা নিতান্তই অমূলক মন্তব্য। কেননা শরিয়তে যা বৈধ, তাকে কীভাবে নিন্দার চোখে দেখা যায়? এছাড়া যবের ছাতু খেয়ে যে দিনাতিপাত করে, সেটা তো মানুষের শরীরে কুলানজা রোগ সৃষ্টির কারণ। যে ব্যক্তি বলে, মধু দ্বারা মাখন খাওয়া অপচয়—তার এ কথাকে শরিয়ত সমর্থন করে না। কেননা এ বিষয়ে শরিয়তে অনুমতি রয়েছে। সহিহ সনদে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণিত আছে :

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كَانَ يَأْكُلُ الْقِثَّاءَ بِالرُّطَبِ

তিনি খেজুর দ্বারা শশা খেতেন।'[১]

---

১ সহিহ বুখারি : হাদিস নং ৫৪৪০, ৫৪৪৭, ৫৪৪৯, সহিহ মুসলিম : হাদিস নং ২০৪৩

كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يُحِبُّ الحَلْوَاءَ وَالعَسَلَ

'মিষ্টিজাতীয় দ্রব্য ও মধু খেতে ভালোবাসতেন।'[১]

সাহাল ইবনে আবদুল্লাহর কথা—'আমি আপন জ্ঞান, মারেফত ও শক্তিকে সাত ভাগ করি'—তার এ কাজ নিন্দনীয়। কেননা তা শরীয়তসমর্থিত নয়; বরং তা হারামের কাছাকাছি। কেননা এটা নিজের প্রতি জুলুমের নামান্তর, এতে দেহের হক আদায় হয় না। আবু আব্দুল্লাহ ইবনে যায়েদ বলেছেন, 'আমি আজ চল্লিশ বছর যাবৎ এমন অবস্থায় উপনীত হওয়ার আগে খাদ্য গ্রহণ করি না, যে অবস্থায় উপনীত হলে শরিয়ত মৃত প্রাণী খাওয়ার অনুমতি দেয়'—ইসলাম এ ধরনের কর্মকাণ্ডকে সমর্থন করে না। অদ্ভুত ও বিকৃত চিন্তার কারণে সে এমনটি করা দুঃসাহস পেয়েছে। বৈধ খাবার উপস্থিত থাকা সত্ত্বেও তা ত্যাগ করা জুলুমের নামান্তর। আবু ইয়াযিদ বলেছেন, 'যিকিরই আমাদের খাদ্য'—এটি তার বানোয়াট মতবাদ। কেননা খাবারের মুখাপেক্ষী করেই আল্লাহ তায়ালা দেহকে সৃষ্টি করেছেন। এমনকি দোযখবাসী দোযখের ভেতরে খাবারের মুখাপেক্ষী হবে এবং খাদ্যের সন্ধান করবে। ওপরের ঘটনায় দীর্ঘদিন ক্ষুধার্ত থাকার পর তরমুজের খোসা খাওয়ার ওপর আবুল হাসান নাসিবী নিন্দা ও হঠকারী সিদ্ধান্ত শরিয়ত সমর্থন করে না। যে ব্যক্তি সাতদিন খাবার-দাবার থেকে দূরে থেকেছেন—ইসলাম সেটাকেও সমর্থন করে না। তদ্রূপ শিঙ্গা লাগানোর সময় যে ব্যক্তি অঙ্গীকার করেছে যে, আমি খাব না, ফলে সে দুর্বল হয়ে বেহুঁশ হয়ে পড়েছে—তার এহেন কর্মকাণ্ডকেও শরিয়ত নিন্দা জানায়। অনুরূপভাবে যে তাকে বলেছে, 'শাবাশ, এ অবস্থার ওপরই অটল থাকো, তাহলে নাজাত পাবে।' তার এ কথা মারাত্মক ভ্রষ্টতা। কেননা এমন পরিস্থিতিতে তার উচিত ছিল, তাকে আহার করানো, যদিও তা রমযান মাস হোক। কেননা শরিয়তের বিধানমতে, যে ব্যক্তি কয়েকদিন রোযা রাখার ফলে দুর্বল হয়েছে এবং শিঙ্গা লাগানোর পর চৈতন্যশক্তি লোপ পেয়েছে, তার জন্য রোযা রাখা বৈধ নয়। হাদিসে আছে : হজরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর রা. হতে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, 'যে ব্যক্তি রমযানে ভীষণ ক্লান্ত হবে, সে যদি রোযা না ভাঙ্গে এবং সে কারণে তার মৃত্যু ঘটে, তাহলে সে জাহান্নামে প্রবেশ করবে।'[২]

---

১ সহিহ বুখারি : হাদিস নং ৫৪৩১, সহিহ মুসলিম : হাদিস নং ১৪৭৪

২ হাদিসটির সনদ দুর্বল। তারিখে বাগদাদ : ১০/২৭০।

গ্রন্থকার বলেন, আরেকটি বিশুদ্ধ সনদেও আছে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, 'যে ব্যক্তি রমযানে ভীষণ ক্লান্ত হবে, সে যদি রোযা না ভাঙ্গে এবং সে কারণে তার মৃত্যু ঘটে, তাহলে সে জাহান্নামে প্রবেশ করবে।'

গ্রন্থকার বলেন, ইবনে খাফিফের অল্প আহারের ঘটনা শরিয়তের দৃষ্টিতে খুবই নিন্দনীয় কাজ। শরিয়তের বিষয়ে অজ্ঞ ব্যক্তিরা এমন অমূলক মন্তব্য করতে পারে। গোশত ভক্ষণ থেকে বিরত থাকা হিন্দু ও বৌদ্ধদের কাজ—যারা প্রাণী হত্যা অবৈধ মনে করে। অথচ কোন খাবার মানুষের জন্য কল্যাণকর, সে বিষয়ে আল্লাহ তায়ালাই ভালো জানেন। তাই মানুষের শরীরকে শক্তিশালী করার জন্য তিনি গোশত ভক্ষণ হালাল করেছেন। হাদিসে আছে : 'রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গোশত খেতেন এবং ছাগলের রান পছন্দ করতেন।'[৩]

'রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদিন আয়েশা রা. এর ঘরে প্রবেশ করলে তাঁর সামনে ঘরের স্বাভাবিক খাবার পেশ করা হলে তিনি বললেন, আমি তো ঘরের পাতিল থেকে গোশতের ঘ্রাণ পাচ্ছি।'[৪]

হযরত হাসান বসরি রহ. প্রতিদিন গোশত কিনতেন। আমাদের পূর্বসূরি মনীষীগণ এমনই ছিলেন। তবে যাঁরা তাঁদের মাঝে দরিদ্র ছিলেন এবং অভাবের কারণে গোশত খেতে পারতেন না—তাঁদের কথা ভিন্ন। আল্লাহ তায়ালা মানবজাতিকে উষ্ণতা, শীতলতা, শুষ্কতা ও আর্দ্রতার মাধ্যমে সৃষ্টি করেছেন। রক্ত, কফ, হলুদপিত্ত ও কালোপিত্তের ভারসাম্যের ওপর তার সুস্থতা নির্ভরশীল করেছেন। তাই শরীরের কোনো দেহরস বৃদ্ধি পেলে শরীর এমন খাদ্যের মুখাপেক্ষী হবে, যা বেড়ে যাওয়া দেহরসকে নিয়ন্ত্রণে আনবে। সুতরাং শরীর কোনো খাদ্যের প্রয়োজন অনুভব করলে তা তাকে না দেয়া শরীরকে ক্ষতিগ্রস্ত করার শামিল। আল্লাহর সৃষ্টি-প্রকৃতি এটা কামনা করে না। এটা শরিয়ত ও বিবেকবর্জিত কাজ।

***

৩ সহিহ বুখারি : হাদিস নং ৩৩৪০

৪ সহিহ বুখারি : হাদিস নং ৫০৯৭

গ্রন্থকার বলেন, বেশি খাবার অধিক তৃপ্তি-সহ খাওয়া নিন্দনীয়। খাদ্য গ্রহণের সর্বোত্তম পন্থা হলো—যা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, সেটা।

হজরত মিকদাদ ইবনে মাদিকারিব রা. বলেন, আমি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছ থেকে শুনেছি,

مَا مَلَأَ آدَمِيٌّ وِعَاءً شَرًّا مِنْ بَطْنٍ بِحَسْبِ ابْنِ آدَمَ أُكُلَاتٌ يُقِمْنَ صُلْبَهُ فَإِنْ كَانَ لَا مَحَالَةَ فَثُلُثٌ طَعَامٌ وَثُلُثٌ شَرَابٌ وَثُلُثٌ لِنَفَسِهِ

'আদমসন্তান যেসব পাত্র পূর্ণ করে, তার মধ্যে নিকৃষ্ট হলো—খাবার দ্বারা উদর পূর্ণ করা। এ পরিমাণ খাদ্য গ্রহণই মানুষের জন্য যথেষ্ট—যা তার মেরুদণ্ড সোজা রাখতে পারে। যদি সে এতে সন্তুষ্ট না হয়, তাহলে পেটের এক-তৃতীয়াংশ খাদ্য দ্বারা ও এক-তৃতীয়াংশ পানি দ্বারা পূর্ণ করবে এবং এক তৃতীয়াংশ শ্বাস-প্রশ্বাসের জন্য খালি রাখবে।'[১]

সুফিবাদ ও ক্ষুধা

গ্রন্থকার বলেন, সুফিরা শুধু অল্পবয়স্ক ও তাসাওউফে নবীন শিক্ষানবীশদেরকে কম খাওয়ার নির্দেশ প্রদান করে বেড়ায়। অথচ যুবকদের জন্য ক্ষুধা যথেষ্ট ক্ষতিকর। কেননা বৃদ্ধ ও পরিণত বয়সের লোকেরা ক্ষুধার যন্ত্রণা সহ্য করতে পারে। এর কারণ হলো, যৌবনের তেজ খুব তীব্র। তাই যুবকদের হজমশক্তি ভালো হওয়ার কারণে পেট দ্রুত খালি হয়ে যায়। নতুন বাতি যেমন অধিক তেলের মুখাপেক্ষী, তদ্রূপ তারা বেশি খেতে চায়।

গ্রন্থকার বলেন, খুব কম খাবার গ্রহণের কারণে শরীর দুর্বল হয়ে যায় বলে আলেমগণ অভিমত দিয়েছেন। ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল রহ.-কে উকবা বিন মুকাররম জিজ্ঞেস করলেন, লোকেরা খুব কম আহার করে এবং অন্নসংস্থানে উদাসীন থাকে, এ ব্যাপারে আপনার মতামত কী? জবাবে তিনি বলেন, তাদের এ বিষয়টি আমার ভালো লাগে না। তিনি আরও বলেন, আমি আবদুর রহমান ইবনে মাহদিকে বলতে শুনেছি, সুফিরা এমন কর্মকাণ্ডের কারণে অনেক ফরয ছেড়ে দেয়। ইসহাক ইবনে দাউদ বলেন, আমি আবদুর রহমান ইবনে মাহদিকে বললাম, হে আবু সাঈদ! আমাদের

---

১ আলবানি প্রণীত 'আলজামে' : হাদিস নং ৫৬৭৪

এলাকায় সুফি সম্প্রদায়ের আবির্ভাব ঘটেছে। তিনি আমাকে বললেন, তুমি এদের কাছে যেয়ো না। কেননা এদের একটি দলকে আমি দেখেছি, যাদেরকে তাদের কর্মকাণ্ড বেপরোয়া করে ফেলে। অনেকে মুলহিদ ও নাস্তিক হয়ে যায়। অপঃপর তিনি বললেন, একবার সুফইয়ান সাওরি রহ. সফরে বের হলে আমিও তাঁর অনুসরণ করি। আমি দেখলাম তাঁর সফরে আনা খাদ্যের মাঝে ফালুদাও ছিল।

আবু আবদুল্লাহ আহমদ ইবনে হাম্বল রহ.-কে জনৈক ব্যক্তি বলল, আজ পনেরো বছর যাবত শয়তান আমাকে প্রলোভন দিয়ে রেখেছে। অধিকাংশ সময় দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে আমি আল্লাহর বিষয়ে চিন্তা করতে থাকি। এ কথা শুনে ইবনে হাম্বল বললেন, সম্ভবত তুমি নিয়মিত সিয়ামব্রত পালন করতে। তুমি রোযা রাখা বন্ধ করে চর্বিযুক্ত খাবার খাও এবং গল্পকারদের সাথে উঠা-বসা করতে থাকো।

গ্রন্থকার বলেন, কিছু কিছু সুফি নিকৃষ্টমানের খাদ্য গ্রহণ করে। তারা চর্বিযুক্ত খাবার খায় না। এতে করে তার পাকস্থলিতে নিকৃষ্ট খাবার একত্র হলে নির্দিষ্ট একটি সময় পর্যন্ত পাকস্থলি তা থেকে খাদ্য গ্রহণ করে। কেননা পাকস্থলি সব সময় এমন কিছু খাবার চায়, যা সে সহজে হজম করতে পারে। সুতরাং পাকস্থলিতে নিকৃষ্ট খাবার একত্র হলে এবং পাকস্থলি তা হজম করে শরীরে খাবার সরবরাহ করলে সেই নিকৃষ্ট খাবার তার মাঝে দ্বিধা, সংশয় ও বেপরোয়া স্বভাবের জন্ম দেয়। খুব অল্প আহারকারীদের পাকস্থলি ক্রমান্বয়ে সরু ও সঙ্কুচিত হয়। একপর্যায়ে একবার আহার করে তারা দীর্ঘদিন অনাহারে কাটাতে পারে। এ ক্ষেত্রে যৌবনের শক্তি তাদেরকে সহযোগিতা করে। বাস্তবতা সম্পর্কে অজ্ঞ থাকার কারণে তারা দীর্ঘদিন অনাহারে থাকতে পারাকে কারামত বলে মনে করতে থাকে।

আবদুল মুনইম বিন আবদুল করিম তার পিতার সূত্রে বর্ণনা করেন, এক মহিলা বৃদ্ধ হওয়ার পর তাকে তার অবস্থা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বললেন, আমি যৌবনকালে কম খাদ্য গ্রহণ করা সত্ত্বেও কয়েকদিন না খেয়ে থাকতে পারতাম। এটাকে আমি কারামত ও বুযুর্গি মনে করতাম। কিন্তু বয়স বাড়তে থাকলে আমার দেহশক্তি কমতে থাকে। তখন আমি বুঝতে পারলাম, এটা তো কারামত নয়; বরং এটা আমার যৌবনশক্তি ছিল।

গ্রন্থকার বলেন, কেউ এ প্রশ্ন উত্থাপন করতে পারে যে, আপনারা কোন্ যুক্তিতে কম খাবার গ্রহণ করতে নিষেধ করছেন? আপনারাই তো বর্ণনা

করেছেন যে, হজরত উমর রা. দিনে মাত্র এগারো লোকমা খাবার খেতেন। ইবনে যুবাইর এক সপ্তাহ ধরে না খেয়ে থাকতেন। ইবরাহিম তামিমি অনবরত দুই মাস না খেয়ে থাকতেন। এর জবাবে আমরা বলব, ইচ্ছে না থাকা সত্ত্বেও অনেক সময় অল্পাহার বা না খেয়ে থাকতে হয়। তবে তারা এতে অনড় থাকেননি। এমনকি এটাকে অভ্যাস হিসেবেও গ্রহণ করতেন না। আমাদের পূর্ববর্তী মনীষীরা অসচ্ছলতা ও দরিদ্রতাজনিত হেতুতে না খেয়ে থাকতেন। আবার অনাহারে থাকা তাদের কারও অভ্যাসে পরিণত হলে তাতে তাদের দেহ দুর্বল হতো না। এতে করে ইবাদত-বন্দেগিতে কোনো প্রকার বিঘ্ন ঘটত না। এখনও আরবের অনেক লোক আছেন, যারা শুধু দুধ পান করে দীর্ঘদিন অনায়াসে কাটাতে পারেন। বিষয়টি ভালো করে বুঝে নেয়া জরুরি যে, আমরা অধিক ভোজনের নির্দেশ দিচ্ছি না; বরং এমন ক্ষুধা থেকে বিরত থাকতে বলছি, যার কারণে শক্তি হ্রাস পায় এবং শরীর দুর্বল হয়ে পড়ে। কেননা এক্ষেত্রে শরিয়তের বিধি-বিধান পালন করা কষ্টকর হয়ে পড়ে।

হজরত আনাস রা. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, হজরত উমর রা. এর সামনে এক সা' পরিমাণ খেজুর রাখা হতো, তিনি খেতে খেতে সব শেষ করে ফেলতেন।

ইবরাহিম ইবনে আদহাম রহ. একবার মাখন, মধু ও রুটি কিনলে তাকে বলা হলো, আপনি কি সবগুলো খেয়ে ফেলবেন? তিনি বললেন, আমরা যখন পাই তখন বীরপুরুষের মতো খাই, আর যখন না পাই তখন মহাপুরুষের মতো সবর করি।

পানি পানের ব্যাপারে প্রমাণপঞ্জি

গ্রন্থকার বলেন, স্বয়ং রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বচ্ছ ও শীতল পানি ভালোবাসতেন। হজরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ রা. হতে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একবার আনসারদের এক অসুস্থ ব্যক্তিকে দেখতে এসে পানি চাইলেন। ওই আনসারির বাড়ির পাশেই একটি ঝরনা ছিল। তিনি বললেন,

عِنْدَكَ مَاءٌ بَاتَ اللَّيْلَةَ فِي شَنٍّ؟ وَإِلَّا كَرَعْنَا

'তোমাদের কাছে কলসে রাখা রাতের পানি থাকলে তা নিয়ে আসো। অন্যথায় আমরা ঝরনা হতেই চুমুক দিয়ে পানি পান করব।'[১]

অন্য হাদিসে আছে, হজরত আয়েশা রা. হতে বর্ণিত,

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُسْتَقَى لَهُ الْمَاءُ الْعَذْبُ مِنْ بِئْرِ السُّقْيَا

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর জন্য সুকইয়া কূপ হতে মিষ্টপানি সংগ্রহ করা হতো।'[২]

গ্রন্থকার বলেন, অনেক সুফি বলে থাকে, মানুষ উত্তম খাবার খেলে এবং শীতল পানি পান করলে মৃত্যুর ভালোবাসা কখন সৃষ্টি হবে? আবু হামেদ গাযালি রহ.ও বলেন, মানুষ সুস্বাদু খাদ্য গ্রহণ করলে তার মন কঠিন হয়ে যায় এবং মৃত্যুকে সে ভালোবাসে না।

গ্রন্থকার বলেন, একজন অভিজ্ঞ ফকিহের মুখ থেকে এমন কথা বের হচ্ছে দেখে আমি আশ্চর্যবোধ করছি। আচ্ছা, বলুন তো, কেউ যদি চতুর্দিক থেকে বহুমুখী শাস্তি ও অত্যাচারের সম্মুখীন হয়, তারপরও কি কেউ মৃত্যু কামনা করতে ভালোবাসবে? এছাড়া মানুষের জন্য নিজেকে শাস্তি দেয়া কি কখনো বৈধ হতে পারে?

وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ

'তোমরা নিজেকে হত্যা কোরো না।'[৩]

সফরকালীন আল্লাহ তায়ালা অনুগ্রহ করে রোযা ভাঙ্গার সুযোগ দিয়ে বলেছেন,

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ

'আল্লাহ তায়ালা তোমাদের ব্যাপারে সহজ বিধান চান, কঠিন বিধান চান না।'[৪] শরীর ছাড়া কি আমরা জান্নাতে যেতে পারব? সুতরাং এর প্রতি অবহেলা প্রদর্শন একপ্রকার ধৃষ্টতা।

ওপরের ঘটনায় আবু ইয়াযিদ এক বছর ধরে পানি পান থেকে বিরত থেকে নিজেকে কষ্ট দেয়ার উত্তরে বলা যায়, এরা শরিয়তের দৃষ্টিতে নিন্দিত ও

---

১ সহিহ বুখারি : হাদিস নং ৫৬১৩
২ সহিহুল জামে' : হাদিস নং ৪৯৫১
৩ সুরা নিসা : আয়াত ২৯
৪ সুরা বাকারা : আয়াত ১৮৫

পরিত্যাজ্য। কারণ মানুষের ওপর তার দেহের হক রয়েছে। হকদারকে হক না দেয়া জুলুমের নামান্তর। তাই গ্রীষ্মকালে দীর্ঘ সময় রোদে পড়ে থাকা আর শীতকালে দীর্ঘ সময় বরফে বসে থাকা দেহের জন্য কষ্টকর বিধায় তাও পরিত্যাজ্য। পানি দেহের আর্দ উপাদানগুলো সুস্থ সবল রাখে এবং শরীরে শক্তি জোগায়। এছাড়া এটা জানা কথা যে, খাবারের মাধ্যমেই দেহ সুস্থসবল থাকে। অতএব কেউ শরীরকে খাবার-দাবার থেকে বিরত রাখলে কিংবা পর্যাপ্ত খাবার-দাবার না দিলে সে দেহের ক্ষতি করেছে হিসেবে বিবেচিত হবে। যে যা উত্তম মনে করে করেছে, তা তার ভুল ছিল। তেমনিভাবে শরীরকে নিদ্রা থেকে বিরত রাখাও জুলুম।

ইবনে আকিল বলেন, মানুষের জন্য তার নিজের ওপর শাস্তি দেয়া জায়েয নয়।[১] অনুরূপভাবে প্রতিশোধ গ্রহণ করাও বৈধ নয়। কেউ এমন করে থাকলে ইমাম তাকে শাস্তি দেবেন। শরীর ও জীবন আল্লাহ তায়ালা মানুষকে আমানতস্বরূপ দান করেছেন। মানুষকে তার নিজ মালিকানাধীন বস্তু ব্যবহারের পূর্ণ স্বাধীনতা আল্লাহ তায়ালা দেননি। ধন-সম্পদ ব্যয়ের পন্থাও আল্লাহ তায়ালা নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন।

গ্রন্থকার বলেন, হিজরতের হাদিসে আমরা উল্লেখ করে এসেছি– 'রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদিনা সফরের জন্য পাথেয় হিসেবে খাদ্য ও পানীয় সঙ্গে নিয়েছেন।'

হজরত আবু বকর রা. পাথরের ছায়ায় রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর জন্য বিছানা বিছিয়েছেন এবং পাত্রে দুধ দোহনের পর তার ওপর পানি ঢেলেছেন, যেন পেটের নিম্নভাগ শীতল হয়। এ সব কর্মকাণ্ডের উদ্দেশ্য ছিল শরীরের সাথে উত্তম ব্যবহার করা। আবু তালেব মক্কি অল্প খাবার গ্রহণের ব্যাপারে যা বলেছেন, তা শরীরের ওপর এমন অত্যাচার, যাতে শরীর খুবই দুর্বল হয়ে পড়ে। অবশ্য ক্ষুধা পরিমিত হলে তা অবশ্যই প্রশংসার দাবি রাখতে পারে। মুহাম্মাদ বিন আলী তিরমিযি[২] যা লিখেছেন তা এক নষ্ট চিন্তার বহিঃপ্রকাশ। হয়তো তিনি নতুন শরিয়ত আবিষ্কার করতে চেয়েছিলেন। তাওবাহর সময় অনবরত দুই মাস রোযা রাখার ব্যাপারে শরিয়তের কোনো দিকনির্দেশনা আছে কি? অনুরূপভাবে ফলমূল ও হালাল খাদ্য পরিহারের মাঝেও কোনো উপকারিতা নেই।

---

১ সহিহ বুখারি : হাদিস নং ৩৯০৫

২ ইনি হাকীম তিরমিযি; সুনান সংকলক আবু ঈসা তিরমিযি নন।

সুফিদের কর্মকাণ্ডের অসারতা প্রমাণে হাদিসসমূহ

সাঈদ ইবনে মুসাইয়্যিব বলেন, হজরত উসমান ইবনে মাযঊন রা. একবার রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দরবারে এসে বললেন, ইয়া রাসুলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! আমার মনে কিছু বিষয়ের উদ্ভব হয়েছে। আপনাকে জিজ্ঞেস না করে সেগুলোর কোনোটি করতে চাই না। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তোমার মনে কিসের উদ্ভব হয়েছে? তিনি বললেন, আমার ইচ্ছে হয় নপুংসক (পুরুষত্বহীন) হয়ে যেতে। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আমার উম্মতের নপুংসক হওয়া হলো রোযা। উসমান ইবনে মাযঊন রা. বললেন, আমার মন চায় পাহাড়ের নির্জন স্থানে গিয়ে বসে থাকতে। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আমার উম্মতের বৈরাগ্য হলো মসজিদে বসে এক নামাযের পর আরেক নামাযের জন্য অপেক্ষা করা। উসমান রা. বললেন, আমার মন চায়, বিভিন্ন দেশ ভ্রমণ করতে। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আমার উম্মতের ভ্রমণ হলো, জিহাদ ও হজ-ওমরা। উসমান রা. বললেন, আমার মন চায় স্ত্রী-সন্তান থেকে পৃথক হয়ে যেতে। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, প্রতিদিন সদকা করা, নিজের এবং বাচ্চাদের ভরণ-পোষণ এবং এতিম-মিসকিনদের ওপর দয়া-দাক্ষিণ্য করা এর চেয়ে উত্তম। উসমান রা. বললেন, আমার মন চায়, স্ত্রী-সহবাস বর্জন করতে। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, কোনো মুসলমান যখন আপন স্ত্রীর সাথে সহবাস করে আর এর ফলে কোনো সন্তান জন্মলাভ না করে, তবে তার জন্য জান্নাতে একটি বাঁদি লাভ হবে। আর যদি সন্তান জন্মলাভ করে, আর প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার পূর্বেই মৃত্যুবরণ করে, তবে সে সন্তান তার জন্য কেয়ামতের দিন সুপারিশকারী হবে। আর যদি তার পরেও জীবিত থাকে, তবে তার জন্য কেয়ামতের দিন নূর হবে। উসমান রা. বললেন, ইয়া রাসুলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! আমার মন চায় গোশত খাওয়া বর্জন করতে। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, গোশত প্রিয় বস্তু। আমি যখন গোশত জোটে তখন খাই। আমি যদি আল্লাহর কাছে প্রতিদিন আমাকে গোশত খাওয়ানোর দরখাস্ত করি, তবে অবশ্যই তিনি তা আমাকে খাওয়াবেন। উসমান রা. বললেন, ইয়া রাসুলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! আমার মন চায়, সুগন্ধজাতীয় দ্রব্য বর্জন করতে। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, জিবরাঈল আলাইহিস সালাম

আমাকে সুগন্ধজাতীয় দ্রব্য ব্যবহার করতে আদেশ করেছেন। আর জুমার দিন আমি কখনে সুগন্ধজাতীয় দ্রব্য ব্যবহার বর্জন করি না। হে উসমান! আমার রাস্তা থেকে বিমুখ হয়ো না। যে ব্যক্তি আমার রাস্তা থেকে বিমুখ হয়ে তাওবাহ ছাড়া মৃত্যুবরণ করে ফেরেশতারা আমার হাউজে কাউসার থেকে তাদেরকে ফিরিয়ে দেবে।[১]

গ্রন্থকার বলেন, এটি ওমায়ের ইবনে মারদাসের হাদিস।

হজরত আবু বুরদাহ রা. হতে বর্ণিত, উসমান ইবনে মাযঊন রা. এর স্ত্রী একবার রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর স্ত্রীদের কাছে এলেন। তাঁরা তাঁকে জীর্ণশীর্ণ অবস্থায় দেখে জিজ্ঞেস করলেন, কী ব্যাপার, তোমার এ অবস্থা কেন? তোমার স্বামী কি বিত্তশালী নয়? মাযঊন-পত্নী বললেন, তার দ্বারা আমার কোনো উপকার লাভ হয় না। সে সারারাত নামায পড়ে, সারাদিন রোযা রাখে। নবীপত্নীগণ রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে ঘটনাটি জানালেন। তিনি উসমান রা.-কে পেয়ে বললেন, হে উসমান! তুমি কি আমার অনুসরণ করো না? উসমান রা. বললেন, ইয়া রাসুলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! কী ব্যাপার? রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তুমি কি সারারাত নামায পড়ো, আর সারাদিন রোযা রাখো? উসমান রা. বললেন, জি হ্যাঁ, ইয়া রাসুলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, এটা করবে না। কেননা তোমার ওপর তোমার চোখের হক আছে। তোমার ওপর আপন শরীরের হক আছে। তোমার ওপর আপন স্ত্রীর হক আছে। অতএব তুমি নামাযও পড়ো, নিদ্রাও যাও। রোযাও রাখো, ইফতারও করো।[২]

হজরত আবু কিলাবাহ রা. বলেন, উসমান ইবনে মাযঊন রা. একটি ঘর নির্মাণ করে তাতে নিরবচ্ছিন্নভাবে ইবাদত করতে শুরু করেন। বিষয়টি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জানতে পেরে তার নিকট গমন করে তার ঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে বললেন,

يا عثمان إن الله عز وجل لم يبعثني بالرهبانية مرتين أو ثلاثا

---

১ [যঈফুন জিদ্দান] এর সনদে আলী ইবনে যায়েদ ইবনে জুদয়ান রয়েছেন– যিনি 'যঈফ'। অবশ্য অনুরূপ অর্থবোধক হাদিস সহিহ বুখারিতে রয়েছে : হাদিস নং ৫০৭৩

২ হাদিসটি তাবাকাতে ইবনে সা'আদে উপরোক্ত সনদে এসেছে। সনদটি 'মুরসালান সহিহ'।

'হে উসমান! আমাকে তো আল্লাহ তায়ালা সন্ন্যাসব্রত দিয়ে পাঠাননি। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ কথা দুইবার তিনবার বলেছেন।'[৩]

কাহমাস হেলালি রা. বলেন, আমি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর খেদমতে উপস্থিত হয়ে ইসলাম গ্রহণের কথা জানালাম। অতঃপর এক বছর যাবৎ অনুপস্থিত রইলাম। এরপর আবার খেদমতে হাজির হলাম। তখন আমি অত্যন্ত দুর্বল হয়ে পড়েছিলাম। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার আপাদমস্তক দেখলেন। আমি বললাম, ইয়া রাসুলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! আপনি আমাকে চিনতে পারছেন না? তিনি জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কে? আমি বললাম, আমি কাহমাস হেলালী। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, তোমার এ অবস্থা কেন? আমি বললাম, আপনার কাছ থেকে যাওয়ার পর এক রাতও ঘুমাইনি এবং একদিনও রোযাবিহীন থাকিনি। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, নিজেকে শাস্তির মুখোমুখি করার নির্দেশ তোমাকে কে দিয়েছে? পূর্ণ রমযান এবং প্রতিমাসে একটি রোযা রাখো। আমি বললাম, আরও বৃদ্ধি করুন। বললেন, পূর্ণ রমযান এবং প্রতি মাসে দু'টি রোযা রাখো। আমি আরয করলাম আরও বৃদ্ধি করুন। বললেন, পূর্ণ রমযান এবং প্রতি মাসে তিনদিন রোযা রাখো।[৪]

হজরত আবু কিলাবা রা. বলেন, আমার মাধ্যমে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট এ সংবাদ পৌঁছল যে, একদল সাহাবি স্ত্রীদের নিকটবর্তী হওয়া ও গোশত খাওয়া পরিত্যাগ করে একস্থানে সমবেত হয়েছেন। তখন আমরাও স্ত্রীদের নিকটবর্তী না হওয়া এবং গোশত না খাওয়ার বিষয়টি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট উল্লেখ করলে তিনি এ বিষয়ে কঠোরভাবে হুঁশিয়ার করে বললেন,

لو كنت تقدمت فيه لفعلت ثم قال إني لم أرسل بالرهبانية إن خير الدين الحنيفية السمحة

---

৩ হাদিসটি তাবাকাতে ইবনে সা'আদে বর্ণিত হয়েছে। আলবানি রহ. এটাকে সহিহ বলেছেন।
৪ [যঈফ] মুসনাদে আহমাদ : ৫/২৮, সুনানে আবি দাউদ : হাদিস নং ২৪২৮

'এর দ্বারা যদি পরকালে মঙ্গলজনক পরিণতি পাওয়া যেত, তাহলে সর্বপ্রথম আমি তা করতাম। অতঃপর তিনি বললেন, আমি সন্ন্যাস-ধর্ম নিয়ে প্রেরিত হইনি। আমি মধ্যপন্থী ধর্ম নিয়ে প্রেরিত হয়েছি।'[১]

গ্রন্থকার বলেন, এক হাদিসে এসেছে– রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন,

إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ يُحِبُّ أَنْ يرى آثَارَ نِعْمَتِه عَلى عَبْدَه فِيْ مَأْكَلِه وَمَشْرَبِه

'আল্লাহ তায়ালা বান্দার খাবার-দাবার ও বেশভূষায় তাঁর অনুগ্রহের নিদর্শন দেখতে ভালোবাসেন।'[২]

বকর ইবনে আবদুল্লাহ বলেন, আল্লাহ তায়ালা যাকে নেয়ামত দান করেছেন এবং তার খাবার-দাবার ও বেশভূষায় নেয়ামতের নিদর্শন দেখা না যায় তাকে 'বাগিযুল্লাহ' বা আল্লাহর অপছন্দনীয় উপাধিতে ভূষিত করা হয়।

***

গ্রন্থকার বলেন, এ সব হাদিস দ্বারা প্রমাণিত হয়, সুফিরা যে পন্থা অবলম্বন করেছে, তা সঠিক নয়। পানাহার বর্জনের এ রীতি আগেকার যুগের সুফিদের ছিল। কিন্তু পরবর্তী সুফিরা এ ব্যাপারে অন্যদেরকে ডিঙিয়ে গেছে।

মুহাম্মাদ ইবনে আবদুস সিরাজ বাগদাদি বলেন, আবু মরহুম একবার বসরায় ওয়াজ করতে দাঁড়িয়ে অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী ও মর্মস্পর্শী ওয়াজ করলেন—এতে মানুষ অঝোরে কাঁদতে থাকল। ওয়াজ শেষে বললেন, আমাদেরকে আল্লাহর ওয়াস্তে কে ভাত খাওয়াবে? এক যুবক দাঁড়িয়ে বলল, আমি এ সেবার জন্য প্রস্তুত আছি। আবু মরহুম বললেন, তুমি বসো। তোমার প্রতি আল্লাহর রহমত বর্ষিত হোক। আমি তোমার মর্যাদা উপলব্ধি করতে পেরেছি। ওই যুবক এভাবে তিনবার ওঠে বলল। তৃতীয়বার আবু মরহুম সঙ্গীদেরকে বললেন, চলো, এ ব্যক্তির বাড়িতে যাই। সবাই ওই যুবকের বাড়িতে গেলেন। যুবক বলল, আমি তাদের সামনে এক পাতিল শাক রান্না করে এনেছিলাম। তাঁরা লবণ ছাড়াই সেগুলো খেয়ে নিলেন।

---

১ 'ইরসাল' এর কারণে হাদিসটির সনদ দুর্বল। এছাড়া অনুরূপ অর্থবোধক হাদিস পূর্বেও উল্লেখিত আছে।

২ [যঈফ] আলবানি প্রণীত 'যঈফুল জামে' : হাদিস নং ১৭১৫, অন্য একটি বর্ণনামতে হাদিসটি 'সহিহ লিগাইরিহী' এর পর্যায়ে পড়ে।

এরপর আবু মরহুম বললেন, আমার কাছে একটি লম্বা চওড়া দস্তরখান, পাঁচ টুকরি ভাত, পাঁচ সের ঘি, দশ সের চিনি, পাঁচ সের বাদাম এবং পাঁচ সের পেস্তা নিয়ে আসো। এ সবকিছু উপস্থিত করা হলো। আবু মরহুম সঙ্গীদেকে লক্ষ্য করে বললেন, এখন দুনিয়া কেমন দেখাচ্ছে? তারা বলল, তার রং চমকাচ্ছে এবং সূর্য উজ্জ্বল। আবু মরহুম বললেন, এখন দুনিয়াতে নহরও প্রবাহিত করে দাও। এ বলে ঘিগুলো ভাতে ঢেলে দেয়া হলো। আবার আবু মরহুম জিজ্ঞেস করলেন, এবার দুনিয়া কেমন দেখাচ্ছে? তারা বলল, তার রং চমকাচ্ছে, সূর্য উজ্জ্বল এবং নহরও প্রবাহমান। অতঃপর পেস্তা বাদাম আনা হলো এবং ভাতে ঢালা হলো। এরপর আবু মরহুম সঙ্গীদেরকে বলল, এখন দুনিয়া কেমন দেখাচ্ছে? তারা বলল, তার রং চমকাচ্ছে, সূর্য উজ্জ্বল, নহরও প্রবহমান এবং গাছও জন্মেছে। আবু মরহুম বললেন, এবার পাথরও ঢেলে দাও। এ বলে চিনিগুলোও ঢেলে দেয়া হলো। এরপর আবু মরহুম সঙ্গীদেরকে বলল, এখন দুনিয়া কেমন দেখাচ্ছে? তারা বলল, তার রং চমকাচ্ছে, সূর্য উজ্জ্বল, নহরও প্রবহমান, গাছ জন্মেছে, ফল ধরেছে এবং পাথরও ঢালা হয়েছে। আবু মরহুম বললেন, ভাইয়েরা! দুনিয়ার সাথে আমাদের কী সম্পর্ক? আমরা দুনিয়া দিয়ে কী করব? এ বলে সবাই হাত বাড়াল এবং পাঁচ আঙ্গুল দিয়ে খেতে শুরু করল।

আবু ফযল আহমদ ইবনে সালামাহ বলেন, আমি এ ঘটনা আবু হাতেম রাযীর কাছে বর্ণনা করলে তিনি বললেন, ঘটনাটি আমাকে লিখে দাও। অতঃপর তিনি বললেন, বর্তমান সুফিদের অবস্থা এটাই।

ছেমা-গান, বাদ্য ও নৃত্যের ব্যাপারে সুফিদের ওপর শয়তানের ধোঁকা

গ্রন্থকার বলেন, জেনে রাখা উচিত—গান-বাজনা দু'টি নেতিবাচক প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে। একটি হলো, আল্লাহর ধ্যান ও স্মরণ থেকে গাফেল করা, আরেকটি হলো, মনে উত্তেজনা সৃষ্টি করা; যা অনেক সময় যিনায় লিপ্ত হতে প্ররোচিত করে। অতএব প্রতীয়তমান হলো যে, الزنا যিনা অর্থাৎ ব্যভিচার ও الغناء গিনা অর্থাৎ গান-বাদ্যের মধ্যে একটি শাব্দিক সাযুজ্য বিদ্যমান। গান আত্মাকে উত্তেজিত করে, পক্ষান্তরে যিনা প্রবৃত্তির বাসনা পূরণের অন্যতম হাতিয়ার। এ জন্য হাদিসে এসেছে :

اَلْغِنَاءُ رُقْيَةُ الزِّنَا

'গান হচ্ছে যিনার মন্ত্র'।[১]

অর্থাৎ গান যিনার প্রতি উদ্বুদ্ধ করার ব্যাপারে মন্ত্রের ন্যায় কাজ করে। আবু জাফর তাবারি বলেন, সর্বপ্রথম বাদ্যযন্ত্র আবিষ্কার করে কাবিলের বংশধর থেকে 'সাওবান' নামক জনৈক ব্যক্তি। এ যুগেই মাহলাইল ইবনে কিনান নামে এক ব্যক্তি বাঁশি, তবলা ইত্যাদি বাদ্যযন্ত্র তৈরি করে। কাবিলের বংশধর গান-বাজনায় লিপ্ত হয়ে পড়ে। হজরত শীশ আলাইহিস সালাম এর বংশধর পাহাড়ে বাস করত। তাদের কাছে এ সংবাদ পৌঁছলে তারাও পাহাড় থেকে নেমে এসে গান-বাজনা ও অন্যান্য বেহায়াপনার কাজে জড়িয়ে পড়ে।

গ্রন্থকার বলেন, এ সব উত্তেজনা উদ্রেককারী যন্ত্রগুলোর এমন বিষয়াশয় বিদ্যমান, যার একটি অপরটি দ্বারা প্রবৃত্তির অনুসরণ ও উত্তেজনা বৃদ্ধিতে সহায়ক ভূমিকা পালন করে। ইবলিস যখন ভাবল—মানুষকে ইবাদত থেকে বিরত রাখতে সুললিত কণ্ঠে বাদ্যের সংমিশ্রণে তাদেরকে বশে আনা সহজ, তখন সে এ যন্ত্রের প্রতি মানুষকে অধিকহারে আকৃষ্ট করতে প্রয়াসী হয়। প্রথম সে গানের প্রতি আকৃষ্ট করতে থাকে। এই পাষণ্ড এরপর বাদ্যযন্ত্রের প্রতি মানুষকে প্ররোচিত করতে থাকে। এর বিভিন্ন শোভা-সৌন্দর্য সে মানুষের সামনে পেশ করতে থাকে।

ফকিহ তিনি—যিনি বস্তুর ফলাফলের প্রতি দৃষ্টি দেয় এবং চিন্তা-ভাবনা করে। যেমন—সুদর্শন কমবয়সী বালকের দিকে দৃষ্টিপাত করা বৈধ, কিন্তু শর্ত হচ্ছে, প্রবৃত্তিতে উত্তেজনা আসতে পারবে না। যদি সুদর্শন কমবয়সী বালকের দিকে দৃষ্টিপাত করলে যৌনস্পৃহা জাগ্রত হয়, তাহলে তার দিকে তাকানো বৈধ নয়। অনুরূপভাবে তিন বছরের কম বয়সী মেয়েকে চুমু দেয়া জায়েয। কেননা এমন বয়সে তার প্রতি যৌন-লালসার উদ্রেক হয় না। পক্ষান্তরে যদি যৌন-স্পৃহা জাগ্রত হয়ে যায়, তাহলে তাকেও চুমু দেয়া বৈধ নয়। একইভাবে মাহরাম নারীদের সাথে একাকী সময় কাটানো অবস্থায় যদি যৌন উত্তেজনা দেখা দেয়, তবে তাদের থেকে দূরে থাকা চাই। কেননা এমতাবস্থায় তাদেরকে সঙ্গ দেয়া হারাম।

---

১ [মাউযূ] হাদিসটি মোল্লা আলী কারী রহ. 'আল আসরারুল মারফূআ' গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন।

গানের ব্যাপারে সুফিদের অভিমত

গ্রন্থকার আল্লামা ইবনুল জাওযি রহ. বলেন, এক্ষেত্রে কয়েকটি বিষয়ে গভীরভাবে দৃষ্টি দেয়া প্রয়োজন। গানের ব্যাপারে কেউ বলেন হারাম, কেউ মাকরুহের সাথে বৈধ বলেছেন। আবার কেউ বৈধতার সাথে মাকরুহ বলেছেন। সঠিক সিদ্ধান্ত হলো, প্রথমে একটি বস্তুর আকৃতি ও রহস্যে দৃষ্টি দেয়া দরকার। পরে তাকে হারাম ইত্যাদিতে অভিহিত করা যেতে পারে। একটি হলো, ওই গান যা প্রেমবিজড়িত, চরিত্র হননকারী এবং বিশেষ রাগে গাওয়া হয়; যা গায়ক-গায়িকারা গেয়ে থাকে—এটা সর্বসম্মতিক্রমে নাজায়েয। আরেকটি হলো, যা হাজীরা দীর্ঘ পথ অতিক্রমকালে ক্লান্তি বিদূরিত করার উদ্দেশ্যে এবং মনে স্ফূর্তি জাগ্রত করতে বা কা'বার প্রশংসার্থে পড়তেন—এটা জায়েয। এমনইভাবে আরব দেশে উটকে দ্রুত চলার ওপর উদ্বুদ্ধ করার জন্য ছন্দাকারে কিছু গাওয়া হতো, যাকে হুদ্দা বলা হয়, এটা জায়েয। এমনিভাবে ওইসব কবিতার বিষয়বস্তু ভালো, তাতে অশ্লীল কথা বা কারও কুৎসা নেই—সে সব কবিতা আবৃত্তি করাও জায়েয। যেমন জনৈক কবি বলেন,

بشرها دليلها وقالا * غدا ترين الطلح والجبالا

'উটনীকে তার পথ প্রদর্শন সুখবর দিয়ে বলেছে, তুমি পাথুরে পথ আর পাহাড়ের সৌন্দর্য।' এ কবিতা দ্বারা আরোহী এবং উট অনুপ্রাণিত হয়। এতে তাদের বিচ্যুত হবার আশঙ্কা নেই।

এই উদ্বুদ্ধকরণের মূল রহস্য সম্পর্কে আবুল বুখতারি ওহাব থেকে তালহা মক্কির বর্ণনা উল্লেখ করে বলেন, কতেক আলেম বলেছেন, এক রাতে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কার রাস্তায় একটি গোত্রের পাশ দিয়ে অতিক্রমকালে এক উদ্বুদ্ধকারী কবি দেখতে পান। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে সালাম দিয়ে বললেন,

إِنَّ حَادِيَنَا نَامَ فَسَمِعْنَا حَادِيَكُمْ فَمِلْتُ إِلَيْكُمْ، فَهَلْ تَدْرُونَ أَنَّى كَانَ الْحَدَّاءُ؟ قَالُوا: لا وَاللَّهِ، قَالَ: إِنَّ أَبَاهُمْ مُضَرَ خَرَجَ إِلَى بَعْضِ رُعَاتِهِ فَوَجَدَ إِبِلَهُ قَدْ تَفَرَّقَتْ فَأَخَذَ عَصًا فَضَرَبَ بِهَا كَفَّ غُلامِهِ، فَعَدَا الْغُلامُ فِي الْوَادِي وَهُوَ يَصِيحُ: يَا يَدَاهُ يَا يَدَاهُ، فَسَمِعَتِ الإِبِلُ ذَلِكَ فَعَطَفَتْ عَلَيْهِ،

'আমাদের উদ্বুদ্ধকারী কবি শুয়ে আছে। আমি তোমাদেরকে উদ্বুদ্ধকারী কবির আবৃত্তি শুনে তোমাদের কাছে এলাম। আচ্ছা, তোমরা কি জানো যে, হুদ্দা তথা উদ্বুদ্ধকারী সংগীত কোথা হতে এসেছে? তারা বলল, ইয়া রাসুলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! আমাদের জানা নেই। তিনি বললেন, একবার আরবের পিতামহ মুদির তার উটের পালের দিকে গিয়ে দেখলেন, উটগুলো বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে। রাখাল সারা বন-বাদাড় ঘুরে ঘুরে 'হায় আমার হাত! হায় আমার হাত' বলে চিৎকার দিতে থাকল। উটগুলো তার চিৎকার শুনে তার দিকে চলে আসলো। মুদির মনে মনে ভাবল, উটগুলোর জন্য যদি এমন একটি সংগীতের প্রচলন করা যেত, যা দ্বারা এগুলোর ব্যাপারে নিশ্চিন্তে থাকা যায়![১] তখন থেকে হুদ্দা নামীয় উদ্বুদ্ধকারী সংগীতের প্রচলন হয়।

গ্রন্থকার বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর একজন হুদ্দি যুবক ছিল যার নাম আঞ্জশাহ। এ যুবক দ্রুতবেগে উট চালানোর সময় রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলতেন, হ্যাঁ, হ্যাঁ, একটু সাবধানে তুমি শিস দিয়ে উটগুলো হাঁকাও।'[২]

সালামা ইবনুল আকওয়ার হাদিসে আছে :

'আমরা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে খায়বার অভিমুখে চলছিলাম। তখন ছিল রাতের বেলা। জামাতের এক লোক আমেরকে জিজ্ঞেস করল, তুমি আমাদেরকে কিছু মোবারক কথা কেন শোনাচ্ছ না? আমের ছিলেন কবি। স্বজাতির উদ্দেশে আবৃত্তি করলেন—

لاهم لولا أنت مَا اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا

فالقين سكينة علينا وثبت الأقدام إذ لاقينا

"হে আল্লাহ! তুমি যদি আমাদের তাওফিক না দিতে, তাহলে আমরা হেদায়েত পেতাম না। যাকাত দিতে পারতাম না, নামায আদায় করতে পারতাম না। হে প্রভু! আমাদের অন্তরে অদৃশ্য প্রশান্তি ঢেলে দিন এবং শত্রুর মোকাবেলা করার সময় আমাদের দৃঢ় ও অবিচল রাখুন।" এই কবিতা শুনে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, এই উট

---

১ [মাউযূ] আসসিলসিলাতুয্ যাঈফা : ৫৫৪। এখানে আবুল বুখতারী নামীয় রাবী বিশ্বস্ত নয়।

২ সহিহ বুখারি : হাদিস নং ৬১৪৯, ৬২০২, সহিহ মুসলিম : হাদিস নং ২৩২৩

হাঁকানোকারী কে? লোকজন বলল, আমের ইবনুল আকওয়া। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আল্লাহ তার ওপর রহম করুন।'[৩]

গ্রন্থকার বলেন, আমরা ইমাম শাফেয়ি রহ. থেকে বর্ণনা করেছি, তিনি বলেছেন, গ্রামের লোকজন উদ্বুদ্ধকরণমূলক গীত গাওয়া এবং শোনাতে কোনো অসুবিধা নেই। লেখক আরও বলেন, আরবদের কবিতা আবৃত্তি করার একটি প্রসিদ্ধ ঘটনা হচ্ছে মদিনায়ে তাইয়্যেবায় রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর আগমন উপলক্ষে কবিতামালা :

طلع البدر علينا * من ثنيات الوداع

وجب الشكر علينا * مَا دعا لله داع

'ওয়াদা পাহাড়ের চূড়া থেকে আমাদের জন্য পূর্ণিমার এক চাঁদ উদিত হতে যাচ্ছে। যখনই কোনো দোয়াকারী দোয়া করবে তার জন্য এই নেয়ামতের শুকরিয়া আদায় করা আবশ্যক।'[৪]

আবু আকিল নাহবাহ থেকে বর্ণনা করেছেন, হজরত আয়েশা রা. বলেন, আমাদের এখানে একজন আনসারি এতিম বালিকা ছিল। আমরা এক আনসারির সাথে তার বিয়ে দিই। বালিকার স্বামীর সাথে তাকে রুখসতের সময় আমিও তার সাথে ছিলাম। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বললেন, হে আয়েশা! এই আনসারি লোকজন গজল পছন্দ করে। তোমরা রুখসতির সময় কী বলেছিলে? আমি বললাম, বরকতের দোয়া করেছি। তিনি বললেন, এমন কেন বলোনি–[৫]

أَتَيْنَاكُمْ أَتَيْنَاكُمْ * فَحَيُّونَا نُحَيِّيكُمْ

وَلَوْلا الذَّهَبُ الأَحْمَرُ * مَا حَلَّتْ بِوَادِيكُمْ

وَلَوْلا الْحَبَّةُ السَّمْرَاءُ * لَمْ تَسْمَنْ عَذَارِيكُمْ

'আমরা তোমাদের কাছে এসেছি, আমরা তোমাদের কাছে এসেছি। তোমরা আমাদের সালাম করো, আমরা তোমাদের সালাম করছি। যদি স্বর্ণ না থাকত, তবে গহনারও নাম-নিশানা থাকত না। আর যদি গমের দানা না হতো, তবে তোমাদের কুমারীদের গায়ে কখনো গোশত হতো না।'

---

৩ সহিহ বুখারি : হাদিস নং ৪১৯৬, ৬১৪৮, ৬৩৩১, সহিহ মুসলিম : হাদিস নং ১৮০২

৪ 'যঈফাহ্' গ্রন্থের ৫৭৯ নম্বরে আলবানি রহ. এই ঘটনাটি 'যঈফ' বলে আখ্যায়িত করেছেন।

৫ [হাসান লিগাইরিহী] আলইরওয়া : ১৯৯৫, আদাবুয্যুফাফ : পৃষ্ঠা ১০৯

ওই সমস্ত গান, যাতে আল্লাহর তাওহিদের কথা আছে অথবা রাসুলের মহব্বত ও তার শামায়েল আছে অথবা যাতে জিহাদে উৎসাহিত করা হয় তাতে দৃঢ় থাকতে অথবা চরিত্রকে দৃঢ় করতে উদ্বুদ্ধ করা হয়। অথবা এমন দাওয়াত দেয়া হয় যাতে মুসলিমদের একে অন্যের প্রতি মহব্বত ও সম্পর্ক সৃষ্টি হয়। অথবা যাতে ইসলামের মৌলিক নীতি বা সৌন্দর্য ফুটিয়ে তোলা হয়। অথবা এই জাতীয় অন্যান্য কথা, যা সমাজকে উপকৃত করে দীনি আমলের দিকে কিংবা চরিত্র গঠনের জন্য।

ঈদের সময় ও বিয়ের সময় কেবল মহিলাদের জন্য তাদের নিজেদের মধ্যে দফ বাজানোর অনুমতি ইসলাম দিয়েছে। যিকরের সময় এটার ব্যবহার ইসলাম কখনোই দেয়নি। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যিকরের সময় কখনোই তা ব্যবহার করেননি। তাঁর পরে তাঁর সাহাবায়ে কেরাম রাদিয়াল্লাহু আনহুমগণ কখনই তা ব্যবহার করেননি। বরঞ্চ, ভণ্ড সুফি পীররা তা মুবাহ করেছে নিজেদের জন্য। আর যিকরে দফ বাজানোকে তারা সুন্নত বানিয়ে নিয়েছে। অথচ তা বিদআত।

গ্রন্থকার আল্লামা ইবনুল জাওযি রহ. বলেন, ইতোপূর্বে আমরা সংগীতের বৈধতা ও অবৈধতা এবং নিন্দনীয় বিষয়গুলোর ব্যাপারে আলোচনাকালে বলেছি, বুদ্ধিমানদের উচিত—স্বীয় নফস এবং জ্ঞাতি ভাইদের উপদেশ দেবে।

বিশেষ জ্ঞাতব্য : জাহিলিয়্যাতের যুগ ও ইসলাম আগমনের পরও আরবরা সাধারণত কবিতা আবৃতি করা ও গান গাওয়াকে বেশি পছন্দ করত। এমনকি রাসুলের সাহাবিরাও কবিতা উপভোগ করত এবং তা পছন্দ করত। ইমাম বাইহাকী রহ. তার *সুনান* গ্রন্থে আবি সালমা বিন আব্দুর রহমান হতে হাসান সনদে একটি হাদিস বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, রাসুলের সাহাবিদের মধ্যে কতক সাহাবি এমন ছিল যারা কবিতা আবৃতি করত এবং তা উপভোগ করত।

এর কারণ হলো, অশ্লীল, অশালীন কথাবার্তা ও মানুষের স্বভাবের পরিপন্থী কার্যকলাপ তাদের ক্ষুব্ধ করত। আরবি ভাষা, অভিধান ও তাদের পরিভাষার প্রতি লক্ষ করলে, তুমি দেখতে পাবে, তারা غنى শব্দ দ্বারা সাধারণত কবিতা, গান, কাব্যিক কথা ইত্যাদিই উদ্দেশ্য নিয়ে থাকে। কারণ, গান হলো যা শুধু মুখ থেকে বের হয়ে থাকে তার সাথে অন্য কিছুকে সম্পৃক্ত করা হয় না। যদি গানের কথার সাথে অন্য কোনো বাজনা বা বাদ্য শোনা

যায় তবে তা শুধু গান থাকে না। তখন তাকে কবিতা, গান ও কাব্যিক কথা তথা সংগীত ইত্যাদি আখ্যায়িত করা হয়ে থাকে, যদি তার আওয়াজ সুন্দর হয়।

রাসুলের সাহাবিদের কর্ম ও আরবদের বিভিন্ন কবিতার মধ্যে চিন্তাভাবনা করলে দেখা যাবে, তারা غناء শব্দ উল্লেখ করা দ্বারা তাদের উদ্দেশ্য হলো, কবিতা ও গান। এমনকি পরবর্তী লোকদের জন্য বিষয়টি আরও জটিল হয়ে গেল। কারণ, তারা ধারণা করত, তারা তাদের কথা ব্যবহার করছে এবং তার দ্বারা পরবর্তীদের পরিভাষানুযায়ী গানকে উদ্দেশ্য নিত। অথচ এটি ছিল নিছক অজ্ঞতা ও মূর্খতা। কারণ, তাদের غناء শব্দটি তাদের নিকট ব্যাপক অর্থে ছিল না।

غناء-পরবর্তীদের পরিভাষা অনুযায়ী যে অর্থ দাঁড়ায়—সাহাবি ও সালাফ প্রমুখদের হতে যে অর্থটি বর্ণিত হয়ে আসছে—শব্দ দুটির উদ্দেশ্যের মাঝে পার্থক্য করাটা মুশকিল হওয়া ও শব্দদ্বয় অর্থের দিক দিয়ে একই রকম হওয়াতে ইবনে হাম্বলী এ বিষয়ে একটি কিতাব লেখেন যার উপর আল্লামা ইবনে কুদামা এ বলে কটাক্ষ করেন, তিনি হেদা শব্দ উল্লেখ করে غنى এর উপর দলিল পেশ করতে আরম্ভ করেন, আর মূলত এ কাজটি তিনিই করতে পারেন, যিনি غناء ও হেদা শব্দদ্বয়ের মধ্যে পার্থক্য করতে পারে না এবং কোনটি কবিতা তাও বোঝে না। সুতরাং যার যোগ্যতা এর মধ্যে সীমাবদ্ধ সে কখনোই ফতোয়া দেয়ার জন্য উপযুক্ত ব্যক্তি হতে পারে না।

আর যিনি এ কথা বললেন, সে একই কথা তিনি তার কিতাব *আলমুগনী*তে আলোচনা করেন, তিনি বলেন, আলেমদের নিকট ইখতেলাফের কেন্দ্র হলো غناء । সে এ কথা দ্বারা কোন غناء উদ্দেশ্য নিয়েছে? উত্তর : এ দ্বারা তার উদ্দেশ্য হেদা-গান। কারণ, তিনি তার মৃত্যুর এক বছর পূর্বে ইবনে হাম্বলির খুব সমালোচনা করেছেন, যিনি গান- غناء হারাম হওয়ার ব্যাপারে আলেমদের ইত্তেফাকের কথা আলোচনা করেছেন।

ইমাম ইবনে জাওযী বলেন, غناء বা গান তাদের যুগে যুহদ সম্পর্কীয় বিভিন্ন ধরনের কবিতার সমষ্টিরই নাম তবে তারা এগুলোকে সুর দিয়ে আবৃত্তি করত। এ কারণেই অনেক ফকিহ রশীদ ইবনে জামের উপস্থিতিতে

বলত, غناء রোজার ক্ষতি করে। তখন সে বলল, তুমি ওমর বিন আবি রাবীয়ার ঘরে বসে কী বলছ, যে এ কাব্য আবৃত্তি করল :

أمِن آل نعم أنت غادٍ فمبكِرٌ ** غداة غد أم رائح فمهجر!

তার কি রোজার ক্ষতি হবে? বলল, না। এ তো হলো, যদ্দারা আমি আমার আওয়াজকে লম্বা করলাম এবং আমারা তো কেবল মাথাকেই নাড়ালাম।

তোমরা আরও লক্ষ করো, আতা বিন আবি রাবাহ এর কথার প্রতি, তিনি বলেন, মুহরিমের জন্য গেনা ও হেদা দ্বারা কোনো অসুবিধা নাই।

কুরআন, হাদিস ও রাসুলের সাহাবি হতে বর্ণিত নুসুসগুলোর প্রতি লক্ষ করলে দেখতে পাবে যে, ওহী আরবি সাহিত্য দ্বারাই বুঝতে হবে। যার মধ্যে কোনো সুর অথবা অশুদ্ধতা থাকে না। এ কারণেই আল্লামা ইবনে কুদামা রহ. যে ব্যক্তি শব্দ দুটির মধ্যে প্রার্থক্য করতে পারে না এবং উভয়কে একত্র করে ফেলে, তাকে ফতোয়া দেয়ার উপযুক্ত বলে মনে করেন না; বরং তিনি তাকে ফতোয়া দেয়ার অযোগ্য মনে করেন।

গেনা এর প্রচলন ঢোল-তবলা ও বাদ্যযন্ত্র ব্যবহারের মাধ্যমে তৃতীয় শতাব্দী হতে শুরু হয়। এর পূর্বে গান ঢোল-তবলা ও বাদ্যযন্ত্রের মাধ্যমে প্রচলন ছিল না। এ জন্যে বলা যায়, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তার সাহাবিদের যুগে গেনা দ্বারা যা বোঝানো হতো, তা বর্তমানের বাদ্যযন্ত্র ইতাদি বাজিয়ে যেভাবে গান-বাজনা করা হয় তা নয়; বরং তা হলো, কবিতা আবৃত্তি।

এ কারণেই এ কথা স্পষ্ট যে, সাহাবিদের কথা ও আরবদের কবিতার মধ্যে غنى শব্দের যে ব্যবহার পাওয়া যায় তার দ্বারা উদ্দেশ্য কোনো প্রচলিত গান-বাজনা নয়; বরং তার দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, কবিতা ও কাব্য। যেগুলোকে বর্তমানে আমরা হামদ নাত ইত্যাদি বলে আখ্যায়িত করে থাকি। একাধিক ভাষাবিদ, আভিধানিক ও ইমামদের থেকে গেনার এ ব্যাখ্যাটিই বর্ণিত আছে।

মোটকথা, আমাদেরকে অবশ্যই বর্তমানের পরিভাষা ও অতীতের মনীষীদের পরিভাষার মধ্যে পার্থক্য জানতে হবে। অন্যথায় বাস্তবতা হতে আমাদের অনেক দূরে থাকতে হবে। যদিও শব্দটি এক কিন্তু গভীরভাবে চিন্তা করে দেখলে দেখা যাবে শব্দটি উভয় বিষয়কেই অন্তর্ভুক্ত করে। তবে

আমাদেরকে বাহ্যিক অবস্থার প্রতি বিশেষভাবে লক্ষ রাখতে হবে যে, শব্দটির ব্যবহার ও প্রয়োগ কীভাবে হচ্ছে এবং তার সাথে কী মিলছে।

বাজনা হচ্ছে নফসের মদস্বরূপ। মদ যেমন মানুষের ক্ষতি করে, বাদ্যও মানুষের সেই রকম ক্ষতি করে। যখন গান-বাজনা তাদের আচ্ছন্ন করে ফেলে, তখনই তারা শিরকে পতিত হয়। আর তখন তারা ফাহেশা কাজ ও জুলুম করতে উদ্যত হয়। তারা শিরক করতে থাকে এবং যাদের কতল করা নিষেধ তাদেরকেও কতল করতে থাকে। যেনা করতে থাকে। যারা গান-বাজনা করে তাদের বেশির ভাগের মধ্যেই এই তিনটি দোষ দেখা যায়। তাদের বেশির ভাগই মুখ দিয়ে শিস দেয় ও হাততালি দেয়।

গান হলো যেনার রাস্তাস্বরূপ। এর কারণেই বেশির ভাগ ফাহেশা কাজ অনুষ্ঠিত হয় গানের মজলিসে। সেখানে পুরুষ, বালক, বালিকা ও মহিলা চরম স্বাধীন ও লজ্জাহীন হয়ে পড়ে। এভাবে গান শ্রবণ করতে করতে নিজেদের ক্ষতি ডেকে আনে। তখন তাদের জন্য ফাহেশা কাজ করা সহজ হয়ে দাঁড়ায়, যা মদ্যপানের সমতুল্য কিংবা আরও অধিক।

গান-বাজনা শ্রবণে অন্তরের কোনো লাভ হয় না, তাতে কোনো উপকারও নেই; বরং ওতে আছে গোমরাহি এবং ক্ষতি—যা লাভের থেকেও বেশি ক্ষতিকর। তা রুহের জন্য ওই রকম ক্ষতিকর যেমন মদ শরীরের জন্য ক্ষতিকর। ফলে যারা সংগীত শ্রবণ করে, তাদের নেশা মদ্যপায়ীর নেশা থেকেও অনেক বেশি হয়। তারা ওতে যে মজা পায়, তা মদ্যপায়ীর থেকেও অনেক বেশি।

গান-বাজনা নিষিদ্ধ হওয়ার ব্যাপারে প্রমাণাদি

কুরআন : আসলে নাচ-গানের ক্ষতি এত বেশি যে তা নাজায়েয হওয়ার জন্য আলাদা কোনো প্রমাণের দরকার পড়ে না। তদুপরি মহান আল্লাহ ও রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বহু ভাষ্য থেকে তা হারাম হওয়া প্রমাণিত। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন,

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ

'আর মানুষের মধ্য থেকে কেউ কেউ না জেনে আল্লাহর পথ থেকে মানুষকে বিভ্রান্ত করার জন্য বেহুদা কথা খরিদ করে, আর তারা ওইগুলোকে হাসি-ঠাট্টা হিসেবে গ্রহণ করে; তাদের জন্য রয়েছে লাঞ্ছনাকর আযাব।'[১]

বেশির ভাগ তাফসিরকারক 'লাহওয়াল হাদিস' বলতে গানকে বুঝিয়েছেন।[২] হজরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. বলেন, তা গান। ইমাম হাসান বসরি রহ. বলেন, তা গান ও বাদ্য সম্পর্কে নাজিল হয়েছে। আল্লাহ তায়ালা সুরা নজমে আরও বলেন,

أَفَمِنْ هَٰذَا الْحَدِيثِ تَعْجَبُونَ * وَتَضْحَكُونَ وَلَا تَبْكُونَ * وَأَنتُمْ سَامِدُونَ

'তোমরা কি এ কথায় বিস্ময়বোধ করছ? আর হাসছ এবং কাঁদছ না? আর তোমরা তো গাফিল।'[৩]

যেমন ইবনে জারির আততাবারি ইকরামা হতে এবং তিনি আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, এখানে আয়াতে সামেদুন অর্থ গান-বাজনা। আল্লাহ তায়ালা কুরআনে কারীমে ইবলিসকে সম্বোধন করে বলেন, 'তোমার কণ্ঠ দিয়ে তাদের মধ্যে যাকে পার প্ররোচিত করো, তাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ো তোমার অশ্বারোহী ও পদাতিক বাহিনী নিয়ে।'[৪]

এখানে ইবলিসের আওয়াজ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, গান। এতেও প্রমাণিত হয়, গান হারাম। মুজাহিদ বলেন, ইবলিসের আওয়াজ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো 'গান-বাজনা।' কুরআন মাজিদের অন্য আয়াতে আছে, ইবলিস-শয়তান আদম সন্তানকে ধোঁকা দেওয়ার আরজি পেশ করলে আল্লাহ তায়ালা ইবলিসকে বললেন,

وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ

'তোমার কণ্ঠ দিয়ে তাদের মধ্যে যাকে পার প্ররোচিত করো।'[৫]

---

১ সুরা লোকমান : আয়াত ৬

২ আল্লাহ তাআলা মক্কাতেই অর্থাৎ ইসলামের প্রাথমিক অবস্থায় গান-বাদ্যকে হারাম ঘোষণা করেন। এতেই অনুমেয় যে গান একজন মুসলমানের জন্য কতবড় ক্ষতিকর এবং বান্দার ওপর তার প্রভাব যে কত মারাত্মক। আল্লাহ তাআলা সুরা নজমে ও সুরা লোকমানে গান হারাম হওয়ার বিষয়ে ঘোষণা দেন। আর সুরাদ্বয় অবশ্যই মক্কি সুরা।

৩ সুরা নজম : আয়াত ৫৯-৬১

৪ সুরা ইসরা : আয়াত ৬৪

৫ সুরা বনি ইসরাঈল : আয়াত ৬৪

এ আয়াতের ব্যাখ্যায় হজরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. বলেন, যে সকল বস্তু পাপাচারের দিকে আহ্বান করে তা-ই ইবলিসের আওয়াজ। বিখ্যাত তাবেয়ি মুজাহিদ রহ. বলেন, ইবলিসের আওয়াজ বলতে এখানে গান ও বাদ্যযন্ত্রকে বোঝানো হয়েছে।

বস্তুত গান-বাজনার ক্ষতিকর প্রভাব এত বেশি যে, তা নাজায়েয হওয়ার জন্য আলাদা কোনো দলীল খোঁজার প্রয়োজন পড়ে না। এতৎসত্ত্বেও রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বহু হাদিসের মাধ্যমে তা প্রমাণিত।

সুন্নাহ : বিখ্যাত তাবেয়ি হজরত নাফে' রহ. থেকে সহিহ সনদে বর্ণিত, তিনি বলেন, একবার চলার পথে আবদুল্লাহ ইবনে উমর রা. বাঁশির আওয়াজ শুনলেন। সঙ্গে সঙ্গে তিনি দুই কানে আঙ্গুল দিলেন। কিছুদূর গিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, হে নাফে'! এখনো কি আওয়াজ শুনছ? আমি বললাম, হ্যাঁ। অতঃপর আমি যখন বললাম, এখন আর আওয়াজ শোনা যাচ্ছে না তখন তিনি কান থেকে আঙ্গুল সরালেন এবং বললেন, একবার রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চলার পথে বাঁশির আওয়াজ শুনে এমনই করেছিলেন।[৬]

বাজনাদার নুপুর ও ঘুঙুরের আওয়াজও সাহাবায়ে কেরাম বরদাশত করতেন না। তাহলে গান ও বাদ্যযন্ত্রের প্রশ্ন কি অবান্তর নয়? নাসাঈ ও সুনানে আবু দাউদে বর্ণিত আছে, একদিন হজরত আয়েশা রা.-এর নিকট বাজনাদার নুপুর পরে কোনো বালিকা আসলে আয়েশা রা. বললেন, খবরদার! তা কেটে না ফেলা পর্যন্ত আমার ঘরে প্রবেশ করবে না। অতঃপর তিনি বললেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, যে ঘরে ঘন্টি থাকে সেই ঘরে রহমতের ফেরেশতা প্রবেশ করে না।[৭] মৃদু আওয়াজের ঘন্টি-ঘুঙুরের যদি এই অবস্থা হয় তাহলে আধুনিক সুরেলা বাদ্যযন্ত্রের বিধান কী হবে তা খুব সহজেই বোঝা যায়। গান-গায়িকা এবং এর ব্যবসা ও চর্চাকে হারাম আখ্যায়িত করে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,

---

৬ মুসনাদে আহমদ, হাদিস : ৪৫৩৫; সুনানে আবু দাউদ হাদিস : ৪৯২৪। বিখ্যাত তাবেয়ী মুজাহিদ রাহ. থেকেও এমন একটি হাদিস বর্ণিত হয়েছে।-ইবনে মাজাহ হাদিস : ১৯০১

৭ সুনানে আবু দাউদ, হাদিস : ৪২৩১; সুনানে নাসাঈ, হাদিস : ৫২৩৭
সহিহ মুসলিমে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, ঘন্টি, বাজা, ঘুঙুর হলো শয়তানের বাদ্যযন্ত্র।-সহিহ মুসলিম, হাদিস : ২১১৪

لاَ تَبِيعُوا الْقَيْنَاتِ وَلاَ تَشْتَرُوهُنَّ وَلاَ تُعَلِّمُوهُنَّ وَلاَ خَيْرَ فِى تِجَارَةٍ فِيهِنَّ وَثَمَنُهُنَّ حَرَامٌ

'তোমরা গায়িকা (দাসী) ক্রয়-বিক্রয় কোরো না এবং তাদেরকে গান শিক্ষা দিও না। আর এসবের ব্যবসায় কোনো কল্যাণ নেই। জেনে রেখো, এর প্রাপ্ত মূল্য হারাম।'[১]

لَيَشْرَبَنَّ أُنَاسٌ مِنْ أُمَّتِي الْخَمْرَ يُسَمُّونَهَا بِغَيْرِ اسْمِهَا وَتُضْرَبُ عَلَى رُءُوسِهِمُ الْمَعَازِفُ يَخْسِفُ اللهُ بِهِمُ الأَرْضَ وَيَجْعَلُ مِنْهُمْ قِرَدَةً وَخَنَازِيرَ.

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও ইরশাদ করেন, আমার উম্মতের কিছু লোক মদের নাম পরিবর্তন করে তা পান করবে। আর তাদের মাথার উপর বাদ্যযন্ত্র ও গায়িকা রমণীদের গান বাজতে থাকবে। আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে জমিনে ধসিয়ে দেবেন।[২]

হজরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. বলেন,

الْغِنَاءُ يُنْبِتُ النِّفَاقَ فِى الْقَلْبِ كَمَا يُنْبِتُ الْمَاءُ الزَّرْعَ

পানি যেমন (ভূমিতে) তৃণলতা উৎপন্ন করে তেমনি গান মানুষের অন্তরে নিফাক সৃষ্টি করে।[৩]

উপরোক্ত বাণীর সত্যতা এখন দিবালোকের ন্যায় পরিষ্কার। গান-বাজনার ব্যাপক বিস্তারের ফলে মানুষের অন্তরে এই পরিমাণ নিফাক সৃষ্টি হয়েছে যে, সাহাবিদের ইসলামকে এ যুগে অচল মনে করা হচ্ছে এবং গান-বাদ্য, নারী-পুরুষের মেলামেশা ইত্যাদিকে হালাল মনে করা হচ্ছে।

গানের ব্যাপারে চার ইমামের অভিমত

গান ও বাদ্যযন্ত্রের ব্যাপারে ইমাম আবু হানিফা, ইমাম মালেক, ইমাম শাফেয়ি ও ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল রহ. অভিন্ন সিদ্ধান্ত প্রদান করেছেন। সকলেই গান-বাদ্যকে হারাম বলে আখ্যায়িত করেছেন। আবদুল্লাহ হতে

---

১ জামে তিরমিযি : হাদিস নং ১২৮২; সুনানে ইবনে মাজাহ : হাদিস নং ২১৬৮
২ সুনানে ইবনে মাজাহ হাদিস : ৪০২০; সহিহ ইবনে হিব্বান হাদিস : ৬৭৫৮
৩ তাফসীরে কুরতুবী ১৪/৫২

বর্ণিত, তার পিতা ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল রহ. বলতেন, গান অন্তরে নিফাক সৃষ্টি করে। ইসমাঈল ইবনে ইসহাক সাকাফী রহ. বলেন, জনৈক ব্যক্তি ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বলের কাছে কাসিদা শুনতে চাইলে তিনি বলেন, এটাকে আমি মাকরুহ মনে করি।

ইমাম মালেক রহ.-কে গান-বাদ্যের ব্যাপারে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন, কেবল ফাসিকরাই তা করতে পারে।[৪] ইমাম শাফেয়ি রহ. বলেছেন, গান-বাদ্যে লিপ্ত ব্যক্তি হলো আহমক। তিনি আরও বলেন, সর্বপ্রকার বীণা, তন্ত্রী, ঢাকঢোল, তবলা, সারেঙ্গী সবই হারাম এবং এর শ্রোতা ফাসেক। তার সাক্ষ্য গ্রহণ করা হবে না।[৫]

হাম্বলী মাযহাবের প্রখ্যাত ফকিহ আল্লামা আলী মারদভী লেখেন, বাদ্য ছাড়া গান মাকরুহে তাহরীমী। আর যদি বাদ্য থাকে তবে তা হারাম। ইমাম শাফেয়ি রহ. শর্তসাপেক্ষে শুধু ওলিমা অনুষ্ঠানে দফ বাজানোর অবকাশ আছে বলে মত দিয়েছেন। কেননা বিয়ের ঘোষণার উদ্দেশ্যে ওলিমার অনুষ্ঠানে দফ বাজানোর অবকাশের বর্ণনা হাদিসে রয়েছে। মনে রাখতে হবে, এখানে দফ বাজানোর উদ্দেশ্য হলো বিবাহের ঘোষণা, অন্য কিছু নয়।[৬]

গান-বাজনা ও ছেমার ব্যাপারে সুফিদের মতবাদ

গ্রন্থকার বলেন, পূর্ববর্তী সুফিদের একটি জামাত তাসাওউফে নবাগতদেরকে ছেমা[৭] থেকে দূরে থাকতে বলতেন। তাদের জানা ছিল—নবাগতরা এতে উত্তেজিত হয়ে পড়বে। আবদুল্লাহ ইবনে সালেহ বলেন, আমাকে জুনাইদ বলেছেন, যখন তুমি মুরিদদের ছেমা শুনতে দেখো, তখন জেনে নেবে

---

৪ কুরতুবী ১৪/৫৫

৫ প্রাগুক্ত

৬ জামে তিরমিযি হাদিস : ১০৮৯; সহিহ বুখারি হাদিস : ৫১৪৭, ৫১৬২

৭ 'ছেমা' বা 'সামা' (সেমা) অর্থ 'শ্রবণ'। সাহাবি-তাবেয়িগণের যুগে সামা বলতে কুরআন শ্রবণ ও রাসুলে আকরামের জীবনী, কর্ম ও বাণী শ্রবণকেই বোঝানো হতো। এগুলোই তাঁদের মনে আল্লাহ-প্রেমের ও নবী-প্রেমের জোয়ার সৃষ্টি করত। কোনো মুসলিম কখনোই আল্লাহর নৈকট্য অর্জনের জন্য বা হৃদয়ে আল্লাহর প্রেম সৃষ্টি করার জন্য গান শুনতেন না। সমাজের বিলাসী ও অধার্মিক মানুষের মাঝে বিনোদন হিসেবে গান-বাজনার সীমিত প্রচলন ছিল, কিন্তু আলেমগণ তা হারাম জানতেন। ২/১ জন বিনোদন হিসেবে একে জায়েয বলার চেষ্টা করেছেন, কিন্তু কখনোই এ সকল কর্ম আল্লাহর নৈকট্য অর্জনের মাধ্যম বলে গণ্য হয়নি।

এখনো তার মধ্যে খেল-তামাশার আগ্রহ বিদ্যমান রয়েছে। মুরতায়াশ বলেন, আমি আবুল হাসান সাওরি থেকে শুনেছি, তিনি তার এক সহপাঠীকে বলেছেন, যখন তুমি মুরিদদেরকে কাসিদা, কবিতা ও গান ইত্যাদি শুনতে দেখবে এবং তাতে জোশ, উত্তেজনা ও প্রশান্তির তৃপ্তি পাবে, তখন তার কাছ থেকে কোনো ভালো বিষয়ের আশা রেখো না।

গ্রন্থকার বলেন, সুফিদের গুরুদের কথা ছিল এমনই। কিন্তু পরবর্তী সময়ে তারা খেল-তামাশার প্রতি অধিক ঝুঁকে পড়ার কারণে এর বৈধতা দিতে থাকে। ফলে এর দ্বারা দু'টি মন্দ ধারার সৃষ্টি হয়। প্রথমত সাধারণ মানুষ পূর্ববর্তী সুফিদের সম্পর্কে মন্দ ধারণা পোষণ করে। কেননা তারা মনে করে, তারা সবাই এমনই ছিলেন। দ্বিতীয়ত সাধারণ মানুষ এ দ্বারা খেল-তামাশায় মত্ত হওয়ার প্ররোচনা পাচ্ছে। এটাকে তারা প্রমাণ হিসেবে উপস্থাপনের প্রয়াস পাচ্ছে। তাই তারা বলে, উনি এমন করেছেন, ইনি এমন করছেন ইত্যাদি।

গ্রন্থকার আল্লামা ইবনুল জাওযি রহ. বলেন, অধিকাংশ সুফির অন্তরে ছেমার প্রতি গভীর অনুরাগ দেখা যায়। এমনকি তারা কুরআন ছেড়ে এই ছেমাকেই প্রাধান্য দিতে থাকে। এ সব এজন্যই হয়েছে যে, প্রবৃত্তির তাড়না এবং মনের খায়েশের কাছে তারা পরাজিত হয়ে গেছে। আবু হাতেম সাজিস্তানী বলেন, আমি আবু নাসার সিরাজকে বলতে শুনেছি, আমাকে আমার এক বন্ধু বলেছেন, আবুল হোসাইন দরাজ বলতেন, আমি বাগদাদে ইউসুফ ইবনে হোসাইন রাযীর সাক্ষাতে গিয়ে তার ঘর সম্পর্কে জানতে চাইলাম। যার কাছেই তার সম্পর্কে জানতে চাই, সে-ই উত্তরে বলে, এই ধর্মদ্রোহী সম্পর্কে কিছু জানতে চেয়ো না। এতে আমি ভীষণ বিচলিত হয়ে পড়লাম। ফলে আমি ফিরে আসার ইচ্ছা করলাম। সে রাতে একটি মসজিদে থাকার সুযোগ হলো। সেখানে মনে মনে চিন্তা করলাম, আমি এতদূর এলাম, তার সাথে দেখা না করে কী করে ফিরে যাই! এই ভাবনায় আবার তার ঠিকানার সন্ধানে বেরিয়ে পড়ি। এমন করে সেই আগের মসজিদে গিয়ে দেখতে পাই, এক লোক মেহরাবের কাছে রেহাল হাতে কুরআন তেলাওয়াত করছে। আমি তাকে গিয়ে সালাম দিলাম। তিনি সালামের উত্তর দিয়ে আমার পরিচয় জানতে চাইলেন। আমি বললাম, আমি বাগদাদ থেকে আপনার সাক্ষাতে এসেছি। তিনি বললেন, তুমি কি সুললিত কণ্ঠে কিছু পড়তে পার? আমি নিম্নোক্ত কবিতাটি পড়লাম–

رأيتك تبني دائما في قطيعتي * ولو كنت ذا حزم لهدمت ما تبني

'হে প্রিয়! আমি দেখছি, তুমি আমার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করতে চাচ্ছ, যদি তুমি দূরে অবস্থান করো তাহলে এর ভিত্তি মূলোৎপাটন সম্ভব।'

এই কবিতা শুনে তিনি কুরআন শরিফ বন্ধ করে দিলেন এবং এমনভাবে ক্রন্দন করতে থাকলেন যে, তার দাড়ি ও কাপড়-চোপড় ভিজে যাচ্ছিল। পরে তিনি আমাকে বললেন, এখানকার অধিবাসী আমাকে ধর্মদ্রোহী বলে অপবাদ দিচ্ছে। নামাযের সময় পর্যন্ত আমি এই স্থানে বসে কুরআন পড়তে থাকি, কিন্তু কখনো আমার চোখ থেকে এক ফোঁটা অশ্রু প্রবাহিত হয় না। কিন্তু তোমার এই কবিতাটি শুনে তো আমার ওপর কিয়ামত পতিত হচ্ছে।

আবু আবদুর রহমান সালামী বলেন, আমি ওস্তাদ আবু সাহাল সালুকির জীবদ্দশায় মরুভূমিতে চলে গিয়েছিলাম। আমি ওখানে চলে যাওয়ার আগে ওস্তাদ এখানে কিছুদিন অবস্থান করেছিলেন। প্রত্যহ তিনি জনসমাবেশে কুরআন ও খতমের ব্যবস্থা করেছিলেন। আমি চলে যাওয়ার পর এই সমাগম বন্ধ হয়ে যায়। সেখানে লোকজন ইবনে ফারগানীর নামে কাউয়ালি এবং রাগ সংগীতের মজলিস কায়েম করে। একদিন ওস্তাদ জিজ্ঞেস করলেন, লোকজন পরস্পর কিসের যেন আলোচনা করছে। আমি বললাম, কুরআনের মজলিস উঠিয়ে সেখানে সংগীতের ব্যবস্থাপনা করা হয়েছে। তিনি শুনে বললেন, যে ব্যক্তি তার ওস্তাদকে এমন বলবে যে, এটা কেন হলো? সে কখনো সফল হবে না।

গ্রন্থকার বলেন, এটা সুফিদের অভ্যাস যে, তারা বলে থাকে, নিজেকে সম্পূর্ণরূপে পীরের হাওয়ালা করে দিতে হবে। অথচ এমন কেউ নেই যারা সম্পূর্ণরূপে নিজেকে সোপর্দ করে দিতে পারে। কেননা মানুষ শরিয়ত ও জ্ঞান-বুদ্ধির সাহায্যে নিজের সমুদয় সমস্যা সমাধান করে থাকে। অন্যদিকে চতুষ্পদ জন্তু তার চিৎকারের সাহায্যে নিজের সমস্যার সমাধান করে বেড়ায়।

সুফিদের গান-বাজনার বিধান

গানের যে সকল ব্যাপারে আমরা আলোকপাত করেছি যে, কিছু আলেমের মতে তা হারাম, কারও মতে মাকরুহ। সুফিদের একটি গ্রুপ মনে করে তাদের জন্য গান মুস্তাহাব। আবু আলী দাক্কাক বলেন, সাধারণ মানুষের

জন্য ছেমা হারাম, কেননা তাদের নফস জীবিত। যাহেদদের জন্য ছেমা মুবাহ বা বৈধ, কেননা তারা আত্মশুদ্ধির ব্যাপারে সজাগ থাকে। পক্ষান্তরে আমাদের সুফিদের জন্য ছেমা মুস্তাহাব, কেননা তাদের অন্তর জীবিত।

গ্রন্থকার বলেন, এ কথাটি পাঁচটি কারণে ভুল। যথা–

১. আবু হামেদ গাযালির সূত্রে আমরা বর্ণনা করেছি যে, ছেমা সবার জন্য বৈধ। এদিকে আবু আলী থেকে গাযালি অনেক বেশি মারেফতবিজ্ঞ।

২. নফস প্রাকৃতিক অভ্যাসের অনুসারী হওয়ার ব্যাপারে কোনো মতানৈক্য নেই। মুজাহাদা দ্বারা কেবল এটুকু লাভ পাওয়া যায় যে, অভ্যাসগত কর্মকাণ্ড থেকে বিরত রাখে। যে ব্যক্তি অভ্যাস পরিবর্তন হওয়ার দাবি করে, সে একটি অসম্ভব বিষয়ের দাবিদার। কেননা এক্ষেত্রে বাধাদানকারী বিষয়টির অবর্তমানে অভ্যাস পূর্বের স্থানে ফিরে যেতে বাধ্য।

৩. ছেমা'র বৈধ-অবৈধ হওয়ার ব্যাপারে আলেমদের মাঝে মতানৈক্য আছে। কোনো আলেম শ্রোতার অভ্যাসের দিকে দৃষ্টিপাত করার অবকাশ পাননি। কেননা তারা মনে করেন, সবার অভ্যাস সমান। এখন যদি কেউ এমন দাবি করে যে, তার অভ্যাস সচরাচর মানুষের অভ্যাসের বিপরীত, তাহলে সে নিশ্চয় অসম্ভবের দাবিদার বলে সাব্যস্ত হবেন।

৪. এ ব্যাপারে আলেমদের ঐকমত্য রয়েছে যে, ছেমা বৈধ। কিন্তু এটাকে মুস্তাহাব বলে অভিহিত করা ইজমার বিপরীত।

৫. যার অভ্যাসে রূপান্তর ঘটেছে তার জন্য ছেমা শোনা মুবাহ বা মুস্তাহাব হওয়া আবশ্যক হয়ে যায়। এতে তার চরিত্রে বিবর্তন ঘটে এবং তাকে প্রবৃত্তির তাড়না নিবারণ করতে উৎসাহিত করে। এই আশঙ্কা না থাকলে মুবাহ বা বৈধ হওয়া যুক্তিযুক্ত। অথচ এ ব্যাপারে আমরা পূর্বে আলোচনা করে এসেছি।

ছেমা ও গানের মাধ্যমে আল্লাহর নৈকট্যলাভের দাবির অসারতা

গ্রন্থকার বলেন, তাদের একটি গোষ্ঠীর ধারণা—ছেমার দ্বারা আল্লাহর নৈকট্য অর্জিত হয়। আবু তালেব মক্কি বলেন, আমাদের কিছু মুরুব্বি বলেছেন যে, জুনাইদ রহ. বলতেন, সুফিদের মজলিসে তিনবার রহমত অবতীর্ণ হয়। ১. পানাহারের সময়। কেননা সুফিরা ক্ষুধা না লাগলে আহার করেন না। ২. যখন আমরা পরস্পর জিকির করি, কেননা সে সময় তারা

সিদ্দীকিনদের মর্যাদা ও নবীদের অবস্থা পর্যবেক্ষণের অবকাশ পান। ৩. ছেমার সময়। কেননা তারা 'ওজদ' এর সাথে তা শ্রবণ করে এবং তারা সত্যের সাক্ষী দিয়ে থাকে।

গ্রন্থকার বলেন, আমার মতে—এ কথা যদি জুনাইদ থেকে সহিহ সূত্রে প্রাপ্ত হয়ে থাকে, তাহলে বুঝতে হবে এটা যাহেদানা কাসীদার ছেমার ওপর নির্ভর। কেননা এটা নম্রতার উপকরণ। অন্যথায় সাওদা ও লায়লার প্রশংসার সময় যদি রহমত অবতীর্ণ হওয়ার ব্যাপারে সম্বন্ধযুক্ত করা হয়, তাহলে এটা খুবই গর্হিত আকিদা বলে বিবেচিত হবে। জুনাইদের আমলে আজকালের মতো কবিতা-গান গাওয়া হতো না। বর্তমান প্রেক্ষাপট ভিন্ন। তাই তুলনাও অসার। লেখক বলেন, এমন বিশ্বাস লালন করা মানুষকে কুফরীর কাছাকাছি নিয়ে যায়। কেননা সে হারাম ও মাকরুহ বিষয়কে আল্লাহর নৈকট্যের উপকরণ বলে মনে করেছে।

'ওয়াজদ' এর ব্যাপারে সুফিদের ওপর শয়তানের ধোঁকা

গ্রন্থকার বলেন, এ সব লোক গানের আবেশে উদ্বেলিত হয়ে নাচানাচি করতে থাকে। এটাকে 'ওয়াজদ' অর্থাৎ আবেগ, উত্তেজনা, উন্মত্ততা বলা হতো। এই ছেমা বা সংগীত ও ওয়াজদ অর্থাৎ গানের আবেশে তন্ময় হয়ে নাচানাচি বা উন্মত্ততা ৫ম হিজরি শতাব্দী থেকে সুফি সাধকদের কর্মকাণ্ডের অন্যতম অংশ হয়ে যায়। সামা ব্যতিরেকে কোনো সুফি খানকা বা সুফি দরবার কল্পনা করা যেত না।

এদিকে যখন সামা সংগীতের ব্যাপক প্রচলন হয়ে গেল নেককার মানুষদের মাঝে তখন জালিয়াতগণ তাদের মেধা খরচের একটি বড় ক্ষেত্র পেয়ে গেল। তারা সামা, ওয়াজদ প্রভৃতির ক্ষেত্রে বিভিন্ন হাদিস বানিয়ে প্রচার করে। গানের মজলিসে আবেগে উদ্বেলিত হয়ে অচেতন হওয়া বা নাচানাচি করাকে ইশকের বড় নিদর্শন বলে গণ্য করা হতো। জালিয়াতরা এ বিষয়ে কিছু হাদিস বানিয়ে নিয়েছিল। অথচ এটা ছিল ইবলিসের মস্ত বড় প্ররোচনা। এই দলটি প্রমাণ হিসেবে ওই হাদিসটি উদ্ধৃতি দিয়ে থাকে যা আমি আবু নাসার আবদুল্লাহ ইবনে আলী সিরাজ তুসি থেকে পেয়েছি। তিনি বলেন, তারা বলে থাকে—যখন وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ অর্থাৎ 'এ

সকল কাফেরদের জন্য জাহান্নাম প্রতিশ্রুত'[১]—এই আয়াত অবতীর্ণ হয়, তখন হজরত সালমান ফারেসী রা. উচ্চশব্দে তালি বাজালেন। এতে তাঁর মাথার চুল পড়ে গেল। পরে তিনি তিনদিন গোপন থাকেন।

অনুরূপভাবে সুফিরা আরেকটি কথাকে প্রমাণ হিসেবে উপস্থাপন করে যা আবু ওয়ায়েল থেকে আমি জানতে পারি। তিনি বলেন, আমরা আবদুল্লাহর সাথে কোথাও যাচ্ছিলাম। আমার সাথে রবী' ইবনে হাইসামও ছিলেন। আমরা এক কামারের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলাম। আবদুল্লাহ দাঁড়িয়ে ওই লোহাটি দেখছিলেন, যা আগুনের মধ্যে ছিল। রবী'ও লোহা দেখছেন এবং কাঁপতে কাঁপতে তিনি পড়ে যাওয়ার উপক্রম হলো। পরে সম্মুখে গিয়ে ফোরাত নদীর তীরে এক কামারের দোকানে গেলে অগ্নির বিচ্ছুরণ দেখতে পেয়ে এই আয়াত পড়েন,

إِذَا رَأَتْهُمْ مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ سَمِعُوا لَهَا تَغَيُّظًا وَزَفِيرًا

"দূর হতে আগুন যখন তাদেরকে দেখবে তখন তারা তার ক্রুদ্ধ গর্জন ও প্রচণ্ড চিৎকার শুনতে পাবে।"[২] এ আয়াত পড়ে তিনি মূর্চ্ছা যান। আবদুল্লাহও তার পাশে অবস্থান করেন। এভাবে যোহর নামায আদায় করেন। তখনও তার সংজ্ঞা ফেরেনি। এমনকি আসরের সময়ও তার হুঁশ ফেরেনি। মাগরিবের সময় হলে আবদুল্লাহ ঘরে ফিরে আসেন।

সুফিরা বলেন, এমন অনেক ঘটনা আছে যে, কোনো কোনো আল্লাহর বান্দা কুরআন শরিফ শুনে মৃত্যুবরণ করেন। কেউ-বা মূর্চ্ছা যান। আবার কেউ চিৎকার করে ওঠেন। এমন ঘটনা যুহুদ তথা কৃচ্ছ্রব্রতের কিতাবসমূহে বিস্তর রয়েছে।

উত্তর : হজরত সালমান রা. সম্পর্কে যে আলোচনা করা হয়েছে তা ভুল ও নিছক বিভ্রান্তি। এছাড়া ওই হাদিসের কোনো ভিত্তি নেই। উক্ত আয়াত মক্কায় অবতীর্ণ হয়, অথচ হজরত সালমান ফারেসী রা. মদিনায় ইসলাম গ্রহণ করেন। কোনো সাহাবি এমন ঘটনা কখনো বলেননি। বাকি রইল রবী' ইবনে হাইসামের ঘটনা। তো, এর রাবি ঈসা ইবনে সালীম 'দুর্বল' রাবি হিসেবে সাব্যস্ত। সুফিয়ান সাওরি বলেন, রবী' ইবনে হাইসামের পক্ষ

---

১ সুরা হজর : আয়াত ৪৩

২ সুরা ফুরকান : আয়াত ১২

থেকে এমন ঘটনা ঘটতেই পারে। কিন্তু সাহাবা বা তাবেয়িদের কারও কাছ থেকে এমন ঘটনার কথা কোথাও নেই।

গ্রন্থকার বলেন, আল্লাহ যদি তাওফিক দেন তবে জেনে নিন যে, সাহাবাদের অন্তর ছিল খুবই পরিষ্কার। তারা আবেগের আধিক্যে প্রচুর কান্নাকাটি করতেন। কোনো বিষয়ের আবেশে তন্ময় হয়ে নাচানাচি বা উন্মত্ততা কখনোই করেননি। সাবেত আমাকে হজরত আনাসের হাদিস শুনিয়েছেন :

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, 'এরা কে যে আমাদের দীনকে তাদের সাথে গুলিয়ে ফেলে? যদি সে সত্যবাদী হয়ে থাকে তাহলে সে নিজেকে যেন প্রকাশ করে। আর সে যদি মিথ্যাবাদী হয়ে থাকে তাহলে আল্লাহ তাকে ধ্বংস করবেন।'[৩]

হজরত আনাস রা. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'আমরা দেখেছি, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদিন আমাদেরকে ওয়াজ করেছেন। এতে ওয়াজের প্রভাবে লোকজনের কান্নার শব্দ শুনেছি। কিন্তু কাউকে পড়ে যেতে দেখিনি।'[৪]

হজরত হোসাইন ইবনে আবদুর রহমান হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আসমা বিনতে আবু বকর রা. এর কাছে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাহাবাদের কুরআন পড়াকালীন অবস্থা সম্পর্কে জানতে চাইলে তিনি বলেন, তাদের অবস্থা তেমনই হতো যেমন আল্লাহ তায়ালা বর্ণনা করেছেন। অথবা এমন বলেছেন, যেভাবে আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে গুণান্বিত করেছেন। অর্থাৎ চোখ ভেজা ভেজা থাকত। তাঁদের শরীরের পশম দাঁড়িয়ে যেত। আমি বললাম, আমাদের এখানে এমন অনেক লোক আছে, যাদের সামনে কুরআন পড়া হলে তারা বেহুঁশ হয়ে পড়েন। হজরত আসমা রা. শুনে বললেন, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 'আমরা আল্লাহর কাছে শয়তান থেকে পানাহ চাই।'

হাসান বসরি রহ. হতে বর্ণিত। তিনি একদিন ওয়াজ করছিলেন। এক ব্যক্তি সেই ওয়াজে দীর্ঘশ্বাস ফেললে হাসান বসরি রহ. বললেন, এই দীর্ঘশ্বাস যদি আল্লাহর জন্য হয়, তবে তুমি নিজেকে প্রসিদ্ধ করলে। আর যদি গাইরুল্লাহর জন্য করে থাকো তাহলে তুমি নিজেকে ধ্বংস করে দিলে।

---

৩ ইমাম যাহাবী রহ. তার 'মীযানুল ই'তিদাল' গ্রন্থে এটাকে বাতিল বলেছেন।

৪ হাদিসটির সনদ 'যঈফ'। এখানে রূহ ইবনে আতা আছেন, তিনি যঈফ রাবী।

ফুযাইল ইবনে আয়ায রহ. তাঁর পুত্রকে বলেন, যে এমন অবস্থায় কেঁপে কেঁপে পড়ে যেতেন, যদি তুমি সত্যবাদী হও তাহলে তুমি নিজেকে হাসির পাত্র বানালে। আর যদি মিথ্যাবাদী হও তাহলে তুমি নিজেকে ধ্বংস করে দিলে। অন্য বর্ণনায় আছে, তিনি ছেলেকে বলেছেন, হে বৎস! যদি তুমি সত্যবাদী হও তাহলে তোমার ভেতরে যা ছিল তা প্রকাশ করে দিলে। আর যদি মিথ্যাবাদী হও তাহলে আল্লাহর সাথে শরিক করলে।

'ওয়াজদ' এর ক্ষেত্রে সুফিদের মতবাদ

লেখক রহ. বলেন, যদি কেউ বলে যে, কথা তো সত্যবাদীদের ব্যাপারে চলতে পারে; রিয়াকারদের ব্যাপারে নয়। ওই ব্যক্তির ব্যাপারে কী বলা হবে, যার ওপর অনিচ্ছাকৃতভাবে 'ওয়াজদ' তথা আবেগ, উত্তেজনা, উন্মত্ততার সৃষ্টি হয়? যে তা নিয়ন্ত্রণের সামর্থ্য রাখে না? এর উত্তরে বলা হবে—'ওয়াজদ' আরম্ভ হওয়ার প্রাক্কালে অভ্যন্তরীণ একধরনের পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয়। তখন মানুষ যদি তার নিয়ন্ত্রণে সচেষ্ট হয় যে, কেউ যেন এই অবস্থা অবলোকন করতে না পারে। তখন শয়তান তার থেকে নিরাশ হয়ে দূরে সরে যেতে বাধ্য।

আইয়ুব সাখতিয়ানির ব্যাপারে বলা হয়ে থাকে, তিনি যখন হাদিস বর্ণনা করতেন এবং তার অন্তর খুবই কোমল হয়ে যেত এবং তিনি বেশ আবেগাপ্লুত হয়ে পড়তেন। তখন তিনি নাক মুছতেন এবং বলতেন আবহাওয়া বেশ শীতল অনুভূত হচ্ছে। বোঝা গেল, মানুষ যদি নিজেকে নিয়ন্ত্রণহীন করে রাখে তাহলে শয়তান তার ভেতর কুমন্ত্রণার বীজ বপন করার সাহস ও সুযোগ পায়। তার ফুৎকারে মানুষ উত্তেজিত হয়ে পড়ে।

হজরত যায়নাব রা. এর ভাতিজা হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, হজরত আবদুল্লাহর স্ত্রী যায়নাব বলেন, একদিন আবদুল্লাহ বাইরে থেকে এলে। আমার পাশে একজন বুড়ি বসা ছিলেন, যিনি আমাকে জ্বরের শুশ্রূশা করছিলেন। আমি তাকে চৌকির নিচে লুকিয়ে রাখলাম। আবদুল্লাহ এসে আমার পাশে বসে আমার গলায় একটি তাবিজ ঝোলানো দেখতে পান। জিজ্ঞেস করলেন, এই তাবিজ কিসের? আমি বললাম, আমার জন্য পড়ে ফুঁক দেয়া হয়েছে। আবদুল্লাহ তাবিজটি নিয়ে ভেঙ্গে ফেললেন এবং বললেন, আবদুল্লাহর পরিবার শিরক থেকে মুক্ত। আমি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে শুনেছি, তিনি বলতেন, কণ্ঠিপাথর, তাবিজ

ও এ-জাতীয় দানা শিরক। যায়নাব রা. বলেন, তুমি এটা কেন বলছ? অথচ একবার আমার চোখে ব্যথা অনুভূত হলে আমি অমুক ইহুদির কাছে গিয়ে ঝেড়ে আসি। এরপর এই ব্যথা উপশম হয়ে যায়। আব্দুল্লাহ বললেন, এটা শুধু শয়তানের কারবার। সে তার হাত দিয়ে চোখে ঠোকর মারে। যখন ইহুদি ঝেড়ে দেয় তখন ভালো হয় বলে মনে হয়। তোমাদের জন্য উচিত ছিল, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এমতাবস্থায় যে আমল করতেন, তা করা। তিনি এই দুআ করতেন :

اللَّهُمَّ أَذْهِبْ الْبَأْسَ رَبَّ النَّاسِ ، وَاشْفِ فَأَنْتَ الشَّافِي ، لَا شِفَاءَ إِلَّا شِفَاؤُكَ شِفَاءً لَا يُغَادِرُ سَقَمًا

'হে আল্লাহ মানুষের প্রতিপালক। দুঃখ-কষ্ট দূর করে দিন। শিফা দান করুন। আপনি সুস্থতা দানকারী। আপনার শিফা ব্যতীত কারও শিফা নেই। এমন শিফা দান করুন যাতে কোনো কষ্ট অবশিষ্ট না থাকে।'[১]

'ওয়াজদ'-এর নিয়ন্ত্রণ

যদি বলা হয়, আমরা ওই ব্যক্তি সম্পর্কে জানতে চাই, যারা 'ওয়াজদ' তথা আবেগ, উত্তেজনা, উন্মত্ততা নিয়ন্ত্রণের বহু চেষ্টা করে। কিন্তু পারে না। তা নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায়। তাহলে এখানে শয়তান আসবে কোথা থেকে?

এর জবাবে বলা হবে, আমরা এ কথা অস্বীকার করছি না যে, কেউ কেউ অভ্যাসকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন না। কিন্তু সত্যবাদীর পরিচয় হচ্ছে, তারা জানে না কী ঘটে যাচ্ছে। অতএব তারা ওই দলের—যাদের সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা বলেছেন, فَخَرَّ مُوسَى صَعِقًا 'এবং মুসা বেহুঁশ হয়ে পড়ে গেল।'[২]

আবদুল্লাহ ইবনে ওয়াহাবের সামনে কেয়ামতের ভয়াবহতার কথা আলোচনা করা হলে তিনি বেহুঁশ হয়ে পড়েন এবং কোনো কথা বলতে পারেননি। এভাবে কয়েকদিন পর তিনি ইন্তেকাল করেন।

---

১ সহিহুল জামে' : হাদিস নং ১৬৩২

২ সুরা আ'রাফ : আয়াত ১৪৩

গ্রন্থকার বলেন, আমি বলছি, অনেক মানুষ ওয়াজ শুনে মারা গেছেন এবং বেহুঁশ হয়ে গেছেন। আমি 'ওয়াজদ' বলতে তাদের বোঝাতে চাচ্ছি, যারা শয়তানের ফাঁদে পড়ে বিভিন্ন উন্মত্ততা ও অস্বাভাবিক আচরণ করে থাকে, উচ্চৈঃস্বরে চিৎকার দিতে থাকে। বাহ্যত তাদেরকে কৃত্রিমতার আশ্রয় নিতে দেখা যায়, যা শয়তানের ফাঁদে পড়েই এমন করে বেড়ায়।

গ্রন্থকার আল্লামা ইবনুল জাওযি রহ. বলেন, যদি বলা হয়, ইখলাসওয়ালাদের অবস্থা কি এমন অবস্থার চেয়ে কম হবে? উত্তরে বলা হবে, হ্যাঁ। দু'টি কারণে। ১. যদি তার ইলম শক্তিশালী হয় তাহলে সে তা আয়ত্ত করতে পারবে। ২. সাহাবি ও তাবেয়িদের বিপরীত কর্মকাণ্ড সাধনের কারণে সে বহু পেছনে পড়ে থাকবে।

সুফিয়ান ইবনে উয়াইনা থেকে আমার কাছে হাদিস পৌছেছে। তিনি বলেন, আমি খালাফ ইবনে হাওশাব থেকে শুনেছি যে, খাওয়াত রহ. ওয়াজের সময় কাঁপতেন। তা দেখে ইবরাহিম নাখয়ী বলেছেন যে, তুমি যদি এই অবস্থাকে নিয়ন্ত্রণ করতে পার, তবে আমি তোমাকে হীন ভাবতে অসুবিধার কিছু দেখি না। পক্ষান্তরে যদি নিয়ন্ত্রণ করতে না পার, তবে মনে রেখো, তুমি পূর্ববর্তী মনীষীদের বিপরীত কর্ম সাধন করছ।

গ্রন্থকার বলেন, ইবরাহিম নাখয়ী এমন একজন ফকিহ ছিলেন, যিনি সুন্নাতের খুবই পাবন্দি করতেন এবং মনীষীদের পদাঙ্ক অনুসরণ করতেন। আর খাওয়াত রহ. ভালো লোক ছিলেন এবং কৃত্রিমতার আশ্রয় নিতেন না। তার ক্ষেত্রেও ওয়াজদ এর ব্যাপারে ইবরাহিম নাখয়ী কী পরিমাণ কঠোর ছিলেন, তা সহজেই অনুমেয়।

গান শুনে পরিতৃপ্ত হয়ে তালি দেওয়া ও নাচা

তাসাওউফওয়ালারা কাউয়ালি গান শুনে পরিতৃপ্ত হয়ে হাতে তালি বাজাতে থাকে। তারা বলে, হজরত ইবনে বুনান 'ওয়াজদ' করতেন এবং হজরত আবু সাঈদ খায্যায তালি বাজাতেন।

গ্রন্থকার বলেন, তালি বাজানো মন্দ ও ঘৃণিত স্বভাব। এটা উত্তেজনার বহিঃপ্রকাশ। বুদ্ধিমান লোক এমন কাণ্ড থেকে বিরত থাকেন। কারণ এটা পৌত্তলিকদের নিয়ম। তারা বায়তুল্লাহ শরিফের সন্নিকটে আসার প্রাক্কালে হাত তালি বাজাত। যার নিন্দা জানিয়ে আল্লাহ তায়ালা বলেন,

وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصْدِيَةً فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ

'আর কাবার নিকট তাদের নামায শিস ও হাত-তালি ছাড়া কিছু ছিল না। সুতরাং তোমরা আস্বাদন করো আযাব। কারণ তোমরা কুফরী করতে।'[১]

লেখক বলেন, এতে মহিলাদের সাথেও সাযুজ্য দেখতে পাওয়া যায়। বুদ্ধিমানেরা এমনটি করতে পারেন না। তারা ব্যক্তিত্ব জলাঞ্জলি দিয়ে মুশরিক ও নারীদের সাযুজ্য গ্রহণ করতে পারেন না। এর পর তারা পরিতৃপ্ত হয়ে নাচতে থাকে। প্রমাণ হিসেবে তারা আল্লাহ তায়ালার বাণী أركض برجلك অর্থাৎ 'হে আইয়ুব! স্বীয় পা মাটিতে মারো।'—এটা দ্বারা প্রমাণ সাব্যস্ত করার চেষ্টা চালায়। গ্রন্থকার বলেন, আমার মতে এ আয়াত দ্বারা প্রমাণ নেয়া চরম ধৃষ্টতা। কেননা জমিনে পা মারার নির্দেশ তো আনন্দ প্রকাশের জন্য দেয়া হয়নি; বরং চাহিদামতো পানি প্রাপ্তির নিমিত্তে এমন নির্দেশ এসেছে।

ইবনে আকিল রহ. বলেন, একজন অসুস্থ ব্যক্তির ঘটনা, যার বিপদমুক্তির সময় এমন পা নাড়ানোর নির্দেশ দেয়া হয়েছে এবং তাতে পানি প্রবহমান হওয়ার নবীর মুজেযার অন্তর্ভুক্ত—এ দ্বারা নাচের বিধান নির্ণয় করা আহমকি। ইবনে আকিল আরও বলেন, কুরআনে কড়া ভাষায় সুফি-দরবেশদের এমন পা মারা ও নাচার ব্যাপারে হুঁশিয়ারি এসেছে–

لَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا

'জমিনে দর্পভরে চলো না।'[২]

আল্লাহ তায়ালা অহংকার ও দর্প সহকারে চলাফেরা করার প্রতি নিন্দা জানিয়েছেন। তিনি বলেন,

إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ

নিশ্চয় আল্লাহ কোনো দাম্ভিক অহংকারীকে পছন্দ করেন না।[৩]

তালি বাজানো ও নাচানাচি করা খুশির আতিশয্যে হয়ে থাকে। এতে পূর্ণমাত্রা অহংকার ও দর্প পরিদৃষ্ট হয়ে থাকে। গানের মজলিসে আবেগে

---

১ সুরা আনফাল : আয়াত ৩৫
২ সুরা বনি ইসরাঈল : আয়াত ৩৭
৩ সুরা লোকমান : আয়াত ১৮

উদ্বেলিত হয়ে অচেতন হওয়া বা নাচানাচি করাকে ইশকের বড় নিদর্শন বলে গণ্য করা হতো। জালিয়াতরা এ বিষয়ে কিছু হাদিস বানিয়েছে।

এদের নাচ-গানের মজলিসে চরম পুলকিত হয়ে কেউ কেউ দাঁড়িয়ে উচ্ছ্বাস প্রকাশ করতে থাকে। এমনকি পাশের বসা লোককে ধরে দাঁড় করিয়ে যুগলভাবে নাচানাচি করতে থাকে। এমতাবস্থায় পাশের বসা লোকটি যদি তৎক্ষণাৎ না দাঁড়ায়, তবে এটাকে ধৃষ্টতা হিসেবে বিবেচনা করা হয়। অতঃপর একজনের দেখাদেখি সকলেই সমস্বরে চিৎকার করে দাঁড়াতে শুরু করে এবং লাফালাফি করতে থাকে। এবার কেউ তার মস্তিষ্কাবরণ খুলে ফেললে সকলে তার অনুসরণ করে নিজ নিজ মাথার কাপড় খুলে ছুড়ে ফেলে দেয়। অথচ বুদ্ধিমানমাত্রই এ কথা স্বীকার করে থাকবেন যে, মাথার কাপড় খুলে ফেলা নিন্দনীয় বিষয়। এটা শিষ্টাচারপরিপন্থী। কেবল হজের সময় আল্লাহ তায়ালার সামনে দাসত্বের নিদর্শনস্বরূপ মাথা খোলা রাখা হয়।

আনন্দের আতিশয্যে পোশাক নিক্ষেপ করা ও ছিঁড়ে ফেলা

আধ্যাত্মিক দাবিদার সুফিরা ছেমা ও কাউয়ালিজাতীয় গান-বাদ্য শুনে খুশির আতিশয্যে স্বীয় পোশাক খুলে ছুড়ে ফেলে দেয়। কেউ কেউ তার সঙ্গী-সাথির দিকে নিক্ষেপ করে। আবার কেউ কেউ তা ছিঁড়ে ফেলে দেয়। তাদের এহেন কাণ্ড দেখে অনেক অজ্ঞলোক বলে থাকে, সে তার নিজের ওপর নিয়ন্ত্রণহীন হয়ে পড়েছে। সুতরাং তাকে অভিযুক্ত করা যাবে না। ইবনে আকিলের কাছে এমন কাপড় ছিঁড়ে ফেলা সম্পর্কে জানতে চাইলে তিনি এটাকে গর্হিত ও হারাম কাজ বলে সাব্যস্ত করেন।

وَنَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ إِضَاعَةِ المَا لِ وَعَنْ شَقِّ الجُيُوْبِ

'রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মাল ধ্বংস করা এবং কাপড় ছিঁড়তে নিষেধ করেছেন।'[১]

জিজ্ঞাসু লোকেরা ইবনে আকিলের কাছে আরও জানতে চেয়েছেন যে, এ সব লোক তো কী করছে তা তারা জানে না। তদুত্তরে তিনি বলেছেন,

---

১ সহিহ বুখারি : হাদিস নং ১২৯৪, সহিহ মুসলিম : হাদিস নং ২৮৫

যেখানে অবস্থান করলে তার মস্তিষ্কের বিকৃতি ঘটে এবং হিতাহিত জ্ঞান লোপ পায়, এমন বৈঠকে উপস্থিত হওয়া গুনাহের কাজ।

ইবনে তাহের এই সুফি মতাবলম্বীদের এহেন কর্মকাণ্ডের বৈধতা দিতে গিয়ে হজরত আয়েশা রা. হাদিসের উদ্ধৃতি পেশ করেছেন। হজরত আয়েশা রা. বলেন : 'আমি একটি পর্দা টাঙিয়েছিলাম, যাতে নকশা ও প্রাণীর ছবি অঙ্কিত ছিল। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তা দেখে ছিঁড়ে ফেললেন।'[২]

লেখক বলেন, এই বেচারা দীনহীন লোকের অজ্ঞতার ওপর করুণা হয়। কোন বিষয়কে কী কাজের সাথে সে তুলনা করছে! এটা যদি মেনেও নেয়া হয় যে, তিনি পর্দাটি ছিঁড়ে ফেলেছেন, তবে সাবধান করার জন্য এটা বৈধ। যেমন তিনি মদের ব্যাপারে মদের পাত্র ভেঙে ফেলার নির্দেশ নিয়েছিলেন। কিন্তু কাপড় ছিঁড়ে ফেলার ব্যাপারে এখানে কী যুক্তি থাকতে পারে? এ সব লোককে শয়তান দারুণভাবেই প্ররোচিত করে রেখেছে।

আবু ইমরান আলজুনী বলেন, একবার মুসা ইবনে ইমরান আলাইহিস সালাম ওয়াজ করছিলেন। এতে আবেগের আতিশয্যে শ্রোতাদের মধ্যে একজন নিজের পোশাক ছিঁড়ে ফেললে হজরত মুসা আলাইহিস সালাম এর কাছে অহী আসে যে, যে লোকটি কাপড় ছিঁড়েছে, তাকে বলুন সে যেন কাপড় না ছিঁড়ে; বরং আমার জন্য অন্তরটা স্বচ্ছ রাখে।

অধিকাংশ সুফির ওপর বালকদের ব্যাপারে শয়তানের চক্রান্ত

জেনে রাখা দরকার, অধিকাংশ সুফি নিজেদের ওপর যুবতী নারীদের দর্শনের দ্বার বন্ধ করে দিয়েছেন। তাই তারা নারী সংশ্রব থেকে দূরে থাকেন এবং তাদের সাথে মেলামেশা করেন না। বিবাহ-শাদি ছেড়ে আল্লাহর ইবাদতে মনোনিবেশ করেন। সৎ উদ্দেশ্যে তাদের কাছে তালীম ও দীক্ষা নিতে আসে কিশোর ও বালকেরা। ইবলিস তখন এদের প্রতি সুফিকে আগ্রহী করে তুলে।

জেনে রাখা চাই, কিশোর-যুবকদের সোহবত বা সংশ্রবের ব্যাপারে সুফিরা সাত (৭) ভাগে বিভক্ত।

---

২ এ অর্থের হাদিস সহিহ বুখারিতে এসেছে। হাদিস নং ৫৯৫৪

১. সবচেয়ে নিকৃষ্ট খবিস। এরা সুফিদের বেশভূষা ধারণ করে এবং 'হুলূল' এর মতাদর্শ লালন করে। আবু নাসার আবদুল্লাহ ইবনে সিরাজ বলেন, আমার কাছে বার্তা এসেছে যে, 'হুলূলিয়া' গোত্রের মধ্যে একটি দলের ধারণা হচ্ছে, আল্লাহ তায়ালা বহু শরীরকে স্বীয় হুলূলের জন্য অবলম্বন করেছেন। আর এটা হচ্ছে 'রুবূবিয়্যাত' এর অর্থ। কারও কারও ভাষ্যমতে, আল্লাহ সুন্দর বস্তুতে হুলূল করে থাকেন। আবু আবদুল্লাহ ইবনে হামেদ বলেন, সুফিদের একটি জামাতের মতাদর্শ হচ্ছে, তারা আল্লাহকে পৃথিবীতে দেখে থাকেন। তারা আল্লাহকে মানুষের আকৃতি ধারণ করা সম্ভব বলে মনে করেন। সুন্দর অবস্থার তার ভেতর হুলূল করেন। বহু সময় তারা হাবশী ছেলেকে দেখে তার ভেতর আল্লাহকে দেখার চেষ্টা করেন।

২. দ্বিতীয়ত ওই সকল লোক, যারা সুফিদের সাথে পোশাকের সাদৃশ্য রাখে।

৩. তৃতীয়ত ওই সকল লোক, যারা ভালো বস্তুকে দেখা বৈধ মনে করে থাকেন। আবু আবদুর রহমান সালামী 'সুনানুস সূফিয়াহ' নামক একটি গ্রন্থ লিখেছেন। গ্রন্থটির শেষ পর্যায়ে তিনি একটি অধ্যায়ে লিখেছেন, 'ঐ সকল বিষয়ের বর্ণনা, যে বিষয়ে সুফিদের জন্য ছাড় আছে।' অধ্যায়টিতে গান, বাদ্য ও সুন্দর চেহারা দেখার বিষয় উল্লেখ করে একটি হাদিস উল্লেখ করেছেন, যেখানে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, 'তোমরা ভালো বস্তু সুন্দর আকৃতির মাঝে সন্ধান করো।"[১]

এছাড়াও আছে, "তিনটি বস্তু দেখা চোখের জন্য উপকারী। যথা—১. সবুজ, ২. পানি ও ৩. সুন্দর চেহারা।"[২]

গ্রন্থকার বলেন, উপরোক্ত দু'টি হাদিস রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণিত হওয়ার কোনো প্রমাণ নেই। প্রথম হাদিসের সনদ নিম্নরূপ :

ইবনে উমর রা. হতে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

اُطْلُبُوْا الْخَيْرَ عِنْدَ حِسَانِ الْوُجُوْهِ

'তোমরা ভালো বস্তু সুন্দর আকৃতির মাঝে সন্ধান করো।"

---

১ [মাউযূ] আলবানি সংকলিত যঈফুল জামে : ৯০৩

২ [যঈফ] আলবানি সংকলিত যঈফুল জামে : ২৫৬৭

ইয়াহইয়া ইবনে মাঈন বলেন, হাদিসটির বর্ণনাকারীদের মধ্যে মুহাম্মাদ ইবনে আবদুর রহমান কেউই নন। লেখক বলেন, হাদিসটি কয়েক সূত্রে বর্ণিত হয়েছে। ওকাইলী বলেন, এ ব্যাপারে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে কোনো কিছু বর্ণিত বলে প্রমাণিত হয়নি। বাকি থাকল দ্বিতীয় হাদিস। এর সনদ হচ্ছে,

"আমাকে আবু মানসুর বিন খাইরুন বলেছেন, তাকে ইবনে উবাইদ রায়হানি বলেছেন, আমি আবুল বুখতারি ওয়াহাব ইবনে ওয়াহাব থেকে শুনেছি, তিনি বলেছেন, আমি বাদশা হারুনুর রশিদের কাছে যাওয়া-আসা করতাম। তার সামনে তার ছেলে কাসেম থাকত। আমি তার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকতাম। হারুনুর রশিদ বলতেন, আমি দেখছি তুমি কাসেমের দিকেই নিষ্পলক তাকিয়ে আছ! তোমার কি ইচ্ছে হয় যে, সে তোমারই হয়ে থাকবে? আমি বললাম, আমিরুল মুমিনীন! আল্লাহর পানাহ! আমাকে এমন দুঃসাহস দেখাতে বলবেন না, যা আমার অন্তরে নেই। আমি কাসেমের দিকে তাকিয়ে আছি, তার কারণ হচ্ছে আমাকে ইমাম জাফর সাদিক বর্ণনা করেছেন, তাঁর পিতা তাঁর দাদা আলী ইবনে হোসাইন থেকে বর্ণনা করেছেন এবং তাঁর পিতা তাঁর দাদা হজরত আলী রা. থেকে বর্ণনা করেছেন যে, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'তিনটি বস্তু দেখা চোখের জন্য উপকারী। যথা—১. সবুজ, ২. পানি ও ৩. সুন্দর চেহারা।'

গ্রন্থকার বলেছেন, আমি বলছি হাদিসটি 'মাওযূ'। আবুল বুখতারির সম্পর্কে আলেমদের মাঝে কোনো মতানৈক্য নেই যে, সে মিথ্যা এবং বানোয়াট হাদিস বানায়। এছাড়া আবু আবদুর রহমান সালামীর উচিত ছিল, যেহেতু তিনি সুন্দর চেহারার দিকে তাকানোর কথা বলেছেন, তাই তিনি তার স্ত্রী বা দাসীদের দিকে তাকিয়ে থাকতে পারতেন। কিন্তু তিনি সম্পূর্ণ অনৈতিক উদ্দেশ্যে এমনটি করেছেন।

আমাদের শায়খ মুহাম্মাদ বিন নাসির আলহাফিজ বলেছেন, ইবনে তাহের মুকাদ্দাসী একটি গ্রন্থ লিখেছেন। যাতে তরুণ বালকদের দিকে তাকানোকে বৈধ বলা হয়েছে। লেখক বলেন, তরুণ বালকদের দিকে তাকালে যে ব্যক্তির কামনা ও প্রবৃত্তি জাগ্রত হয়, তার জন্য দেখা হারাম। মানুষ যখন এই দাবি করবে যে, সুন্দর বালকদের দিকে তাকালে তার কামনা জাগে না, তবে তার এ দাবি মিথ্যা। সাধারণত এ জন্য এটাকে 'মুবাহ' বা বৈধ

সাব্যস্ত করা হয়েছে। কেননা শিশু-কিশোরদের সাথে মেলা-মেশা অধিক পরিমাণে হয়ে থাকে। নিষিদ্ধ হলে এতে মানুষের দুঃখ-দুর্দশার অন্ত থাকবে না। কিন্তু দেখার মাত্রা যদি অতিরিক্ত হয়, তাহলে তা প্রবৃত্তি বা কামনা জাগরণের প্রমাণ। সাঈদ ইবনে মুসায়্যিব বলেন,

إذا رأيتم الرجل يلح النظر الى غلام أمرد فاتهموه

"কাউকে যখন দেখবে, সে সুদর্শন বালকের দিকে অপলক তাকিয়ে আছে, তখন তাকে অভিযুক্ত করতে পার।"

৪. চতুর্থ হচ্ছে সেই দল—যারা বলে, আমরা কামনার দৃষ্টিতে দেখি না; বরং অভিজ্ঞতা ও শিক্ষা গ্রহণের নিমিত্তে দেখি। তাদের প্রতি তাকানোতে আমাদের কোনো ক্ষতি হয় না। অথচ তাদের এ সকল কথা ভুল। কেননা সকলের অভ্যাস সমান সমান। তারপরও যে এই দাবি করবে যে, সে অভ্যাসের ক্ষেত্রে অন্যদের চেয়ে ভিন্ন, তাহলে সে একটি অগ্রহণযোগ্য বিষয়ের দাবি করল। এ বিষয়ে আমরা শুরুতে 'ছেমা'র বর্ণনায় বিস্তারিত আলোকপাত করেছি।

আবু হামযা সুফি বলেন, আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর বলেছেন, আমি আবু নাসার গানাভীর কাছে বসা ছিলাম। তিনি একজন অতুলনীয় আবেদ ছিলেন। এক সুদর্শন বালককে দেখে গভীর দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে রইলেন। এমনকি তার কাছাকাছি গিয়ে তাকে বললেন, তুমি সর্বশ্রোতা, মহা প্রজ্ঞাবান, ইজ্জতে রফী' মহান সৃষ্টিকর্তার উসিলায় আমার সামনে দাঁড়িয়ে থাকো। আমি মন ভরে তোমাকে দেখে নিই। ছেলেটি কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে চলে যেতে চাইলে সুফি বললেন, তুমি হাকিক, মাজিদ, কারিম, মুবদী ও মুয়ীদ আল্লাহ তায়ালার উসিলায় একটু দাঁড়াও। ছেলেটি ফিরে আবার এসে দাঁড়ালো। সুফি ছেলেটির মাথা থেকে পা পর্যন্ত দেখতে থাকল। অতঃপর সে যেতে চাইলে সুফি বললেন, তুমি ওয়াহেদ, আহাদ, সামী', বাসীর, বেমেছাল খোদা ও নাযীরের উসিলায় সামান্য দাঁড়াও। ছেলেটি দাঁড়ালো। সুফি আগের মতোই তাকে দেখে যাচ্ছে। অতঃপর তার মাথা মাটিতে ঠেকালেন। আর ছেলেটি চলে গেল। দীর্ঘক্ষণ পর জমিন থেকে মাথা তুলে সুফি কাঁদছেন আর বলছেন, ছেলেটির চেহারা দেখার কারণে আমার ভেতর সেই সত্তার কথা স্মরণ এসেছে, যিনি তুলনা থেকে অনেক উর্ধ্বে, উপমা থেকে চির পবিত্র এবং চির অসীম।

আল্লাহর কসম! আমি তাঁর সন্তুষ্টির জন্য স্বীয় প্রাণ তাঁর শত্রুদের সাথে জিহাদ করে কষ্ট-ক্লেশে নিপতিত করব এবং তাঁর বন্ধুদের সাথে ভালোবাসা রাখব, যাতে আমার উদ্দেশ্য সাধিত হয়। অর্থাৎ তাঁর উৎসৃষ্ট চেহারা ও পূতপবিত্র উচ্চতা দেখতে পাব। আমি আশা করি, তিনি আমাকে তাঁর দর্শনে কৃতজ্ঞ করবেন। তার বিনিময়ে তিনি আমাকে আকাশ-মাটির এই পৃথিবীতে আগুনে নিক্ষেপ করুন, এতে আমার আক্ষেপ নেই। এটা বলেই তিনি মাটিতে পড়ে গেলেন।

আল্লামা ইবনুল জাওযি রহ. বলেন, কিছু আলেম আমাকে বলেছেন, একজন বালক আমাকে বলেছে, অমুক সুফি যে আমাকে ভালোবাসে, তিনি বলেছেন, বৎস! তোমার ওপর আল্লাহ তায়ালা বিশেষ অনুগ্রহ এবং দৃষ্টি রয়েছে। আমাকে তিনি তোমার মুখোপেক্ষী বানিয়ে দিয়েছেন। বর্ণিত আছে, সুফিদের একটি জামাত আহমাদ গাযালির নিকট গেলে তাঁর কাছে একজন বালক দেখতে পান। তারা একসাথে বসে আছে। উভয়ের মাঝখানে একটি গোলাপ ফুল রয়েছে। আহমাদ কখনো দৃষ্টি দেন গোলাপের দিকে, কখনো বালকের দিকে চোখা ফেরান। সুফিরা এসে বসলে তাদের মধ্য হতে একজন বললেন, সম্ভবত আমরা এসে আপনাকে বিরক্ত করলাম। প্রত্যুত্তরে তিনি বললেন, অবশ্যই, আল্লাহর কসম! পরে সকলে সমস্বরে ওজদেহালের নিয়মে স্লোগান দিলেন।

আবুল হাসান ইবনে ইউসুফ আমাকে বলেন, তিনি আহমাদ গাযালিকে এক চিরকুটে লিখেছেন, 'তুমি তোমার তুর্কি গোলামের দিকে তাকাও।' তিনি চিরকুট পড়ে গোলামকে ডেকে সঙ্গে নিয়ে মিম্বরে আরোহণ করলেন এবং তার উভয় চোখে চুমু খেয়ে বললেন, এটাই চিরকুটের জবাব। লেখক বলেন, ওই ব্যক্তির (আহমাদ গাযালি) এহেন কার্যকলাপে তার চেহারায় লজ্জা-শরমের পর্দা পড়ে যাওয়া কোনো আশ্চর্যের কথা নয়। আশ্চর্য লাগে ওই গাধাদের ওপর, যারা ওখানে উপস্থিত ছিল। তারা কেন কোনো অভিযোগ করল না? এ থেকে বিরত রাখল না? বাস্তবতা হলো, অধিকাংশ মানুষের অন্তরে শরিয়তের তাপ ঠান্ডা হয়ে গেছে।

আবু তৈয়ব তাবারি আমাকে বলেছেন, যে সব গোষ্ঠী রাগশাস্ত্র চর্চা করেন, শুনেছি তারা ছেমার সাথে সাথে সুদর্শন বালকদের দিকে তাকানোকেও আবশ্যক মনে করেন। অনেক সময় বালকদেরকে অলংকার ও রঙিন কাপড় এবং জরিদার পোশাকে সাজিয়ে থাকে। তারা মনে করে, এমন কর্মকাণ্ড মূল

ঈমান এবং বালকের প্রতি দৃষ্টি দেয়ার ফলে তাদের অভিজ্ঞতা অর্জিত হয়। তারা 'সৃষ্টিবস্তু দ্বারা সৃষ্টিকর্তার স্মরণ হয়' বলে প্রমাণ দিতে চায়। অথচ তাদের এ সব কথা একান্তই তামাশা ও প্রবৃত্তির অনুগামী। বিবেক-বুদ্ধিকে ধোঁকা দেয়া এবং জ্ঞানের বিপরীত কাজই এর ফলাফল। আল্লাহ তায়ালা বলেন,

وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ

"আল্লাহ তায়ালার নিদর্শন তোমাদের অস্তিত্বেই বিদ্যমান, তোমরা কি তা দেখো না?"[১]

তিনি আরও বলেন,

أَفَلَا يَنظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ

"তারা কি উটের দিকে দৃষ্টি দেয় না! কীভাবে তাকে সৃষ্টি করা হয়েছে!"[২]

আল্লাহ তায়ালা আরও বলেন,

أَولم ينظرُوا فِي ملكوت السَّمَوَات وَالْأَرْض

"তারা কি আকাশমণ্ডলী ও জমিনের দিকে তাকায় না!"[৩]

যে সব বস্তুর মাধ্যমে অভিজ্ঞতা ও শিক্ষা নেয়ার নির্দেশ দেয়া হয়েছে, তা ছেড়ে এরা এমন বিষয়ে পড়ে আছে, যা থেকে তাদেরকে নিষেধ করা হয়েছে। এই গোষ্ঠীটি কেবল রুচিশীল ও সুস্বাদু খাবার খেয়ে উপর্যুক্ত কমকাণ্ড করে থাকে। এসব মজাদার খাদ্য খেয়ে তাদের মন ভরে গেলে তারা নাচ, গান-বাদ্য ও সুদর্শন বালকদের দিকে তাকিয়ে থাকা এবং এ-জাতীয় প্রবৃত্তির অনুসরণ করতে থাকে। যদি কখনো খাবার-দাবার কম গ্রহণ করে, তখন ছেমা ও নজরের কাছে কম ঘেঁষে থাকে। আবু তৈয়ব বলেন, রাগসংগীত শ্রোতাদের অবস্থা এবং কিছু ছেমার সময় তাদের ওপর কী ধরনের অবস্থা অতিবাহিত হয়, কয়েক পঙ্‌ক্তি কবিতায় তা বিশ্লেষণ করা হয়েছে–

أتذكر وقتنا وقد اجتمعنا * على طيب السماع الى الصباح

ودارت بيننا كأس الأغاني * فأسكرت النفوس بغير راح

---

১ সুরা যারিয়াত : আয়াত ২১

২ সুরা গাশিয়াহ : আয়াত ১৭

৩ সুরা আ'রাফ : আয়াত ১৮৫

فلم نر فيهم إلا نشاوى * سرورا والسرور هناك صاحي
إذا لبى أخو اللذات فيه * منادى اللهو حي على الفلاح
ولم نملك سوى المهجات شيئا * أرقناها لالحاظ ملاح

'যে অবস্থায় আমরা সকাল থেকে মনোমুগ্ধকর রাগ-সংগীত শুনতে সমবেত হয়েছি, তুমি কি এখনও সে সময়কার কথা স্মরণ করতে চাও? আমাদের মাঝে রাগ-সংগীতের পেয়ালা ঘুরছে। যা পান করে আমাদের মনপ্রাণ শরাবের নেশা ছাড়াই নেশাগ্রস্ত হয়ে গেছে। জলসায় যারা আছে, সবাই প্রশান্তিতে তৃপ্ত। এখানে কেবল শান্তিই হুঁশিয়ার। এই জলসায় যখন খেল-তামাশার আহ্বানকারী ডাকে যে, লবণাক্ত প্রিয়তমা তোমায় আহ্বান করছে, চলো। তখন মজা ও তৃপ্তি গ্রহণকারী ব্যক্তি বলে, উপস্থিত! আমাদের কাছে মনোলোভা বস্তু ব্যতিরেকে আর কিছু নেই। যার খুশি চোখ দিয়ে ভাসিয়ে দাও।'

আবু তৈয়ব বলেন, মনে ছেমার প্রভাব এভাবে পড়ে যেভাবে কবি আবৃত্তির সুরে উল্লেখ করেছেন। তাহলে ছেমা-কী করে উপকার পৌছায়? ইবনে আকিল বলেন, যারা বলে, সুদর্শন বস্তু দেখার বিষয়ে আমার কোনো ভয় নেই। অথচ তার এ কথা অসার ও অযৌক্তিক। কেননা শরিয়তের খেতাব তথা উদ্দিষ্ট সবার জন্য সমান। কেউ এর ব্যতিক্রম হতে পারে না। কোরআনের আয়াত তাদের দাবিকে আরও অসার ও অকৃতকার্য করে তোলে। আল্লাহ তায়ালা বলেন,

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ

'হে রাসুল! আপনি বিশ্বাসীদের বলুন, তারা যেন তাদের দৃষ্টিকে অবনত রাখে।"[৪]

অন্যত্র আল্লাহ তায়ালা বলেন,

أَفَلَا يَنْظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ

"তারা কি উটের দিকে দৃষ্টি দেয় না! কীভাবে তাকে সৃষ্টি করা হয়েছে!"[৫]

সুতরাং বোঝা যাচ্ছে, ওই সকল বস্তুর প্রতি দৃষ্টি দেয়া বৈধ যার প্রতি তাকালে কামনার উদ্রেক হয় না, মনের লালসা জাগে না। এটা এমন শিক্ষা,

---

৪ সুরা নূর : আয়াত ৩০
৫ সুরা গাশিয়াহ : আয়াত ১৭

যেখানে বিন্দু পরিমাণ কামনা-বাসনার অবকাশ নেই। অন্যদিকে কামনা উদ্রেককারী বিষয়গুলোর ব্যাখ্যায় বলা যায়, এতে প্রবৃত্তির দাসত্বস্বরূপ কামনার অভিজ্ঞতা নেয়া যায়। প্রত্যেকটি চেহারাই পাপের উৎস। এর প্রতি দৃষ্টি দেয়া উচিত নয়। কেননা এর মাধ্যমে অধিকাংশ ফিতনার উৎপত্তি। এ জন্য আল্লাহ তায়ালা কোনো নারীকে নবী হিসেবে পাঠাননি। না কোনো নারীকে কাজী, ইমাম বা মুয়াজ্জিন বানিয়েছেন। এসবের হেতু হচ্ছে নারীরা আপদ ও কামনার উৎস। অধিকাংশ ক্ষেত্রে নারীর দিকে তাকালে শরিয়তের উদ্দেশ্য রহিত হয়ে যায়। এখন যে ব্যক্তি বলে, আমি সুন্দর দর্শন করে ইবরত নিই। তাকে আমরা মিথ্যুক বলব। আর যারা নিজের স্বভাবকে অন্যদের চেয়ে উন্নত মনে করে, তাদের দাবি অমূলক। এব কথা কেবলই শয়তানের ধোঁকা ও প্রতারণা।

৫. পঞ্চম, ওই সকল সুফি—যারা বালকদের সাথে মেলামেশা করে এবং নিজেকে অনাচার অযাচার থেকে দূরে রাখে। এটাকে মুজাহাদা এবং আত্মশুদ্ধি মনে করে। তারা এটা জানে না যে, সুদর্শন বালকদের সাথে মেলামেশা করা এবং তাদের দিকে কামনার দৃষ্টিতে তাকানোও পাপ। এগুলো সুফিদের অভ্যাস। তাদের উত্তরসূরিরাও এমন মতবাদ লালন করত। আহমদ ইবনে সাবিত আমাকে বলেছেন, আবু আলী রোযবারী নিম্নোক্ত কবিতা আবৃত্তি করতেন–

أنزه في روض المحاسن مقلتي * وأمنع نفسي أن تنال محرما

وأحمل من ثقل الهوى مالو أنه * على الجبل الصلد الأصم تهدما

"আমি স্বীয় নয়নযুগল সুন্দর ও সৌন্দর্যের বাগিচায় অবগাহন করাই এবং নিজের নফসকে হারামে পতিত হওয়া থেকে বিরত রাখি। আমি প্রেম-প্রীতি ও ভালোবাসার এতো ভারী বোঝা বহন করি, তা যদি কোনো দৃঢ় পাহাড় বহন করে তবে তা ভেঙ্গে পড়বে।"

আল্লামা ইবনুল জাওযি রহ. বলেন, অচিরেই ইউসুফ ইবনুল হোসাইনের ঘটনা এবং তার অভিমত বিবৃত হবে, যাতে তিনি বলেছেন, আমি আল্লাহর কাছে একশতবার অঙ্গীকার করেছি যে, কোনো সুদর্শন বালকের কাছে বসব না। তথাপি নাজুক দেহাবয়ব ও কামনাময় চোখ দেখে সেই অঙ্গীকার ভঙ্গ করে ফেলি।

আবুল মুখতার আয্যবী বলেন, আমি আবুল কুমাইন আন্দুলুসি—যিনি খুবই কুৎসিত কৃষ্ণ বর্ণের ছিলেন—তাকে বললাম, সুফিদের অত্যাশ্চার্য কোনো ঘটনা বলুন। তিনি বললেন, সুফিদের মধ্যে একজনের সাথে আমার মেলামেশার সুযোগ হয়েছে, যার নাম মেহেরজান। তিনি শুরুতে অগ্নিপূজক ছিলেন। পরে মুসলমান হয়ে সুফি হয়ে গিয়েছিলেন। আমি তার সাথে একজন সুদর্শন বালক দেখতে পেতাম, যাকে তিনি কখনো পৃথক করতেন না। রাত হলে তাহাজ্জুদ আদায় করতেন। পরে তার দিকে ফিরে শুয়ে যেতেন। অতঃপর ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে ওঠে দাঁড়াতেন এবং যতটুকু সম্ভব নামায পড়তেন। আবার বালকের দিকে ফিরে শুয়ে যেতেন। এমন কর্মকাণ্ড রাতে কয়েকবার করতেন। অবশেষে ভোর আলোকময় হলে কিংবা ভোরের কাছাকাছি সময়ে বিতর নামায আদায় করতেন। অতঃপর আকাশের দিকে উভয় হাত তুলে বলতেন, হে আল্লাহ! তুমি ভালো করেই জানো, আজ রাত আমার নিরাপদে কেটেছে। এ রাতে অন্যায়মূলক কোনো কাজ আমি করিনি। মন্দ কামনার কাছে যাইনি। কিরামান কাতিবীন আমার আমলনামায় কোনো গোনাহ লেখেনি। অথচ এই বালকের ভালোবাসা আমার অন্তরে এতটাই গোপনে গেঁথে রেখেছি, তা যদি কোনো পাহাড় বহন করে, তবে নির্ঘাত সে হেলে পড়বে এবং খণ্ড-বিখণ্ড হয়ে যাবে। যদি তা জমিন বহন করে তবে, তা ফেটে যাবে। পরে তিনি বলতেন, হে রাত! আমার পক্ষ থেকে যা কিছু তোমার মাঝে অতিবাহিত হয়েছে, তুমি তার সাক্ষী থেকো। আল্লাহর ভয় আমাকে হারামের খাহেশ এবং পাপাচারে লিপ্ত হওয়া থেকে বিরত রেখেছে। পরে বলতেন, হে আল্লাহ! হে আমার মালিক! তুমি আমাকে পরহেযগারীর ওপর অটল রেখো। যেদিন সব প্রিয়তমা একে অন্যের কাছ থেকে দূরে থাকবে সেদিনও আমাদেরকে পৃথক কোরো না। বর্ণনাকারী বলেন, আমি ওই সুফির কাছে দীর্ঘদিন ছিলাম। প্রত্যেক রাতে এটা তার রুটিন ছিল। আমি তার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে আসতে চাইলে, তাকে বললাম, এটা কেমন কথা যে, রাত অতিবাহিতকালে আপনাকে এমন কথা বলতে শুনি। তিনি বললেন, তুমি কি তা শোনো? আমি বললাম, হ্যাঁ। উত্তরে বললেন, হে ভাই, আল্লাহর কসম! আমার অন্তরে বালকটির এতই ভালোবাসা, তা যদি কোনো রাজা-বাদশার তার প্রজাদের প্রতি থাকত, তাহলে আল্লাহর পক্ষ হতে সে মাগফিরাতের হকদার হয়ে যেত। আমি বললাম, তাহলে এটা বলুন, যে মানুষের পক্ষ থেকে আপনার ওপর পাপ বা

অন্যায়ে পতিত হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে, তার সাথে মেলামেশারই-বা দরকার কী?

আবু মুহাম্মাদ জাফর ইবনে আবদুল্লাহ সুফি বলেন, আবু হামযা সুফি বর্ণনা করেছেন, আমি বায়তুল মুকাদ্দাসে একজন যুবক সুফি দেখেছি, যে দীর্ঘদিন ধরে একজন বালকের সাথে মেলামেশা করত। পরে সেই সুফি মারা গেল। তার মৃত্যুতে বালক খুব মর্মাহত হলো। এমনকি দুশ্চিন্তা আর পেরেশানির কারণে সে দুর্বল হয়ে যাচ্ছিল। তার শরীরে কেবল চামড়া আর হাড্ডিই পরিদৃষ্ট হতো। একদিন আমি তাকে বললাম, তুমি তোমার দোস্তের জন্য খুব শোকাহত। আমি তো দেখছি তুমি স্থির থাকতে পারছ না। উত্তরে বলল, এমন ভালো ব্যক্তি গত হলে কেউ কি স্থির থাকতে পারে? যার জন্য আল্লাহ নির্ধারিত করে দিয়েছেন। তিনি এক মুহূর্তের জন্যও আমার থেকে পৃথক হননি। এত লম্বা সময়ের রাত-দিন মেলামেশা ও উঠা-বসা সত্ত্বেও আমার সাথে কোনো পাপ বা অন্যায় আচরণ করেননি।

গ্রন্থকার বলেন, এই গোষ্ঠীকে শয়তান যখন দেখল যে, তারা প্রবৃত্তির অনুসরণ করছে না, তখন তাদের দৃষ্টিতে বেহায়াপনাকে বৈধ হিসেবে দেখাতে শুরু করল। সুতরাং তারা দেখা, মেলামেশা করা এবং পরস্পর কথা বলার মাধ্যমে পরিতৃপ্ত হতে শুরু করে এবং এভাবে মন্দ কাজ থেকে বাঁচার জন্য নফসের বিরোধিতা করার অঙ্গীকার করে। এখন যদি সে সত্যবাদী হয়, তাহলে তার উচিত—যে দিলে আল্লাহকে স্থান দেয়ার কথা সেখানে গাইরুল্লাহকে কেন স্থান দেয়া হচ্ছে? আর যে সময়টুকু এমন জোরপূর্বক আত্মশুদ্ধি, সাধনা এবং মুজাহাদার পেছনে ব্যয় করা হয়, মনকে তা থেকে ফিরিয়ে আখিরাতে উপকারী বিষয়ে অধিক মনোযোগী হওয়া অধিক জরুরি। শুধু যিনা-ব্যভিচার থেকে বিরত থাকার এই সংযমে সময় ক্ষয় করা অজ্ঞতা এবং শরয়ি শিষ্টাচারবিরোধী। কেননা আল্লাহ তায়ালা চক্ষুদ্বয় অবনত রাখার নির্দেশ দিয়েছেন। এর মাধ্যমেই কোনো শঙ্কা ও সংশয় ব্যতিরেকে আল্লাহর দিকে মনোযোগী হওয়া যায়। ওই সকল লোকদের উদাহরণ হচ্ছে ওই ব্যক্তির মতো যে কোনো অলস ও অমনোযোগী হিংস্র প্রাণীর কাছ দিয়ে কোথাও যাচ্ছে, হিংস্র প্রাণী তাকে দেখতে পায়নি। এহেন অবস্থায় সে হিংস্র প্রাণীকে উত্তেজিত করতে লাগল এবং তার মোকাবেলা করার চেষ্টা করল। এমতাবস্থায় ওই ব্যক্তি যদি মারা না-ও যায়, কিন্তু সে কি কখনো আঘাত থেকে রক্ষা পাবে?

আত্মশুদ্ধি

সুফিদের মধ্যে অনেকে এমন আছেন, যাদের সাধনা নির্দিষ্ট একটি সময়ব্যাপী দৃঢ় ছিল, পরে তা দুর্বল হয়ে যেতে থাকে। তাদের প্রবৃত্তি অন্যায়ের অভিলাষী হয়ে পড়লে তারা বালকদের সাথে মেলামেশা ছেড়ে দেয়। আবু হামযা সুফি বলেন, আমি মুহাম্মাদ বিন আলা দামেস্কীকে জিজ্ঞেস করলাম, যিনি সুফিদের দলপতি ছিলেন, নির্দিষ্ট এককাল ধরে তার সাথে একজন সুদর্শন বালক দেখতে পেতাম। পরে তিনি তার থেকে পৃথক হয়ে গিয়েছিলেন। আমি বললাম আপনি ওই বালককে কেন ছেড়ে দিলেন? যাকে সর্বদা আপনার সাথে দেখতে পেতাম। আপনি তার সাথে খুব মেলামেশা করতেন। তার প্রতি গভীর অনুরাগী ছিলেন। এ কথা শুনে উত্তরে বললেন, আল্লাহর কসম! আমি তাকে কোনো প্রকার শত্রুতা বা বিদ্বেষের কারণে ছাড়িনি। আমি বললাম, তো শেষে কেন ছেড়ে দিলেন? বললেন, আমি যখন তার সাথে একাকী থাকতাম আর সে আমার পাশে বসত, তখন আমি দিলের দিকে মনোযোগী হয়ে দেখতাম, সে এমন কাজের প্রতি আমাকে উৎসাহিত করছে যদি তাতে লিপ্ত হয়ে পড়ি, তাহলে আল্লাহর দৃষ্টি থেকে আমি ছিঁটকে পড়ব। তাই আমি তাকে ছেড়ে দিলাম। যাতে আল্লাহর শাস্তির মুখোমুখি হতে না হয় এবং আমার নফস ফিতনার মোকাবেলায় নিরাপদে থাকে।

তাওবাহ ও দীর্ঘ ক্রন্দন

অধিকাংশ সুফিদের মাঝে এমন লোকও আছেন, যারা অনুশোচনাকারী এবং দৃষ্টি মেলে তাকানোর কারণে দীর্ঘ সময় নিয়ে কান্নাকাটি করেন। উবায়দুল্লাহ আমাকে বলেছেন, আমি আমার ভাই আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মাদ বিন মুহাম্মাদ থেকে শুনে বলছি, তাকে খায়র নাসাজ বলেছেন, আমি উমাইয়া ইবনে সামেত সুফির সফরসঙ্গী ছিলাম, হঠাৎ তার দৃষ্টি একজন বালকের দিকে পড়লে তিনি এ আয়াত পড়েন :

وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

'তোমরা যেখানেই থাকো, আল্লাহ তোমাদের সাথে রয়েছেন। আর যা কিছু তোমরা করে থাকো, তিনি সবকিছু দেখেন।"[১] পরে বললেন, আল্লাহর জেলখানা থেকে কে পালাতে পারে? অথচ তিনি তাঁর জেলখানাকে শক্তিশালী ও কঠোর ফেরেশতা দ্বারা সুরক্ষিত রেখেছেন। আল্লাহু আকবার! এই ছেলের প্রতি দৃষ্টিপাত করা আল্লাহর পক্ষ থেকে আমার জন্য কত বড় পরীক্ষা! তার প্রতি দৃষ্টিপাতের উদাহরণ হচ্ছে, যেমন কোথাও দমকা হাওয়া বইছে, আর ওদিকে জঙ্গলে আগুন লেগেছে। এমতাবস্থায় আগুন সম্মুখপানে যা পাবে তা-ই ভস্মীভূত করে ছাড়বে। পরে তিনি বললেন, আমার চোখ আমার অন্তরে যে সকল মন্দ প্রভাব দ্বারা আকর্ষিত করতে চাচ্ছে, তা থেকে আমি আল্লাহর কাছে সাহায্য প্রার্থনা করছি। আমি এ ব্যাপারে ভয় করছি যে, আমি এ কাজের শাস্তিতে পাকড়াও হব কি না! কেয়ামতের দিবসে সত্তরজন সিদ্দীকের পুণ্য নিয়ে উপস্থিত হলেও এ পাপের ক্ষতিপূরণ হবে কি? অথচ অচিরেই মৃত্যু ঘনিয়ে আসছে। আমি শুনিছে, গুনগুনিয়ে তিনি নিম্নের কবিতা আবৃত্তি করে চলেছেন, 'হে চোখ আমি তোমাকে এই আপৎসঙ্কুল দৃষ্টি থেকে হটিয়ে কান্নাকাটির জন্য নিয়োজিত করলাম।'

অধিক মহব্বতের ব্যাধি

অধিকাংশ সুফি এমন আছেন, যারা অতিরিক্ত মহব্বতের কারণে রোগাক্রান্ত হয়ে পড়েন। আবু হামযা সুফি বলেছেন, আবদুল্লাহ ইবনে মুসা সুফিদের সরদার ও মুরুব্বি ছিলেন। তিনি কোনো এক হাটে একজন সুন্দর বালকের দিকে দৃষ্টি দিয়েছিলেন। এতে তিনি তার প্রতি আসক্ত হয়ে পড়েন। অবস্থা এমন পর্যায়ে পৌঁছল যে, সত্বর তিনি বুদ্ধি বিপর্যয়ে আক্রান্ত হওয়ার উপক্রম হয়ে গেলেন। প্রতিদিন এসে রাস্তায় দাঁড়িয়ে যেতেন। ছেলেটি যখন আসা-যাওয়া করত, তাকে দেখতে থাকতেন। এভাবে তার প্রেম-প্রীতি বেড়েই চলল। তার চিন্তায় তিনি অতি দুর্বল হয়ে পড়লে আর চলাফেরা করতে পারলেন না। একদিন আমি তার সাক্ষাতে গেলে জিজ্ঞেস করলাম, হে আবু মুহাম্মাদ! তোমার কী অবস্থা? এ বিপদ কী করে এলো যা আমি তোমার ওপর পতিত হতে দেখছি? জবাবে তিনি বললেন, এটা ওই কর্মফল যার ওপর আল্লাহ আমাকে পরীক্ষা নিয়েছেন। আমি সেই মসিবতে ধৈর্য ধরিনি, তা সহ্য করার ক্ষমতাও আমার ছিল না। মানুষ অধিকাংশ সময় এমন

---

১ সুরা হাদীদ : আয়াত ৪

পাপকে খাটো করে দেখে, অথচ তা আল্লাহর কাছে কবিরা গুনাহের চেয়ে মারাত্মক। যে ব্যক্তি হারাম বস্তুর প্রতি দৃষ্টিপাত করবে, সে নির্ঘাত লম্বা সময়ের জন্য এমন রোগে আক্রান্ত হবে। এটা বলে সে কান্নাকাটি করতে থাকল। আমি জিজ্ঞেস করলাম, তুমি কাঁদছ কেন? সে বলল, আমি ভাবছি এই দুর্ভাগা দীর্ঘ সময় জাহান্নামে পড়ে থাকবে কি না? বর্ণনাকারী বলেন, এরপর আমি তার নিকট থেকে ফিরে এলে তার জন্য আমার খুবই করুণা হতে থাকল।

আবু হামযা বলেন, মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে আশআস দামেস্কী আল্লাহর নৈকট্যপ্রাপ্ত বান্দা ছিলেন। তিনি একজন সুদর্শন বালককে দেখে বেহুঁশ হয়ে পড়লে লোকেরা তাকে ঘরে নিয়ে গেল। পরে তিনি প্রচণ্ড অসুস্থ হয়ে পড়েন। এমনকি তিনি চলাফেরা করতে অপারগ হয়ে পড়েছিলেন। দীর্ঘকাল এভাবে অতিক্রম হচ্ছিল। আমরা তাকে দেখতে যেতাম এবং তার অবস্থা জানতে চাইতাম। তিনি সরাসরি আমাদেরকে তার প্রকৃত অবস্থা জানাতেন না। সে ঘটনাও বলতেন না। অসুস্থ হওয়ার কারণও বলতেন না। কিন্তু অন্যান্য লোকজন সেই সুদর্শন বালকের প্রতি তাকানোর কারণে এই অবস্থায় পতিত হওয়ার ঘটনা বলত। এ কথা এক সময় বালকের কানে যায়। সে তাঁকে দেখতে আসে। বালককে দেখে সুফি খুশি হয়ে গেলেন এবং স্বাচ্ছন্দ্যে চলাফেরা করতে আরম্ভ করলেন। তার চেহারা দেখে হাসতেন। বালকও সর্বদা তাকে দেখতে আসত। এভাবে একসময় সুফি সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে পূর্বের অবস্থায় ফিরে আসেন। একদিন বালক তার ঘরে সুফিকে দাওয়াত দেয়। কিন্তু তিনি যেতে অস্বীকার করেন। আমি জানতে চাইলাম, শেষ পর্যন্ত ছেলেটির উসিলায় আপনি সুস্থ হলেন, আর এখন তার বাড়িতে যেতে কেন আপনার অস্বীকৃতি? প্রত্যুত্তরে তিনি বলেন, আমি আপদ থেকে মুক্ত নই এবং ফিতনা থেকে নিরাপদ নই। আমি ভয় করি, কখন শয়তান আমাকে তার ওপর মহব্বত ও কামনা উদ্রেক করে কোনো পাপাচারে আক্রান্ত করে। তখন তো আমি ধ্বংসপ্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাব!

ব্যভিচারের উপক্রম হলে আত্মহনন

কিছু সুফি এমন আছেন, যাদেরকে তাদের নফস কোনো মন্দ কাজে আহ্বান করার কারণে তারা নিজেদের ধ্বংসের মুখে ঠেলে দেন। আবু আবদুল্লাহ হোসাইন ইবনে মুহাম্মাদ দামগানী বর্ণনা করেন, পারস্য শহরে একজন নামকরা সুফি ছিলেন। হঠাৎ একবার তিনি এক সুদর্শন বালকের ইশকে লিপ্ত হয়ে পড়েন। পরে তিনি আর নিজের নফসকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারছিলেন না। এমনকি অযাচারের মন্দ কামনা মনে ঠাঁই নিল। পরে তিনি মোরাকাবায় বসলেন এবং নিজের ইচ্ছার ওপর লাঞ্ছিত হলেন। তাঁর ঘর ছিল একটি উঁচু পাহাড়ের ওপর। তার নিচে প্রবাহিত ছিল একটি নদী। অনুশোচনার আধিক্যে তিনি ঘরের ছাদ থেকে নদীতে ঝাঁপ দেন এবং এ আয়াত পড়েন :

فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ

'হে বনি ইসরাইল, আল্লাহর দরবারে তাওবা করো এবং নিজেদেরকে ধ্বংস করে দাও।"[১] পরে তিনি পানিতে ডুবে মারা গেলেন।

গ্রন্থকার আল্লামা ইবনুল জাওযি বলেন, ইবলিসকে দেখুন। প্রথমত বেচারাকে এটা শেখাল যে, বালকের প্রতি দৃষ্টিপাত করো। পরে এখান থেকে হটিয়ে তার দিকে সারাক্ষণ তাকিয়ে থাকতে উদ্দীপনা জাগাতে থাকল। এভাবে তার অন্তরে বালকের প্রতি অগাধ ভালোবাসা সৃষ্টি হলো। পরে ইবলিস যখন দেখল, সে এ থেকে বিরত থাকার চেষ্টা করছে, তখন অজ্ঞতা দ্বারা তাকে আত্মহত্যার দিকে প্ররোচনা দিতে থাকল। বাহ্যত এমন মনে হয় যে, এ লোক কুমন্ত্রণা কেবল অন্তরেই পোষণ করত, নিশ্চিত কামেচ্ছা চরিতার্থের ফন্দি আঁকত না। শরিয়তে নিয়তের ক্ষেত্রে পাপ হলে ক্ষমার অবকাশ আছে। কেননা রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন :

عفي لأمتي عما حدثت به نفوسها

"আমার উম্মতের ওই সকল পাপ ক্ষমা করে দেয়া হয়েছে, যার ইচ্ছা সে কেবল মনে মনে পোষণ করে।"[২] পরে লোকটি তার এমন ইচ্ছার ওপর

---

১ সুরা বাকারা : আয়াত ৫৪

২ সহিহ বুখারি : হাদিস নং ২৫২৮, সহিহ মুসলিম : হাদিস নং ১২৭

অনুশোচনাও করেছে। এটাকেই তো তাওবা বলে। কিন্তু শয়তান তাকে এভাবে ধোঁকা দিয়েছে যে, নিজেকে ধ্বংস তথা আত্মহত্যা হচ্ছে তাওবার সর্বোচ্চ স্তর, যা বনি ইসরাইলের আমল ছিল। অথচ তারা আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্দেশিত হয়েছিল। যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেছেন,

فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ

'হে বনি ইসরাইল, আল্লাহর দরবারে তাওবা করো এবং নিজেদেরকে ধ্বংস করে দাও।"[৩] আর আমাদেরকে তথা উম্মতে মুহাম্মদিকে এমন কাজ করতে বারণ করা হয়েছে :

لَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ

'তোমরা নিজেদের ধ্বংস কোরো না।"[৪] মোট কথা উক্ত সুফি মস্ত বড় পাপে লিপ্ত হলো। *সহিহাইনে* রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণিত :

وَمَنْ تَرَدَّى مِنْ جَبَلٍ فَقَتَلَ نَفْسَهُ فَهُوَ يَتَرَدَّى فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيهَا أَبَدًا

'যে ব্যক্তি পাহাড়ের চূড়া থেকে ইচ্ছাকৃতভাবে ঝাঁপিয়ে পড়ে নিজেকে ধ্বংস করে, সে যেন জাহান্নামের অগ্নিতে ঝাঁপ দিল। সে সর্বদা সেখানেই অবস্থান করবে।"[৫]

***

বহু সুফি এমন আছেন, যাদেরকে তাদের প্রিয়তমের থেকে পৃথক করে দেয়া হলে তিনি সেই প্রিয়তমকে মেরে ফেলেন। এমন একজন সুফির ঘটনা শুনেছি, তিনি বাগদাদে প্রত্যন্ত অঞ্চলে বসবাস করতেন। যে ঘরে তিনি থাকতেন সেখানে তার সঙ্গে একজন সুদর্শন বালকও থাকত। মানুষজন তাকে অপবাদ দিচ্ছিল এবং উভয়কে পৃথক করে দিল। উক্ত সুফি একটি ছুরি নিয়ে বালকের কাছে গিয়ে তাকে খুন করে ফেললেন এবং তার কাছে বসে কাঁদতে থাকলেন। মহল্লাবাসী এসে এমন অবস্থা দেখে ঘটনার কথা

---

৩ সুরা বাকারা : আয়াত ৫৪

৪ সুরা নিসা : আয়াত ২৯

৫ সহিহ বুখারি : হাদিস নং ৫৭৭৮, সহিহ মুসলিম : হাদিস নং ১০৯

জিজ্ঞেস করলে সুফি বালককে খুন করার কথা স্বীকার করেন। লোকেরা তাকে আদালতে নিয়ে গেলে সেখানেও সে খুনের কথা অকপটে স্বীকার করে। সেখানে সে বালকের পিতাকে দেখতে পেয়ে বলে, তোমাকে আল্লাহর দোহাই দিয়ে বলছি, তুমি আমার থেকে তোমার ছেলে হত্যার বদলা নাও। সে বলল, এখন আমি তোমাকে ক্ষমা করে দিয়েছি। সুফি সেখান থেকে ওঠে বালকের কবরের কাছে এসে তার জন্য ক্রন্দন করতে থাকল। অবশেষে আজীবন ছেলেটির জন্য প্রতি বছর হজ করতেন এবং তার জন্য ইসালে সাওয়াব করতেন।

ফিতনার নিকটবর্তী ও এতে পতিত হওয়ার উপক্রম

সুফিদের মধ্যে অনেকে এমনও আছেন, যারা ফিতনার দ্বারপ্রান্তে পৌঁছে গিয়েছিলেন এবং তাতে আক্রান্ত হয়ে পড়েছিলেন। সবর ও সাধনার দাবি তাদেরকে বিরত রাখতে পারেনি। ইদ্রীস ইবনে ইদ্রীস বলেন, আমি মিসরে সুফিদের একটি জামাতে উপস্থিত হয়ে তাঁদের কাছে একজন সুদর্শন বালক দেখতে পেলাম, যে তাদেরকে গান শোনাত। তাদের মধ্যে এক ব্যক্তির জোশ বেড়ে গেলে সে কোনো বাছ-বিচার না করে বলল হে বালক, বলো—اللهُ لا إله إلا لا বালক বলল—اللهُ لا إله إلا لا এরপর সুফি বললেন, যে মুখ দিয়ে اللهُ لا إله إلا لا বলেছ, সেই মুখ দিয়ে আমাকে চুমু দাও।

৬. ষষ্ঠ প্রকার সুফি হচ্ছেন যারা সুদর্শন বালকদের সাথে মেলামেশার ইচ্ছা পোষণ করেন না; বরং তাদের ব্যাপারে তাওবা করেন এবং জগৎ-সংসার থেকে উদাসীন হয়ে যান। সুফিদের সাথে ইচ্ছেমতো তারা চলাফেরা করে। শয়তান তাদের জন্য ফাঁদ পাতে। বলে, বালকটিকে ভালো ও নেকি থেকে বঞ্চিত কোরো না। পরে সে অনিচ্ছাকৃতভাবে তার দিকে বারেবারে তাকাতে থাকে। এভাবে মনে ফিতনার প্রভাব পড়ে। এমনকি শয়তান তার সর্বোচ্চ চেষ্টা অনুযায়ী তাকে ঘায়েল করতে থাকে। এদের মধ্যে যে সর্বোচ্চ সম্মানিত হিসেবে বিবেচিত, তাকে দিয়ে শয়তান খারাপ কাজ ঘটিয়ে থাকে। যেমন বরশিশার সাথে করা হয়েছে। লেখক বলেন, বরশিশার ঘটনা আমরা কিতাবের শুরুর দিকে বর্ণনা করেছি। তার ভুল ছিল, সে বালকদের সামনে চলে যেত এবং এমন মানুষের সাথে মহব্বত রাখত যার দ্বারা ফিতনায় পতিত হওয়ার সমূহ আশঙ্কা বিদ্যমান।

৭. সপ্তম প্রকার সুফি তারা, যারা জানে যে, সুদর্শন বালকদের প্রতি দৃষ্টিপাত হারাম, কিন্তু তা হতে তারা নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না। আবু আবদুর রহমান মুহাম্মাদ বিন হোসাইন বলেন, তোমরা আমার কাছ থেকে যে সকল কাজ করতে দেখো, তার সবই করতে থাকো, কিন্তু শুধু বালকের সংশ্রবে যেও না। কেননা এটা খুবই ভারী ফিতনা। আমি আমার প্রতিপালকের সম্মুখে একশতবার প্রতিজ্ঞা করেছি যে, বালকদের সাথে মেলামেশা করব না। কিন্তু সুন্দর সুন্দর চেহারাবিশিষ্ট বালকদের কোমল শরীর ও দৃষ্টিকাড়া চাহনি দেখে সেই প্রতিজ্ঞা ভেঙ্গে দিতাম। অবশ্য আল্লাহ তায়ালা সুন্দর ছেলেদের সাথে কোনো অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনার জন্য আমাকে জিজ্ঞাসাবাদ করবেন না। (অর্থাৎ আমি কোনো ব্যভিচারে লিপ্ত হইনি)। পরে তিনি সারীউল গাওয়ানীর কয়েক ছত্র কবিতা আবৃত্তি করেন,

إن ورد الخدود والحدق النجل * وما في الثغور من أقحوان

واعوجاج الأصداغ في ظاهر الخد * وما في الصدور من رمان

تركتني بين الغواني صريعا * فلهذا أدعى صريع الغواني

"ফুলের মতো চেহারা ও ডাগর ডাগর নয়ন, বাবুই পাখির বাসার মতো দাঁত ও চেহারায় মায়াবী পশম, আনারের ন্যায় ঘাড়বিশিষ্ট বালকেরা আমাকে নারী সংশ্রব থেকে দূরে রেখেছে। এ জন্য আমাকে সুন্দর নারীর পতি বলে আখ্যায়িত করা হয়।"

গ্রন্থকার বলেন, আমি বলছি, আবু আবদুর রহমান এমন পাপ সম্পর্কে—যা আল্লাহ তায়ালা গোপন রেখেছেন—তিনি তা প্রকাশ করে নিজেকেই তিরস্কৃত করলেন। আর মানুষকে বলে বেড়াচ্ছেন, যখন তিনি এমন ফিতনার মুখোমুখি হন, তখন তাওবা ভেঙ্গে দেন। তাহলে তাসাওউফের সেই মহাগুরুত্বপূর্ণ সূত্রাবলি কোথায় গেল, যা এমন পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ ও মোকাবেলার ইন্ধন যোগায়? তথাপি তিনি নিজের অজ্ঞতার কারণে এই ধারণা পোষণ করতেন যে, পাপ কেবল 'মন্দ কাজ'কেই বলে। কিন্তু তিনি যদি জানতে চাইতেন তবে জেনে নিতে পারতেন যে, সুদর্শন বালকদের সাথে মেলামেশা এবং তাদের প্রতি দৃষ্টিপাত করাও পাপ। অজ্ঞদের ব্যাপারে গভীরভাবে চিন্তা করলে বোঝা যায়, শয়তান তাদেরকে কীভাবে ঠকায়!

আবু মুসলিম খুশুয়ির ব্যাপারে বলা হয়ে থাকে, তিনি দীর্ঘ সময় ধরে এক সুদর্শন বালকের প্রতি গভীর মনোযোগ দিয়ে তাকিয়ে থেকে বলেছিলেন,

সুবহানাল্লাহ! আমি আমার চক্ষুকে মাকরুহ তথা নিষিদ্ধ বস্তুর প্রতি নিক্ষেপ করেছি এবং স্বীয় প্রতিপালকের নাফরমানি করেছি। দৃষ্টিকে নিষিদ্ধ বস্তুর প্রতি আকৃষ্ট করেছি, এর বিনিময়ে হয়তো কেয়ামতের মাঠে আমাকে লজ্জিত ও অপদস্থ করা হবে। এই দৃষ্টিপাত আমাকে এমন আশঙ্কাজনক অবস্থায় নিমজ্জিত করেছে। আল্লাহ তায়ালা যদিও আমাকে ক্ষমা করেন, কিন্তু আমি আজীবন লজ্জিতই থেকে যাব। এ কথা বলে তিনি বেহুঁশ হয়ে পড়ে গেলেন।

ইলমের অনিবার্যতা

যে ব্যক্তি জ্ঞান থেকে দূরে থাকবে, সে নির্ঘাত শয়তানের খপ্পরে পড়বেই। আর যার জ্ঞান আছে কিন্তু সে সেই জ্ঞান মতে আমল করে না, সে আরও মারাত্মক ক্ষতির সম্মুখীন হবে। আল্লাহ তায়ালা বলেন,

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ

"মুমিনদের বলুন, তারা যেন স্বীয় দৃষ্টিকে অবনত রাখে।"[১] যে ব্যক্তি শরয়ি শিষ্টাচার মতে চলবে, সে শুরুতে জেনে থাকবে যে, তার পরিণতি কী ভয়াবহ হতে পারে। শরিয়তে সুদর্শন বালকদের সংস্পর্শ ত্যাগ করতে বলা হয়েছে এবং আলেমগণ এদের থেকে দূরে থাকার নসিহত করে গেছেন। হজরত আনাস রা. হতে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন,

لا تجالسوا أبناء الملوك فإن النفوس تشتاق إليهم ما لا تشتاق إلى الجواري العواتق

'তোমরা শাহজাদাদের পাশে বোসো না। কেননা তাদের সংশ্রব দু'জন ললনার ফিতনার চেয়ে ভয়াবহ।'[২]

হজরত আবু হোরায়রা রা. হতেও অনুরূপ বর্ণিত আছে।[৩] ওয়াফদে আবুল কায়েস রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দরবারে উপস্থিত

---

১ সুরা নূর : আয়াত ৩০

২ [মাওযূ] হাদিসটি ইবনুল জাওযি রহ. 'আলইলালুল মুতানাহিয়া' এবং ইবনুল ইরাক রহ. 'তানযিয়াতুস শারিয়াহ'তে সংকলন করেছেন।

হলে সেখানে এক উজ্জ্বল বর্ণের বালক দেখা যায়। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে স্বীয় পিঠের পেছনে বসালেন এবং বললেন, হজরত দাউদ আলাইহিস সালাম অপাত্রে দৃষ্টি দিয়েছিলেন।'[৪]

হজরত আবু হোরায়রা রা. হতে বর্ণিত,

نهي رسول الله «صلى الله عليه وسلم» أن يحد الرجل النظر إلى الغلام الأمرد

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সুদর্শন বালকদের দিকে গভীর দৃষ্টিতে তাকাতে নিষেধ করেছেন।'[৫]

হজরত ওমর ইবনুল খাত্তাব রা. বলেন, কোনো আলেমকে হিংস্র জন্তুর আক্রমণে আমি ওই পরিমাণ ভয় করি না, যে পরিমাণ ভয় সুদর্শন বালকের প্রতি দৃষ্টিপাতের কারণে করি।

আবদুল আযিয ইবনে আবি সায়েব স্বীয় পিতা থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আমি একজন আবেদের ওপর একজন সুদর্শন বালককে সত্তরজন কুমারী ললনার চেয়ে অধিক ভয় করি। আবু আলী রোযবারি বলেন, আমি জুনাইদের কাছে শুনেছি, তিনি বলতেন, ইবনে হাম্বলের কাছে এক ব্যক্তি এসেছিল, তার সঙ্গে ছিল একজন সুদর্শন বালক। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, বালকটি কে? উত্তরে বললেন সে আমার পুত্র। এবার তিনি বললেন, দ্বিতীয়বার আসার সময় তাকে তুমি সঙ্গে আনবে না। যখন দাঁড়ালেন, তখন মুহাম্মাদ ইবনে আবদুর রহমান হাফেজ বলেন, আর খতিবের বর্ণনামতে, তাকে বলা হয়েছে, আল্লাহ তায়ালা শায়খকে তাওফিক দিন। এ ব্যক্তি পরহেযগার। তার ছেলে তার চেয়েও বড় পরহেযগার। এ কথা শুনে ইমাম আহমদ রহ. বললেন, এ ব্যাপারে আমি যা কিছু চেয়েছি, তাদের পরহেযগার হওয়ার জন্য, এতে কোনো বাধা নেই। এভাবেই আমাদের মুরুব্বিরা আসলাফদের মাধ্যমে আমাদের জানিয়েছেন।

হাসান বায্যারের ব্যাপারে শোনা যায়, তিনি একবার আহমদ ইবনে হাম্বলের নিকট এসে তার নিকট একজন সুদর্শন বালক দেখতে পান। তিনি তার সাথে কথা বলছিলেন। ওঠে যাওয়ার সময় তাকে আবু আবদুল্লাহ

---

৩ والحديث بإسناده عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تملأوا أعينكم من أولاد الملوك فإن لهم فتنة أشد من فتنة العذارى

৪ [মাউয়ূ] আলবানি রহ. সংকলিত 'আস্সিলসিলাতুয্ যাঈফাহ' : ৩১৩

৫ [যঈফ] ইবনে আদী 'আলকামিল' ও উকাইলী 'যুয়াফা' গ্রন্থে হাদিসটি সংকলন করেছেন।

বললেন, হে আবু আলী! এই বালকের সাথে কোনো রাস্তায় চলাফেরা কোরো না। প্রত্যুত্তরে তিনি বললেন, এ তো আমার ভাতিজা। তিনি আবার বললেন, ভাতিজা হলেও। মানুষ তোমার সম্পর্কে (আমি চাই না) অপবাদমূলক কোনো প্রকার কথা বলুক।

শুজা ইবনে মুখাল্লিদ হতে বর্ণিত, তিনি বিশর ইবনে হারেসকে বলতে শুনেছেন যে, এই নওজোয়ানদের থেকে দূরে থাকো। ফাতাহ মুসিলি বলেন, আমি ত্রিশজন বুযুর্গের সাথে চলেছি, যাদেরকে আবদাল বলে আখ্যায়িত করা হতো। সবাই আমাকে বিদায়ী নসিহতস্বরূপ বলেছেন যে, অপ্রাপ্ত বয়স্ক নওজোয়ানদের সংশ্রব ত্যাগ করো। সালাম আল আসওয়াদ সম্পর্কে বর্ণিত আছে, তিনি এমন একজন মানুষকে দেখেছিলেন, যে একজন সুদর্শন বালকের দিকে অপলক তাকিয়ে আছে। তা দেখে সালাম বললেন, হে অমুক! স্বীয় ব্যক্তিত্বের কথা ভাবো। কেননা যতক্ষণ তুমি আল্লাহর সম্মান বজায় রাখবে, ততক্ষণ তুমিও সম্মানিত ও মর্যাদাসম্পন্ন হিসেবে বিবেচিত হবে। আবু মনসুর আবদুল কাদের বিন তাহের'র অভিমত হচ্ছে, যে ব্যক্তি সুদর্শন বালকদের সাথে মেলামেশা করবে, সে নিষিদ্ধ কর্মে পতিত হবে। সালাম বলেন, আমাকে আবু আবদুর রহমান সালামি বলেছেন, মুযাফ্ফর কামমিসিনীর ভাষ্য—যে ব্যক্তি নিরাপত্তা ও উপদেশের শর্তে তরুণ বালকদেরকে সংস্পর্শে রাখবে, সে মসিবতে পতিত হবে। তাহলে তার কী হবে, যে নিরাপত্তার শর্ত ছাড়া বালকদের সাথে মেলামেশা করে?

অল্পবয়স্ক যুবকদের থেকে দূরে থাকা

পূর্বেকার লোকেরা বালকদের থেকে দূরে থাকার জন্য জোর দিতেন। আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি, "রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সুন্দর চেহারার বালককে পিঠের পেছনে বসিয়েছেন।" সুফিয়ান সাওরি রহ. কোনো সুন্দর চেহারার বালককে তাঁর কাছে বসতে দিতেন না। ইবরাহিম ইবনে হানী হতে বর্ণিত আছে, ইয়াহইয়া ইবনে মাঈন বলেছেন, এমন কখনো হয়নি যে, একই রাস্তায় আমার সাথে কোনো বালক চলার আশা করবে, আর ওদিকে আহমদ ইবনে হাম্বল রহ.ও থাকবেন। আবু আইয়ুব বলেন, আমি আবু নসর ইবনে হারেসের সাথে ছিলাম। তার সাথে এক অত্যধিক সুন্দরী কন্যা, যার মতো সুন্দর বালিকা আমি আর কখনো দেখিনি, সে এসে বলল, হে জনাব, বাবে হারাব কোথায় অবস্থিত? তিনি

উত্তর দিলেন, এই যে সামনে ফটক আছে, এটাকেই বাবে হারব বলে। এরপর একজন অত্যধিক সুন্দর বালক, যার মতো সুন্দর বালক আগে আমি আর কখনো দেখিনি, সে এসে বলল, হে জনাব, বাবে হারব কোথায়? আবু নসর মাথা নিচু করে ফেললেন এবং নিজের চোখ বন্ধ করে দিলেন। আমি ছেলেটিকে বললাম, এদিকে এস। কী জিজ্ঞেস করছ? সে বলল, বাবে হারাব কোথায়? আমি বললাম, তোমার সামনে। বালক চলে গেলে আমি শায়খকে জিজ্ঞেস করলাম, হে আবু নসর! আপনার সামনে মেয়ে এলো, আপনি তার কথার উত্তর দিলেন। আর যখন বালক এলো, তখন তার সাথে কথা বললেন না। কেন? তিনি জবাব দিলেন, হ্যাঁ, সুফিয়ান সাওরি হতে বর্ণিত আছে, মেয়েদের সাথে একজন শয়তান থাকে, আর সুন্দর চেহারার বালকদের সাথে দু'জন শয়তান থাকে। আমি নিজের ব্যাপারে সেই দুই শয়তানের কথা ভেবে ভীত হয়ে পড়েছিলাম। অন্য এক বর্ণনামতে, সুন্দর চেহারার বালকদের সাথে দশজন পর্যন্ত শয়তান থাকে।

আবুল কাসেম আমাকে বলেছেন, মুহাম্মাদ ইবনে হোসাইন—যিনি ইয়াহইয়া ইবনে মাঈনের সাথি ছিলেন, তার কাছে গেলেন। বলা হয়ে থাকে, তিনি চল্লিশ বছর পর্যন্ত আকাশের দিকে মাথা তুলে তাকাননি। আমরা যখন তার কাছে গেলাম, তখন আমাদের সাথে সুন্দর চেহারার একজন বালকও তার মজলিসে উপস্থিত ছিল। তাকে তিনি বললেন, আমার সম্মুখ থেকে চলে যাও এবং আমারে পেছনে বসো। আবু উসামা বলেন, আমি একজন শায়খের কাছে থাকতাম, যিনি হাদিস বর্ণনা করতেন। তার কাছে হাদিস শোনাতে এক বালক এলো। আমি সেখান থেকে উঠতে চাইলে, তিনি আমার বাহু ধরে বললেন, দাঁড়াও। একটু অপেক্ষা করো। বালকের শোনানো শেষ হলে তখন যেও। আমি একাকী এই বালকের সাথে থাকা খুব অপছন্দ করি।

আবু আলী রোযবারী আমাকে বলেছেন, আমাকে আবুল আব্বাস আহমদ আলমুয়াদ্দিব জিজ্ঞেস করলেন, হে আবু আলী! আমাদের কালে সুফিরা সুন্দর চেহারার বালকদেরকে কাছে রাখার নিয়ম কোথায় পেল? উত্তরে আমি বললাম, হে জনাব! আপনি তো তাদেরকে খুব ভালো করেই চেনেন। অধিকাংশ সময় বালকেরা তাদের কাছে নিরাপদেই থাকে। তিনি বললেন, হায়! হায়! আমি তাদের চেয়ে আরও উত্তম বুযুর্গদের দেখেছি, যাদের ঈমান আরও দৃঢ় ছিল—তারা যখন সুন্দর চেহারার কোনো বালককে দেখত, এমনভাবে পালাত—যেভাবে মানুষ জঙ্গলের হিংস্র জন্তু থেকে পলায়ন

করে। এসব কথা কেবল ওই সময়ের উপযোগী, যখন অধিকাংশ মানুষের ওপর অবস্থা নিয়ন্ত্রিত হয়। যখন অভ্যাস স্বাভাবিক থাকে, তখন এমন আশঙ্কার ধারণা একেবারেই অমূলক।

সুন্দর বালকদের সাথে মেলামেশা

সুন্দর চেহারার বালকদের সাথে উঠা-বসা ও মেলামেশা করা ইবলিসের একটি অন্যতম ফাঁদ। যা দিয়ে সে সুফিদের শিকার করে বেড়ায়। আবু আবদুর রহমান সালামী আমাকে বলেন, আমি আবু বকর রাযী'র কাছে শুনেছি, ইউসুফ ইবনে হোসাইন বলেছেন, আমি সৃষ্টির বিপৎসমূহের ওপর গভীরভাবে চিন্তা করে দেখলাম তার উৎপত্তি কোথায়। সুফিদের বিপদাপদ আমি সুন্দর চেহারার বালকদের সোহবত, মূর্খদের মেলামেশা এবং নারীদের সংশ্রবে পেয়েছি। সুফি ইবনে ফারাজ রুস্তমি বলেন, আমি শয়তানকে স্বপ্নে দেখেছি। তাকে বললাম, তুমি আমাদেরকে কেমন পেলে? আমরা তো দুনিয়া ও তার সমুদয় আরাম-আয়েশের সামগ্রী এবং ধন-দৌলত থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছি। এখন তুমি তো আর আমাদেরকে কাবু করতে পারছ না। শয়তান বলল, তোমাদের কি খবর আছে? তোমাদের মন গান শ্রবণ ও সুন্দর চেহারার বালকদের সাথে মেলামেশার প্রতি কী পরিমাণ উদগ্রীব? আবু সাঈদ বলেন, এই ফিতনা থেকে খুব কম সুফি-দরবেশই মুক্তি পেতে পারেন।

সুদর্শন বালকদের প্রতি দৃষ্টিপাতের শাস্তি

আবু আবদুল্লাহ ইবনুল জালাল বলেন, আমি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে একজন খ্রিষ্টান সুদর্শন বালককে দেখছিলাম। ইত্যবসরে আবু আবদুল্লাহ বলখি আমার সম্মুখে এসে জিজ্ঞেস করলেন, কেন দাঁড়িয়ে আছেন? আমি বললাম, চাচাজান! এই সুন্দর চেহারার দিকে লক্ষ করেছেন, কীভাবে তাকে জাহান্নামে শাস্তি দেয়া হবে! তিনি তাঁর উভয় হাত দ্বারা আমার সিনায় ধাক্কা দিয়ে বললেন, তার পরিণতি তোমাকেও ভুগতে হবে, যদিও এটা কিছুটা সময়সাপেক্ষ ব্যাপার। আমি চল্লিশ বছর পর এর প্রমাণ পেলাম। আমি কুরআন শরিফ ভুলে গিয়েছিলাম।

আবুল আদইয়ান বলেন, আমি আমার ওস্তাদ আবু বকর দাক্কাক-এর সাথে ছিলাম। এক অল্পবয়সী যুবক সামনে এলে তাকে আমি দেখছিলাম। তার প্রতি তাকিয়ে আছি দেখে ওস্তাদ আমাকে বললেন, বৎস! কিছুদিন পর তুমি টের পাবে এর অশুভ পরিণতি। আমি বিশ বছর ধরে অপেক্ষায় রইলাম। কিন্তু সেই অশুভ পরিণতি দেখলাম না। এই ভাবনায় একবার শুয়ে পড়লাম। ভোরে ওঠে দেখলাম পুরো কুরআন শরিফ আমার আর স্মরণ নেই।

আবু বকর কাত্তানী আমাকে বলেছেন, আমি আমার এক বন্ধুকে স্বপ্নে দেখে তাকে জিজ্ঞেস করলাম, আল্লাহ তোমার সাথে কীরূপ ব্যবহার করেছেন? উত্তরে তিনি জানালেন, আমার সামনে আমার কৃত সমুদয় পাপ উপস্থাপন করে আমাকে বলা হলো, তুমি এমন এমন করেছ। তারপর বলা হলো, তুমি এমন এমনও করেছ, এটা স্বীকার করতে আমার খুব লজ্জাবোধ হলো। আমি বললাম, এর স্বীকারোক্তিতে আমার ভীষণ লজ্জা হচ্ছে। আমাকে বলা হলো, তোমার স্বীকারকৃত পাপ যখন আমি ক্ষমা করে দিয়েছি, তো লজ্জায় স্বীকার করতে ইতস্ততবোধ করছ—এমন পাপসমূহও ক্ষমা করে দিলাম। আমি বললাম, সেই লজ্জাজনক পাপটি কী? সে বলল, একজন সুদর্শন বালকের প্রতি দৃষ্টি দিয়েছি, যে আমার সামনে দিয়ে কোথাও যাচ্ছিল। এক বর্ণনায় আছে, আমি লজ্জিত হয়ে প্রচণ্ড ঘেমে যাচ্ছিলাম; এমনকি আমার মুখের মাংস পড়ে যাচ্ছিল।

আবু ইয়াকুব তাবারি হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, আমার কাছে একজন সুদর্শন বালক থাকত। সে আমার সেবা-যত্ন করত। একবার বাগদাদ থেকে এলো একজন সুফি। সে অধিকাংশ বালকের প্রতি তাকিয়ে থাকত। আমি তাকে এ ব্যাপারে সতর্ক করতাম। একরাতে আমি ঘুমের মধ্যে মহান আল্লাহকে স্বপ্নে দেখলাম। আমাকে তিনি বলছেন, তুমি কেন বাগদাদিকে বালকদের প্রতি দৃষ্টি দেয়ার ব্যাপারে বারণ করছ না? আমার মর্যাদার কসম! তাকেই আমি বালকদের প্রতি আগ্রহী করে তুলি, যাকে আমার কাছ থেকে দূরে রাখতে চাই। আবু ইয়াকুব বলেন, এ কথা শুনে আমি খুব বিচলিত হয়ে পড়লাম। বাগদাদিকে স্বপ্নে কথা বললে সে জোরে এক চিৎকার মেরে মৃত্যুমুখে ঢলে পড়ল। তাকে গোসল ও দাফন করলাম। কিন্তু আমার মনপ্রাণজুড়ে তার চিন্তা। অবশেষে তাকে স্বপ্নে দেখলাম একমাস পর। জিজ্ঞেস করলাম, আল্লাহ তায়ালা তোমার সাথে কীরূপ আচরণ করেছেন?

তিনি বললেন, আমাকে খুব ধমক দেয়া হয়েছে। এমনকি আমি মুক্তির ব্যাপারে হয়ে পড়লাম আশঙ্কাগ্রস্ত। পরে আমাকে ক্ষমা করে দেয়া হয়েছে।

আমি বলছি, এ ব্যাপারে আমি দীর্ঘ আলোচনা করে আসছি। কেননা অধিকাংশ সাধারণ মানুষ এ পাপে লিপ্ত। এ ব্যাপারে আরও বিশদভাবে জানতে চাইলে 'যাম্মুল হাওয়া' নামীয় গ্রন্থে চোখ রাখতে পারেন। তাতে এ সকল বিষয়ে বিশদ বিশ্লেষণ বিদ্যমান।

তাওয়াক্কুলের দাবি করা ও ধন-সম্পদের ব্যাপারে সুফিদের ওপর ইবলিসের ধোঁকা

আহমদ ইবনে আবুল হাওয়ারি বলেন, আমি আবু সুলাইমান দারানিকে বলতে শুনেছি, আমরা আল্লাহর ওপর তাওয়াক্কুল ও পূর্ণ ভরসা করলে চোরের ভয়ে দেয়াল দিতাম না এবং দরজায় তালা দিতাম না।

যুন্নুন মিসরির সূত্রে বর্ণিত আছে, আমি কয়েক বছর ভ্রমণ করেছি, কিন্তু এর ভেতর একবার ব্যতীত আল্লাহর ওপর আমার ভরসা বিশুদ্ধ হয়নি। আমি একদিন সমুদ্র ভ্রমণে ছিলাম। প্রচণ্ড জলোচ্ছ্বাসে আমাদের জাহাজ টুকরো টুকরো হয়ে যায়। তখন আমি জাহাজের একটি কাঠের খণ্ডের সাথে ভাসতে থাকি। একসময় মন আমাকে বলল, আল্লাহ তায়ালা যদি তোমার মৃত্যু পানিতে লিখে রাখেন, তাহলে এই কাঠ তোমাকে কী উপকার করবে? তখন আমি কাঠটি ছেড়ে পানিতে ভাসতে থাকি এবং পানির ঢেউ একসময় আমাকে তীরে নিক্ষেপ করে।

হাফেজ আবু নুয়াইম বলেন, জাফর খুলদি তার গ্রন্থে লেখেন, আমি জুনাইদ বাগদাদিকে বলতে শুনেছি, একবার আমরা দলবদ্ধ হয়ে আবু ইয়াকুব যাইয়্যাতের বাড়িতে গিয়ে দরজায় কড়া নাড়লে তিনি বললেন, আল্লাহর ইবাদতে তোমাদের এমন কী ব্যস্ততা নেই, যা তোমাদেরকে আমার কাছে আসতে বাধা দেয়? আমি বললাম, আপনার কাছে আসাও ইবাদতের অংশ। তখন আমরা তাঁর কাছে তাওয়াক্কুল সম্পর্কে জানতে চাইলাম। প্রত্যুত্তরে তিনি বললেন, আমার কাছে ধন-সম্পদ বিদ্যমান থাকা অবস্থায় তোমাকে তাওয়াক্কুলের ব্যাখ্যা দিতে আমি লজ্জাবোধ করছি।

আবু নাসার সিরাজ স্বীয় *কিতাবুল্ লামা* গ্রন্থে লেখেন, এক লোক আবদুল্লাহ ইবনে জালার কাছে এসে তাওয়াক্কুল সম্পর্কে জানতে চাইলে

তিনি কোনো প্রকার উত্তর না দিয়ে ঘরে প্রবেশ করেন। কিছুক্ষণ পর ঘর থেকে একটি থলে নিয়ে আসেন, যাতে কিছু মুদ্রা ছিল। তিনি মুদ্রাগুলো উপস্থিত লোকদেরকে দিয়ে বললেন, তোমরা এগুলো দিয়ে কিছু কিনে আনো। পরে তাওয়াক্কুলের ব্যাখ্যা দিলে তাঁকে বলা হলো, আপনি এমন করলেন কেন? জবাবে তিনি বললেন, উক্ত মুদ্রাগুলো থাকা অবস্থায় আমি তাওয়াক্কুলের ব্যাখ্যা পেশ করতে লজ্জাবোধ করছি।

গ্রন্থকার বলেন, শরিয়ত সম্পর্কে অজ্ঞতা তাদের এই অসার চিন্তাচেতনা সরবরাহ করেছে। তাওয়াক্কুলের হাকিকত ও বাস্তবতা সম্পর্কে অবগত থাকলে তারা জানতে পারত যে, আসবাব-উপকরণ তাওয়াক্কুল পরিপন্থী নয়। কেননা আল্লাহর প্রতি মনের অবস্থাকেই তাওয়াক্কুল বলে। এটা শরীরের মাধ্যমে উপকরণ সংগ্রহ ও ধন-সম্পদ সঞ্চয় ও সংরক্ষণের বিপরীত কিছু নয়। ধন-সম্পদের প্রতি গুরুত্বারোপ করে বলা হয়েছে–

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا

'আর তোমরা নির্বোধদের হাতে তোমাদের ধন-সম্পদ দিও না, যাকে আল্লাহ তোমাদের জন্য করেছেন জীবিকার মাধ্যম।'[১]

হাদিসে আছে, হজরত আমর ইবনুল আস রা. বলেন, 'রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লোক মারফত আমাকে ডেকে বললেন, তুমি বর্ম ও অস্ত্র ধারণ করে আমার কাছে এসো। আমি তখন তা পরিধান করে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দরবারে উপস্থিত হলে তিনি আমাকে বললেন, আমি তোমাকে এক সেনাদলের উদ্দেশে পাঠাতে চাই। তুমি সেখানে পৌঁছলে আল্লাহ তায়ালা তোমাকে বিজয়ী করবেন এবং গনীমত দান করবেন। আর ভালো উদ্দেশ্যে আমি তোমার জন্য ধন-সম্পদ কামনা করি। তখন আমি বললাম, ইয়া রাসুলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! আমি তো ধন-সম্পদ লাভের আশায় ইসলাম গ্রহণ করিনি। আল্লাহর আনুগত্য করার জন্য ইসলাম গ্রহণ করেছি। জবাবে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, হে আমর! ভালো মানুষের জন্য হালাম ধন-সম্পদ কতই-না উত্তম!'[২]

---

১ সুরা নিসা : আয়াত ৫

২ মুসনাদে আহমাদ : ৪/১৯৭, [আলবানি রহ. হাদিসটি সহিহ বলেছেন]

وقال «صلى الله عليه وسلم» إنك تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس

'তুমি তোমার ওয়ারিশদেরকে সচ্ছল অবস্থায় রেখে যাওয়া তাদেরকে দরিদ্রাবস্থায় রেখে যাওয়া থেকে উত্তম, যেন মানুষের কাছে তাদের হাত পাততে না হয়।'[১]

ভালো করে জেনে রাখা দরকার যে, আল্লাহ তায়ালা তাওয়াক্কুলের নির্দেশ দেয়ার পাশাপাশি সতর্কতা অবলম্বনের আদেশ দিয়ে বলেছেন,

خُذُوا حِذْرَكُمْ

'তোমরা সতর্কতা অবলম্বন করো।'[২]

অন্য আয়াত আল্লাহ তায়ালা শত্রুর মোকাবিলার নির্দেশ দিতে গিয়ে বলেন,

وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ

'তোমাদের সাধ্য অনুযায়ী তাদের মোকাবিলার জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করো।'[৩]

অন্য আয়াতে হজরত মুসা আলাইহিস সালাম-কে শত্রু বাহিনী থেকে আত্মরক্ষার নির্দেশ দিয়ে বলেছেন,

أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي لَيْلًا

'আমার বান্দাদের নিয়ে রাতে ভ্রমণ করুন।'[৪]

স্বয়ং রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অস্ত্রের আঘাত থেকে আত্মরক্ষার জন্য একসঙ্গে দু'টি লোহার বর্ম পরিধান করেছেন। রোগের বিষয়ে দু'জন চিকিৎসকের সাথে পরামর্শ করেছেন। শত্রুর ভয়ে পাহাড়ের গুহায় আত্মগোপন করেছেন।[৫] রাতে পাহারার জন্য লোক নিয়োগ দিয়েছেন এবং ঘুমের পূর্বে দরজা বন্ধ করার নির্দেশ প্রদান করেছেন।

হজরত জাবের রা. হতে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

أَغْلِقْ بَابَكَ

---

১ সহিহ বুখারি : হাদিস নং ১২৯৫, সহিহ মুসলিম : হাদিস নং ১৬২৮
২ সুরা নিসা : আয়াত ৭১
৩ সুরা আনফাল : আয়াত ৬০
৪ সুরা দুখান : আয়াত ২৩
৫ সহিহ বুখারি : হাদিস নং ৩৯০৫, সহিহ মুসলিম : হাদিস নং ২১৪৬

'তুমি তোমার দরজা বন্ধ করো।'[৬]

তিনি তাঁদেরকে এটাও বলেছেন যে, এমন সতর্কতা অবলম্বন করা তাওয়াক্কুলের বিপরীত কোনো বিষয় নয়।

হজরত আনাস ইবনে মালেক রা. হতে বর্ণিত, জনৈক ব্যক্তি তার উট মসজিদের সামনে ছেড়ে দিয়ে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সামনে উপস্থিত হলে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে তার উট সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন। লোকটি বলল, আমি আল্লাহর ওপর তাওয়াক্কুল করে তা মসজিদের সামনে ছেড়ে রেখেছি। এটা শুনে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বললেন, আগে উট বেঁধে আসো, তারপর তাওয়াক্কুল করো।[৭]

ইবনে আকিল বলেন, মানুষ মনে করে, সতর্কতা ও সংরক্ষণ তাওয়াক্কুল-পরিপন্থী বিষয়। তাই কোনো ব্যক্তি আল্লাহর ওপর আস্থাশীল তখনই হতে পারবে যখন সে কর্মপরিণতির চিন্তা পরিত্যাগ করবে এবং ধন-সম্পদ সংরক্ষণে উদাসীন থাকবে। অথচ এটাকে বিদগ্ধ ওলামায়ে কেরাম অক্ষমতা ও অবজ্ঞা বলে আখ্যা দেন। মানুষ এটাকে বিবেকবর্জিত কাজ হিসেবে ধরে নেয়। আল্লাহ তায়ালা বান্দাকে সতর্কতা অবলম্বন ও সংরক্ষণের ব্যাপারে সাধ্য অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণের পর তাওয়াক্কুলের নির্দেশ দিয়েছেন। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে সম্বোধন করে আল্লাহ বলেন,

وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ

'আর কাজে-কর্মে তাদের সাথে পরামর্শ করো। অতঃপর যখন সংকল্প করবে তখন আল্লাহর ওপর তাওয়াক্কুল করবে।'[৮]

অতএব সতর্কতা অবলম্বন তাওয়াক্কুল-পরিপন্থী হলে আল্লাহ তায়ালা বিশেষভাবে তাঁর নবীকে সতর্কতা অবলম্বনের নির্দেশ দিতেন না। কেননা পরামর্শের উদ্দেশ্যই হলো, শত্রু থেকে সতর্কতা অবলম্বনের সর্বোত্তম পন্থা সাথিদের থেকে গ্রহণ করা। এছাড়া আল্লাহ তায়ালা সতর্কতা অবলম্বনের ক্ষেত্রে সাথিদের মতামত গ্রহণের নির্দেশ দিয়েই ক্ষান্ত হননি; বরং নামাযের

---

৬ সহিহ বুখারি : হাদিস নং ৩২৮০, সহিহ মুসলিম : হাদিস নং ২০১২
৭ [হাসান] সহিহুল জামে' : হাদিস নং ১০৬৮
৮ সুরা আলে ইমরান : আয়াত ১৫৯

মতো সর্বোত্তম ইবাদতের ক্ষেত্রেও সতর্কতা অবলম্বনকে কার্যকরীভাবে বাস্তবায়নের নির্দেশ দিয়ে বলেছেন,

وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ

'আর যখন তুমি তাদের মধ্যে থাকবে। অতঃপর তাদের জন্য নামায কায়েম করবে, তখন যেন তাদের মধ্য থেকে একদল তোমার সাথে দাঁড়ায় এবং তারা তাদের অস্ত্র ধারণ করে।'[১] অতঃপর সতর্কতা অবলম্বনের কারণ বর্ণনা করে আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন :

وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً

'কাফিররা কামনা করে যদি তোমরা তোমাদের অস্ত্র-শস্ত্র ও আসবাব-পত্র সম্বন্ধে অসতর্ক হও তাহলে তারা তোমাদের ওপর একসাথে ঝাঁপিয়ে পড়বে।'[২] অতএব যে ব্যক্তি জানবে যে, সতর্কতা অবলম্বন তাওয়াক্কুলেরই অংশ, সে কিছুতেই এ কথা বলতে পারবে না যে, সতর্কতা অবলম্বন পরিত্যাগ করলে আল্লাহর প্রতি বান্দার তাওয়াক্কুল বিশুদ্ধ হবে। তাওয়াক্কুল হলো, যা বাস্তবায়নের ক্ষমতা বান্দার নেই, সে বিষয়ে আল্লাহর ওপর ভরসা করা। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন :

'আগে উট বাঁধো, তারপর তাওয়াক্কুল করো।' যদি সতর্কতা অবলম্বন ছেড়ে দেয়ার নাম তাওয়াক্কুল হতো, তাহলে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে নামাযের মধ্যে সতর্কতা অবলম্বন না করার নির্দেশ দিতেন। কিন্তু প্রজ্ঞাবান আল্লাহ তায়ালা তা করেননি, নামাযের মধ্যে সশস্ত্র থাকার নির্দেশ দিয়েছেন। এ কারণেই ইমাম শাফেয়ি রহ. বলেন, যদি হামলার আশঙ্কা থাকে, তাহলে নামাযের মধ্যেও সশস্ত্র থাকা ওয়াজিব। অতএব প্রতীয়মান হলো, সতর্কতা অবলম্বন তাওয়াক্কুলের বিপরীত কোনো বিষয় নয়। কেননা মুসা আলাইহিস সালামকে যখন বলা হয়,

يَا مُوسَى إِنَّ الْمَلَأَ يَأْتَمِرُونَ بِكَ لِيَقْتُلُوكَ فَاخْرُجْ إِنِّي لَكَ مِنَ النَّاصِحِينَ

'হে মুসা, নিশ্চয় পারিষদবর্গ তোমাকে হত্যার পরামর্শ করছে, তাই তুমি বেরিয়ে যাও, নিশ্চয় আমি তোমার জন্য কল্যাণকামীদের একজন।'[৩] তিনি

---

১ সুরা নিসা : আয়াত ১০২
২ সুরা নিসা : আয়াত ১০২
৩ সুরা কাসাস : আয়াত ২০

তখন শহর ছেড়ে মাদায়েন চলে যান। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ষড়যন্ত্রকারীদের থেকে আত্মরক্ষার উদ্দেশ্যে মক্কা ছেড়ে মদিনা হিজরত করেন এবং গুহার বিষধর প্রাণীর দংশন থেকে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে রক্ষার উদ্দেশ্যে হজরত আবু বকর রা. গুহার ছিদ্রপথ কাপড় দ্বারা বন্ধ করে দেন। এভাবেই রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর সাহাবায়ে কেরাম সতর্কতা অবলম্বনের পর আল্লাহ তায়ালার ওপর তাওয়াক্কুল করে এই উম্মতকে তাওয়াক্কুল শিক্ষা দিয়েছেন। কুরআন মাজীদে এর অনেক নজির বিদ্যমান। হজরত ইয়াকুব আলাইহিস সালাম এর উক্তি উল্লেখ করে আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন :

لَا تَقْصُصْ رُؤْيَاكَ عَلَىٰ إِخْوَتِكَ

'তুমি তোমার ভাইদের নিকট তোমার স্বপ্নের বর্ণনা দিও না।'[৪] অন্য আয়াতে হজরত ইয়াকুব আলাইহিস সালাম এর উক্তি উল্লেখ করে আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন :

لَا تَدْخُلُوا مِنْ بَابٍ وَاحِدٍ وَادْخُلُوا مِنْ أَبْوَابٍ مُتَفَرِّقَةٍ

'তোমরা এক দরজা দিয়ে প্রবেশ কোরো না; বরং ভিন্ন ভিন্ন দরজা দিয়ে প্রবেশ করো।'[৫] অনেকে প্রশ্ন করতে পারে, আমরা কীভাবে সতর্কতা অবলম্বন করব? অথচ সৃষ্টির বহু পূর্বেই মানুষের ভাগ্য লিপিবদ্ধ হয়েছে। এর জবাবে বলা হবে—আপনি কেন সতর্কতা অবলম্বন করবেন না? অথচ ভাগ্য নির্ধারণকারীই সতর্কতা অবলম্বনের আদেশ করেছেন। কেননা তিনিই তো বলেছেন,

خُذُوا حِذْرَكُمْ

'তোমরা সতর্কতা অবলম্বন করো।'[৬]

আবু উসমান বলেন, একদিন ঈসা আলাইহিস সালাম পাহাড়ের চূড়ায় নামায পড়ছিলেন। তখন শয়তান তার কাছে এসে বলল, আপনি তো বলে থাকেন, সবকিছু আল্লাহর সিদ্ধান্ত অনুযায়ী হয়। তিনি উত্তরে বলেছিলেন, হ্যাঁ, অবশ্যই আমি তা দাবি করি। শয়তান বলল, তাহলে আপনি পাহাড়

---

৪ সুরা ইউসুফ : আয়াত ৫
৫ সুরা ইউসুফ : আয়াত ৬৭
৬ সুরা নিসা : আয়াত ৭১

থেকে ঝাঁপ দিয়ে মনকে বলুন, আল্লাহ আমার জন্য এটাই সিদ্ধান্ত রেখেছেন। তখন ঈসা আলাইহিস সালাম বললেন, হে অভিশপ্ত শয়তান! পরীক্ষা আল্লাহই করবেন বান্দাকে। বান্দা কী করে আল্লাহকে পরীক্ষা করার স্পর্ধা দেখাবে?

***

আমরা সুফিদের যে সকল অবান্তর ও অনর্থক কর্মকাণ্ডের ঘটনাবলি উল্লেখ করেছি—এর সবই ছিল শয়তানের কুমন্ত্রণা ও প্ররোচনা।

আবদুর রহমান সালামি বলেন, আমি মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল্লাহ রাযির কাছ থেকে শুনেছি, জনৈক ব্যক্তি আবু আবদুল্লাহ ইবনে সালেমকে জিজ্ঞেস করেন, আমরা কি উপার্জনের ভিত্তিতে আল্লাহর ইবাদত করব নাকি তাওয়াক্কুলের ভিত্তিতে আল্লাহর ইবাদত করব? প্রত্যুত্তরে তিনি বলেন, তাওয়াক্কুল রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর অবস্থা, আর উপার্জন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সুন্নত। তিনি আরও বলেন, যার বিশ্বাস দৃঢ় নয়, তার জন্য উপার্জন করা সুন্নত। তবে আল্লাহর ওপর যার দৃঢ় বিশ্বাস আছে, তার জন্য উপার্জন করা বৈধ নয়। আবুল কাসেম রাজী বলেন, আমি ইউসুফ ইবনে হোসাইনকে বলতে শুনেছি, কোনো শিষ্য জাগতিক উপার্জনে ব্যস্ত হলে তার থেকে কল্যাণ পাওয়া যাবে না।

গ্রন্থকার বলেন, যারা তাওয়াক্কুলের মর্মার্থ বুঝতে অপারগ, তারাই এমন কথা বলার স্পর্ধা দেখাতে পারেন। ইতোপূর্বে আমরা উল্লেখ করে এসেছি, তাওয়াক্কুল অন্তরঘটিত ব্যাপার। তাই রিযিক অন্বেষণে শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের ব্যবহার তাওয়াক্কুল-পরিপন্থী হতে পারে না। রিযিক অন্বেষণকারী তাওয়াক্কুলকারী না হলে তো বলতে হবে, কোনো নবী তাওয়াক্কুলকারী ছিলেন না! কেননা হজরত আদম আলাইহিস সালাম চাষী ছিলেন, হজরত নুহ ও যাকারিয়া আলাইহিস সালাম কাঠমিস্ত্রি ছিলেন, হজরত ইদরীস আলাইহিস সালাম দর্জি ছিলেন, হজরত ইবরাহিম ও লূত আলাইহিস সালাম কৃষক ছিলেন, হজরত সালেহ আলাইহিস সালাম ব্যবসায়ী ছিলেন, হজরত দাউদ আলাইহিস সালাম বর্ম বানাতেন এবং তা বিক্রি করে সংসার চালাতেন, হজরত মুসা আলাইহিস সালাম, শুয়াইব আলাইহিস সালাম ও হজরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাখাল ছিলেন। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন :

وَأَنَا كُنْتُ أَرْعَاهَا لِأَهْلِ مَكَّةَ بِالْقَرَارِيطِ

'আমি অর্থের বিনিময়ে মক্কাবাসীর ছাগল চড়াতাম।'[১]

আল্লাহ তায়ালা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর জন্য গনিমতের অংশ নির্ধারণ করলে তাঁকে আর উপার্জনের পেছনে পড়তে হয়নি। হজরত আবু বকর, ওসমান, আবদুর রহমান ইবনে আউফ ও তালহা রা. কাপড় ব্যবসায়ী ছিলেন। তেমনিভাবে মুহাম্মাদ ইবনে সিরিন ও মায়মুন ইবনে মেহরান রহ.ও কাপড় ব্যবসায়ী ছিলেন। হজরত যুবাইর ইবনুল আউয়াম, আমর ইবনুল আস, আমের ইবনে কুরাইজ রা. রেশম ব্যবসায়ী ছিলেন। তেমনিভাবে ইমাম আবু হানিফা রহ.ও রেশম ব্যবসায়ী ছিলেন। সাহাবায়ে কেরাম রা. ও তাবেয়িনরা নিজে উপার্জন করতেন এবং অন্যকেও এ ব্যাপারে উৎসাহ দিতেন।

আতা ইবনে সায়েব রা. বলেন, খিলাফতের গুরুদায়িত্ব হজরত আবু বকর রা. এর কাঁধে পড়লে তিনি ব্যবসার উদ্দেশ্যে মাথায় কাপড় নিয়ে বাজারে রওয়ানা হন। পথিমধ্যে হজরত ওমর ও আবু উবায়দা রা. এর সাথে সাক্ষাৎ হলে তাঁরা বলেন, আপনি কোথায় যাচ্ছেন? তিনি বললেন, আমি বাজারে যাচ্ছি। তাঁরা বললেন, আপনি বাজারে গিয়ে ব্যবসা করলে মুসলমানদের দায়িত্ব পালন করবে কে? সিদ্দীকে আকবর রা. বললেন, আমি যদি ব্যবসা না করি, আমার পরিবারের ভরণ-পোষণ কীভাবে হবে?

আমর ইবনে মাইমূন রা. বলেন, আবু বকর রা. এর ওপর খিলাফতের দায়িত্ব পড়লে, তাঁর জন্য দুই হাজার দিরহাম ভাতা নির্ধারণ করা হয়। তিনি বললেন, আমাকে আরও কিছু বাড়িয়ে দাও, কেননা আমার পরিবার আছে। আর তোমরাও আমাকে ব্যবসা থেকে বিরত রাখছ। তখন আরও পাঁচশত দিরহাম ভাতা বাড়ানো হয়।

গ্রন্থকার বলেন, কেউ যদি সুফিদেরকে বলে, আমি আমার পরিবারকে কীভাবে খাওয়াব? এ কথা শুনে সুফি বলবে, তুমি শিরক করে ফেলেছ। কাউকে তারা ব্যবসা করতে দেখলে তারা তাকে বলবে, তুমি আল্লাহর ওপর তাওয়াক্কুলকারী নও, তোমার ইয়াকীন বিশুদ্ধ হয়নি। অথচ এই বেচারা সুফি তাওয়াক্কুল ও ইয়াকীনের সঠিক মর্ম অনুধাবন করতে না পেরে এমন মন্তব্য করেছে। অনেক সুফি তাই আয়-উপার্জন বাদ দিয়ে সারাক্ষণ খানকায় পড়ে

---

১ সহিহ বুখারি : হাদিস নং ২২৬২

থাকে। এখানে লোকজন দান-দক্ষিণা করে থাকে। এই দান-অনুদানই হয় তাদের তাওয়াক্কুলের কেন্দ্রবিন্দু। এক্ষেত্রে দোকান আর খানকার মাঝে তেমন বিস্তর তফাৎ নেই।

ইবরাহিম ইবনে আদহাম বলেন, সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যিব বলতেন, যে ব্যক্তি উপার্জন বাদ দিয়ে সারাক্ষণ মসজিদে পড়ে থাকে এবং মানুষের দান-অনুদান গ্রহণ করে সে যেন ভিক্ষার জন্য হাত পাতল।

ইসমাঈল ইবনে নাজদি বলেন, আবু তুরাব তাঁর সঙ্গীদেরকে বলতেন, তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি তালিযুক্ত কাপড় পরবে, সে যেন ভিক্ষার ভান করল। আর যে ব্যক্তি উপার্জন ছাড়া খানকা বা মসজিদে পড়ে থাকবে, সেও ভিক্ষার ভান করল।

গ্রন্থকার বলেন, পূর্বেকার মহান বুযুর্গরা এমন ভান-বাহানা অবলম্বন করতে নিষেধ করতেন এবং জীবিকার সন্ধানে বের হবার তাগাদা দিতেন। হজরত উমর রা. বলেন, হে দরিদ্র জাতি, তোমরা মাথা উঁচু করো। নিশ্চয় হক-বাতিলের পথ স্পষ্ট হয়েছে। সুতরাং কল্যাণের দিকে এসো এবং মুসলমানদের ওপর নির্ভরশীল হয়ো না।

মুহাম্মাদ ইবনে আসেম বলেন, আমার কাছে এ বার্তা এসেছে যে, কোনো বালককে দেখে হজরত উমর রা. খুশি হলে তার সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে বলতেন, তার কি কোনো পেশা আছে? না-সূচক উত্তর দেয়া হলে তিনি বলতেন, সে আমার দৃষ্টি হতে দূরে সরে পড়ল।

সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যিব বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাহাবারা সিরিয়ায় ব্যবসা করতেন। তালহা ইবনে উবাইদুল্লাহ ও সাঈদ ইবনে যায়েদ রা. সেই ব্যবসায়ীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন।

আবুল কাসেম খুত্তালি বলেন, আমি আহমদ ইবনে হাম্বল রহ.-কে জিজ্ঞেস করলাম, এমন ব্যক্তিকে আপনি কোন দৃষ্টিতে দেখেন, যে সারাক্ষণ ঘরে বা মসজিদে অবস্থান করে বলে, আমি ততক্ষণ কোনো কাজ করব না, যতক্ষণ আমার রিযিক আমার কাছে না আসে। তখন আহমদ ইবনে হাম্বল রহ. বললেন, সে তো শরিয়ত সম্পর্কে সম্পূর্ণ অজ্ঞ ব্যক্তি। অথচ রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

جَعَلَ اللهُ رِزْقِي تَحْتَ ظِلِّ رُمْحِي

'আল্লাহ তায়ালা আমার তরবারির ছায়ার নীচে আমার রিযিক নির্ধারণ করেছেন।'[১]

অন্য হাদিসে এসেছে, পাখিরা ভোরবেলা খালি পেট নিয়ে রিযিকের সন্ধানে বের হয়।[২]

আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন,

وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ

'আর কেউ কেউ আল্লাহর অনুগ্রহ সন্ধানে পৃথিবীতে ভ্রমণ করবে।'[৩]

অন্য আয়াতে এসেছে–

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ

'আল্লাহর রিযিক সন্ধান করাতে তোমাদের কোনো পাপ নেই।'[৪]

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাহাবায়ে কেরামগণ জলে-স্থলে ব্যবসা-বাণিজ্য করতেন এবং নিজেদের খেজুর বাগানে কাজ করতেন। এঁরাই তো আমাদের আদর্শ।

আবু বকর মারুযি বলেন, আমি আবু আবদুল্লাহকে বললাম, তাওয়াক্কুলের দাবিদার এ সব লোকেরা বলে, আমরা রিযিকের সন্ধান করব না। কেননা আল্লাহর জিম্মাতেই আমাদের রিযিক। আবু আবদুল্লাহ উত্তরে বললেন, এটা একটা অবান্তর মন্তব্য। অজ্ঞরাই এমন বলতে পারে। অথচ আল্লাহ তায়ালা বলেছেন :

إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ

'জুমার দিন নামাযের আযান দিলে ক্রয়-বিক্রয় বন্ধ করে নামাযের দিকে ধাবিত হও।'[৫]

আবদুল্লাহ ইবনে আহমদ বলেন, আমি আমার পিতাকে এমন জাতি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম, যারা বলে, আল্লাহর ওপর তাওয়াক্কুল করব, উপার্জনের পেছনে পড়ব না। তিনি তখন বললেন, এটা একমাত্র বেকুবরাই বলতে পারে। প্রত্যেক মানুষের উচিত—আল্লাহর ওপর তাওয়াক্কুল করে রিযিকের

---

১ [সহিহ] মুসনাদে আহমাদ : ২/৫০
২ [সহিহ] সহিহুল জামে' : হাদিস নং ৫২৫৪
৩ সুরা মুয্যাম্মিল : আয়াত নং ২০
৪ সুরা বাকারা : আয়াত নং ১৯৮
৫ সুরা জুমা : আয়াত ৯

সন্ধানে সাধ্যমতো চেষ্টা-তদবির করা। ফযল ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে যিয়াদ বলেন, ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল রহ. মানুষকে বাজারে গিয়ে ব্যবসা করার নির্দেশ দিয়ে বলতেন, বাজারে গিয়ে ব্যবসা করলে মানুষের মুখাপেক্ষী থাকতে হয় না।

গ্রন্থকার বলেন, ইবরাহিম ইবনে আদহাম রহ. ফসল কাটতেন, সালমান খাওয়াস রহ. টোকাই ছিলেন এবং হোযাইফা মারয়াসী গোয়াল ছিলেন। ইবনে আকিল বলেন, উপকরণ গ্রহণ করা তাওয়াক্কুল-পরিপন্থী নয়, পাথেয় ও উপকরণ গ্রহণকারীকে নিন্দা করা ইসলামে নিষিদ্ধ। ভালো করে জেনে রাখা দরকার—নবীদের অনন্য গুণাবলি ও বৈশিষ্ট্য থেকে বিচ্যুত হয়ে আরও উঁচু বৈশিষ্ট্যের অনুশীলন একদিকে যেমন শরিয়তে নিষিদ্ধ, অন্যদিকে তা দীনের জন্য বহু ক্ষতি ডেকে আনে।

চিকিৎসা গ্রহণের ব্যাপারে সুফিদের ওপর শয়তানের কুমন্ত্রণা

গ্রন্থকার বলেন, রোগ-বালাই হলে তার জন্য চিকিৎসা গ্রহণের ব্যাপারে আলেমদের মাঝে কোনো মতবিরোধ নেই। শুধু মুষ্টিমেয় কিছু লোকের মতামত হচ্ছে, চিকিৎসা না নেয়া উত্তম। এ ব্যাপারে মনীষীদের অভিমত এবং আরও বিস্তারিত তত্ত্ব ও তথ্য আমি চিকিৎসাবিষয়ক 'লাকতুল মানাফী' গ্রন্থে বিবৃত করেছি। এখানে আমি শুধু এটুকুই আলোকপাত করব, যেহেতু চিকিৎসা গ্রহণ সর্বসম্মতিক্রমে বৈধ এবং কোনো কোনো আলেমের মতে উত্তম হিসেবে বিবেচিত। সুতরাং আমরা তাদের কথার প্রতি কর্ণপাত করব না যারা বলে, চিকিৎসা গ্রহণ করা 'তাওয়াক্কুল' এর বিপরীত। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে সহিহ সূত্রে বর্ণিত আছে,

'রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চিকিৎসা গ্রহণ করেছেন এবং চিকিৎসা গ্রহণের জন্য নির্দেশ দিয়েছেন।'[১]

তাবারি বলেন, বিভিন্ন হাদিস দ্বারা প্রমাণিত হয়, রোগাক্রান্ত হলে চিকিৎসা না নিয়ে বসে থাকা তাওয়াক্কুলের পরিচায়ক নয়। এটা উচিতও নয়। কেননা আল্লাহ তায়ালা মৃত্যু ব্যতীত যত রোগ-ব্যাধি আছে তার চিকিৎসারও ব্যবস্থা করেছেন।[২]

---

১ সহিহ বুখারি : হাদিস নং ৫৬৭৮, সহিহ মুসলিম : হাদিস নং ৫৭৪১

২ মুসতাদরাকে হাকিম : ৪/৪৪৫

রোগ সারানোর উপকরণও সৃষ্টি করেছেন, যেভাবে পানাহারকে ক্ষুদা নিবারণের উপকরণ বানিয়েছেন। অথচ আল্লাহ তায়ালা তার মাখলুককে ক্ষুধা ও রোগ-ব্যাধি থেকে মুক্ত রাখার ক্ষমতা রাখেন। সুতরাং ক্ষুধার যন্ত্রণা যেভাবে পানাহার দিয়ে দূরীভূত হয়, অদ্রূপ ঔষধ খাওয়ার মাধ্যমে তিনি রোগ নিরাময়ের ব্যবস্থা রেখেছেন।

নির্জনতা ও জুমা ছেড়ে দেয়ার ব্যাপারে সুফিদের ওপর শয়তানের প্ররোচনা

আগেকার যুগে যারা একাকিত্ব এবং মানুষের কাছ থেকে পৃথক থাকার অভ্যাস অবলম্বন করতেন, তাদের মূল লক্ষ্য থাকত যেন জ্ঞান অর্জন ও আল্লাহর ইবাদতে ভালো করে মনোনিবেশ করা যায়। কিন্তু তারা এই নির্জনতা অবলম্বন করতে গিয়ে কখনো জুমা ও জামাত ছাড়তেন না। অসুস্থের খবরাখবর নিতেন, জানাযার নামাযে উপস্থিত হতেন। একাকিত্ব অবলম্বনের কারণ ছিল কেবলই মন্দ কাজ হতে বিরত থাকা, ঝগড়া-বিবাদ থেকে নিরাপদ থাকা এবং অসৎ সংশ্রব থেকে দূরে থাকা। সুফিদের এক গোষ্ঠীর অন্তরে প্ররোচনা জাগাতে থাকল শয়তান। এতে কতেক সুফি পাহাড়ের চূড়ায় সন্ন্যাসীদের মতো আসন গাড়তে আরম্ভ করল। জুমা এবং জামাতের সাথে নামায আদায়ের তোয়াক্কা করল না। ছেড়ে দিল আলেম ও জ্ঞানীদের সংশ্রব। সাধারণত সুফিরা তাদের খানকায় অবস্থান করে। মসজিদে নামায পড়তে খুব কমই আসে। প্রশান্তিদায়ক বিছানায় পড়ে থাকে। জীবিকার চিন্তা ছেড়ে দেয়।

আবু হামেদ গাযালি রহ. *এহইয়াউল উলুম* গ্রন্থে বর্ণনা করেন, রেয়াযত বা সাধনার লক্ষ্য হচ্ছে মনের একাগ্রতা জাগ্রত হওয়া। এ লক্ষ্য তখনই সাধিত হবে যখন সে একটি অন্ধকার ঘরে কিংবা যদি অন্ধকার ঘর পাওয়া না যায়, তাহলে চক্ষু বন্ধ করে চাদর ইত্যাদির নিচে একাকী অবস্থান করবে। এমতাবস্থায় সে হক শব্দ শুনতে পাবে এবং পরম প্রতিপালকের জালাল ও ঔজ্জ্বল্য প্রত্যক্ষ করতে পারবে।

গ্রন্থকার বলেন, এই প্রশিক্ষণের দিকে গভীরভাবে চিন্তা করে দেখুন। আশ্চর্যের বিষয় হচ্ছে, একজন ফকিহ ব্যক্তির পক্ষ থেকে কী করে এমন কথা বেরোতে পারে? আর তিনি কী করে বুঝলেন যে, সে যা শুনবে তা আল্লাহ তায়ালার আওয়াজ! আর সে যা দেখতে পাবে তা পরম

প্রতিপালকের জালাল বা ঔজ্জ্বল্য! অথচ যে ব্যক্তি প্রয়োজনের তুলনায় কম আহার করবে, তার ব্যাপারে এমন আশঙ্কা আছে যে, হয়তো সংজ্ঞা হারাবে। কোনো কোনো সময় মানুষ বিভিন্ন প্ররোচনা ও সন্দেহ থেকে দূরে থাকে। কিন্তু যখন সে চোখ বন্ধ করে তার মনে বিভিন্ন ধরনের সন্দেহের উদ্রেক হয়ে থাকে। কেননা মানব মস্তিষ্কে তিনটি শক্তি বিদ্যমান। এক. ইচ্ছাশক্তি, দুই. চিন্তাশক্তি ও তিন. স্মরণশক্তি। মস্তিষ্কে ইচ্ছার স্থানের আগে আরও দু'টি পর্দা আছে, চিন্তার স্থান মাঝামাঝি আর ধী বা স্মরণশক্তি আরও পেছনে অবস্থান করে। মানুষ যখন তার মাথা ঝুঁকিয়ে রাখে এবং চক্ষু বন্ধ করে নেয় তখন চিন্তা ও ইচ্ছাশক্তি প্রভাবিত হতে থাকে।

আবু উসমান ইবনুল আদমি বলেন, আবু উবাইদ বসরির নিয়ম ছিল, রমযানের প্রথম তারিখে ঘরে গিয়ে স্ত্রীকে বলতেন, আমার ঘরের দরজা মাটি দ্বারা ভরাট করে দেবে এবং ছিদ্র দিয়ে প্রতিদিন একটি করে রুটি দেবে। ঈদের দিন এলে স্ত্রী তার ঘরে গিয়ে ত্রিশটি রুটি দেখতে পেত। সে কিছু খেত না, পানও করত না এবং মাসের শেষ দিন পর্যন্ত এক অযুতে থাকত।

গ্রন্থকার বলেন, এই ঘটনা দু'টি কারণে আমার মতে বিশ্বাসযোগ্য নয়। প্রথমত এক মাস ধরে মানুষ কীভাবে পানাহার, অযু ও পায়খানা-পেশাব ছাড়া চলতে পারে? দ্বিতীয়ত মুসলমান হয়ে জুমা ও জামাতে নামায আদায় হতে বিরত থাকা কি উচিত? অথচ এটা ওয়াজিব, ছেড়ে দেয়া নাজায়েয। তথাপি ঘটনা যদি বাস্তবে ঘটেও থাকে, তাহলে বলতে হবে এই লোকের সাথে শয়তান ধোঁকা দিতে অনেক চেষ্টা-তদবির চালিয়ে সফল হয়েছে। আবু আবদুল্লাহ নিশাপুরী বলেন, আমি অনেকবার আবুল হাসান সুফিকে বলতে শুনেছি, তাঁকে জুমা ও জামাত তরক করার কারণে বহু অপদস্থ হতে হয়েছে। তিনি বলতেন, ফজিলত যদিও জামাতের মধ্যে, কিন্তু নিরাপত্তা একাকিত্বে নিহিত।

নির্জনতার ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা

যে নির্জনতা ও একাকী অবস্থানের ফলে ইলম অর্জন এবং কাফিরদের সাথে জিহাদ হতে বঞ্চিত থাকতে হয়, এমন নির্জনতা ও একাকী অবস্থানের ব্যাপারে নিষেধ করা হয়েছে।

হজরত আবু উমামা রা. হতে বর্ণিত, আমি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে একটি বাহিনীর সফরসঙ্গী ছিলাম। আমাদের মধ্য হতে এক ব্যক্তি পাহাড় দিয়ে অতিক্রমকালে সেখানে সামান্য পানি দেখতে পেল। সে মনে মনে ভাবল, এই পাহাড়ে আমি ঘর নির্মাণ করব এবং এখানে যে সবুজ প্রকৃতি আছে, তা হতে জীবিকা নির্বাহ করে জীবন কাটিয়ে দেব। দুনিয়াদারি থেকে একেবারে পৃথক হয়ে যাব। পরে সে ভাবল, ব্যাপারটি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে উপস্থাপন করে দেখি। তিনি অনুমতি দিলেই আমি এমন করব, নচেৎ নয়। সে এসে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে বিস্তারিত মনোবাসনার কথা পেশ করলে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আমি ইহুদিবাদ ও খ্রিষ্টবাদ নিয়ে অবতীর্ণ হইনি; বরং প্রকৃত শরিয়ত ও সহজ দীন নিয়ে অবতীর্ণ হয়েছি। ওই সত্তার কসম, যার কুদরতি হাতে মুহাম্মদের প্রাণ! আল্লাহর রাস্তায় সকাল-সন্ধ্যা একবার কদম উঠানো দুনিয়া এবং দুনিয়ার মধ্যে যা কিছু রয়েছে তদাপেক্ষা উত্তম। আর তোমাদের জন্য জামাতের কাতারে দাঁড়ানো একাকী ষাট বছর নামায অপেক্ষা উত্তম।[১]

সুফিদের ওপর অতি নম্রতা ও মাথা অবনত রাখার ব্যাপারে ইবলিসের চক্রান্ত

গ্রন্থকার আল্লামা ইবনুল জাওযি রহ. বলেন, আল্লাহর ভয় যখন মানুষের মনে বদ্ধমূলভাবে গেঁথে যায়, তখন স্বাভাবিকভাবে নম্রতা ও দুর্বলতা প্রদর্শনের অভ্যাস গড়ে ওঠে। এটাকে মানুষ নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না। সুতরাং সে অবনত মস্তিষ্কে সারাক্ষণ নিজেকে দুর্বল ও ছোট ভাবতে থাকে। সালফে সালেহীনগণ এ অবস্থা লুকাতে চেষ্টা করতেন। মুহাম্মাদ বিন সিরিন দিনের বেলা হাসতেন আর রাত্রিবেলা কাঁদতেন। আমি এটা বলতে চাচ্ছি না যে, আলেমগণ সাধারণ মানুষের কাছে বসে অস্বাভাবিক আচরণ করবেন; বরং এতে তো তাদের কষ্ট আরও বৃদ্ধি পাবে।

হজরত আলী রা. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'যখন তোমরা ইলমের আলোচনা করবে, তখন স্বীয় মর্যাদা ও ব্যক্তিত্ব বজায় রাখবে। হাসি-

---

১ [যঈফ] মুসনাদে আহমাদ : ৫/২৬৬

কৌতুকের সাথে ইলমকে গুলিয়ে ফেলো না। যাতে মানুষ মন থেকে সে কথা ছুড়ে ফেলে । এমন অবস্থাকে 'রিয়া' বলে না।'

সুতরাং আলেমদের উচিত, সাধারণ মানুষের সামনে নীরবতা ও আদবের সাথে উপস্থিত হওয়া। অন্যদিকে তাদের সামনে কৃত্রিম দুর্বলতা ও নম্রতা প্রদর্শন, মাথা নিচু রাখা নিন্দনীয় বিষয়। এতে মানুষ তাকে বড় পীর, অলি বুঝবে এবং মুসাফা করে হাতে চুমু দেয়ার জন্য দূর-দূরান্ত থেকে ঝাঁকে ঝাঁকে মানুষ আসবে। অনেক সময় কেউ যদি বলে, হুজুর আমার জন্য একটু দোয়া করবেন, তৎক্ষণাৎ তিনি হাত তুলে দোয়া আরম্ভ করেন, যেন তিনি তার জন্য এখনই মঙ্গল বয়ে আনবেন। এ সব খুবই নিন্দনীয় ও পরিত্যাজ্য। ইবরাহীম নাখয়ি রহ. হতে বর্ণিত আছে, তাঁকে বলা হয়েছিল, আমাদের জন্য দোয়া করুন, তার কাছে বিষয়টি খুব খারাপ লাগে এবং এতে তিনি মারাত্মক অসন্তুষ্ট হন।

এমন বহু ভীরু রয়েছেন—যারা ভয়ের আধিক্যের দরুন নিজেকে খুবই হেয় ও অথর্ব ভেবে থাকেন। লজ্জা-সংকোচের তীব্রতায় আকাশের দিকে তাকান না মাথা তুলে। অথচ এটা কোনো ফজিলতের বিষয় নয়। কেননা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নম্রতা ও খুশুর চেয়ে অধিক খুশু আর নম্রতা কারও হতে পারে না। সহিহ মুসলিমে আছে, হজরত আবু মুসা আশয়ারী রা. হতে বর্ণিত,

وَكَانَ كَثِيرًا مَا يَرْفَعُ رَأْسَهُ إِلَى السَّمَاءِ

'রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অধিকাংশ সময় আকাশের দিকে মাথা তুলে থাকতেন।[১]

এ হাদিস দ্বারা প্রমাণিত, আকাশের নিদর্শনাবলি থেকে শিক্ষা নেয়ার উদ্দেশ্যে আকাশপানে তাকানো মুস্তাহাব। আল্লাহ তায়ালা বলেন,

أولم يَنْظُرُوا إِلَى السَّماءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْناها

"তারা কি উপরের আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখে না, আমি কীভাবে তা সৃষ্টি করেছি!"[২] অন্যত্র বলেন,

قُلِ انْظُرُوا مَاذَا فِي السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ

"ভূমণ্ডল ও নভোমণ্ডল তথা জমিন ও আকাশের দিকে দেখো এতে কত নিদর্শন বিদ্যমান।"[৩]

---

১ সহিহ মুসলিম : হাদিস নং ২৫৩১

২ সুরা ক্বাফ : আয়াত ৬

এসব আয়াত সুফিদের এমন কর্মকাণ্ডের ঘোরতর বিরোধী, যেখানে তারা বলে যে, অমুক সুফি এত বছর যাবৎ আকাশের দিকে তাকায়নি।

এসব শ্রেণি নিজেদের আবিষ্কৃত বিদয়াতের সাথে বিভিন্ন উপমাও নির্ধারণ করে রেখেছে। তাদের যদি এ বিষয়ে জানা থাকত যে, আল্লাহর ভয় ও লজ্জায় তাদের মাথা অবনত করা ঊর্ধ্বমুখী রাখার মতোই, তাহলে তারা এমন করত না। কিন্তু ইবলিসের কারবার হচ্ছে অজ্ঞদের সাথে খেল-তামাশায় মত্ত থাকা।

বাকি রইল আলেমগণ। তাদের থেকে ইবলিস বহু দূরে অবস্থান করে। ভীষণ ভয় পায় তাদের। কেননা আলেমগণ ইবলিসের সমুদয় হাল-অবস্থা ও স্বভাব-প্রকৃতি সম্পর্কে ভালোভাবে অবগত। তাঁরা তার সকল ফাঁদ, ধোঁকা ও চক্রান্ত থেকে দূরে থাকেন। আবু সালামা ইবনে আবদুর রহমান হতে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাহাবাগণ কোণঠাসা ও লাজুক প্রকৃতির ছিলেন না। তাঁরা তাদের মজলিসে শে'র-কবিতা আবৃত্তি করতেন এবং নিজেদের জাহেলি যুগের কথা অকপটে বর্ণনা করতেন। পরে যখন তাদের সম্মুখে দীনের কোনো বিষয় আসতো তাদের নয়নযুগল এমনভাবে ঘষতেন ও ঘোরাতেন যেন তিনি পাগল হয়ে গেছেন।

বর্ণিত আছে, হজরত উমর ইবনুল খাত্তাব রা. এক ব্যক্তিকে দেখলেন যিনি মাথা নিচু করে আছেন। উমর রা. বললেন, হে অমুক! মাথা উঠাও। কেননা যে পরিমাণ খুশু বা আল্লাহর ভয় তোমার অন্তরে আছে, তার বেশি প্রকাশ হয় না। আর যে ব্যক্তি নিজের অন্তরের আল্লাহর ভয়ের চেয়ে মানুষকে দেখানোর জন্য তাদের সামনে খুশু ও নম্রতা প্রদর্শন করে, সে তো মুনাফেকী প্রকাশ করল। বলা হয়, হজরত উমর রা. এর সামনে কোনো এক ব্যক্তি চিন্তা বা পেরেশানীর কারণে ভারী শ্বাস ফেললে তিনি তাকে ঘুষি মারেন অথবা লাথি মারেন।

ইবনে আবি খাইসামা তাঁর পিতা হতে বর্ণনা করেন, শিফা বিনতে আবদুল্লাহ কিছু লোককে দেখেন, যারা ধীরে ধীরে হাঁটছে এবং নম্রসুরে কথা বলছে। জিজ্ঞেস করা হলো, তারা এমন করছে কেন? উপস্থিত লোকেরা বলল, এরা আবেদ। তিনি বললেন, আল্লাহর কসম! হজরত উমর রা. যখন কথা বলতেন উচ্চৈঃস্বরে বলতেন যেন সকলে শুনতে পায়। আর যখন

---

৩ সুরা ইউনুস : আয়াত ১০১

হাঁটতেন তীব্র বেগে হাঁটতেন। আর কাউকে প্রহারের জন্য উদ্যত হলে তার মন কোমল হয়ে যেত। অথচ তিনি ছিলেন সত্যিকার অর্থে আবেদ।

গ্রন্থকার বলেন, মনীষীরা নিজেদের অবস্থা লুকাতেন। আইয়ুব সাখতিয়ানি রহ. এর ব্যাপারে বর্ণিত আছে, তিনি স্বাভাবিকের চেয়ে একটু লম্বা জামা পরতেন। যাতে তার প্রকৃত অবস্থা গোপন থাকে। সুফিয়ান সাওরি রহ. বলতেন, আমার যে সব আমল প্রকাশ হয়ে গেছে আমি তা গণনায় ধরি না। তিনি কাউকে নামায পড়তে দেখে বলেছিলেন, এই নামায দ্বারা তুমি কী পাবে, যা মানুষজন দেখছে? আবু উমামা জনৈক ব্যক্তিকে সিজদা অবস্থায় দেখে বললেন, কত ভালো হতো, যদি এই সিজদাটি ঘরে গিয়ে দিতে! হোসাইন ইবনে আম্মারার মজলিসে জনৈক ব্যক্তি আহ্ করে উঠল। লোকজন বলছে, হোসাইন ওই লোককে দেখে জানতে চাইলেন সে কে? তার ইচ্ছে ছিল পরিচয় নিয়ে তাকে একাকী গিয়ে এ ব্যাপারে কিছু কথা বলবেন। হারমালা হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি ইমাম শাফেয়ি রহ.কে নিম্নের কবিতা আবৃত্তি করতে শুনেছি–

ودع الذين اذا أتوك تنسكوا * واذا خلوا فهم ذئاب خفاف

"এমন লোকদের থেকে দূরে থাকো, যারা তোমার সম্মুখে এলে তীব্র নম্রতায় মাথা নিচু করে রাখে, আর তোমার অগোচরে সে হিংস্র বাঘ হয়ে যায়।"

ইবরাহিম ইবনে সাঈদ রহ. বলেন, আমি খলিফা মামুনুর রশীদের খেদমতে দাঁড়িয়ে ছিলাম। আমাকে আওয়াজ দিয়ে তিনি বললেন, হে ইবরাহিম! আমি উত্তর দিলাম, জি হুজুর! তিনি বললেন, দশটি নেক আমল এমন আছে, যা আল্লাহর কাছে পৌঁছে না। তার কিছুই আল্লাহর দরবারে গ্রহণযোগ্য হিসেবে বিবেচিত হয় না। আমি জানতে চেয়ে বললাম, আমিরুল মুমিনীন! সেগুলো কী কী? উত্তরে তিনি বললেন, ইবরাহিম ইবনে বুরাইহার মিম্বরে দাঁড়িয়ে কান্না করা, আবদুর রহমান ইবনে ইসহাকের খুশু', দরবেশীর কারণে ইবনে সুমা'আর চেহারা বিবর্ণ হওয়া, ইবনে খিউইয়ার রাত্রিবেলা নামায পড়া, আইয়্যাশের চাশতের নামায পড়া, ইবনে সিন্দীর সোম ও বৃহস্পতিবারে রোযা রাখা, আবু রাজা'র হাদিস বর্ণনা করা, হাজেবীর গল্প বলা, হাফসুইয়ার সদকা করা এবং ইয়া'লা ইবনে কুরাইশের কিতাব 'আশ্‌শামী'।

বিয়েতে অনাগ্রহী করার ব্যাপারে সুফিদের ওপর শয়তানের ধোঁকা

গ্রন্থকার আল্লামা ইবনুল জাওযি রহ. বলেন, ব্যভিচারে লিপ্ত হওয়ার আশঙ্কা হলে বিয়ে করা ওয়াজিব। আর যদি ব্যভিচারে পতিত হওয়ার আশঙ্কা না থাকে তবে বিবাহ করা সুন্নাতে মুয়াক্কাদা। এটা জামহূর তথা অধিকাংশ ফকিহদের মাযহাব। ইমাম আবু হানিফা ও ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল বলেন, এমন অবস্থায় বিয়ে করা সকল প্রকার নফল ইবাদত অপেক্ষা উত্তম। কেননা তা সন্তানপ্রাপ্তির উপায়। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন :

تناكحوا تناسلوا

"বিয়ে করো এবং বংশ বৃদ্ধি করো।"[১]

আরও বলেছেন,

النِّكَاحُ مِنْ سُنَّتِي، فَمَنْ لَمْ يَعْمَلْ بِسُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي

"বিয়ে করা আমার সুন্নত। যে ব্যক্তি আমার সুন্নত থেকে মুখ ফিরিয়ে নিল, সে আমার দলভুক্ত নয়।"[২]

عَنْ سَعْدِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: " رَدَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى عُثْمَانَ بْنَ مَظْعُونٍ التَّبَتُّلَ وَلَوْ أَذِنَ لَهُ فِيهِ لَاخْتَصَيْنَا

হজরত সাআদ ইবনে আবি ওয়াক্কাস রা. বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উসমান ইবনে মাযঊন রা.-কে বিয়ে ছেড়ে দিতে বারণ করেছেন। যদি তিনি বিয়ে ছেড়ে অনুমতি দিতেন, তাহলে আমরা সবাই খাসি তথা যৌনশক্তি রহিত করার পন্থা অবলম্বন করতাম।"[৩]

عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ نَاسًا سَأَلُوا أَزْوَاجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ عِبَادَتِهِ فِي السِّرِّ، قَالَ: فَحَمِدَ اللهَ، وَأَثْنَى عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: " مَا بَالُ أَقْوَامٍ يَسْأَلُونَ عَمَّا أَصْنَعُ، أَمَّا أَنَا فَأُصَلِّي وَأَنَامُ، وَأَصُومُ وَأُفْطِرُ، وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ، فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي، فَلَيْسَ مِنِّي

---

১ [যঈফ] যঈফুল জামে' : হাদিস নং ২৪৮৪

২ [সহিহ] সহিহুল জামে' : হাদিস নং ৬৮০৭

৩ সহিহ বুখারি : হাদিস নং ৫০৭৩, সহিহ মুসলিম : হাদিস নং ১৪০২

'হজরত আনাস রা. হতে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাহাবিদের মধ্য থেকে একটি জামাত আয্ওয়াজে মুতাহ্হারাত তথা নবীপত্নীদের কাছে জিজ্ঞেস করলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘরে কীভাবে ইবাদত-বন্দেগি করতেন? নবীপত্নীগণ উত্তর দিলেন। সাহাবাদের মধ্যে কেউ কেউ বললেন, আমি মেয়েদের সাথে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হব না। কেউ কেউ বললেন, আমি কখনো গোস্ত ভক্ষণ করব না। আবার কেউ কেউ বললেন, আমি রাত্রিবেলা নিদ্রা গ্রহণ করব না। কেউ কেউ অনবরত রোযা রাখার সংকল্প করলেন। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁদের এ সব কথা শুনে খুতবায় হামদ ও সানা পড়ার পর ইরশাদ করলেন—এরা কারা যারা এমন এমন ইচ্ছা পোষণ করছে? আমি তো রাত্রিবেলা নামায পড়ি এবং ঘুমাই। রোযা রাখি এবং রোযা ছাড়াও থাকি। নারীদের বিবাহ করি। যে ব্যক্তি আমার সুন্নত থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয় সে আমার দলভুক্ত নয়।'[১] ইবনে আব্বাস রা. বলেন, এই উম্মতের সবচেয়ে উত্তম ব্যক্তি সে, যার বহু স্ত্রী ছিল।[২]

শাদ্দাব ইবনে আউস রা. বলেন, আমাকে বিয়ে করিয়ে দিন। কেননা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে অসিয়ত করে বলেছেন যাতে আমি বিয়ে করা ছাড়া আল্লাহর দরবারে না যাই।[৩]

মুহাম্মাদ ইবনে রাশেদ আমাকে বলেছেন, মাকহূল জনৈক ব্যক্তির কাছে বর্ণনা করেছেন, হজরত আবু যর রা. বলেছেন, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর খেদমতে এক ব্যক্তি এসেছিলেন যার নাম আক্কাফ ইবনে বিশির তামিমি হিলালী। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, হে আক্কাফ! তোমার কোনো স্ত্রী আছে? সে বলল, নেই। জিজ্ঞেস করলেন, কোনো দাসী আছে? সে বলল, নেই। এবার তার কাছে জানতে চেয়ে বললেন, তুমি কি যৌনশক্তি রহিত? সে বলল, হ্যাঁ, এতে আমি সন্তুষ্ট। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, এখন তুমি শয়তানের ভাই। তুমি যদি খ্রিষ্টান হতে তাহলে সন্ন্যাসী হয়ে যেতে। আমাদের সুন্নত হচ্ছে বিয়ে করা। আর তোমার মতো মন্দ ব্যক্তিরা বিয়েবিহীন জীবন কাটায়। মৃত্যুবেলায় সবচেয়ে অপদস্থ হয়ে ওই ব্যক্তি মারা যায়, যে বিয়ে-শাদী ছাড়া

---

১ সহিহ বুখারি : হাদিস নং ৫০৬৩, সহিহ মুসলিম : হাদিস নং ১৪০১

২ হাদিসটির সনদ দুর্বল। এর রাবী আবু রাজা আলজুযরী বহু মুনকার হাদিস রেওয়ায়াত করেছেন।

৩ মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবাহ : ৩/৪৩৯ [রেওয়ায়াতটি মুনকার]

জীবন কাটিয়ে দেয়। সৎ লোকদের জন্য বিয়ে ছেড়ে দেয়ার চেয়ে বড় কোনো অস্ত্র শয়তানের কাছে নেই।[৪]

আবু বকর আলমারুযি আমাকে বলেন, আমি আহমদ ইবনে হাম্বল রহ. এর কাছ থেকে শুনেছি, তিনি বলেন, বিয়ে ছাড়া তথা চিরকুমার থাকা ইসলামের কোনো বিধানের অন্তর্ভুক্ত নয়। কেননা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চৌদ্দটি বিয়ে করেছেন এবং নয়জন স্ত্রী রেখে ইন্তেকাল করেছেন। পরে বলেছেন, যদি বিশর ইবনুল হারিস বিয়ে করে নিতেন তাহলে তার সব কাজ চুকে যেত। মানুষ বিয়ে-শাদী ছেড়ে দিলে আর জিহাদ করবে না, হজ করবে না, এটা করবে না, সেটা করবে না। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর অবস্থা অনেক সময় এমন হতো যে, ঘরে রান্না করার মতো কোনো উপকরণ নেই, তারপরও তিনি বিয়ে করা পছন্দ করতেন এবং মানুষকে এ ব্যাপারে উৎসাহ দিতেন। চিরকুমার থাকতে বারণ করতেন। সুতারং যে ব্যক্তি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাজ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয় সে কখনো হকের ওপর থাকতে পারে না।

হজরত ইয়াকুব আলাইহিস সালাম শেষ বয়সে প্রচণ্ড পেরেশান অবস্থাতেও বিয়ে করেছেন এবং তাঁর সন্তান হয়েছে। উপরন্তু রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, আমার অন্তরে নারীদের প্রতি ভালোবাসা দেয়া হয়েছে।[৫] ইবরাহিম ইবনে আদহাম হতে বর্ণিত, জনৈক ব্যক্তি আমার কাছে অভিযোগ তুলল যে, আমি বিয়ে করেছি। পরে আমার সন্তান হলে এখন আমি ভীষণ পেরেশানি ভোগ করছি। এখনও তার কথা শেষ হয়নি, ইবরাহিম ইবনে আদহাম তাকে ধমক দিয়ে বললেন, আমি দেখছি, এর বিনিময়ে আল্লাহ তোমাকে ক্ষমা করে দিয়েছেন। তুমি সেই পন্থায় দৃষ্টি দাও যে পথে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও সাহাবায়ে কেরাম জীবন কাটিয়েছেন। পরে বললেন, নিজের পিতা থেকে কেঁদে কেঁদে রুটি চাওয়া এমন এমন ফজিলতের কারণ। বলো, এ সব মর্যাদা অবিবাহিত আবেদরা কোথা হতে অর্জন করবে?

---

৪ [যঈফ]

৫ [সহিহ] সহিহুল জামে' : হাদিস নং ৩১২৪, আলবানি রহ. সংকলিত মিশকাত : হাদিস নং ৫২৬১

বিয়ে-বিতৃষ্ণায় সুফি মতাদর্শের খণ্ডন

ইবলিস অধিকাংশ সুফিকে ধোঁকা দিয়ে তাদেরকে বিয়ে-শাদী থেকে দূরে সরিয়ে রাখে। তাই পূর্বেকার সুফিরা ইবাদতে মত্ত থাকার নিমিত্তে বিয়ে করতেন না। তারা মনে করতেন এতে ইবাদতে বিঘ্ন ঘটে। এদের যদি বিয়ের চাহিদা জাগত বা এ-জাতীয় কোনো আকর্ষণ দেখা দিত, তাহলে নিশ্চিত তারা শরীর ও দীনকে শঙ্কায় ফেলতেন। আর যদি বিয়ের চাহিদা না জাগত বা এ-জাতীয় কোনো আকর্ষণ দেখা না দিত, তাহলে এই ফজিলত থেকে বঞ্চিত থাকত। *সহিহাইনে* আছে, হজরত আবু হোরায়রা রা. হতে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন :

وَفِي بُضْعِ أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيَأْتِي أَحَدُنَا شَهْوَتَهُ وَيَكُونُ لَهُ فِيهَا أَجْرٌ قَالَ أَرَأَيْتُمْ لَوْ وَضَعَهَا فِي الْحَرَامِ أَكَانَ عَلَيْهِ فِيهَا وِزْرٌ قَالُوا نَعَمْ قَالَ فَكَذَلِكَ إِذَا وَضَعَهَا فِي الْحَلَالِ كَانَ لَهُ فِيهَا أَجْرٌ ثم قال أفتحتسبون الشر ولا تحتسبون الخير

'তোমাদের বিশেষ অঙ্গেরও সদকা আছে। সাহাবারা আরয করলেন, ইয়া রাসুলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ দ্বারা তো আমরা নিজের প্রবৃত্তি নিবারণ করে থাকি। তাতেও কি সদকা হবে? তিনি বললেন, অবশ্যই। বলো, যদি সে তার প্রবৃত্তি অপাত্রে পূরণ করত তাহলে সে কি গুনাহগার হতো না? সাহাবারা বলেলেন, হ্যাঁ। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তোমরা এর মন্দ দিকটা দেখছ আর ভালো দিকটা দেখছ না?"[১]

সুফিদের কারো কারো অভিমত হচ্ছে, বিয়ের কারণে রুটি-রুজির পেছনে পড়তে হয়। জীবিকা নির্বাহ করা বড় কঠিন কাজ। তাদের এই অজুহাত কেবল জীবিকা অর্জনের কষ্ট থেকে গা বাঁচিয়ে রাখার জন্য। *সহিহাইনে* আছে, হজরত আবু হোরায়রা রা. হতে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,

دِينَارٌ أَنْفَقْتَهُ فِي سَبِيلِ اللهِ وَدِينَارٌ أَنْفَقْتَهُ فِي رَقَبَةٍ، وَدِينَارٌ تَصَدَّقْتَ بِهِ عَلَى مِسْكِينٍ، وَدِينَارٌ أَنْفَقْتَهُ عَلَى أَهْلِكَ، أَعْظَمُهَا أَجْرًا الَّذِي أَنْفَقْتَهُ عَلَى أَهْلِكَ

১ সহিহ মুসলিম : হাদিস নং ১০০৬

'এক দিনার তোমরা আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় করো, এক দিনার গোলাম ও কর্মচারীদের জন্য ব্যয় করো, এক দিনার তোমরা সদকা করো, আর এক দিনার তোমরা পরিবার-পরিজনের জন্য ব্যয় করো। এসবের সেটাই সর্বোৎকৃষ্ট দিনার যা তোমরা নিজেদের পরিবার-পরিজনদের জন্য ব্যয় করে থাকো।'[২]

সুফিদের কেউ কেউ আছেন যারা বলেন, বিয়ে দুনিয়ার প্রতি আকৃষ্ট হওয়ার উপকরণ। আবু সোলায়মান দারানি হতে বর্ণিত, যখন মানুষ হাদিসের সন্ধানে বা জীবিকার সন্ধানে সফর করে, তখন তা দুনিয়ার প্রতি আকৃষ্ট করে। গ্রন্থকার বলেন, এসব কথা শরিয়তবিরোধী। কেন হাদিসের সন্ধানে বের হওয়া যাবে না? অথচ তালেবে ইলমদের জন্য ফেরেশতারা তাদের পাখা বিছিয়ে দেন। অন্যদিকে জীবিকার সন্ধানে কেন বের হওয়া দূষণীয় হবে? অথচ হজরত ওমর রা. বলেন, আমি যদি জীবিকার সন্ধানে পরিশ্রম করতে গিয়ে মারা যাই তা আমার নিকট আল্লাহর রাস্তায় গাজী হয়ে মৃত্যুবরণ করা অপেক্ষা উত্তম। আর বিয়ে-শাদী কেন নিন্দনীয় হবে? অথচ রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, "তোমরা বিয়ে করো এবং বংশ বৃদ্ধি করো।"[৩] আমার মতে উপরোক্ত বাহানাগুলো শরিয়তবিরোধী হিসেবে বিবেচ্য।

আবু হামেদ বলেন, সুফিদের কেউ কেউ প্রসিদ্ধ যাহেদ তথা দুনিয়ারিবাগী সাজার জন্য বিয়ে-শাদি থেকে দূরে থাকে। সাধারণ মানুষ সুফিদেরকে খুব সম্মান করে থাকে। কারণ তাদের কোনো স্ত্রী থাকে না। তারা আরও বলে থাকে, অমুক বুযুর্গ জীবনে কখনো নারী সংশ্রবে পতিত হননি। অথচ এই বৈরাগ্যবাদী ইসলামি শরিয়তের বিপরীত।

তিকরিতী বলেন, মুরিদদের উচিত নিজ থেকে বিয়ে-শাদীর প্রতি ঝুঁকে না পড়া। কেননা এতে সুলূক থেকে দূরে সরে যাবে। লেখক বলেন, এই লোকের কথা আমার কাছে খুব আশ্চর্য লেগেছে। তার এটুকু জ্ঞান নেই যে, কেউ তার নিজের যৌনচাহিদার নিয়ন্ত্রণ, বিবি-বাচ্চার খোরপোশ ইত্যাদিতে সচেষ্ট হলে তা কখনো সুলূকের বিপরীত হয় না। আল্লাহ তায়ালা নিজেই বলেন,

---

২ সহিহ মুসলিম : হাদিস নং ৯৯৫

৩ [যঈফ] যঈফুল জামে' : হাদিস নং ২৪৮৪

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً

"আল্লাহ তায়ালা তোমাদের মধ্য থেকে তোমাদের জন্য জোড়া সৃষ্টি করেছেন। যাতে তোমরা আরামে থাকতে পার। তিনি তোমাদের পরস্পরে মুহব্বত ও ভালোবাসার জন্ম দিয়েছেন।"[১]

সহিহ হাদিসে আছে, হজরত জাবের রা. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বলেছেন,

هَلَّا تَزَوَّجْتَ بِكْرًا تُلَاعِبُهَا وَتُلَاعِبُكَ

'হে জাবির! তুমি কেন কুমারী মেয়ে বিয়ে করছ না? যাতে তুমি তার সাথে খেলতে পার এবং সেও তোমার সাথে খেলতে পারে!"[২]

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কখনো জাবের রা.-কে এমন বিষয়ে নির্দেশনা দিতেন না যা আল্লাহর নৈকট্য থেকে তাঁকে দূরে সরিয়ে রাখে। "স্বয়ং রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পবিত্র স্ত্রীগণদের সাথে প্রীতিময় আচরণ করতেন।"[৩] তিনি হজরত আয়েশা রা. এর সাথে দৌড় খেলা খেলতেন।[৪] এ সব কাজ কি আল্লাহ তায়ালার নৈকট্যবিরোধী? বরং সুফিদের ওসব কথা অজ্ঞতার পরিচায়ক।

বিয়ে-বিতৃষ্ণার নেপথ্যে

জেনে রাখা দরকার, যুবক যুবক সুফিরা যখন বিয়ে-শাদি ছেড়ে চিরকুমার থাকতে চায় তখন তারা তিনটি দলে বিভক্ত হয়ে পড়ে। যথা :

১. বীর্যস্খলন রোগে আক্রান্ত হয়ে পড়ে। কেননা বীর্য যখন দীর্ঘ সময় পর্যন্ত আবদ্ধ থাকে, তখন তার বিষাক্ত প্রভাব মস্তিষ্ককে আক্রান্ত করে। আবু বকর মুহাম্মাদ বিন যাকারিয়া রাযি. বলেন, আমি এমন এক গোত্র সম্পর্কে জানি, যাদের অনেক বীর্য ছিল। অতঃপর যখন তারা দর্শনতত্ত্বে প্রভাবিত হয়ে তা আবদ্ধ করে রাখে, তখন তাদের যৌনচাহিদা হ্রাস পেতে থাকে। তাদের

---

১ সুরা রূম : আয়াত ২১

২ সহিহ বুখারি : হাদিস নং ৫০৭৯

৩ লেখক এখানে উম্মে যারা'র হাদীসের প্রতি ইংগিত করেছেন– যা বুখারি ও মুসলিম বর্ণনা করেছেন।

৪ সুনাদে আবু দাউদ : হাদিস নং ২৫৭৮

শরীর বিকৃত হয়ে যেতে থাকে এবং হজমশক্তিতে বিঘ্ন ঘটে। চলাফেরায় সমস্যা দেখা দেয়। তিনি আরও বলেন, সহবাসবিরোধী এক ব্যক্তিকে আমি দেখেছি, তার রুচি ও খাদ্যগ্রহণশক্তি শূন্যের কোঠায় নেমে গেছে। পরিস্থিতি এমন পর্যায়ে ঠেকেছে যে, সামান্য খেলেও তা আর হজম হয় না। পরে সহবাসের অভ্যাসে ফিরে আসলে তৎক্ষণাৎ এই ব্যাধি দূরীভূত হয়ে যায়।

২. দ্বিতীয় প্রকারের যুবক সুফিরা যা কিছু পরিত্যাগ করেছিল, তার ওপর আরও প্রচণ্ডভাবে আক্রান্ত হয়ে পড়ে। সুফিদের অনেকে এমন আছেন, যারা বিয়ে-শাদী থেকে দূরে থেকে ধৈর্যধারণ করেছেন এবং তাদের বীর্য আবদ্ধ রয়েছে। পরে হুঁশ ফিরলে আবার যৌনকর্মে মত্ত হয়ে যায়। জাগতিক বিষয়গুলো থেকে তারা যে পরিমাণ দূরে অবস্থান করেছিল, দ্বিগুণ উৎসাহ নিয়ে আবার তাতে ফিরে আসে। এর উদাহরণ হচ্ছে, কোনো ব্যক্তি কয়েক দিন উপোস থাকার পর তীব্র ক্ষুধা নিয়ে যখন খেতে বসে, সে তখন নির্দিষ্ট পরিমাণের চেয়ে বেশি খেয়ে থাকে। যেন উপোস থাকাকালীন খাবারগুলোও সে সাবাড় করে ছাড়বে।

৩. তৃতীয় শ্রেণির সুফিরা ছেলেদের সাথে অযাচারে লিপ্ত হয়। সুফিদের অনেকে এমন আছে যারা বিয়ে-শাদী থেকে বিমুখ ও বিতৃষ্ণ হয়েছেন ঠিকই, কিন্তু তাদের বীর্যগুলো আবদ্ধ হয়ে আছে। তারা তখন সুদর্শন বালকদের সাথে সহবাস করে বিকৃত প্রশান্তি অনুভব করে।

***

সুফিদের একটি দলকে শয়তান এমনভাবে আকৃষ্ট করল যে, তারা বিয়ে করেছে ঠিকই আবার বলতে থাকে আমরা যৌনচাহিদা চরিতার্থ করতে বিয়ে করিনি। এক্ষেত্রে তারা যদি মনে করে বিয়ে আমরা কেবল সুন্নত আদায়ের নিমিত্তে করেছি, তাহলে ঠিক আছে। আর যদি বলে বিয়ের ওপর তার আগ্রহ ছিল না বা নেই, তাহলে তা খুব চিন্তার বিষয়।

কিছু কিছু লোককে অজ্ঞতা এমন প্ররোচনা দিতে থাকে যে, তারা পুরুষাঙ্গ কর্তন করে ফেলে। তারা ভাবে আল্লাহ তায়ালাকে লজ্জা করার নিদর্শন হিসেবে তারা এমন কর্মকাণ্ড করেছেন। অথচ এটি মারাত্মক আহমকি। কেননা আল্লাহ তায়ালা এই অঙ্গের কারণে নারীদের ওপর পুরুষকে সম্মানিত করেছেন। মানবজন্মের পরম্পরা বহমান রাখার নিমিত্তে তিনি এই অঙ্গ দান করেন। যে এটি কর্তন করে মুখে বলে ভালো উদ্দেশ্যের কথা—

তার কথা ভিত্তিহীন ও অসার বলে বিবেচিত। উপরন্তু পুরুষাঙ্গ কর্তন করার ফলে তার যৌনস্পৃহা স্তিমিত হয়ে যায়নি। সুতরাং তার লক্ষ্য ভিত্তিহীন।

সন্তানে অনাগ্রহীর ব্যাপারে সুফিদের ওপর ইবলিসের ধোঁকা

আবুল হাওয়ারী বলেন, আমি আবু সুলাইমান দারানি থেকে শুনেছি, তিনি বলেন, যে ব্যক্তি সন্তানের আশা পোষণ করে সে আহমক। এতে না জাগতিক উপকার আছে, না দীনি ফায়েদা। কেননা সে যদি পানাহার, নিদ্রা ও যৌনতার আকাঙ্ক্ষী করে, তাহলে সন্তানের কারণে এতে তার অসুবিধা দেখা দেবে।

গ্রন্থকার আল্লামা ইবনুল জাওযি রহ. বলেন, উপরোক্ত কথাটি মারাত্মক ভ্রান্তির বহিঃপ্রকাশ। এর ব্যাখ্যা হচ্ছে, পৃথিবী সৃষ্টি করার পেছনে মহান আল্লাহ তায়ালার ইচ্ছে হচ্ছে তিনি কেয়ামত পর্যন্ত এখানে মানুষের মধ্য থেকে মানুষের বংশ-পরম্পরা অব্যাহত রাখবেন। যেহেতু এ জগতে মানুষের জীবনের সময়কাল খুবই সীমিত, তাই তিনি মানুষের প্রকৃতি ও অভ্যাসের মাঝে যৌবন সৃষ্টি করে তাকে যৌনচাহিদা নিবারণের সুবন্দোবস্ত করেছেন। শরয়ি দৃষ্টিকোণে চিন্তা করলে আমরা দেখি আল্লাহ তায়ালা বলেন,

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ

'তোমরা কুমারী নারীদের বিয়ে করো।"[১]

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন :

تناكحوا تناسلوا فاني أباهي بكم الأمم يوم القيامة ولو بالسقط

"বিয়ে করো এবং বংশ বৃদ্ধি করো। কেননা আমি কেয়ামতের দিন তোমাদের সংখ্যাধিক্যের কারণে অন্যান্য উম্মতের ওপর গর্ব করব। যদিও তা ভূমিষ্ঠ হওয়ার পূর্বেকার শিশু হোক না কেন।"[২]

স্বয়ং নবীগণ আলাইহিমুস সালাম সন্তানের আকাঙ্ক্ষা পোষণ করেছেন। সৎ ব্যক্তিরা সন্তান ধারণের বিভিন্ন উপকরণ তৈরি করেছেন। অনেক সময় স্ত্রী-

---

১ সুরা নূর : আয়াত ৩২

২ [যঈফ] যঈফুল জামে' : হাদিস নং ২৪৮৪

সহবাসের ফলে জগৎজোড়া খ্যাতিসম্পন্ন ব্যক্তি জন্মলাভ করেন। যেমন ইমাম আবু হানিফা, আবু ইউসুফ, শাফেয়ি ও আহমাদ রাহিমাহুমুল্লাহ প্রমুখ ব্যক্তিবর্গ। এমন সহবাস হাজার বছর ইবাদতের চেয়ে উত্তম। স্বয়ং হাদিস শরিফে বর্ণিত আছে, স্ত্রীর সাথে সহবাসকারী, সন্তানদের খোরপোশের ব্যবস্থাকারী, যে ব্যক্তির সন্তান মারা যায় অথবা যে সন্তান রেখে মারা যায়, এ সবকিছুর বিনিময়ে সে সাওয়াবপ্রাপ্ত হয়।[৩] অতএব যে ব্যক্তি সন্তানের আকাঙ্ক্ষা থেকে বিমুখ হয়ে থাকে সে সুন্নত ও উত্তম বিষয়ের বিরোধী এবং সুখপূজারি বলে সাব্যস্ত হবে।

জুনাইদ বলতেন, সন্তান হচ্ছে বৈধ সহবাসের শাস্তিস্বরূপ। তাহলে অবৈধ সহবাসের ফল কী হতে পারে? চিন্তা করে দেখো! লেখক আল্লামা ইবনুল জাওযি রহ. বলেন, কথাটি ভুল। কেননা 'মুবাহ' ও বৈধ বস্তুকে কখনো শাস্তি বলে আখ্যায়িত করা যায় না। এটি খুবই মন্দ কাজ। কেননা যে কাজ মুবাহ, তার ফলাফল শাস্তি কী করে হয়? শরিয়ত যে কাজের দিকে আহ্বান করেছে, তা অর্জন করা সাওয়াব বলে বিবেচিত হয়ে থাকে।

সফর ও বৈরাগ্যের ব্যাপারে সুফিদের ওপর শয়তানের ধোঁকা

শয়তান অধিকাংশ সুফির মনে অদ্ভুত প্ররোচনা জাগালে তারা ঘর ছেড়ে বেরিয়ে পড়ে এবং তা কোনো বিশেষ স্থান বা ইলম অর্জনের উদ্দেশ্যে নয়। অনেকেই সফরের উপকরণ ছেড়ে একাকী বেরিয়ে পড়ে এবং এটাকে 'তাওয়াক্কুল' বলে দাবি করে। বহু ফরয ও ফজিলতপূর্ণ আমল তার থেকে ছুটে যায়। বৈরাগীপনাকে তারা ইবাদতের অন্তর্ভুক্ত মনে করে থাকে এবং এর দ্বারা নিজেকে বেলায়েতের কাছাকাছি পৌঁছার দাবি করে। অথচ এরা নাফরমান এবং খোদাদ্রোহী। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রয়োজন ছাড়া নির্দিষ্ট কোনো স্থানে দৌড় দেয়া বা চক্কর দেয়া হতে নিষেধ করেছেন। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,

لا زِمَامَ وَلا خِزَامَ وَلا رَهْبَانِيَةَ وَلا تَبَتُّلَ وَلا سِيَاحَةَ فِي الإِسْلامِ

'যিমাম, হাযাম, রাহবানিয়ত, তাবাত্তুল ও সিয়াহত ইসলামে নেই।"[৪]

---

৩ আবু দাউদ : হাদিস নং ২০০

৪ [যঈফ] যঈফুল জামে' : হাদিস নং ৬২৮৭

ইবনে কুতাইবা বলেন, হাযাম চুল উপড়ে ফেলাকে বলা হয় যা উটের কুঁজের একদিকে রাখা হয়। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ দ্বারা বনি ইসরাইলের উপাসনাকারীদের বুঝিয়েছেন। তাবাত্তুল মানে বিয়ে থেকে বিমুখ হওয়া এবং সিয়াহাত বলা হয় নিজ এলাকা ছেড়ে পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে ঘুরতে থাকা। ইমাম আবু দাউদ রহ. তার সুনানে আবু উমামা রা. এর হাদিস বর্ণনা করেছেন,

أن رجلا قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ: ايْذَنْ لَنَا فِي السِّيَاحَةِ، فَقَالَ: «إِنَّ سِيَاحَةَ أُمَّتِي الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ

'এক ব্যক্তি আরয করল, ইয়া রাসুলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে সিয়াহাতের অনুমতি প্রদান করুন। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আমার উম্মতের সিয়াহাত হলো আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করা।'[১]

গ্রন্থকার বলেন, হজরত উসমান ইবনে মাযঊন রা. এর হাদিস আমরা পূর্বে বর্ণনা করে এসেছি। তিনি বলেছিলেন,

إن نفسي تحدثني بأن أسيح في الأرض فقال النبي «صلى الله عليه وسلم» لـ مهلا يا عثمان فإن سياحة أمتي الغزو في سبيل الله والحج والعمرة

'ইয়া রাসুলাল্লাহ! আমার মন চায় আমি পৃথিবীতে ঘোরাঘুরি করি। এ কথা শুনে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, হে উসমান! দাঁড়াও! আমার উম্মতের সিয়াহাত হচ্ছে জিহাদ, হজ ও ওমরা।'[২]

ইসহাক ইবনে ইবরাহিম ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল হতে বর্ণনা করেন, জনৈক ব্যক্তি তাঁকে জিজ্ঞেস করল, যে ব্যক্তি বৈরাগ্যের সাথে ইবাদত-বন্দেগি করে, তাকে পছন্দ করেন, নাকি যে তার এলাকায় অবস্থান করে তাকে পছন্দ করেন? আহমদ ইবনে হাম্বল রহ. উত্তরে বলেন, বৈরাগ্যবাদ ইসলামের কোনো অংশ নয় আর এটি আম্বিয়া ও নেককার ব্যক্তিদের কাজ নয়।

বাকি থাকল, একাকী সফর করা—তো, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একাকী সফর করতে নিষেধ করেছেন, হজরত আবু হোরায়রা রা. হতে বর্ণিত,

---

১ সুনানে আবু দাউদ : হাদিস নং ২৪৮৬, সহিহুল জামে' : হাদিস নং ২০৯৩

২ শারহুসসুন্নাহ : ২/৩৭০-৩৭১

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُسَافِرَ الرَّجُلُ وَحْدَهُ

'রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একাকী বনে-জঙ্গলে চলাফেরাকারীদের ওপর লানত করেছেন।'[৩]

রাতের বেলা একাকী চলাফেরা

সুফিরা রাতের বেলায় ঘোরাফেরা করে। অথচ এটি নিষিদ্ধ। হাদিসে এসেছে, হজরত ইবনে ওমর রা. হতে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন :

لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِي الْوَحْدَةِ، مَا سَارَ أَحَدٌ وَحْدَهُ بِلَيْلٍ أَبَدًا

"মানুষ যদি একাকী সফরের ক্ষতি সম্পর্কে জানত, তাহলে কখনো তারা রাতে একাকী বেরোত না।"[৪]

তিনি আরও বলেছেন,

أَقِلُّوا الْخُرُوجَ إِذَا هَدَأَتِ الرِّجْلُ إِنَّ اللَّهَ يَبُثُّ مِنْ خَلْقِهِ بِاللَّيْلِ مَا شَاءَ

"গভীর রাতে তোমরা বের হয়ো না। কেননা রাতের বেলা আল্লাহ তায়ালা যা চান তা মাখলুকের মাঝে ছিটিয়ে দেন।"[৫]

গ্রন্থকার বলেন, অধিকাংশ সুফি সফরকে তাদের পেশা বানিয়ে রেখেছেন। অথচ সফর নিজে কোনো উদ্দেশ্য হতে পারে না। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন :

السَّفَرُ قِطْعَةٌ مِنَ العَذَابِ، فَإِذَا قَضَى نَهْمَتَهُ مِنْ وَجْهِهِ فَلْيُعَجِّلْ إِلَى أَهْلِهِ

"সফর আজাবের একটি টুকরো। সফরে তোমাদের প্রয়োজন পূরণ হয়ে গেলে দ্রুত বাড়ি চলে যাও।"[৬]

অতএব যে ব্যক্তি সফরকে নিজের পেশা বানিয়ে রেখেছে, সে তো নিজেকে শাস্তিতে পতিত করল। এভাবে তার জীবনকে ধ্বংস করে যাচ্ছে। এ দু'টি উদ্দেশ্যই বাতিল। লেখক আরও বলেন, আবু হামযা খোরাসানি বর্ণনা করেছেন, আমি এহরামের সময় বহু কষ্ট-ত্যাগ স্বীকার করি। প্রতি বছর

---

৩ প্রাগুক্ত

৪ সহিহ বুখারি : হাদিস নং ২৯৯৮

৫ [সহিহ] সহিহুল জামে' : হাদিস নং ১১৮৪

৬ সহিহ বুখারি : হাদিস নং ১৮০৪, সহিহ মুসলিম : হাদিস নং ১৯২৭

হাজার মাইল সফর করি। আমার মাথার ওপর সূর্য উঠত আর ডুবত। এভাবেই আমি এহরাম বেঁধে নিতাম। হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে এমন তাওফিক কামনা করি যা দ্বারা তুমি আমার ওপর সন্তুষ্ট হয়ে যাও।

পাথেয় ছাড়া বেরিয়ে পড়ার ব্যাপারে সুফিদের ওপর ইবলিসের ধোঁকা

গ্রন্থকার আল্লামা ইবনুল জাওযি রহ. বলেন, ইবলিস সুফিদের বৃহৎ একটি গোষ্ঠীকে এই সন্দেহে পতিত করে রেখেছে যে, সহায়-সম্বল ও উপায়-উপকরণ ছাড়া সফর করাকে 'তাওয়াক্কুল' বলা হয়। পূর্বে আমরা এর ক্ষতিকারক দিকসমূহ নিয়ে আলোচনা করেছি। কিন্তু বিষয়টিকে জাতির অজ্ঞ লোকেরা ভালো দৃষ্টিতে প্রচার করতে থাকে। গল্পচ্ছলে আহমকরা এসব ঘটনাকে তাওয়াক্কুলের পরিচায়ক হিসেবে উপস্থাপন করে বেড়ায়। এতে বিদয়াতিরা আরও প্ররোচিত হতে থাকে। অজ্ঞদের প্রশংসার কারণে সঠিক পথ আড়ালে ঢেকে যায়। এ ব্যাপারে বহু ঘটনা লোকমুখে প্রসিদ্ধ হয়ে আছে। আমরা এর কিছু তুলে ধরছি :

আলী ইবনে সাহাল বসরি রহ. বলেন, ফাহাত মুসিল্লী আমাকে বলেছেন, আমি হজের সফরে এক বিস্তীর্ণ মাঠে পৌঁছলে অল্পবয়সী এক বালককে দেখতে পাই। আমি মনে মনে ভাবলাম, আল্লাহু আকবার! এই বিস্তীর্ণ প্রান্তরে একাকী এ ছেলে কোথায় যাচ্ছে? দ্রুত হেঁটে আমি তার কাছে গিয়ে সালাম দিয়ে তাকে বললাম, বৎস! তুমি তো এখনও ছোট বালক, তোমার ওপর তো শরিয়তের বিধান জারি হয়নি। সে বলল, হে জনাব! আমার চেয়েও ছোট বালক পরপারে চলে যায়। আমি বললাম, তাহলে দ্রুত বেগে চলো। কেননা মঞ্জিলে পৌঁছার রাস্তা বহু দূর। সে বলল, চাচাজান! আমার চলার সামর্থ্য আছে, কিন্তু পৌঁছানোর এখতিয়ার আল্লাহর কাছে। আপনি কি আল্লাহ তায়ালার ইরশাদ পড়েননি?

وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ

'যে ব্যক্তি আমার জন্য কষ্ট-পরিশ্রম করে, আমি তাকে আমার রাস্তা বাতলে থাকি।"[১] আমি বললাম, তোমার কাছে দেখছি সফরের কোনো সহায়-

---

১ সুরা আনকাবূত : আয়াত ৬৯

উপকরণ ও সাওয়ারি-বাহন নেই! সে জবাব দিল, হে চাচা! 'একিন' হচ্ছে আমার সহায়, আর 'আশা' আমার বাহন। আমি বললাম, আমি তোমার কাছে রুটি ও পানির ব্যাপারে জানতে চেয়েছি। সে বলল, চাচা! আপনি তাহলে বলুন, আপনাকে যদি আপনার কোনো ভাই বা নিকটাত্মীয় তার ঘরে দাওয়াত করে, আপনি কি তখন নিজের ঘর থেকে খাবার তৈরি করে তার বাড়িতে গিয়ে খাওয়া পছন্দ করবেন? এ কথা শুনে আমি তাকে বললাম, আমি তোমাকে সফরের কিছু সহায়-উপকরণ দিয়ে দিই? সে বলল, হে মিথ্যাবাদী! আমার কাছ থেকে দূর হয়ে যাও! আল্লাহ তায়ালা আমাকে খাওয়ান, পান করান। ফাতাহ মুসিল্লী বলেন, আমি এ বালকের চেয়ে ছোট আর কোনো বালককে এমন তাওয়াক্কুলসম্পন্ন দেখিনি, কোনো বড় বুযুর্গকেও তার মতো সংসারত্যাগী ও যাহেদ হিসেবে পাইনি।

গ্রন্থকার বলেন, এমন ঘটনাগুলোই সঠিক কর্মসাধনে বিঘ্ন ঘটায় এবং মনে হয় এটা সঠিক পন্থা। বিখ্যাত মনীষীরা যেহেতু বলছেন, এমন ছোট বালক এমন এমন করেছেন। তাহলে আমরা তো তার চেয়ে অধিক উপযোগী। উক্ত বালকের কর্মকাণ্ডে তো আশ্চর্যের কিছু নেই, কিন্তু আশ্চর্য লাগছে তার ওপর, যিনি তাকে এভাবে দেখেও বলেননি যে, এটা শরিয়তসম্মত পন্থা নয়। এটাও কেন বলেননি যে, যে মহান প্রতিপালক তোমাকে তার ঘরের দিকে আহ্বান করেছেন, তিনি তার দেয়া সম্পদ হতে সফরের সহায়-সম্বল ও উপায়-উপকরণ নিয়ে যেতে বলেছেন। দুঃখ হয় বড়রাও যখন এ ব্যাপারে উদাসীন, ছোটদের কথা বলাই বাহুল্য।

আবু আবদুল্লাহ আলজালার নিকট জনৈক ব্যক্তি জানতে চাইল, সহায়-সম্বল ও উপায়-উপকরণ ছাড়া বন-বাদাড়ে যাওয়া এবং এটাকে তাওয়াক্কুলসম্মত কাজ বলে মনে করা, আর সেই বন-জঙ্গলেই মারা যাওয়ার ব্যাপারে আপনার কী অভিমত? উত্তরে তিনি বলেছিলেন, এটা হকপন্থীদের কাজ। সে মারা গেলে খুনিকে দিয়্যত দিতে হবে।

গ্রন্থকার বলেন, এটা এমন এক ব্যক্তির ফাতাওয়া, যে শরিয়ত সম্পর্কে মোটেই ওয়াকিফহাল নন। কেননা উম্মতের সর্বসম্মত মতানুসারে সহায়-সম্বল ও উপায়-উপকরণ ছাড়া বন-জঙ্গলে যাওয়া অবৈধ। অন্যথায় যে এর বিপরীত করে সেখানে মারা যাবে, সে আল্লাহর নাফরমান হিসেবে সাব্যস্ত হবে এবং জাহান্নামের উপযোগী বলে বিবেচিত হবে। উপরন্তু প্রাণ সংহারের এমন আশঙ্কা পূর্ব থেকে আঁচ করা সত্ত্বেও এমন পরিবেশে

নিজেকে পতিত করা ধ্বংসের কারণ। কেননা আল্লাহ তায়ালা প্রাণকে আমাদের কাছে আমানত হিসেবে গচ্ছিত রেখেছেন এবং বলেছেন, ولا تقتلوا أنفسكم 'তোমাদের নিজেকে ধ্বংস কোরো না।" এ ব্যাপারে আমরা পূর্বেই আলোচনা করেছি যে, কষ্টদায়ক বস্তু থেকে দূরে থাকা ওয়াজিব। আল্লাহ তায়ালা বাণী— وتزودوا 'তোমরা প্রয়োজনীয় উপকরণ নিয়ে সফর করো।"[১] এর বিপরীত।

আবদুল্লাহ ইবনে খাফিফ বলেন, আমি আমার তৃতীয় সফরে 'সিরাজ' শহর থেকে একাকী বনে চলে গিয়েছিলাম। সেখানে ক্ষুধা-পিপাসার তীব্রতায় এত অধিক কষ্ট অনুভব হয়েছিল যে, আমার আটটি দাঁত পড়ে গিয়েছিল এবং শরীরের সমুদয় কেশ পড়ে গিয়েছিল। লেখক বলেন, লোকটি এমনভাবে ঘটনার বিবরণ দিচ্ছে যেন তা খুব প্রশংসনীয় কাজ! অথচ এটি বড়ই নিন্দনীয় বিষয়।

সুফি আবু হামযা বলেন, আমি পেট পুরে খেয়ে তাওয়াক্কুলের দাবি করে জঙ্গলে অবস্থান করার ব্যাপারে আল্লাহকে লজ্জা করি। ঘর থেকে সফরের উপকরণ নেয়া ও পেট ভরে খেয়ে সফর করা আমি পছন্দ করি না। গ্রন্থকার বলেন, এমন উদ্ভট দাবির খণ্ডনে বিস্তর আলোচনা গত হয়েছে। এসব লোক মনে করে, প্রয়োজনীয় উপায়-উপকরণ ছেড়ে দেয়ার নাম তাওয়াক্কুল। যদি এমন হতো, তাহলে কেন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রয়োজনীয় উপায়-উপকরণ নিয়ে গারে হেরায় তাশরিফ নিয়েছেন? তার কি তাওয়াক্কুলের কমতি ছিল? অনুরূপভাবে হজরত মুসা আলাইহিস সালাম যখন হজরত খিযির আলাইহিস সালাম এর সন্ধানে দীর্ঘ সফরে যাচ্ছিলেন, তখন কেন প্রয়োজনীয় উপায়-উপকরণের পাশাপাশি মাছ ইত্যাদি সঙ্গে নিয়েছিলেন? এছাড়া আসহাবে কাহাফ দেশান্তরী হতে চাইলে কেন তারা সঙ্গে কিছু দিরহাম তথা মুদ্রা রেখে দিয়েছিলেন?

মূল কথা হচ্ছে, এ সব লোক তাওয়াক্কুলের অর্থই জানেন না। এ ব্যাপারে তারা অজ্ঞই থেকে গেছেন। আবু হামেদ রহ. মানুষের জন্য উপায় বের করে বলেছেন, প্রয়োজনীয় উপায়-উপকরণ ছাড়া বন-জঙ্গলে অবস্থান করা দুই শর্তে বৈধ। ১. এ ব্যাপারে মানুষের দৃঢ় বিশ্বাস থাকতে হবে যে, অনাহারে সে অন্তত এক সপ্তাহ অতিবাহিত করতে পারবে। ২. সেখানে

---

১ সুরা বাকারা : আয়াত ১৯৭

ঘাস-পাতা ইত্যাদি খাওয়ার মানসিকতা থাকতে হবে। হতে পারে সেখানে এক সপ্তাহ পর কোনো মানুষজনের দেখা পাবে কিংবা খাওয়ার উপযোগী কোনো বৃক্ষ-লতা-গুল্ম মিলে যাবার সম্ভাবনা থাকবে। আর এতে পরিস্থিতি মোকাবেলা করা সম্ভব হবে।

আমি বলি, একজন জ্ঞানী লোক কী করে এমন অভিমত ব্যক্ত করতে পারলেন! কেননা এমনও হতে পারে, হয়তো কারও দেখা সেখানে পাবে না, কখনো-বা রাস্তা ভুলে যাবার আশঙ্কা থাকতে পারে। অসুস্থ হয়ে পড়ার আশঙ্কাও উড়িয়ে দেয়া যায় না, তখন তার জন্য ঘাস খাওয়া সমীচীন হতে পারে না। আবার কখনো এমন লোকও পাওয়া যেতে পারে, যে তাকে কোনো প্রকার সাহায্য-সহযোগিতা করবে না, মেহমানদারি করবে না। এমতাবস্থায় সে মারা যেতে পারে, যখন তার কাছে কেউ থাকবে না। এছাড়া আমরা একাকী সফরের ক্ষতিকর দিকগুলো উল্লেখ করে এসেছি। এমন অহেতুক কষ্ট সহ্য করার কী প্রয়োজন? যে ভরসা করছে তার অভ্যাসের ওপর বা কোনো ব্যক্তির সাক্ষাতের ওপর। ঘাসের এমন রুটি খাওয়ার কি কোনো বিশেষ ফজিলত আছে? নিজেকে এমন ধ্বংসের মুখে ঠেলে দেয়া সালফে সালেহীনদের মধ্যে কার নিদর্শন ছিল? তারা কি এমন কর্মকাণ্ড দ্বারা আল্লাহকে পরীক্ষা করতে চায়? আল্লাহ নিঝুম এই বন-জঙ্গলে রুটি-রুজি দেন কি না!? (নাউযুবিল্লাহ) যে ব্যক্তি জঙ্গলে খাদ্য অন্বেষণ করে বেড়ায়, সে অপ্রচলিত বস্তুর সন্ধান করে। তোমাদের কি জানা নেই মুসা আলাইহিস সালাম এর গোত্র যখন সুস্বাদু খাদ্যের অভিপ্রায় ব্যক্ত করেছিল তখন আল্লাহ তায়ালা—اهبطوا مصرا "শহরে চলে যাও"[২] বলে নির্দেশ দিয়েছিলেন। কারণ তারা এমন বস্তুর আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত করেছে যা কেবল শহরেই পাওয় যায়। অতএব এসব লোক মস্তবড় ভ্রান্তিতে নিমজ্জিত। এটা শরিয়ত ও বিবেক-বোধপরিপন্থী বিষয় এবং মনগড়া কার্যকলাপ হিসেবেই বিবেচিত।

ইকরামা ইবনে আব্বাস রা. হতে বর্ণিত, ইয়ামেনের অধিবাসীরা হজে আসার সময় সফরের প্রয়োজনীয় উপকরণ সঙ্গে আনত না। তারা বলত, আমরা আল্লাহর ওপর ভরসা করছি। এ সব লোক হজ করত আর মক্কায় এসে মানুষের সামনে ভিক্ষার হাত পেতে দিত। আল্লাহ তায়ালা তখন এই আয়াত অবতীর্ণ করেন :

---

২ সুরা বাকারা : আয়াত ৬১

وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوٰى

'তোমরা সফরের প্রয়োজনীয় উপকরণ সঙ্গে রাখো। কেননা সফরের উন্নত উপকরণ তাকওয়ার অন্তর্ভুক্ত।"[১]

মুহাম্মাদ ইবনে মুসা জুরজানি বলেন, আমি মুহাম্মাদ ইবনে কাসির সানয়ানির কাছে ওই সকল দুনিয়াত্যাগীদের ব্যাপারে জিজ্ঞেস করলাম, সফরের সময় যারা প্রয়োজনীয় উপকরণ সঙ্গে নেয় না; এমনকি জুতা-মোজাও ব্যবহার করে না। উত্তরে তিনি বললেন, তুমি আমাকে শয়তানের বংশধরদের সম্পর্কে প্রশ্ন করেছ; যাহেদ তথা দুনিয়াবিরাগীদের ব্যাপারে প্রশ্ন করোনি। আমি বললাম, তাহলে 'যুহদ' তথা দুনিয়াবিরাগ কী? তিনি বললেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সুন্নত মতে আমল করা এবং সাহাবায়ে কেরামের সাথে সাদৃশ রাখা।

ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল রহ. এর কাছে যারা সফরের সময় প্রয়োজনীয় উপকরণ সঙ্গে না নিয়ে বন-জঙ্গলে অবস্থান করে তাদের সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি কঠিন ভাষায় তা অস্বীকার করেন। বলেন, উফ্ উফ্, না! না! সফরের সময় প্রয়োজনীয় উপকরণ, সঙ্গী ও কাফেলা ছাড়া কখনো কোথাও যাওয়া উচিত নয়। তিনি এ কথা উচ্চৈঃস্বরে বললেন।

আবু আবদুল্লাহ আহমদ ইবনে হাম্বল রহ. এর কাছে জনৈক ব্যক্তি এসে বলল, এক ব্যক্তি সফর করতে চায়। আপনি সফরের সময় প্রয়োজনীয় উপকরণ সঙ্গে নেয়া পছন্দ করেন নাকি তাওয়াক্কুল তথা ভরসা করা পছন্দ করেন? উত্তরে তিনি বললেন, সফরের সময় প্রয়োজনীয় উপকরণ সঙ্গে নেয়া আবশ্যক অথবা এমন তাওয়াক্কুল করা যে, তাকে কেউ কিছু দেয়ার জন্য সে যেন মাথা উপরের দিকে না উঠায়।

খাল্লাল বলেন, আমাকে ইবরাহিম ইবনে খলিল বর্ণনা করেছেন, আহমদ ইবনে নাসার লোকদেরকে বর্ণনা করেছিলেন যে, এক ব্যক্তি আবু আবদুল্লাহকে জিজ্ঞেস করল, তাওয়াক্কুল করে মক্কায় যেতে চাই এবং নিজের সঙ্গে সফরের সময় প্রয়োজনীয় উপকরণ নেব না বলে ভাবছি। আবু আবদুল্লাহ বললেন, আমার জানা নেই তুমি খাবে কোথা থেকে? সে বলল, তাওয়াক্কুল করব, তাহলে মানুষ আমাকে কিছু খেতে দেবে। তিনি বললেন, মানুষ যদি কিছু না দেয়, তাহলে কি তাদের দিকে মুখ তুলবে না যাতে

---

১ সুরা বাকারা : আয়াত ১৯৭

মানুষ তোমাকে কিছু দেয়? এটা আমি ভালো দৃষ্টিতে দেখছি না। আমি এমন কোনো হাদিস সম্পর্কে অবগত নই, যেখানে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, সাহাবা বা তাবেয়িনরা এমন করেছেন বলে প্রমাণ পাওয়া যায়।

ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল রহ. এর কাছে খোরাসানি একজন ব্যক্তি এসে বলল, হে আবু আবদুল্লাহ! আমার কাছে এক দিরহাম আছে। এটা নিয়ে আমি হজে যাব। ইমাম সাহেব তাকে বললেন, তুমি বাবুল কারাখে গিয়ে এই দিরহাম দিয়ে কিছু বরই ক্রয় করো। এটা মাথায় নিয়ে ফেরি করে বিক্রয় করতে থাকো। যখন তোমার কাছে তিনশত দিরহাম জমা হবে তখন হজের উদ্দেশে গমন কোরো। সে বলল, হে আবু আবদুল্লাহ! আপনি মানুষের জন্য জীবিকার বিষয় নিয়ে ভাবছেন? ইমাম সাহেব বললেন, দেখো এই অপদার্থ কী বলছে! তুমি কি মানুষের জন্য জীবিকা নির্বাহের উপকরণকে অস্বীকার করছ? সে বলল, হে আবু আবদুল্লাহ! আমি তাওয়াক্কুল করব। ইমাম সাহেব তাকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কি জঙ্গলে মানুষের সাথে যাবে, নাকি একাকী? সে উত্তর দিল, মানুষের সাথে যাব। ইমাম সাহেব বললেন, তুমি মিথ্যাবাদী, ভরসাকারী নও। একাকী যাও নতুবা মানুষজনের থলের ওপর ভরসা করো।

সফর ও সাধনাকালে সুফিদের শরিয়তবিরোধী কার্যকলাপ

সুফি আবু হামযা বলেন, আমি তাওয়াক্কুলের ওপর নির্ভর করে একটি সফর করেছিলাম। এক রাতে আমি হাঁটছিলাম, তখন আমার দু'চোখ ছিল তন্দ্রাচ্ছন্ন। হঠাৎ একটি কূপে পড়ে গেলাম। আমি নিজেকে তখন কূপের অভ্যন্তরে আবিষ্কার করলাম। এখান থেকে বের হতে পারছিলাম না, কেননা তার পার্শ্ব ছিল বহু উঁচু। অতএব সেখানে আমি বসে পড়লাম। এভাবে বসেই ছিলাম অনেকক্ষণ। হঠাৎ দেখি কূপের উপরে দু'ব্যক্তি দাঁড়িয়ে আছে। একজন আরেকজনকে বলছে, চলো, আমরা মুসলমানদের জন্য কূপটি ছেড়ে দিই। অপরজন বলল, তারপর কী করবে? আমি মনে মনে ভাবলাম, চিৎকার দিয়ে বলব, আমি কূপের ভেতরে আটকা পড়েছি। আওয়াজ এলো, তুমি আমার ওপর ভরসা করেছ আবার আমার দেয়া বিপদের ব্যাপারে অন্যের কাছে ফরিয়াদ করছ? সুতরাং আমি চুপ হয়ে গেলাম। ওই দুই ব্যাক্তি চলে গেল। এরপর আবার ফিরে এলো এবং একটি

ঢাকনা দিয়ে কূপের মুখ আটকে দিল। আমাকে আমার মন বলছে, কূপের মুখ তো নিরাপদ হয়েছে কিন্তু তুমি এখন এখানে বন্দি। আমি রাত-দিন এখানে সমান দেখছিলাম। পরের দিন কেউ একজন আমাকে শব্দ করে ডাকল। কিন্তু তাকে আমি চোখে দেখছিলাম না। সে আমাকে শক্তহাতে ধরতে বলল। আমি আমার হাত বাড়ালাম। এতে একটি কঠিন বস্তু পড়ে গেল। আমি তা ধরলাম। সে আমাকে উপরে উঠিয়ে মাটিতে নিক্ষেপ করল। আমি ভালো করে খেয়াল করে দেখলাম, এটি একটি হিংস্র প্রাণী। এমতাবস্থায় একটি গায়েবি আওয়াজ এলো যে, হে আবু হামযা! আমি তোমাকে বিপদ দ্বারা বিপদ থেকে উদ্ধার করেছি এবং ভয়ংকর স্থান হতে ভয়ংকর স্থানে নিক্ষেপ করেছি।

ইবনে মালেকী বর্ণনা করেন যে, আবু হামযা খোরাসানি বলেন, আমি এক বছর হজের সফরে রাস্তায় হাঁটছিলাম। হঠাৎ একাকী একটি কূপে পতিত হলে মন আমার সাথে খুব বিরোধিতা করল। মন বলল, ফরিয়াদ করো। আমি বললাম, আল্লাহর শপথ! আমি কখনো ফরিয়াদ করব না। আমি আমার ইচ্ছা পূরণ করিনি। কূপের মুখে দু'ব্যক্তি এসে একে অন্যকে বলল, এসো এ রাস্তার কূপটির মুখ বন্ধ করে দিই। তারা তখন কুঠার ও খুঁটি নিল। আমি কিছু বলার ইচ্ছে করলে মন বলল, তাকে বলো যে ওই দুই ব্যক্তির চেয়ে তোমার নিকটবর্তী। (অর্থাৎ তাওয়াক্কুল করো)। আমি চুপ হয়ে গেলাম। একসময় তারা কূপের মুখ বন্ধ করে চলে গেল। পরে হঠাৎ কে একজন এসে কূপের মুখ খুলে তার উভয় পা ঝুলিয়ে রাখল। যেন সে বলছে আমাকে ধরো। আমি তার ওপর ঝুলে রইলাম। সে আমাকে ভেতর থেকে বাইরে নিয়ে গেল। পরে দেখলাম, এটি একটি হিংস্র প্রাণী। এমতাবস্থায় এক ব্যক্তি আমাকে চিৎকার দিয়ে বলল, হে আবু হামযা! এটা কি উত্তম নয়? আমি ভয়ংকর বস্তু দিয়ে ভয়ংকর স্থান থেকে তোমাকে হেফাজত করেছি!

আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মাদ ইবনে নাঈম সুফি আবু হামযা দামেস্কীর ঘটনা বর্ণনা করে বলেন, তিনি কূপ থেকে বেরিয়ে কয়েক ছত্র কবিতা আবৃত্তি করেন। যথা–

نهائي حيائي منك أن أكشف الهوى * فأغنيتني بالقرب منك عن الكشف

ترأيت لي بالغيب حتى كأنني * تبشرني بالغيب إنك في الكف

أراك وبي من هيبتي لك وحشة * وتؤنسني بالعطف منك باللطف
وتحيء محبا أنت في الحب حتفه * وذا عجب كون الحياة مع الحتف

"আমার ভালোবাসার কথা প্রকাশ করতে লজ্জা হচ্ছে। তোমার নৈকট্যের কারণে এই ভালোবাসা প্রকাশ করার আর প্রয়োজন নেই। অদৃশ্যে আমার এমন অনুভব হয়েছে, যেন অদৃশ্য থেকে আমার জন্য সুসংবাদ আসছে, যা আমি এখনই প্রত্যক্ষ করলাম। আমি তোমাকে দেখছি, তোমার শাস্তির ভয়াবহতায় আমি ভীত হয়ে পড়েছি। আর তুমি আমাকে দয়া ও করুণা দ্বারা নির্ভার করছ। সেই আশেককে পুনরুজ্জীবন দান করো, যাকে ভালোবাসায় ধ্বংস করো। এটা বড় আশ্চর্যের বিষয় যে, ধ্বংসের সাথেই জীবনের বসবাস।"

গ্রন্থকার আল্লামা ইবনুল জাওযি রহ. বলেন, কূপে পড়ে যাওয়ার ব্যাপারে আবু হামযা সম্পর্কে ঘটনার বিভিন্ন মত পরিলক্ষিত হয়। আবু আবদুর রহমান সুলামী বলেন, আবু হামযা খোরাসানের অধিবাসী। যিনি জুনাইদ বাগদাদি রহ. এর সময়কালের এবং তাঁর নাম মুহাম্মাদ ইবনে ইবরাহিম। তাঁর কথা খতিবে বাগদাদি তাঁর ইতিহাসগ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। তাঁর উপরোক্ত ঘটনার কথাও উল্লেখ করেছেন। যাক, তিনি যে-ই হোন না কেন তিনি শরিয়তবিরোধী কাজ তথা কূপে পতিত অবস্থায় চুপ থেকে ভুল করেছেন। অথচ চিৎকার দেয়া এবং কূপের এই বিপদ থেকে দূরে থাকা তার জন্য ওয়াজিব ছিল। যেমন কেউ যদি তাকে খুন করতে চায়, তবে তার জন্য বাধা দেয়া ওয়াজিব। অন্যথায় 'আমি ফরিয়াদ করব না'—এমন বলা ওই উপমা বহন করে যেমন কেউ বলল, আমি খাবার খাব না, পানি পান করব না। অথচ যে ব্যক্তি এমন কর্মকাণ্ড করবে সে জাহেল তথা অজ্ঞ হিসেবে বিবেচিত হবে। এসব কর্মকাণ্ড সৃষ্টির সচরাচর নিয়মবহির্ভূত। কেননা আল্লাহ তায়ালা বস্তুজগৎকে একটি প্রকৃতি ও নিয়মানুসারে পরিচালনা করছেন। মানুষকে স্পর্শ করার জন্য হাত দিয়েছেন, যাতে সে বাধা দিতে পারে। কথা বলার জন্য মুখ দিয়েছেন, বিবেক-বুদ্ধি দিয়েছেন, যাতে সে বিপৎসঙ্কুল পরিস্থিতিতে পথ দেখাতে পারে। মানুষের উপকারে ঔষধপত্র ও খাদ্যসামগ্রী সৃষ্টি করেছেন।

এখন যে ব্যক্তি তাদের জন্য সৃষ্টিকৃত বস্তু ব্যবহার করা থেকে বিমুখ হবে, তাহলে সে শরয়ি বিধানকে ছেড়ে দিয়েছে বলে বিবেচিত হবে। কেননা সে সৃষ্টিকর্তার হেকমতের প্রতি অবজ্ঞা দেখিয়েছে। কোনো অজ্ঞ ব্যক্তি যদি

আল্লাহর 'কাযা' ও 'কদর' থেকে বিমুখ হয়, আমরা তার উত্তরে বলব কেন বিমুখ হবেন? অথচ আল্লাহ তায়ালা নির্দেশ দিয়েছেন :

خُذُوا حِذْرَكُمْ

'তোমরা তোমাদের সতর্কতা অবলম্বন করো।'[১]

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পাহাড়ে আশ্রয় নিয়েছিলেন এবং সুরাকাকে বলেছিলেন, আমার অবস্থান গোপন রাখবে। তিনি মদিনায় যাওয়ার জন্য একজন পথপ্রদর্শক ভাড়া করেছিলেন।[২] তিনি এমন বলেননি যে, আমি তাওয়াক্কুল করে চলতে থাকব। সর্বদা তিনি প্রকাশ্যে আসবাব তথা বস্তুর দিকে দৃষ্টি দিয়েছেন এবং অন্তরে বস্তুর সৃষ্টিকর্তার ওপর ভরসা করেছেন। এ সম্পর্কে বিশদ বিবরণ আমরা পূর্বে উল্লেখ করেছি।

আবু হামযার কথা 'আমাকে আমার মন বলছে' এটা নিছক অজ্ঞতাজনিত কথা। এই অজ্ঞতা দ্বারা সে বুঝে নিয়েছে যে, এটা তাওয়াক্কুলের অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং সে আসবাব তথা উপায়-উপকরণ ছেড়ে দিল। অথচ শরিয়ত এমন কাজের নির্দেশ দেয়নি। এছাড়া আবু হামযার কাছে যখন শক্ত কিছু ধরার বিষয় সামনে এলো তখন সে কেন তা না ধরে তাওয়াক্কুল করেনি? এটাও তো আসবাব ছেড়ে দেয়ার পরিপন্থী কাজ—যে দাবি সে করে এসেছিল। আবু হামযা ভেতরে বসে থাকেনি কেন, সে তো আসবাব ছাড়া উপরে ওঠে যেতে পারত। অতএব এটি নিন্দনীয় কাজ। আল্লাহ তায়ালা তাঁর বান্দার ওপর সর্বদা ইহসান করে থাকেন। আমরা কেবল শরিয়তবিরোধী কাজের বিরোধিতা করছি।

জুনাইদ রহ. বলেন, আমাকে মুহাম্মাদ ইবনে সামীন বর্ণনা করেছেন, আমি কুফায় আমাদের নিকটবর্তী একটি মাঠের পাশে অবস্থিত রাস্তা দিয়ে হাঁটছিলাম। সেই রাস্তা দিয়ে কেউ চলাফেরা করত না। রাস্তার গোড়ায় আমি একটি মৃত উট দেখতে পেলাম, যাকে ৮-৯টি হিংস্র হায়েনা টেনে-টুনে খাচ্ছে। হায়েনারা পরস্পর একে অপরকে হামলাও করছে। এমন পরিস্থিতি দেখে আমি ভীষণ ঘাবড়ে গেলাম। কেননা এগুলো সব রাস্তার গোড়াতেই অবস্থান করছে। আমার মন আমাকে বলল, ডানে-বাঁয়ে কোথাও ঢুকে বেরিয়ে যাও। কিন্তু আমি মনের কথা শুনলাম না। হায়েনাদের ভেতর

---

১ সুরা নিসা : আয়াত ৭১

২ সহিহ বুখারি : হাদিস নং ৩৯০৬

দিয়েই চলে গেলাম। পরে মনের দিকে তাকিয়ে দেখলাম সে বলছে, এখন দেখো কী অবস্থা হয়! ভয় আমাকে সেখান থেকে সরে যেতে বললেও আমি তা অস্বীকার করে হায়েনাদের মাঝেই বসে গেলাম। তখনও আমি মনকে ভীষণ ভীত পেলাম। কিন্তু আমি উঠতে অস্বীকার করে সেখানেই শুয়ে পড়লাম। এমতাবস্থায় নিদ্রা আমাকে পেয়ে বসলে আমি ঘুমিয়ে পড়ি। এভাবে কিছুক্ষণ আমি শুয়ে থাকি। জেগে দেখি হায়েনারা চলে গেছে। তাদের কেউ আর সেখানে নেই। এ ক্ষণে আমার ভয়ও দূরীভূত হলো এবং আমি আমার পথ চলতে শুরু করলাম।

গ্রন্থকার বলেন, উপর্যুক্ত ব্যক্তি হায়েনার ভয় থাকা সত্ত্বেও সেখানে গিয়ে বসে পড়া এবং শুয়ে পড়া সম্পূর্ণ শরিয়তবিরোধী কাজ। স্বেচ্ছায় কারও জন্য হিংস্র প্রাণী বা সাপের কাছে যাওয়া জায়েয নয়; বরং তার থেকে পলায়ন করা ওয়াজিব। বুখারি ও মুসলিমে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

إِذَا وَقَعَ الطَّاعُونُ بِأَرْضٍ وَأَنْتُمْ بِهَا، فَلَا تَقْدَمُوا عَلَيْهِ

'কোনো শহরে ভাইরাসজনিত রোগের প্রাদুর্ভাব দেখা দিলে সেখানে যাবে না।"[৩]

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও বলেন,

"বসন্ত রোগীর কাছ থেকে এমনভাবে পলায়ন করো, যেভাবে বাঘ থেকে তোমরা পলায়ন করে থাকো।"[৪]

অনুরূপভাবে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হেলে পড়া একটি দেয়ালের নিচ দিয়ে যাওয়ার সময় "দ্রুত পায়ে হেঁটে গিয়েছিলেন।"[৫]

উপরের ঘটনায় উল্লেখিত ব্যক্তি তার স্বাভাবিক অভ্যাস ও প্রকৃতিকে ভীত হতে বারণ করে। অথচ এটা এমন একটি বিষয় যেখানে হজরত মুসা আলাইহিস সালাম এর মতো নবীও অবিচল থাকতে পারেননি। কেননা তিনি যখন হাতের লাঠিকে সাপের আকৃতিতে দেখতে পান, তৎক্ষণাৎ তিনি পেছনে সরে আসেন। আলোচ্য ব্যক্তির কথা ঠিক হলেও বিশুদ্ধ নয়। কেননা মানুষের অভ্যাস ও প্রকৃতি সমান। যে ব্যক্তি বলে যে, আমি

---

৩ সহিহ বুখারি : হাদিস নং ৬৯৭৪

৪ [সহিহ] আস্‌সহিহাহ্ : হাদিস নং ৭৮৩

৫ [মুনকার] ইমাম যাহাবী রহ. মীযানুল ই'তিদাল গ্রন্থে এটাকে 'মুনকার' বলেছেন।

অভ্যাসগতভাবে হিংস্র প্রাণীকে ভয় পাই না, তাহলে আমরা তাকে মিথ্যুক হিসেবে আখ্যায়িত করব। যেমন কেউ যদি বলে, আমি ভালো বস্তু আগ্রহভরে দেখি না, তাহলে সে যেন নিজের ওপরই ক্রোধান্বিত হলো। নিজের মনগড়া বিবেচনায় ধ্বংসের মুখে নিজেকে ঠেলে দেয়াকে তাওয়াক্কুল ভেবেছে। অথচ এটা নিছক মনগড়া খেয়ালিপনা। এটা যদি তাওয়াক্কুল হতো, তাহলে ক্ষতিকারক বস্তুর কাছে যাওয়া থেকে বাধা দেয়া হতো না। আলোচ্য ব্যক্তির অক্ষত থাকার ব্যাপারে আশ্চর্যের কিছু নেই। কেননা হায়েনারা মৃত উট ভক্ষণের কাজে লিপ্ত ছিল। তার প্রতি হয়তো তারা লক্ষ করেনি। কেননা আবু তোরাব নাখশি নামীয় একজন খ্যাতিমান সুফি ছিলেন—যাকে বনের হিংস্র প্রাণীরা একা পেয়ে আক্রমণ করে বসে এবং তাকে খেয়ে ফেলে। এভাবে তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

তথাপি এ কথা অস্বীকার করার উপায় নেই যে, আলোচ্য ব্যক্তির ওপর আল্লাহ তায়ালা দয়া ও অনুগ্রহ করেছেন। তাকে উত্তম ধারণার কারণে মুক্তি দিয়েছেন। আমরা কেবল এহেন কর্মকাণ্ডের ভ্রান্তি ও ক্ষতি সম্পর্কে আলোচনা করছি। সাধারণ মানুষ তার এমন কর্মকাণ্ডের ঘটনা শুনে তাকে বীর ও অতি সাহসী ভেবে থাকবে। উক্ত ব্যক্তির অবস্থাকে কখনো-বা হজরত মুসা আলাইহিস সালাম এর ঘটনা থেকেও চিত্তাকর্ষক হিসেবে মনে করবে। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর অবস্থা থেকেও তাকে অগ্রগামী মনে করার স্পর্ধা দেখাতে পারে, যিনি হেলে পড়া দেয়ালের পাশ দিয়ে অতিক্রমকালে দ্রুতবেগে হেঁটেছিলেন। এভাবে তারা হজরত আবু বকর রা. এর অবস্থা থেকেও তাকে অগ্রগামী মনে করতে থাকবে, যিনি ক্ষতিকর বস্তু থেকে নিরাপদে থাকতে পাহাড়ের গুহার ছিদ্র বন্ধ করেছিলেন। অথচ আলোচ্য ব্যক্তির ভ্রান্ত ধারণামতে, তার কর্মকাণ্ডকে তাওয়াক্কুলের অন্তর্ভুক্ত ভেবে থাকলেও তা কখনো আম্বিয়ায়ে কেরাম ও সিদ্দিকিনের মর্যাদার সমকক্ষ হতে পারবে না।

মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল্লাহ ফারাগানি বলেন, আমি মুয়াম্মিল মুগাবি থেকে শুনেছি, তিনি বলতেন, আমি ছিলাম মুহাম্মাদ ইবনে সামীনের সমসাময়িক। তার সাথে তিকরিত ও মসুলের মধ্যবর্তী স্থানের সফর করতাম। একবার জঙ্গলের পাশ দিয়ে যেতে থাকলে একটি বাঘ দেখে আমি ভীষণ ঘাবড়ে পড়েছিলাম। আমার চেহারায় ভীতির আলামত দেখা গেলেও আমি সম্মুখে এগোবার ইচ্ছা পোষণ করি। মুহাম্মাদ ইবনে সামিন আমার গায়ে হাত দিয়ে বললেন, হে মুয়াম্মিল! এখানেই তাওয়াক্কুলের পরীক্ষা।

গ্রন্থকার আল্লামা ইবনুল জাওযি রহ. বলেন, নিঃসন্দেহে ভরসাকারীদের ওপর তাওয়াক্কুলের সাক্ষাৎ পাওয়া যায় বিপদ-আপদের সময়। কিন্তু তাওয়াক্কুলের শর্তসমূহের মধ্যে নিজেকে বাঘের মুখে ঠেলে দেয়ার কোনো কথা নেই। কেননা এটা অবৈধ।

খাওয়াস বলেন, আমাকে কয়েকজন বুযুর্গ বলেছেন, আলী রাযীকে কেউ বললেন, আমি আপনাকে আবু তালেব জুরজানির সাথে দেখি না কেন? উত্তরে তিনি বলেছিলেন, একবার আমরা উভয়ে এমন এক স্থানে উপস্থিত ছিলাম, যেখানে ছিল হিংস্র প্রাণীদের বসবাস। আবু তালেব আমাকে নিদ্রা আসছে না দেখে বললেন, আজকের পর তুমি আমার কাছে আসবে না।

গ্রন্থকার বলেন, তিনি তাঁর সাহচর্যের ব্যাপারে অতিরঞ্জন করেছেন। কেননা তিনি তার কাছে এমন বিষয় সন্ধান করেছেন যা তার আয়ত্তাধীন নয়। শরিয়তও তাকে এ বিষয়ে জবরদস্তি করেনি। (অর্থাৎ হিংস্র প্রাণীদের কাছে কেন তার নিদ্রা এলো না?) হজরত মুসা আলাইহিস সালামও এমন অবস্থায় নিয়ন্ত্রণ রাখতে পারেননি, যখন তিনি সাপ দেখে পালাচ্ছিলেন। সুতরাং এ ক্ষেত্রে তাকে এমন নির্দেশ দেয়া অজ্ঞতা ছাড়া আর কিছু নয়।

আহমদ ইবনে আলী ওয়াজদি বলেন, দিনুরি নামীয় এক ব্যক্তি খালি পা ও খালি মাথায় বারো (১২) বার হজ করছেন। পায়ে কোনো কাঁটা বিধলে জমিনে পা হেঁচড়াতেন এবং এভাবে হাঁটতে থাকতেন। কাঁটা বের করার জন্য জমিনের দিকে ঝুঁকতেন না, যাতে তার তাওয়াক্কুল বিশুদ্ধ থাকে।

গ্রন্থকার বলেন, চিন্তা করে দেখুন। অজ্ঞদের সাথে অজ্ঞতা কী ধরনের ব্যবহার করে থাকে। খালি পায়ে বন-জঙ্গলে হাঁটাচলা করে কখনো আল্লাহ তায়ালার আনুগত্য হতে পারে না। কেননা এতে মনে-প্রাণে ভীষণ কষ্ট অনুভূত হয়। অনুরূপভাবে খোলা মাথায় সফর করাতেও কোনো বিশেষত্ব ও ফজিলত নেই। এ দ্বারা আল্লাহর নৈকট্য লাভ হয় না। যদি ইহরামের সময় খালি মাথায় থাকার নির্দেশ না থাকত তাহলে মাথা খোলা রাখা অর্থহীন হিসেবে বিবেচিত হতো। ওই ব্যক্তিকে কে নির্দেশ দিল যে, নিজের পা থেকে কাঁটা তুলবে না। এটা কী ধরনের আনুগত্য? কাঁটাবিদ্ধ হওয়ার ফলে যখন সে প্রচণ্ড যন্ত্রণায় ভুগতে থাকে তখন তা না তুলে জমিনে হেঁচড়ানোর কী অর্থ? জমিনে হেঁচড়ানোর ফলেই তো তার কষ্ট কিছুটা কম অনুভূত হয়। এতে কি তার তাওয়াক্কুলে বিঘ্ন ঘটে না? তাওয়াক্কুলের সাথে এসব বিবেকবর্জিত ও শরিয়তবিরোধী কার্যক্রমের কোনো সম্পর্ক নেই।

কেননা বিবেক ও শরিয়তের চাহিদা হচ্ছে নিজেকে উপকার পৌঁছানো এবং কষ্টদায়ক ও ক্ষতিকারক বিষয় থেকে দূরে রাখা। স্বয়ং শরিয়ত এই নির্দেশ প্রদান করে যে, ইহরাম বাঁধলে যদি কারও কষ্ট অনুভূত হয় তাহলে ইহরামে নিষিদ্ধ বস্তু ভেঙ্গে দেবে এবং ফিদিয়া প্রদান করবে। আব্বাস ইবনে মুহাম্মাদ বলেন, আমি আবু উবায়দা থেকে শুনেছি, তিনি বলতেন, মানুষের বুদ্ধিতে এটা তো কাজ করে যে, সে রৌদ্র ছেড়ে ছায়ার নিচ দিয়ে চলাচল করবে।

আবু আলী রোযবারি আবু বকর দাক্কাক থেকে বর্ণনা করেন, আমি আরবের একটি পরিবারে মেহমান হয়েছিলাম। সেখানে আমি একজন সুন্দরী মেয়ে দেখতে পাই। তার দিকে তাকানোর অপরাধে আমি আমার চক্ষু উপড়ে ফেলি।

গ্রন্থকার বলেন, দেখুন, এ ব্যক্তির অজ্ঞতা কেমন। এহেন কর্মকাণ্ডের সাথে শরিয়ত বা ইবাদতের কোনো সম্পর্কই নেই। কেননা সে যদি ওই মেয়ের দিকে অনিচ্ছাকৃতভাবে তাকিয়ে থাকে, তাহলে এতে তার গুনাহ হবে না। আর যদি ইচ্ছে করে দেখে থাকে, তাহলে তার সগিরা গুনাহ হবে। যার জন্য লজ্জাবোধই যথেষ্ট। কিন্তু এ ক্ষেত্রে সে নিজের চক্ষু উপড়ে ফেলে একটি কবিরা গুনাহে পতিত হলো। এ অপরাধে সে তাওবাও করল না। কেননা সে ভেবে রেখেছে, এ দ্বারা সে আল্লাহর নৈকট্য অর্জন করতে পারবে। এদিকে যে ব্যক্তি নিষিদ্ধ বিষয়কে আল্লাহর নৈকট্যের কারণ হিসেবে মনে করবে, তার অন্যায়ের কোনো সীমারেখা থাকবে না। হয়তো সে এমন ঘটনা বনি ইসরাইলের জনৈক ব্যক্তির সম্পর্কে শুনেছে। বনি ইসরাইলের এক ব্যক্তি মহিলার দিকে দৃষ্টি দিলে সে নিজের চক্ষু উপড়ে ফেলে। এটা তৎকালীন যুগে হয়তো সঠিক ছিল এবং তাদের শরিয়তে তা ছিল বৈধ। পক্ষান্তরে আমাদের শরিয়তে এটাকে অবৈধ ও হারাম সাব্যস্ত করা হয়েছে। এই সুফি গোষ্ঠী নিজেরাই একটি শরিয়ত নির্মাণ করে তার নাম রেখেছে তাসাওউফ। ফলে শরিয়তে মুহাম্মদি তারা ছেড়ে দেয়।

অনেক সুফি মহিলার পক্ষ থেকেও এ ধরনের ঘটনা শোনা যায়। শুয়ানা বলেন, আমাদের প্রতিবেশী একজন নেককার মহিলা ছিলেন। একদিন সে বাজারে গেলে এক ব্যক্তি তাকে দেখে উৎসাহী হলো এবং তার পিছু পিছু তার ঘর পর্যন্ত এলো। মহিলা তাকে বলল, হে লোক! আপনি আমার কাছে কী চান? সে বলল, আমি আপনার প্রেমে পড়ে গিয়েছি। মহিলা বলল,

আপনি আমার কী পছন্দ করেন? সে বলল, আপনার নয়নযুগল বেশ সুন্দর। মহিলা ঘরে গিয়ে নিজের চক্ষু উপড়ে ফেলল এবং দরজার কাছে এসে ওই লোকের সম্মুখে নিক্ষেপ করল। বলল, নিয়ে যান এই চক্ষু! আল্লাহ এতে আপনাকে বরকত দিবেন না।

গ্রন্থকার আল্লামা ইবনুল জাওযি রহ. বলেন, আমার ভাইয়েরা, দেখুন। শয়তান জাহেলদের সাথে কীভাবে খেলা করে! এই লোক তো মহিলাকে দেখে সগিরা গুনাহে পতিত হয়েছিল, কিন্তু মহিলা এর ফলে কবিরা গুনাহে লিপ্ত হলো। দুঃখজনক ব্যাপার হচ্ছে, সে এটাকে ইবাদত মনে করেছিল। এছাড়াও তার উচিত ছিল, বেগানা পুরুষের সাথে কথা না বলা। অথচ কোনো কোনো সুফি এর বিপরীত করে থাকেন।

যুন্নুন বলেন, জঙ্গলে এক মহিলার সাথে আমার দেখা হলে আমি তাকে ডাকলাম। সে আমার কথা শুনে বলল, কোনো পুরুষের জন্য বেগানা নারীকে আহ্বান করা বৈধ নয়। আমি যদি তোমার হীন বুদ্ধি সম্পর্কে অবগত না হতাম, তাহলে তোমাকে আঘাত করতাম।

ইসমাঈল ইবনে নাজীদ বলেন, আমি ইবরাহিম হারভী সাবতিয়ার সাথে কোনো এক সফরে সঙ্গী ছিলাম। সাবতিয়া তাকে বলল, জাগতিক বস্তুসামগ্রীর মধ্যে যা কিছু তোমার কাছে আছে তা ফেলে দাও। ইবরাহিম বলেন, আমি সবকিছু ফেলে দিলাম এবং এক দিনার রেখে দিলাম। কয়েক কদম এগোনোর পর তিনি আবার বললেন, দুনিয়াবি সবকিছু ফেলে দাও এবং আমার বাতেনকে কলঙ্কিত কোরো না। আমি দিনারটি বের করে তাকে দিলে তিনি তা ফেলে দিলেন। আরও কয়েক কদম এগোনোর পর আবার বললেন, তোমার কাছে যা আছে তা ফেলে দাও। আমি বললাম, আমার কাছে আর কিছু নেই। তিনি বললেন, এখনও আমার বাতেন কলঙ্কিত। হঠাৎ আমার স্মরণ এলো যে, আমার কাছে তাবিজের পাত্র আছে। তিনি আমার কাছ থেকে সেটি নিয়ে ফেলে দিয়ে বললেন, এখন চলো। আমরা উভয়ে চললাম। রাস্তায় আমার সেই তাবিজের পাত্র এর প্রয়োজন দেখা দিলে জঙ্গলের ভেতর আমার সামনে সেটা পেয়ে গেলাম। সাবতিয়া আমাকে বললেন, দেখো—যে আল্লাহর সাথে সত্যের ব্যবহার করে, আল্লাহ তায়ালা তার সাথে তেমনই ব্যবহার করে থাকেন।

গ্রন্থকার বলেন, এসব কর্মকাণ্ড ভুল এবং সম্পদ নিক্ষেপ করা হারাম। ওই ব্যক্তির ওপর আশ্চর্য লাগে, যে তার নিজের মালিকানাধীন বস্তু ফেলে দেয়

এবং এমন বস্তু গ্রহণ করে যার সে মালিক নয়, জানাও নেই এটা কোথা থেকে এসেছে।

আলী ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে মিসরির কাছ থেকে আমি শুনেছি, তিনি বলেন, আমাকে আবু সাঈদ খায্যায বলেছেন, আমি একবার কোনো ধরনের সফর-সামগ্রী ছাড়া জঙ্গলে প্রবেশ করলে আমার প্রচণ্ড ক্ষুধা পায়। দূর থেকে আমি আমার গন্তব্য দেখতে পেয়ে বেশ খুশি হলাম। পরে ভাবলাম, এটা আমি ঠিক করিনি। আমি গায়রুল্লাহর ওপর ভরসা করে ফেলেছি। ফলে আমি শপথ করে নিলাম যে, কারও প্রয়োজন ছাড়া আমি আমার গন্তব্যে যাব না। আমি সেখানে ধারালো বস্তু দিয়ে একটি গর্ত খুঁড়ে ফেললাম এবং নিজেকে সিনা পর্যন্ত সেখানে ঢেকে রাখলাম। অর্ধরাত অতিবাহিত হলে আমি একটি আওয়াজ শুনতে পেলাম। কে যেন বলছে, হে গ্রামবাসী, তোমাদের পাশে এই জঙ্গলে আল্লাহর একজন অলী নিজেকে লুকিয়ে রেখেছে, তোমরা তার খবর নাও। তারপর গ্রাম থেকে কিছু লোক এসে আমাকে গ্রামে নিয়ে গেল।

গ্রন্থকার বলেন, এই লোক নিজের স্বাভাবিক চাহিদা ও প্রকৃতির ওপর জুলুম করেছেন। কেননা সে এমন বিষয় চেয়েছে, যার জন্য তাকে সৃষ্টি করা হয়নি। কেননা মানুষের জন্য তার প্রয়োজনীয় বিষয়ের দিকে আকর্ষণাত্মক প্রকৃতিতে সৃষ্টি করা হয়েছে। পিপাসার্ত অবস্থায় পানির দিকে যাওয়া এবং ক্ষুধার্ত অবস্থায় খাবারের দিকে যাওয়া কখনো আপত্তিজনক বিষয় হতে পারে না। তাই প্রয়োজনীয় বিষয়ের দিকে ধাবিত হওয়া স্বাভাবিক। হাদিসে আছে,

"রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন সফর থেকে আসতেন এবং মদিনা দেখা যেত, তখন ঘরের টানে তিনি দ্রুত হাঁটতেন।"[১]

অন্যত্র বর্ণিত আছে :

"মক্কা থেকে ফেরার সময় মাতৃভূমির টানে তিনি বারবার মুখ ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে মক্কার দিকে দেখতেন।"[২]

---

১ সহিহ বুখারি : হাদিস নং ১৮৮৬

২ তিরমিযি : হাদিস নং ৩৯২৫

হজরত বেলাল রা. বলতেন, উতবা ও শাইবার ওপর আল্লাহর লা'নত পতিত হোক। সে আমাকে মক্কা থেকে বিতাড়ন করে দিয়েছে। তিনি তখন নিম্নোক্ত কবিতা আকৃত্তি করতেন :

أَلا ليت شعري هل أبيتن ليلة * بواد وحولي إذخر وجليل

"ইস্ যদি এমন হতো! যদি এমন কোনো রজনি আসত, যখন আমি মক্কায় থাকতাম এবং আমার পিঠ সেখানের ঘাসের ওপর থাকত!"

এমতাবস্থায় যে ব্যক্তি জ্ঞান ও বুদ্ধির বিষয় থেকে বিমুখ হবে তাকেও আল্লাহ রক্ষা করবেন। তথাপি সে জামাতে নামায পড়া ছেড়ে দেয়ায় নিকৃষ্ট পাপে পতিত হলো। এমন কর্মকাণ্ডে কি আল্লাহর নৈকট্য লাভ হতে পারে? এটা তো কেবল অজ্ঞতা।

বকর ইবনে মুহাম্মাদ বলেন, আমি আবুল খায়ের নিশাপুরির পাশে ছিলাম। সে নির্দ্বিধায় আমার সাথে কথাবার্তা বলছিল। তিনি তার শুরুর জীবনের আলোচনা করলে আমি তাকে হাত কাটার কারণ জিজ্ঞেস করলাম। উত্তরে তিনি বললেন, সে অন্যায় করেছে, তাই তা কেটে ফেলা হয়েছে। পরে আমি কিছু মানুষ নিয়ে তার কাছে গেলাম। তখন তারা তার হাত কাটার কারণ জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, আমি একবার সফরে গিয়েছিলাম। এস্কান্দরিয়া পৌঁছে সেখানে বারো (১২) বছর কাটিয়েছি। সেখানে আমি একটি ঝুপড়ি বানিয়ে রাত কাটাতাম এবং গ্রামবাসীর শিকারকৃত বস্তু দ্বারা ইফতার করতাম। তাদের দস্তরখানার অবশিষ্টাংশ কুকুর থেকে কেড়ে নিয়ে খেয়ে নিতাম। তখন আমার বাতেন অন্তর আমাকে আওয়াজ দিয়ে বলল, হে আবুল খায়ের! তোমার মনোবাসনা হচ্ছে, মাখলুককে তার রুজির ব্যাপারে কষ্ট দেয়া যায় না। তাওয়াক্কুল করে সফর করবে। অথচ তুমি মানুষের মাঝে অবস্থান করছ। আমি আরয করলাম, হে আমার মাবুদ! তোমার ইজ্জতের শপথ! আমি আমার হাত ওই বস্তুর প্রতি হাত বাড়াব না, যা মাটি হতে উৎপন্ন হয়েছে। এভাবে এমন স্থান হতে আমার কাছে রিজিক পৌঁছানো হয়, যার কল্পনাও আমি করিনি। বারোদিন পর্যন্ত আমি কেবল ফরয আদায় করতাম। পরে আর দাঁড়াতে পারতাম না। তারপরও বারোদিন দাঁড়িয়ে ছিলাম। পরে বসে নামায পড়তাম। এরপর বসার শক্তিও পেতাম না। আমি দেখছিলাম নিজেকে নিজেই ক্ষয় করে দিচ্ছি। অতঃপর আমি মনকে আল্লাহর দিক মনোযোগী করে আরয করলাম, হে আমার মাবুদ! তুমি আমার ওপর ফরয নির্ধারিত করেছ, যে ব্যাপারে আমি জিজ্ঞাসিত হব।

তুমিই আমার রুজির জামিনদার হয়েছ। সুতরাং তোমার দয়া আর অনুগ্রহে আমাকে রিযিক দাও। তোমার সম্পর্কে আমি যে বিশ্বাস স্থাপন করেছি, সে ব্যাপারে আমাকে কাঠগড়ায় দাঁড় করিও না। তোমার ইজ্জতের শপথ! তোমার সাথে কৃত অঙ্গীকার পূরণে আমি প্রাণপণ চেষ্টা করে যাবে।

হঠাৎ আমার সম্মুখে দু'টি রুটি দেখতে পেলাম। তাতে কিছু তরকারিও ছিল। সর্বদা আমি এমন খাদ্য পেতাম। এক রাত থেকে আরেক রাত পর্যন্ত এতেই আমার ক্ষুধা নিবারণ হতো। পরে আমাকে ঘাঁটিতে ফেরার নির্দেশ দেয়া হলে আমি চলে এলাম। শহরে এসে মসজিদে একজন বক্তাকে দেখতে পেলাম, যিনি হজরত যাকারিয়া আলাইহিস সালাম এর ঘটনা বর্ণনা করছেন। হজরত যাকারিয়া আলাইহিস সালাম এর মাথায় যখন করাত চালানো হলো, তখন আল্লাহ তায়ালা অহী পাঠালেন যে, যদি আমার কাছে তোমার আহ্ শব্দ আসে, তাহলে নবুয়তের তালিকা থেকে তোমার নাম কর্তন করে ফেলা হবে। যাকারিয়া আলাইহিস সালাম সবর করলে তার মাথা দ্বিখণ্ডিত হয়ে যায়। প্রকৃতপক্ষে যাকারিয়া আলাইহিস সালাম অনেক বড় ধৈর্যধারণকারী ছিলেন।

পরে সেখান থেকে আমি এনতাকিয়া নামক স্থানে প্রবেশ করলাম। সেখানে আমার কিছু বন্ধুর সাথে সাক্ষাৎ হলো। তারা জেনে নিল যে, আমি পাহাড়ের গর্তে অবস্থান করতে চাই। তারা আমাকে একটি তরবারি, একটি ঢাল এবং একটি কুঠার দিল। তখন আমি আল্লাহকে খুব লজ্জা করতাম, তাই শত্রুর ভয়ে দেয়ালের আড়ালে অবস্থান করা আমার সহ্য হতো না। একটি জঙ্গলে আমার অবস্থান নির্ধারণ করে নিলাম। সেখানেই থাকতাম। রাতের বেলা নদীর পাড়ে যেতাম। তীরে হাতিয়ার গেড়ে ঢাল মেহরাবের দিকে ফিরিয়ে দাঁড়াতাম। এভাবে ফজর পর্যন্ত নামায পড়তাম। ফজরের নামায আদায়ে পর আবার জঙ্গলের দিকে ফিরে যেতাম। সারাদিন এখানেই অবস্থান করতাম।

একদিন বের হয়ে আমার সামনে একটি বৃক্ষ দেখতে পাই। এর ফলগুলো আমার খুব ভালো লাগে। আল্লাহর সাথে আমি যে অঙ্গীকার করেছিলাম, তা ভুলে গেলাম। জমি থেকে উৎপন্ন কোনো বস্তুর প্রতি হাত না বাড়ানো সংক্রান্ত শপথের কথাও আমার স্মরণ ছিল না। আমি হাত বাড়িয়ে কিছু ফল নিয়ে তা মুখে পুরে খেতে থাকলাম। হঠাৎ আমার অঙ্গীকার ও শপথের কথা

স্মরণ হলে, তৎক্ষণাৎ যে ফল আমার মুখে ছিল তা ছুড়ে ফেললাম। সেখানেই মাথায় হাত রেখে বসে গেলাম।

আমার কাছে কিছু আরোহী এসে বলল, দাঁড়াও। তারা আমাকে নদীর তীরে নিয়ে গেল। সেখানে গিয়ে একজন সরদারকে দেখতে পাই। তার পাশে আরও কিছু সাওয়ারি ও কাফেলা রয়েছে। তাদের সামনে হাবশিদের একটি দলও দেখতে পাই—যারা ডাকাতি করত। সরদার তাদেরকে গ্রেফতার করেছিল এবং যারা পালিয়ে গেছে তাদের সন্ধানে আমাকে বহনকারী সাওয়ারির মতো আরও কিছু সাওয়ারি সে জঙ্গলের এদিক-সেদিক পাঠায়। তারা আমার কাছে তরবারি, ঢাল ও কুঠার দেখে ওই ডাকাত হাবশিদের একজন বলে ভেবে নিয়েছে।

সরদার আমার সামনে এসে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কে? আমি বললাম, আমি একজন আল্লাহর বান্দা। তারপর তিনি হাবশিদের জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা কি এই লোককে চেনো? তারা বলল, না। সরদার বললেন, কেন চেনো না? এ তো তোমাদের সরদার। তোমরা নিজের প্রাণ দিয়ে হলেও তাকে রক্ষা করতে চাচ্ছ। আমি তোমাদের হাত-পা কেটে ফেলব। এক একজন ডাকাতকে সামনে এনে এনে তাদের হাত-পা কাটা হতে থাকল। আমার সিরিয়াল এলে আমাকে বলা হলো, সম্মুখে এসে স্বীয় হাত বাড়াও। আমি হাত বের করে সামনে রাখলাম। তা কেটে ফেলা হলো। তারপর পা এগিয়ে দিতে বলা হলে, আমি পা এগিয়ে দিলাম এবং আকাশের দিকে মাথা তুলে আরয করলাম, হে আমার প্রতিপালক! আমার হাত তো অন্যায় করেছে, কিন্তু আমার পা কী অন্যায় করেছে?

ইত্যবসরে একজন আরোহী সোজা এখানে এসে দাঁড়াল। মাটিতে পড়ে সে চিৎকার দিয়ে বলল, হে লোকেরা! তোমরা এটা কী করছে! তোমরা কি চাও, আকাশ-মাটি একীভূত হয়ে যাক? এই লোক একজন খাঁটি নেককার ব্যক্তি। তিনি আবুল খায়ের নামে প্রসিদ্ধ। সরদার এ কথা শুনে মাটিতে লুটে পড়ে আমার কর্তিত হাতটি তার হাতে নিয়ে চুমোতে আরম্ভ করল। আমাকে জড়িয়ে ধরে আমার বাহু ও হাতে চুমোতে লাগল এবং বলল, আল্লাহর জন্য আমাকে ক্ষমা করে দিন। আমি বললাম, তুমি যখন আমার হাত কাটছিলে তখনই আমি তোমাকে ক্ষমা করে দিয়েছি। কেননা এই হাত অন্যায় করার কারণে কাটা হয়েছে।

গ্রন্থকার বলেন, চিন্তা করা দরকার—অজ্ঞতা তার সাথে কেমন আচরণ করেছে! অথচ তিনি একজন ভালো লোক হিসেবে সুপ্রসিদ্ধ। জ্ঞান থাকলে তিনি জেনে নিতে পারতেন যে, যেসব কর্মকাণ্ড তিনি করেছেন এসব তার জন্য হারাম ছিল। আবেদ ও যাহেদ তথা ইবাদতকারী ও দুনিয়াত্যাগীদের সাথে শয়তানের জন্য অজ্ঞতার চেয়ে অধিকতর সাহায্যকারী আর কিছু নেই।

সূত্র পরম্পরায় বর্ণিত আছে, ইবনে হাদীক বলেন, আমি হাতেম আসামের সাথে মসিসা নামক এলাকায় প্রবেশ করেছিলাম। হাতেম যতক্ষণ পর্যন্ত তার মুখ খুলে কোনো খাদ্যবস্তু তার মুখে ঢুকিয়ে দেয়া না হয়, ততক্ষণ পর্যন্ত কিছু না খাওয়ার অঙ্গীকার করে বসলেন। সাথিদের বললেন, তোমরা এদিক-সেদিক চলে যাও। এরপর তিনি বসে গেলেন। এভাবে নয়দিন ধরে বসে রইলেন এবং কিছু খেলেন না। দশম দিনে এক ব্যক্তি তাঁর কাছে এসে কিছু খাদ্যদ্রব্য তাঁর সম্মুখে পেশ করে বলল, এগুলো খান। হাতেম কোনো উত্তর দিল না। এভাবে তিনবার বলার পরও তিনি কোনো উত্তর দিলেন না। পরে লোকটি বলল, এই লোক পাগল। তাই এক মুঠো খাবার তাঁর মুখের দিকে তুলে ধরল। কিন্তু তিনি মুখ খুলছেন না এবং কোনো কথাও বলছেন না। এই লোক তার চাদরের কোণে থাকা চাবি বের করে তাঁর মুখ খুলে বলল, খেতে থাকুন। এ কথা বলে সে খাবার তাঁর মুখে ঢুকিয়ে দিলেন। হাতেম খেলেন। এরপর বললেন, তুমি যদি এই খাবারের বিনিময়ে কোনো উপকার পেতে চাও, তাহলে এদেরকে খাওয়াও। এ কথা বলে তিনি তাঁর সাথিদের দিকে ইশারা করলেন।

কাজী আহমদ ইবনে সাইয়্যার বলেন, জনৈক সুফি আমাকে বলেছেন, এক সফরে একজন শায়খের সাথে আরও কিছু লোক ছিল। তাওয়াক্কুলের আলোচনা চলছিল। রিযিক এবং নফসের দুর্বলতা ও শক্তির বিষয়ে তাওয়াক্কুলের আলোচনার ফাঁকে শায়খ বললেন, আমার সাথে এসো। এ কথা বলে তিনি কঠিন শপথ করেন যে, ততক্ষণ পর্যন্ত আমি কোনো খাদ্যদ্রব্যের স্বাদ নেব না, এমনকি গরম গরম ফালুদার পাত্র আমার কাছে পাঠানো হলেও আমি তা খাবো না, যতক্ষণ পর্যন্ত খাওয়ার জন্য কেউ শপথ করে। আমরা সাহার নামক এলাকার অভিমুখে চললাম। অন্য একটি কাফেলা শায়খের অবস্থা শুনে বলল, এটা অজ্ঞতা। হাঁটতে হাঁটতে আমরা একটি গ্রামে গিয়ে পৌঁছলাম। একদিন দুই রাত অতিবাহিত হয়ে গেল। শায়খ কিছু খেলেন না। কাফেলার অন্যরা তাঁকে একাকী ছেড়ে দিলে শুধু

আমি তাঁর সঙ্গে থাকি। গ্রামের মসজিদে তিনি শুয়ে গেলেন এবং অতিরিক্ত দুর্বলতার দরুন তিনি যেন নিজেকে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিচ্ছিলেন। আমি তাঁর সঙ্গেই ছিলাম।

এভাবে চতুর্থ দিনের অর্ধরাত অতিবাহিত হলে শায়খ মরণাপন্ন হয়ে পড়েন। ইত্যবসরে হঠাৎ শুনতে পাই কে যেন মসজিদের দরজা খুলছে। দেখি কৃষ্ণবর্ণের এক বালিকা একটি পোটলা নিয়ে আমাদের সামনে হাজির। আমরা তাকে দেখলে, সে জানতে চাইল আমরা কি মুসাফির নাকি গ্রামবাসী? আমি বললাম, আমরা মুসাফির। সে পোটলা খুলল এবং ফালুদার একটি পাত্র আমাদের সামনে পেশ করল। যা গরমের তীব্রতায় টগবগ করছিল। বালিকা বলল, খাও। আমি শায়খকে বললাম, এগুলো খেয়ে নিন। তিনি উত্তর দিলেন, আমি খাব না। বালিকা তার হাত উঠিয়ে জোরে ধাক্কাতে আরম্ভ করল এবং বলল, আল্লাহর শপথ! আপনি যদি না খান, তাহলে আমি এভাবে মারতে থাকব। অনুগ্রহ করে আপনি খেয়ে নিন। এবার শায়খ আমাকে বললেন, এসো, আমার সাথে খাও। আমরা উভয়ে খেয়ে পাত্র খালি করে ফেললাম।

বালিকা ফিরে যেতে চাইলে তাকে আমি জিজ্ঞেস করলাম, তুমি কে? আর এটা কেমন পাত্র? সে বলল, আমি এই গ্রামের সরদারের দাসী। তিনি ভীষণ বদমেজাজি লোক। আমার কাছে তিনি ফালুদার পাত্র চাইলে আমি দ্রুত ফালুদা তৈরি করি। কিন্তু তার পরও আমার কিছুটা দেরি হয়ে যায়। সরদার তৎক্ষণাৎ তালাকের কসম খেয়ে বললেন, এই পাত্রের খাবার না আমি খাব, না ঘরের কোনো লোক খেতে পারবে, আর না গ্রামের কোনো অধিবাসী। এটা কেবল মুসাফিরকেই খাওয়াতে হবে। আমি মসজিদে মসজিদে ফকিরদের সন্ধানে ছুটে চললাম। তোমাদের ছাড়া আর কাউকে পেলাম না। যদি এই শায়খ না খেতেন, তাহলে তাকে আমি মারতেই থাকতাম; যতক্ষণ পর্যন্ত তিনি না খেতেন। কারণ কিছুতেই যেন আমার মালিকের স্ত্রীর ওপর মালিকের তালাক পতিত না হয়। শায়খ আমাকে বললেন, কী দেখলে তুমি! আল্লাহ তায়ালা রিযিক পৌঁছাতে চাইলে এভাবেই পৌঁছান।

গ্রন্থকার আল্লামা ইবনুল জাওযি রহ. বলেন, অনেক সময় অজ্ঞ লোকেরা এমন কাহিনী শুনলে মনে করবে এটা কারামত। অথচ লোকটি যা করল তা খুবই নিন্দনীয়। কেননা সে আল্লাহ তায়ালাকে পরীক্ষা করছে, সে ব্যাপারে শপথ করছে এবং নিজের নফসের ওপর আক্রমণ করছে। এজন্য উপরোক্ত

কর্মকাণ্ড বৈধ ছিল না। আমরা এটা অস্বীকার করছি না যে, আল্লাহ তায়ালা তার ওপর অনুগ্রহ করেছেন। কিন্তু কথা হচ্ছে, সে সঠিকের বিপরীত কাজ করছে। এ অবস্থা অব্যাহত মারাত্মক পাপের কারণ। কেননা সে বিশ্বাস করেছে যে, আল্লাহ তায়ালা তাকে সম্মান করেছে। এ ব্যাপারে সে নিজেকে মর্যাদাসম্পন্ন ভেবে নিয়েছে। এ ঘটনা পূর্বে উল্লেখিত হাতেম রাযীর অনুরূপ। কেননা সে যদি সুস্থ ও বিবেকবান হয়, তাহলে সে অজ্ঞতাপূর্ণ ও নাজায়েয কাজ করেছে বলে প্রমাণিত হবে। কেননা তারা ভেবে নিয়েছে যে, তাওয়াক্কুল মানে আসবাব ও বস্তুসামগ্রী ছেড়ে দেয়া। যদি তারা স্বীয় অঙ্গীকার পূরণে ব্রতী হতো, তাহলে খাবার চিবাত না এবং গিলত না। অতএব এমন নিষ্ফল কর্মকাণ্ডে কী করে আল্লাহর নৈকট্যের কারণ হতে পারে? এ সব কথাকে আমি বাড়াবাড়ি বলে মনে করি। এটা শরয়ি জ্ঞানস্বল্পতার কারণে অজ্ঞদের সাথে শয়তানের খেলা। কারণ অজ্ঞদের সাথে শয়তান খেলতে মজা পায়।

আবু ইসহাক ইবরাহিম ইবনে আহমদ তাবারি বলেন, আমাকে জাফর খুলদী বলেছেন, আমি ছাপ্পান্নবার আরাফার ময়দানে অবস্থান করেছি। এর মধ্যে একুশবার মাযহাব মতো ছিলাম। আমি আবু ইসহাককে জিজ্ঞেস করলাম, 'একুশবার মাযহাব মতো ছিলাম'—এর মানে কী? তিনি বললেন, সে তখন নাশেরিয়া ব্রিজে চড়ত এবং তার জামা ছিঁড়ে দিত, যাতে মানুষ বুঝতে পারে যে, তার কাছে সফরের কোনো সহায়-সম্বল, পানাহার-সামগ্রী নেই। এরপর সে তালবিয়া বলে বলে হাঁটত।

গ্রন্থকার বলেন, এটা শরিয়তবিরোধী কাজ। কেননা আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন— وتزودوا 'তোমরা সঙ্গে পাথেয় তথা সফরসামগ্রী নাও"[১] স্বয়ং রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সফরসামগ্রী সঙ্গে রাখতেন। এমন বলা সম্ভব নয় যে, এক মাস যাবৎ মানুষ কোনো ধরনের প্রয়োজনের মুখোমুখি হবে না। যদি সে দুস্থ হয় এবং নিজেকে ধ্বংস করে দেয়, তবে সে গুনাহাগার হবে। যদি মানুষের কাছে হাত পেতে কিছু চায়, তাহলে তা তাওয়াক্কুলের দাবির বিপরীত। আর যদি এই দাবি করে যে, আল্লাহ তায়ালা তাকে সম্মান করবেন এবং কোনো উপকরণ ছাড়া তার কাছে রিযিক পৌঁছাবেন, তাহলে বুঝতে হবে—সে নিজেকে সম্মানের উপযোগী মনে

---

১ সুরা বাকারা : আয়াত ১৯৭

করে। পক্ষান্তরে সে যদি শরিয়তের অনুসরণ করত এবং সফরসামগ্রী সঙ্গে রাখত, তাহলে সব দিক থেকেই-তার জন্য মঙ্গল হতো।

আবু শুয়াইব মুকাফ্ফা সম্পর্কে আমি একটি আশ্চর্যজনক ঘটনা শুনেছি। তিনি পায়ে হেঁটে সত্তরবার হজ করেছেন। প্রত্যেক হজের সময় বায়তুল মুকাদ্দাসের পাহাড় হতে ইহরাম বাঁধতেন এবং তাবূক এলাকায় তাওয়াক্কুল করে প্রবেশ করতেন। শেষবার হজের সময় তিনি জঙ্গলে একটি পিপাসার্ত কুকুর দেখতে পান, যে তীব্র পিপাসার কারণে হাঁ করে আছে এবং বলছে, এমন কে আছ যে আমাকে এক মুঠো পানি পান করিয়ে সত্তরটি হজের সাওয়াব গ্রহণ করবে? এক ব্যক্তি পিপাসা নিবারণ উপযোগী পানি কুকুরকে দিল। সে পানি পান করা করিয়ে বলল, এই আমল সত্তরটি হজ অপেক্ষা উত্তম। কেননা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন,

'প্রত্যেক প্রাণীর সাথে ভালো আচরণ করার দ্বারা সাওয়াব পাওয়া যায়।'[২]

আমি বলছি, এসব ঘটনাবলি আমি এ জন্য উল্লেখ করেছি, যাতে করে জ্ঞানীরা অভিজ্ঞতা অর্জন করতে পারেন। তাঁরা অতিরিক্ত বুঝতে চেয়েছেন এবং তাওয়াক্কুল ইত্যাদির ভুল ব্যাখ্যা লালন করেছেন, যা শরয়ি বিধি-বিধানের বিপরীত। আমার বুঝে আসছে না, এ সব লোক খালি হাতে বের হলে কীভাবে অযু ও নামায আদায় করতেন? কাপড় ছিঁড়ে গেলে সুই দিয়ে সেলাই না করে কীভাবে পরতেন? অথচ তাদের পীর ও শায়খেরা সফরের পূর্বে সফরের উপায়-উপকরণ তৈরি রাখার নির্দেশ প্রদান করতেন।

গ্রন্থকার বলেন, তাওয়াক্কুলের ক্ষেত্রে ইবরাহিম খাওয়াস ছিলেন স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যের অধিকারী। তিনি সর্বদা নিজের সাথে সুঁই, সুতা, বদনা ও কাঁচি রাখতেন। কখনো এগুলো ফেলে চলতেন না। কেউ তাকে জিজ্ঞেস করল, আপনি অন্যদেরকে কোনো দুনিয়াবি বস্তু সঙ্গে না রাখতে উপদেশ দেন, অথচ আপনি নিজে এগুলো সঙ্গে রাখেন, এর কারণ কী? উত্তরে ইবরাহিম বলেন, এগুলো সঙ্গে রাখার দ্বারা তাওয়াক্কুলে বিঘ্ন ঘটে না। কেননা আমার ওপর আল্লাহ তায়ালার ফারায়েয রয়েছে। এদিকে দরবেশদের শরীরে একটিমাত্র কাপড় থাকে। কখনো কখনো সেটা ছিঁড়ে যাবার আশঙ্কা রয়েছে। সাথে যদি সুঁই, সুতো না থাকে তাহলে লজ্জাস্থান ঢেকে রাখা দায় হয়ে যাবে এবং নামায ফাসেদ হবে। আবার সাথে বদনা ও বাটি রাখা না

---

২ মুসনাদে আহমাদ : ৪/১৭৫

হলে পবিত্রতা অর্জন করা সম্ভব হবে না। অতএব কোনো দরবেশকে যদি সুঁই-সুতো ছাড়া দেখে থাকো, তাহলে নামাযের ব্যাপারে তুমি তাকে অভিযুক্ত করতে পার।

সফর থেকে ফেরার সময় সুফিদের ওপর শয়তানের ধোঁকা

গ্রন্থকার বলেন, সুফিদের মতবাদ হচ্ছে, মুসাফির সফর থেকে ফিরে তার মহল্লা প্রবেশ করলে সেখানকার উপস্থিত লোকজনকে সে সালাম দেবে না; বরং প্রথমে অযুখানায় গিয়ে অযু করে দুই রাকাত নামায পড়ার পর তার শায়খকে সালাম করবে। এরপর লোকজনদেরকে সালাম দেবে।

এই শরিয়তবিরোধী বিদয়াতটি পরবর্তীকালের সুফিরা উদ্ভাবন করেছে। কেননা ফুকাহায়ে কেরামগণের মতে কেউ কোনো মানুষের জমায়েতে উপস্থিত হলে সে সবাইকে সালাম দেবে—চাই অযু থাক বা না থাক। অবস্থাদৃষ্টে মনে হয়, সুফিরা এই মতবাদ ছোট ছেলেদের থেকে গ্রহণ করেছে। কেননা ছোট ছেলেদেরকে যদি বলা হয়, তুমি সালাম দাওনি কেন? সে জবাবে বলে, আমি এখনও মুখ ধুইনি। সম্ভবত এদের থেকেই বিদয়াতিরা এ অভ্যাসটি আয়ত্ত করেছে। হজরত আবু হোরায়রা রা. বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন :

يُسَلِّمُ الصَّغِيرُ عَلَى الكَبِيرِ، وَالمَارُّ عَلَى القَاعِدِ، وَالقَلِيلُ عَلَى الكَثِيرِ

'ছোটদের উচিত বড়দের সালাম দেয়া, চলন্ত অবস্থার লোকেরা বসা লোকদের সালাম দেবে এবং কমসংখ্যক লোক অধিক লোককে সালাম দেবে।'[১]

এই হাদিস বুখারি ও মুসলিমে রয়েছে। সুফিদের আরেকটি অভ্যাস হচ্ছে, সফর থেকে ফিরে তারা শরীর মালিশ করাতে চায়। আবু যুরআ' তাহের ইবনে মুহাম্মাদ আমাকে বলেছেন, তাঁর পিতা স্বীয় গ্রন্থে সফর থেকে ফিরে কীভাবে শরীর মালিশ করবে—সে ব্যাপারে একটি অধ্যায় নির্মাণ করেছেন। তিনি হজরত ওমর রা. এর কথা থেকে এটাকে প্রমাণিত করেছেন।

'হজরত ওমর রা. বলেন, আমি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর খেদমতে উপস্থিত হয়ে দেখি, তাঁর হাবশি ক্রীতদাস তাঁর পিঠ মোবারক

---

১ সহিহ বুখারি : হাদিস নং ৬২৩১

মালিশ করছে। আমি আরয করলাম ইয়া রাসুলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! এ অবস্থা কেন? তিনি বললেন, উটনী আমাকে ফেলে দিয়েছে।'[২]

গ্রন্থকার আল্লামা ইবনুল জাওযি রহ. বলেন, ভায়েরা! উক্ত হাদিস থেকে উপরোক্ত ব্যক্তির কথিত বিষয়ে প্রমাণ সাব্যস্তকরণের ব্যাপারে চিন্তা করুন। এই লোকের উচিত ছিল, যে ব্যক্তি উট থেকে পড়ে গিয়ে আঘাতপ্রাপ্ত হয়, কীভাবে তার শরীর মালিশ করা চাই—সে বিষয়ক অধ্যায় নির্মাণ করা। আর সুন্নত কি পিঠ মালিশ করা নাকি পা মালিশ করা? সে কোথায় পেল যে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন সফর থেকে এসেছেন এবং প্রথম রাতে মালিশ করা হয়েছে? এছাড়া হাদিসের আলোকে কখনো ব্যথা অনুভূত হলে পিঠ মালিশ করার নিয়মের ব্যাপারে তিনি তাঁর গ্রন্থের অধ্যায় নির্মাণ করতে পারতেন। এমন বিষয়ের অবতারণা করে তাদের 'ইসতিদরাজ' থেকে দূরত্ব অবলম্বন করা উচিত। সুফিদের আরও একটি কুসংস্কার হচ্ছে, তারা সফর থেকে এলে চতুর্দিকে এ খবর ছড়িয়ে দেয়া হয়।

ইবনে তাহের একটি অধ্যায় নির্মাণ করেছেন। যেখানে তিনি উল্লেখ করেন, সুফিরা সফর থেকে এলে আনন্দ-ফুর্তি করবে। এ ব্যাপারে তিনি হজরত আয়েশা রা. এর হাদিসকে প্রমাণ হিসেবে সাব্যস্ত করেন।

'হজরত আয়েশা রা. বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একবার সফরে বের হলে কুরাইশের এক মেয়ে মানত করল যে, আল্লাহ তায়ালা যদি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে সহি সালামতে ফিরিয়ে আনেন, তাহলে আমি হজরত আয়েশা রা.-এর ঘরে দফ বাজাব। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাশরিফ আনলে তিনি বললেন, এসো। দফ বাজিয়ে নাও।'[৩]

গ্রন্থকার বলেন, দফ বাজানোর বৈধতার ব্যাপারে পূর্বে আলোচনা করেছি। যেহেতু এই মেয়ে দফ বাজানোর মানত করে ফেলেছে, তাই রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমার মানত পূরণ করে নাও। মুসাফির ঘরে এলে তার আগমন উপলক্ষে নাচ-গানের আয়োজন করার প্রমাণ এ হাদিস দ্বারা কী করে নেয়া যেতে পারে?

---

২ [যঈফ] হাইসামী 'মাজমাউয্যাওয়াইদ' গ্রন্থে হাদিসটি উল্লেখ করেছেন।

৩ [হাসান] আস্সিলসিলাতুস্ সাহীহাহ্ : হাদিস নং ১৬০৯

সুফিদের কেউ মারা গেলে তখনকার শয়তানের ধোঁকার নমুনা

সুফিদের কেউ মারা গেলে তখন শয়তান দু'ভাবে ধোঁকা দিয়ে থাকে। যথা–

প্রথম ধোঁকা : তারা বলে বেড়ায়, মৃত কোনো ব্যক্তির ওপর আমাদের কান্না করা উচিত নয়। কোনো সুফি-দরবেশ যদি তার নিকটাত্মীয়ের মৃত্যুতে কান্না করে তাহলে সে মারেফতের রাস্তা থেকে ছিটকে পড়বে। ইবনে আকিল বলেন, এ দাবি শরিয়তের ব্যাপারে অত্যুক্তি। এটা বিবেকহীনতার পরিচায়ক। মানবপ্রকৃতি এর অনুকূলে নয় এবং তা মানবিক শিষ্টাচারবহির্ভূত প্রথা। সুতরাং এ সব লোকের চিকিৎসা এমন ঔষধ দিয়ে করা উচিত যা দ্বারা তাদের অভ্যাস পরিবর্তন করা যায়।

স্বয়ং আল্লাহ তায়ালা তাঁর প্রিয় নবী হজরত ইয়াকুব আলাইহিস সালাম এর সম্পর্কে বলেছেন,

وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ

'পেরেশানি ও শোকে তাঁ দু'টি চোখ সাদা হয়ে গেছে।'[১]

আরও বলতেন–

يَا أَسَفَى عَلَى يُوسُفَ

'হায় আফসোস! ইউসুফ চলে গেছে!'[২]

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর ছেলের মৃত্যুতে ক্রন্দন করেছিলেন এবং বলেছিলেন–

إِنَّ الْعَيْنَ تَدْمَعُ

'নিশ্চয় চক্ষু অশ্রু প্রবাহিত করে।'[৩]

হজরত ফাতেমা রা. রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ইন্তেকালের সময় বলেছিলেন—وأكرب أبتاه 'উহ্! আমার পিতার উপর কত কষ্ট!'।[৪] তখন এটাকে কেউ মন্দ বলেননি। হজরত ওমর রা. মুতাম্মিমকে তার ভাইয়ের মৃত্যুতে ক্রন্দনরত দেখেছিলেন। সে সময় তার কিছু কবিতা–

وكنا كندماني جزيمة حقبة * من الدهر حتى قيل لن يتصدعا

---

১ সুরা ইউসুফ : আয়াত ৮৪

২ সুরা ইউসুফ : আয়াত ৮৪

৩ সহিহ বুখারি : হাদিস নং ১৩০৩, সহিহ মুসলিম : ২৩১৫

৪ সহিহ বুখারি : হাদিস নং ৪৪৬২

'আমরা দুই ভাই দীর্ঘ সময় পর্যন্ত বাদশা জুযাইমার দুই উজিরের মতো ছিলাম। লোকেরা আমাদেরকে দেখে বলত, এরা কখনো পৃথক হবে না।' হজরত ওমর রা. বলেছিলেন, 'ইস্! যদি আমি কবি হতাম তাহলে আমার ভাই যায়দের জন্য এভাবে মরসিয়া বলতাম!' মুতাম্মিম উত্তরে বললেন, 'আমার ভাই যদি আপনার ভাইয়ের ভাগ্য বরণ করে মারা যেত তাহলে আমি মরসিয়া করতাম না।' উল্লেখ্য, মুতাম্মিমের ভাই মালেক কুফরী অবস্থায় মারা যায়, অন্যদিকে হজরত যায়দ রা. শাহাদাতের সুধা পানে ধন্য হন।

হজরত ওমর রা. খুশি হয়ে বললেন, হে মুতাম্মিম! কেউ আমার ভাই সম্পর্কে এভাবে মর্যাদাপূর্ণ কথা বলেনি, যা তুমি বললে। এছাড়া আমরা চিন্তা করলে দেখতে পাই, উটের মতো কঠিনপ্রাণ ও পাষাণ জন্তুও তার থাকার ঘর ছাড়ার সময় এবং নিজেদের মানুষের বিদায় বেলায় কান্নাকাটি করে থাকে। সে তার বাচ্চাদের জন্য ছটফট করতে থাকে। পাখিরা তাদের কারও বিয়োগে কান্নার আধিক্যে চিৎকার-চ্যাঁচামেচি করতে থাকে। অর্থাৎ নিকটজনের মৃত্যুতে মানুষের কান্নাকাটি করা ও অশ্রু ঝরানো একটি স্বাভাবিক ও মানবিক প্রকৃতি। যাকে খুশির সংবাদ আলোড়িত করে না এবং দুঃখের সংবাদ বিচলিত করে না, সে তো প্রাণহীন উদ্ভিদের মতো। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মানবিক প্রকৃতি থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়াকে নিন্দাযোগ্য বলে আখ্যায়িত করে বলেছেন, 'যে ব্যক্তি বলবে, আমি কখনো আমার দশ সন্তানের কারও গালে চুমু খাইনি, তার সম্পর্কে আমি বলব, তার অন্তর থেকে তো আল্লাহ তায়ালা দয়া-মায়া উঠিয়ে নিয়েছেন।'[৫] রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কা ছেড়ে যাওয়ার প্রাক্কালে মক্কার দিকে বারবার ফিরে তাকিয়েছিলেন। সুতরাং যে ব্যক্তি এমন কথার সমর্থন করবে, যা শরিয়ত ও মানবিক প্রকৃতির বিপরীত, তাকে জাহেল তথা অজ্ঞ বলে আখ্যায়িত করাই সমীচীন। শরিয়ত কেবল আমাদের থেকে এতটুকু কামনা করেছে, যাতে আমরা মুখ ও শরীর ক্ষত-বিক্ষত করে না ফেলি, জামা-কাপড় ছিঁড়ে না ফেলি। কিন্তু অশ্রু প্রবাহিত করা এবং পেরেশান ও দুঃখ প্রকাশ করা দোষের কিছু নয়।

দ্বিতীয় ধোঁকা : সুফি-দরবেশরা তাদের কেউ মারা গেলে একটি আয়োজন করে থাকে, যাকে 'ওরশ' বলে। সেখানে উচ্চাঙ্গ সংগীত, কাউয়ালি ও জারিগান গাওয়া হয়। জুয়াসহ বিভিন্ন ধরনের খেলাধুলার আয়োজন করা

---

৫ সহিহ বুখারি : হাদিস নং ৫৯৯৮, সহিহ মুসলিম : হাদিস নং ২৩১৭

হয়। তারা বলে থাকে, আমরা এ জন্য খুশি ও আনন্দ উপভোগ করে থাকি যে, মৃত ব্যক্তি তাঁর প্রতিপালকের সান্নিধ্যে পৌঁছেছেন। শয়তান তিনভাবে এদেরকে বিভ্রান্ত করেছে–

১. সুন্নত হচ্ছে, কেউ মারা গেলে মৃতবাড়িতে খাবার পৌঁছে দেয়া। কেননা শোকের কারণে তারা খাবার তৈরি করতে অপারগ থাকে। কিন্তু মৃতবাড়ির লোকজনই খাবার পাকিয়ে অন্যদের খাওয়ানো ও অন্যত্র পরিবেশন করা— এটা কোন্ ধরনের সুন্নত? মৃতবাড়িতে খাবার পৌঁছানোর ব্যাপারে হাদিসের ভাষ্য হচ্ছে,

'সুফিয়ান ইবনে উয়াইনা বর্ণনা করেন, আমাকে জাফর ইবনে খালেদ বলেছেন, আমার পিতা আবদুল্লাহ ইবনে জাফর বলেন, জাফরের মৃত্যুর সংবাদ পেয়ে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, 'জাফরের পরিবারের জন্য খাবার রান্না করে পাঠাও। কেননা আজ তারা শোকের কারণে রান্না তৈরি করা থেকে অপারগ।'[১] ইমাম তিরমিযি রহ. বলেন, হাদিসটি 'হাসান সহিহ'।

২. সুফিরা বলে থাকে, আমরা মৃত ব্যক্তির জন্য এ কারণে আনন্দ উদ্‌যাপন করছি যে, সে মহান আল্লাহর দরবারে মিলিত হয়েছে। অথচ এটি খুশি হওয়ার মতো কোনো বিষয় নয়। কেননা আমরা নিশ্চিত করে বলতে পারব না যে, তাকে ক্ষমা করা হয়েছে না কি হয়নি! এদিকে যদি শাস্তিতে পতিত হন তার জন্য আনন্দ উদ্‌যাপন করার ব্যাপারে বিবেকেরও সাড়া পাওয়া যায় না। ওমর ইবনে যর—তার ছেলে মারা গেলে তিনি বলেন, আমি তোমার পরিণতির দুশ্চিন্তায় পেরেশান হতে বাধ্য হয়েছি। খারেজা ইবনে ইয়াযিদ আনসারি উম্মে আলা থেকে বর্ণনা করেন, উসমান ইবনে মাযঊন ইন্তেকাল করলে আমাদের কাছে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাশরিফ আনেন। আমি সে সময় উসমানের ব্যাপারে এটুকু বলেছি যে, হে আবুস্‌সাইব! তোমার ওপর আল্লাহর রহমত হোক। আমি কেবল এতটুকু সাক্ষী দিচ্ছি যে, আল্লাহ তায়ালা তোমাকে সম্মানিত করেছেন। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ কথা শুনে বললেন, 'তুমি কি জানো যে, আল্লাহ তায়ালা তাকে সম্মানিত করেছেন?'[২]

৩. সুফিরা সেই ওরশ অনুষ্ঠানে নাচ-গান করতে থাকে। এমন কার্যকলাপে সুস্থ ও স্বাভাবিক প্রকৃতি সীমার বাইরে চলে যায়। কেননা মানবপ্রকৃতিতে

---

১ [হাসান] সহিহুল জামে' : হাদিস নং ১০১৫

২ সহিহ বুখারি : হাদিস নং ১২৪৩

বিয়োগ ব্যাথার আলামত দৃশ্যমান হওয়ার কথা। তাও যদি মৃত ব্যক্তিকে আল্লাহ তায়ালা ক্ষমা করে শান্তি দান করেন, তখন। এই নাচ-গান কখনো শুকরিয়া বা কৃতজ্ঞতা প্রকাশের মাধ্যম হিসেবে গণ্য হতে পারে না। তাহলে দুঃখ পেরেশানির আলামত কোথায় যাবে?

জ্ঞানান্বেষণ পরিহারে সুফিদের ওপর শয়তানের ধোঁকা

গ্রন্থকার বলেন, জেনে রাখা উচিত—মানুষের জন্য শয়তানের প্রথম ফাঁদ হচ্ছে তাকে ইলম তথা জ্ঞানার্জন থেকে দূরে সরিয়ে রাখা। কেননা জ্ঞান আলোসদৃশ। শয়তান তার বাতি নেভাতে পারলে অন্ধকারে যেভাবে ইচ্ছে সেভাবেই ধোঁকা দিয়ে পথভ্রষ্ট করতে পারবে। সুফিদের ওপর শয়তান এ ব্যাপারে আরও উদ্যমের সাথে এগোতে থাকে। প্রথমে তাদের বড় একটি দলকে সামগ্রিকভাবে ইলম থেকে দূরে সরিয়ে রাখে এবং তাদেরকে বোঝাতে থাকে যে, ইলম অর্জন করতে গিয়ে বহু ত্যাগ-তিতিক্ষা সহ্য করতে হয়। শয়তান তাদেরকে আরাম ভোগ্য সামগ্রীকে উত্তম হিসেবে দেখাতে থাকে। ফলে তারা ধুতি পরে ছেঁড়া বিছানায় পড়ে থাকে।

ইমাম শাফেয়ি রহ. বলেন, অলসতার ওপর তাসাওউফের ভিত্তি। তাঁর অভিমতের ব্যাখ্যা হচ্ছে, নফসের উদ্দেশ্য হয়তো সাধনা অথবা দুনিয়া অর্জন করা। সাধনা বা সম্পদ সঞ্চয় করা ইলম অর্জনের কারণে দেরিতে অর্জিত হয়। এতে শরীর কষ্ট-ক্লেশে পতিত হয়, চাই এতে উদ্দেশ্য সাধিত হোক বা না হোক। সুফিরা সাধনাকে দ্রুত অর্জন করতে চায়। কেননা তারা দুনিয়াবিরাগীর প্রতি দৃষ্টি দিয়ে থাকে।

কতেক শ্রেণির সুফি আছেন যারা আলেমবিদ্বেষী। তারা মনে করেন ইলম তথা জ্ঞানার্জনে সময় দেয়া অহেতুক ও অনর্থক। তাদের দাবি—আমাদের ইলম কোনো মাধ্যম ছাড়া সরাসরি অর্জন করা যায়। এরা জ্ঞানান্বেষণকে অসার ও অনর্থক ভেবে নেয়ার কারণে সংক্ষিপ্ত পোশাক, লেংটি আর লোটা নিয়ে বৈরাগী সেজে থাকেন।

দ্বিতীয় শ্রেণির কিছু সুফি আছেন, যারা সামান্য কিছু ইলমের ওপর তুষ্ট থেকে যান। জ্ঞানের বৃহৎ পরিসর থেকে তাঁরা বঞ্চিত হন। হাদিসের শব্দে তুষ্ট হয়ে দ্বিধায় পড়ে যান। তারা মনে করেন, হাদিসের সনদ অন্বেষণ করা এবং হাদিস শেখা ও শেখানোর ক্লাশ কায়েম করা সবই দুনিয়াবি কাজ। এতে নফস তৃপ্তি পায়।

ফাতাওয়া, কাযা ও ইমারত সবই শঙ্কার বিষয়। কিন্তু এতে ফযিলতও অনেক। কাঁটা তো সর্বদা গোলাপের সাথেই থাকে। মানুষের উচিত—উভয় জাহানের উপকারী বিষয় অন্বেষণ করা। এর ভেতর যা কিছু বালা-মসিবত আছে, তা থেকে বিরত থাকার আপ্রাণ চেষ্টা করা। চেষ্টা-সাধনার শক্তি ও গুণ সব মানুষের মধ্যেই আছে। তাদের সেসব ক্ষমতা দেয়া হয়েছে। যেমন বিয়ের প্রতি অনুরাগ ও টান প্রকৃতিগতভাবে সবাইকে দেয়া হয়েছে। এতে সন্তান হবে। এভাবেই ইলমের মাধ্যমে দুনিয়ার নেজামকে সাজানো হয়েছে। ইয়াযিদ ইবনে হারুন বলতেন, আমি সর্বদা গাইরুল্লাহর জন্য জ্ঞান অন্বেষণ করেছি। কিন্তু সকল প্রকার জ্ঞান আল্লাহর জন্যই রয়ে গেছে। এর ব্যাখ্যা হচ্ছে, ইলমের মাধ্যমে আমি ইখলাসের হেদায়াত পেয়েছি। যে ব্যক্তি এটা কামনা করে যে, নফসের দ্বারা সে তার প্রকৃতিকে বিলীন করে দেবে, তা কখনো সম্ভব নয়।

তৃতীয়ত শয়তান সুফিদের একটি দলকে এমন দ্বিধায় ফেলে দিয়েছে যে, তাদের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে আমল। এ সব লোক এ কথা বুঝতে পারছে না যে, ইলমে লিপ্ত হওয়া সম্পূর্ণই আমলের অন্তর্ভুক্ত। আলেম যদি আমলের বেলায় অবহেলাও করে, তারপরও সে সঠিক পথ হতে বিচ্যুত হবে না। আর ইলমবিহীন আবেদ নির্ঘাত ভুল পথে পড়ে যেতে পারেন।

চতুর্থত ইবলিস এই গোষ্ঠীর মনে এ কথা ভালো ভাবেই ঢেলে দেয়েছে যে, ইলম বলা হয় যা বাতেন তথা গোপন বিষয় দ্বারা অর্জিত হয়। ফলে এদের কেউ কেউ حدثني قلبي عن ربي 'আমাকে আমার মন বলেছে আমার রব ইরশাদ করেছেন'—এমন ধারণা লালন করতেও দ্বিধা করছে না। শিবলী এই কবিতা আবৃত্তি করতেন :

اذا طالبوني بعلم الورق * برزت عليهم بعلم الخرق

'মানুষ যখন আমাকে কিতাবি ইলমের ব্যাপারে কিছু জিজ্ঞেস করে, তখন আমি তাকে ডুবে যাওয়া ও কারামাতের ইলম শেখাই।'

এরা শরয়ি ইলমকে যাহেরি ইলম বলে থাকে, নফসের আপৎসঙ্কুল বিষয়াদিকে বাতেনি ইলম আখ্যা দিয়ে থাকে। প্রমাণস্বরূপ এরা বলে, হজরত হাসান ইবনে আলী রা. হজরত আলী রা. থেকে বর্ণনা করেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন,

علم الباطن سر من سر الله عز وجل وحكم من أحكام الله تعالى يقذفه الله عز وجل في قلوب من يشاء من أوليائه

'বাতেন আল্লাহর গোপন ভেদসমূহের মধ্য হতে একটি রহস্য। আর আল্লাহর বিধানাবলি হতে একটি বিধান। আল্লাহ তায়ালা সেই রহস্য তাঁর ওলিদের মধ্য থেকে যাকে চান তার কাছে উন্মোচিত করে থাকেন।'[১]

গ্রন্থকার বলেন, এ হাদিসটি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণিত হওয়ার কোনো নির্ভরযোগ্য উৎস বা প্রমাণ নেই। এর সনদে অবিশ্বস্ত ও অজ্ঞাত লোক রয়েছে।

আবু মুসা বলেন, একজন ফকিহ আবু ইয়াযিদের প্রতিবেশী ছিলেন। তিনি আবু ইয়াযিদের কাছে গেলে আবু ইয়াযিদ তাকে অনেক আশ্চর্যজনক ঘটনা শোনালেন। তিনি জানতে চাইলেন, এত আশ্চর্য বিষয় তুমি কী করে জানলে? প্রত্যুত্তরে আবু ইয়াযিদ বললেন, তুমি এখনও শোনোনি এমন আরও অনেক আশ্চর্য ঘটনা আমি জানি। আলেম বললেন, হে আবু ইয়াযিদ! এই জ্ঞান আপনি কী করে অর্জন করলেন? তিনি উত্তরে বললেন, আমার ইলম আল্লাহ কর্তৃক প্রদত্ত। তুমি কি শোনোনি, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

'যে ব্যক্তি জানা ইলমের ওপর আমল করবে, আল্লাহ তাকে এমন ইলম দান করবেন, যা সে জানত না।'[২] অন্যত্র রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

العلم علمان علم ظاهر وهو حجة الله تعالى على خلقه وعلم باطن وهو العلم النافع

'ইলম দুই প্রকার। ১. প্রকাশ্য ইলম—যা মাখলুকের জন্য আল্লাহ তায়ালার দলিল। ২. গোপন ইলম—এটি উপকারী ইলম।'[৩]

হে বুযুর্গ! তোমাদের ইলম তো জবানের সাহায্যে শিক্ষাপ্রাপ্ত। পক্ষান্তরে আমার ইলম আল্লাহর পক্ষ থেকে ইলহামের মাধ্যমে প্রাপ্ত। আলেম বললেন, আমার ইলম তো বিশ্বস্ত সূত্র-পরম্পরায় রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু

---

১ [মাউযূ] যঈফুল জামে' : হাদিস নং ৩৭২৪
২ [মাউযূ] আস্‌সিলসিলাতুয্ যাঈফাহ : হাদিস নং ৪২২
৩ [যঈফ] যঈফুল জামে' : হাদিস নং ৩৮৭৮

আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে প্রাপ্ত। তিনি জিবরাঈল আলাইহিস সালাম থেকে, আর জিবরাঈল আল্লাহ হতে প্রাপ্ত। আবু ইয়াযিদ বললেন, হে বুযুর্গ! রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে আল্লাহ তায়ালা আরও একটি ইলম শিক্ষা দিয়েছেন, যা জিবরাঈল আলাইহিস সালাম জানেন না, মিকাঈল আলাইহিস সালামও জানেন না। আলেম বললেন, ঠিক আছে। কিন্তু আমি চাই, আপনি সঠিকভাবে আল্লাহ হতে প্রাপ্তির বিষয়টুকু আমার কাছে স্পষ্ট করুন। আবু ইয়াযিদ বললেন, হ্যাঁ, তোমাকে আমি ওই পরিমাণ বয়ান করতে পারি, যে পরিমাণ মারেফাত তুমি রপ্ত করতে পেরেছ। আচ্ছা, তুমি কি জানো যে, আল্লাহ তায়ালা মুসা আলাইহিস সালাম এর সাথে শুধু কথা বলেছেন, কিন্তু রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে সরাসরি সামনাসামনি কথা বলেছেন। কোনো ধরনের পর্দা ছাড়াই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহকে দেখেছেন। আর নবীরা ওহি দ্বারা বিধান আরোপ করে থাকেন।

আলেম উত্তরে বললেন, সঠিক বলেছেন। এরপর আবু ইয়াযিদ বললেন, তুমি কি জানো যে, সিদ্দিকীন ও ওলিদের কথা আল্লাহর ইলহামের মাধ্যমে হয়ে থাকে। আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে প্রজ্ঞাপূর্ণ জবান দান করেন। উম্মতকে তাদের দ্বারা উপকৃত করে থাকেন। মুসা আলাইহিস সালাম এর মায়ের মনে, খিযির আলাইহিস সালাম এর নৌকা ভেঙ্গে ফেলা, দেয়াল উপড়ে দেয়া এ সবই ইলহামের মাধ্যমে হয়েছে। অনুরূপভাবে ওমর রা. এর 'হে সারিয়া! পাহাড়ের দিকে তাকাও!'—এ সবই ইলহামের অন্তর্ভুক্ত।

ইবরাহিম বলেন, আমি আবু ইয়াযিদের মজলিসে উপস্থিত ছিলাম। লোকজন বলাবলি করছিল, অমুক অমুক থেকে হাদিস শুনেছে, অমুক এটা-ওটা বর্ণনা করেছে ইত্যাদি। আবু ইয়াযিদ এ সব শুনে বললেন, হে দোস্তরা! তোমরা মৃত মানুষের কাছ থেকে মৃতদের জন্য ইলম নিয়ে এসেছ। আর আমি এনেছি মহাচিরঞ্জীব আল্লাহর কাছ থেকে।

গ্রন্থকার বলেন, প্রথম ঘটনায় আবু ইয়াযিদ ফিকাহ সম্পর্কে যে মন্তব্য করেছেন, তা ছিল তার স্বল্পজ্ঞানের পরিচায়ক। কেননা তিনি যদি আলেম হতেন, তাহলে অবশ্যই জানতেন—কোনো বিষয়ের ইলহাম হওয়া কখনোই ইলম-পরিপন্থী হতে পারে না। ইলমকে ডিঙিয়ে ইলহামের কাছে যাওয়া যায় না। যেমন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন,

'নিশ্চয় বিভিন্ন নবীর উম্মতে মুহাদ্দিসিন ছিলেন। আর আমার মুহাদ্দিস হচ্ছে ওমর।'[১]

মুহাদ্দিস দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে, ভালো বিষয়ের ইলহাম হওয়া। কিন্তু ইলহামওয়ালার কাছে যদি ইলমের বিপরীত কোনো ইলহাম আসে, তাহলে তার ওপর আমল করা জায়েয নেই। হজরত খিযির আলাইহিস সালাম সম্পর্কে বলা হয়, তিনি নবী ছিলেন। এ কথাকে অস্বীকার করার উপায় নেই যে, নবীদেরকে ওহির মাধ্যমে বিভিন্ন পরীক্ষার মুখোমুখি করা হয়। এটা ইলম ও তাকওয়ার ফলাফল। তাকওয়াবান ব্যক্তিকে ভালো কাজের তাওফিক দেয়া হয় এবং 'রুশদ্' এর ইলহাম করা হয়। সুফিরা যে দাবি করে আসছে, আলেমরা মৃতের কাছ থেকে মৃতের ইলম অন্বেষণ করেছে। এমন দাবিদারের জানা নেই—কত বড় দাম্ভিকতাপূর্ণ কথা বলে ফেলেছে। এটা সরাসরি শরিয়তের ওপর আঘাত করার নামান্তর।

শরিয়ত ও হাকিকতের ব্যাপারে সুফিদের মতবাদ

অনেক সুফি শরিয়ত ও হাকিকতের মধ্যে পার্থক্য সৃষ্টি করে বেড়ায়। অথচ এমন কথা কেবল এদের অসার দাবি। কেননা শরিয়তের সবকিছুই হাকিকত। এ কথা দ্বারা তারা যদি কোনো ধরনের বিশেষত্ব বা ছাড়ের আশ্রয় নেয়, তাহলে তাও শরিয়তের আওতাভুক্ত হতে হবে।

গ্রন্থকার বলেন, ইমাম আবু হামেদ গাযালি রহ. তাঁর এহইয়াউল উলূম গ্রন্থে লিখেছেন, যে ব্যক্তি এমন বলবে যে, হাকিকত শরিয়তের বিপরীত অথবা বাতেন জাহেরের বিপরীত, তাহলে সে ঈমান থেকে দূরে সরে কুফরের নিকটবর্তী হয়ে যাবে।

ইবনে আকিল বলেন, সুফিরা শরিয়তকে হাকিকতের একটি শাখা মনে করে থাকে। তিনি বলেন, এটা খুবই গর্হিত কথা। কেননা আল্লাহ তায়ালা শরিয়তকে সৃষ্টির উপকার এবং ইবাদাতের জন্য সৃষ্টি করেছেন। এখন যদি কেউ হাকিকত দ্বারা মনে করে যে, শরিয়ত কিছু নয়, তাহলে এটা নির্ঘাত শয়তানের ধোঁকা বলে মানতে হবে। যে ব্যক্তি শরিয়ত ছেড়ে হাকিকতের পেছনে পড়ে, শয়তান তাকে নিয়ে খেলা করে এবং ধোঁকা দেয়।

---

১ সহিহ বুখারি : হাদিস নং ৩৬৮৯, সহিহ মুসলিম : হাদিস নং ২৩৯৮

জ্ঞানগ্রন্থ দাফন ও সাগরে নিক্ষেপ বিষয়ে সুফিদের ওপর শয়তানের কুমন্ত্রণা

গ্রন্থকার বলেন, সুফিদের একটি দল এমন আছেন, যারা নির্দিষ্ট একটি সময় পর্যন্ত কিতাবি ইলমে মগ্ন ছিলেন। পরে শয়তান তাদের মনের অলিন্দে প্ররোচনার ডানা মেলতে থাকে যে, এসব পড়া দ্বারা কিছু হবে না, আসল বিষয় হচ্ছে আমল। সুতরাং তারা কিতাবসমূহ দাফন করে দেন। ইবরাহিম ইবনে ইউসুফ আমাকে বলেছেন, আহমাদ ইবনুল হাওয়ারি তার কিতাবসমূহ সাগরে ভাসিয়ে দেন এবং বলেন, কিতাব হচ্ছে উন্নত প্রমাণপঞ্জি। কিন্তু উদ্দেশ্য সাধনের পর দলিল-প্রমাণের পেছনে পড়ে থাকা অনুচিত।

আহমাদ ইবনুল হাওয়ারি ত্রিশ বছর যাবৎ ইলম অর্জন করেছেন। ইলমের শীর্ষচূড়ায় পৌঁছলে কিতাবগুলো নিয়ে সাগরে নিক্ষেপ করেন এবং বলেন, হে ইলম! তোমার সাথে এমন ব্যবহার তোমাকে লাঞ্ছিত ও অযোগ্য মনে করে করিনি; বরং আমি তোমাকে এ জন্য অর্জন করেছি, যাতে তোমার দ্বারা আমি আমার প্রতিপালককে চিনতে পারি। আমি সে রাস্তা পেয়ে গেলে তোমার প্রয়োজন ফুরিয়ে যায়।

আবুল হোসাইন ইবনুল খিলাল সম্পর্কে আমার কাছে সংবাদ এসেছে যে, তিনি তার সমুদয় শ্রবণকৃত হাদিস দজলা নদীতে ফেলে দেন। তাঁর প্রথম শ্রবণ অর্জিত হয়েছিল আবুল আব্বাস আসাম্ম থেকে। তার কাছ থেকে তিনি বহু হাদিস লিপিবদ্ধ করেন। আবু তাহের জানাবুযী বলেন, মুসা ইবনে হারুন আমাকে হাদিস পড়ে শোনাতেন। একেক অধ্যায় শোনানো শেষ হলে তিনি তা দজলা নদীতে নিক্ষেপ করতেন এবং বলতেন, আমি এর হক আদায় করেছি।

আবু নাসার তুসি বলেন, বুযুর্গদের কাছ থেকে আমি শুনেছি, আবু আবদুল্লাহ মুকার্‌রা তাঁর পিতা থেকে উত্তরাধিকার সম্পত্তিস্বরূপ জমি ও ধন-সম্পদ ছাড়াও পঞ্চাশ হাজার দিনারের মালিক হন। তিনি তা পেয়ে ফকিরদের মাঝে বণ্টন করে দেন। বর্ণনাকারী বলেন, আমি আবু আবদুল্লাহর কাছে এ ব্যাপারে জানতে চাইলে তিনি বলেন, একসময় যখন আমি যুবক ছিলাম, তখন আমি এহরাম বেঁধে একাকী মক্কা অভিমুখে বেরিয়েছিলাম। তখন আমার কাছে এমন কিছু ছিল না, যার জন্য আমার ফেরত আসার দরকার পড়ত। আমার চেষ্টা ছিল, কিতাব দ্বারা আমি আমার প্রয়োজন পূরণ করে

নেব। যে সকল ইলম ও হাদিস আমি সঞ্চয় করেছিলাম, তা আমার জন্য আরও কঠিনতর হয়ে যেতে থাকে যে, কী করে মক্কায় যাব এবং সফর করব? এ জন্য আমি এ সব থেকে মুক্তি চেয়েছি।

গ্রন্থকার আল্লামা ইবনুল জাওযি রহ. বলেন, পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, ইলম হচ্ছে আলোস্বরূপ। পক্ষান্তরে শয়তান মানুষের মনে প্ররোচনা দিতে থাকে যে, এ আলো নিভিয়ে দেয়া উত্তম। এতে করে শয়তান অন্ধকারে মানুষের মনে অনায়াসে বাসা বাঁধতে সক্ষম হয়। কেননা অজ্ঞতার চেয়ে গহিন অন্ধকার আর কিছুই নেই। শয়তান যখন এ ব্যাপারে শঙ্কায় পতিত হলো যে, এসব লোক ফের কখনো কিতাব অধ্যয়নে পড়ে যায় কি না! তাই সে মানুষের মনে কিতাবসমূহ দাফন করা ও ধ্বংস করতে প্ররোচনা জাগাতে থাকে। অথচ এমন কাণ্ড খুবই গর্হিত ও নিন্দনীয়।

এ সব কথার ব্যাখ্যা হচ্ছে, ইলমের উৎস হলো কুরআন ও সুন্নাহ। শরিয়ত প্রণেতা এর সংরক্ষণের জন্য তা লিপিবদ্ধ করে রাখতে নির্দেশ দেন। কুরআনের ব্যাপারে বলা হয়েছে—রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ওপর কোনো আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার সাথে সাথে তিনি ওহি-লেখকদের ডেকে তা লিখিয়ে নিতেন। সাহাবারা আয়াতগুলো কাঠি ও পাথরের সাহায্যে লিপিবদ্ধ করতেন। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পর হজরত আবু বকর সিদ্দীক রা. কুরআন শরিফকে মাসহাফ আকারে একত্র করেন। এরপর হজরত ওসমান রা. এটা নকল করে লেখ্য আকারে সাজান। এ সবকিছু এ জন্য করা হয়, যাতে তা নির্ভুলভাবে সংরক্ষিত থাকে। এখান থেকে যাতে কোনো অংশই বাদ পড়ে না যায়।

এরপর আসে সুন্নাতের কথা। তো, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইসলামের প্রারম্ভলগ্নে শুধু কুরআন শরিফই সংরক্ষণের নির্দেশ দেন এবং বলেন,

لا تَكْتُبُوا عَنِّي شيئاً سوى القرآن

'কুরআন ছাড়া আর কিছু আমার কাছ থেকে শুনে লিখবে না।'[১]

---

১ সহিহ মুসলিম : হাদিস নং ৩০০৪

এরপর হাদিসের সংখ্যা বাড়তে থাকলে এবং তিনি যখন দেখেন মুখস্থ রাখা কষ্টকর হয়ে পড়বে, তখন তিনি হাদিস লিখে রাখার নির্দেশ দেন। হজরত আবু হোরায়রা রা. হতে বর্ণিত, 'জনৈক ব্যক্তি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে এসে তার স্মরণশক্তি স্বল্পতার কথা জানালে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

اسْتَعِنْ بِيَمِينِكَ عَلَى حِفْظِكَ

'নিজের স্মরণশক্তির ওপর হাত দ্বারা সাহায্য নাও।'[১]

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «قَيِّدُوا الْعِلْمَ» قُلْتُ: وَمَا تَقْيِيدُهُ؟ قَالَ: «كِتَابَتُهُ»

হজরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর রা. হতে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, ইলমকে বন্দি করে নাও। আমি আরজ করলাম, ইয়া রাসুলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! কীভাবে বন্দি করে নেব? তিনি বললেন, লিখে নাও।'[২]

লেখক বলেন, জেনে রাখা উচিত—সাহাবায়ে কেরাম রা. রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বাণীর শব্দ, বাক্য ও যাবতীয় কর্মকাণ্ড সংরক্ষণ করেছেন। বর্ণনা পরম্পরায় শরয়ি বিধি-বিধান কায়েম হয়েছে। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, 'তোমরা আমার কাছে যা শোনো তা অন্যকে পৌঁছাও।'[৩]

হাদিস শুনে তা অক্ষরে অক্ষরে বর্ণনা করা লেখনপদ্ধতি ব্যতীত সম্ভব নয়। কেননা মুখস্থ ও স্মরণকৃত বিষয়ের ওপর ভরসা নেই। আহমদ ইবনে হাম্বল রহ. সম্পর্কে বলা হয়ে থাকে, তিনি হাদিস বয়ান করার সময় লোকজন তাঁকে বলত, আপনি আপনার জবান থেকে আমাদের শোনান। তিনি বলতেন, না, আমি কিতাব দেখা বিনে বয়ান করব না। আলী ইবনুল মাদিনী বলেন, আমাকে আমার গুরু আহমদ ইবনে হাম্বল রহ. নির্দেশ দিয়েছেন, কিতাবে দেখা ব্যতীত কোনো হাদিস বয়ান করবে না।

---

১ সহিহ বুখারি : হাদিস নং ১১৯
২ [সহিহ লিগাইরিহী] সহিহুল জামে' : হাদিস নং ৪৪৩৪
৩ সহিহ বুখারি : হাদিস নং ৩৪৬১

সুতরাং সাহাবারা যখন সুন্নাত রেওয়ায়াত করেছেন, তাদের থেকে তাবেয়িগণ ধারণ করেছেন। মুহাদ্দিসীনরা পৃথিবী বিভিন্ন প্রান্ত সফর করে হাদিসগুলো সযত্নে সংরক্ষণ করেছেন। বিশুদ্ধ ও অবিশুদ্ধ হাদিসে গবেষণা করে সিদ্ধান্ত দিয়েছেন। সুনানগুলো সাজিয়েছেন এবং গ্রন্থবদ্ধ করেছেন। এরপর যারা এগুলো ধুয়ে ফেলছেন, তারা মনগড়া কর্ম সাধন করেছেন। এ ব্যাপারে তারা আল্লাহর নির্দেশের তোয়াক্কা করেননি। শরিয়তের পরোয়া করেননি। মুহাদ্দিসীনরা কত কষ্ট-ত্যাগ স্বীকার করে এ সব হাদিস সমবেত করেছেন। এর প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করা চরম ধৃষ্টতার পরিচায়ক বৈকি?

এ সকল কিতাব—যা তারা দাফন করেছে বা সাগর-নদীতে নিক্ষেপ করেছেন, এটা তিনটি অবস্থাকে অবশ্যম্ভাবী করে তোলে। হয়তো তা হক হবে বা বাতিল; অথবা হক-বাতিল উভয়টির সংমিশ্রণ। যদি এগুলো বাতিল কিছু থেকে থাকে, তাহলে তা দাফন করাতে নিন্দার কিছু নেই। যদি হক-বাতিল মিশ্রিত থাকে এবং এগুলোতে পার্থক্য নির্ণয় করা কঠিন হয়ে দাঁড়ায় তাহলে তা ধ্বংস করার একটি অজুহাত থাকতে পারে। কেননা বহু লোক নির্ভরযোগ্য ও মিথ্যাবাদী উভয় ধরনের লোকদের থেকে হাদিস লিপিবদ্ধ করেছেন। কিন্তু মূল বিষয়গুলো এতে একাকার হয়ে গেলে তারা কিতাবগুলো দাফন করে দেন। সুফিয়ান সাওরি রহ. এর সম্পর্কে যে সকল কিতাব দাফন করে ফেলার কথা বিবৃত হয়ে থাকে, এর কারণও তা-ই।

পক্ষান্তরে এ সব কিতাবে যদি হক এবং শরিয়তের বিষয়াদি থেকে থাকে, তাহলে তা ধ্বংস করা কিছুতেই বৈধ হতে পারে না। কেননা ইলম ও সম্পদ ধ্বংস করার অধিকার কারও নেই। যে এগুলো ধ্বংস করতে চায়, তাকে এর কারণ জিজ্ঞেস করা উচিত। সে যদি বলে—কিতাবগুলো আমাকে ইবাদতে বিঘ্ন ঘটায়। তাহলে বলতে হবে, এর প্রতিবিধান তিন প্রকার। ১. তোমার যদি জানার অবকাশ হতো, তাহলে তুমি নিশ্চিত জেনে নিতে যে, ইলমের লিপ্ততা ও ব্যস্ত থাকা ইবাদতের অন্তর্ভুক্ত। ২. জ্ঞানের যে অন্তর্নিহিত আলো তুমি গ্রহণ করেছ, তা চিরদিন অবশিষ্ট থাকবে না। জাগতিক বিভিন্ন ফিতনা ফাসাদে জড়িয়ে পড়ার সমূহ আশঙ্কার কথা উড়িয়ে দেয়া যায় না। ইউসুফ ইবনে আসবাত তার কিতাবসমূহ জ্বালিয়ে দিয়েছিল। কিন্তু সে হাদিস শোনানো বন্ধ রাখতে পারেনি। সুতরাং মুখস্থ হাদিস বর্ণনা করতে গিয়ে তিনি অনেক উল্টা-পাল্টা করে ফেলেন। ৩. আমরা মেনে নিচ্ছি যে, তোমার অন্তর আলোয় টইটম্বুর এবং তা চিরস্থায়ী, তোমার কিতাবের প্রয়োজনও নেই। কিন্তু তোমার কাছ থেকে জ্ঞান

অন্বেষণকারীরা তোমার স্তরে পৌঁছতে পারছে না। তুমি তাদেরকে কিতাবগুলো না দিয়ে কেন ধ্বংস করে দিলে? অথবা এমন কাউকে কেন ওয়াকফ্ করলে না যে তা দ্বারা উপকৃত হতে পারে? অতএব কিতাবাদি ধ্বংস করা কোনো অবস্থাতে সঠিক নয়।

মুরাব্বাযী ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল রহ. হতে বর্ণনা করেন, তাঁর কাছে ওই ব্যক্তি সম্পর্কে জানতে চাওয়া হয়, যে এমন অসিয়ত করে—আমার কিতাবগুলো দাফন করে দেবে। তদুত্তরে তিনি বলেন, আমি এটাকে সমর্থন করতে পারি না যে, ইলমকে দাফন করা হবে। মুরাব্বাযী বলেন, আহমদ ইবনে হাম্বল বলতেন, কিতাব ধ্বংস করার কোনো যুক্তিসংগত কারণ আমি দেখি না।

ইলমী মাসায়েলে ক্ষেত্রে সুফিদের ওপর শয়তানের চক্রান্ত

গ্রন্থকার বলেন, জেনে রাখা উচিত—সুফিদের একটি জামাত ইলম তথা জ্ঞানান্বেষণ ছেড়ে দিয়ে নিজের মনমতো সাধনায় নিমগ্ন হলেও মাসআলা-মাসায়েলের ক্ষেত্রে মতামত পেশ করতে পিছপা হন না। এ ক্ষেত্রে তাঁরা নিজেদের কর্মকাণ্ডের আলোকে নিন্দনীয় বিচ্যুতিতে পতিত হন। কখনো তাঁরা কুরআনের তাফসির ও ব্যাখ্যায় হাত দেন, আবার কখনো হাদিসের মধ্যে, এমনকি ফিকাহতেও তারা নিজেদের মনমতো ফতোয়া দিতে কার্পণ্য করেন না। মোটকথা—ইলমের সকল শাস্ত্রকেই তাঁরা তাসাওউফের সাথে মিলিয়ে মন্তব্য করে বসেন। আল্লাহ তায়ালা কোনো যুগ এমন রাখেননি, যখন তাদের ভ্রান্ত কথামালার উচিত জবাব দেয়া না হয়। বিশেষজ্ঞরা তাদের বিচ্যুতিগুলো সবার সামনে উন্মুক্ত করে দেন।

পবিত্র কুরআনের ব্যাপারে সুফিদের বিভিন্ন মন্তব্যের কিঞ্চিৎ আলোচনা

জাফর ইবনে মুহাম্মাদ খুলদী বলেন, আমি আমার শায়খ জুনাইদের দরবারে উপস্থিত হলাম। ইবনে কাইসান তাঁর কাছে নিম্নোক্ত আয়াতের উদ্দেশ্য জানতে চাইলেন :

سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَى

'আমি তোমাকে পড়িয়ে দেব অতঃপর তুমি ভুলবে না।'[১]

তিনি বললেন, এ আয়াতের ব্যাখ্যা হচ্ছে, এর ওপর আমল করতে তুমি ভুলবে না। জাফর বলেন, জনৈক ব্যক্তি জুনাইদের কাছে নিম্নোক্ত আয়াতের ব্যাখ্যা জানতে চাইলেন–

وَدَرَسُوا مَا فِيهِ

'তাতে যা লেখা ছিল, তারা তা পড়েছে।'[২]

জুনাইদ বললেন, এ আয়াতের উদ্দেশ্য হচ্ছে, তারা আমল করা ছেড়ে দিলে তিনি বললেন, আল্লাহ তোমাদের মুখের মোহর না ভাঙুক।

গ্রন্থকার বলেন, প্রথম আয়াতাংশে জুনাইদের নিজস্ব ব্যাখ্যা 'এর ওপর আমল করতে তুমি ভুলবে না'—কথাটি নিরর্থক। এটা স্পষ্ট ভ্রান্তি। কেননা لا تنسى কোনো সীগা নয়; বরং এটি হচ্ছে জুমলায়ে খবরিয়া। নাহী নয়। এটি فما تنس এর অর্থ বহন করে। এটি যদি নাহী হতো তাহলে জযম থাকত। মোটকথা—তার এই ব্যাখ্যা আলেমদের সর্বসম্মত ঐকমত্যের বিপরীত। অনুরূপভাবে ودرسوا ما فيه এটি درس থেকে উদ্গত, যা তেলাওয়াতের অর্থ বহন করে। যথা অন্যত্র ইরশাদ হয়েছে— ربما كنتم تدرسون । এখানে ওই দরস উদ্দেশ্য নয়, যা ধ্বংসের অর্থবোধক।

মুহাম্মাদ ইবনে জারির বলেন, আমি আবুল আব্বাস ইবনে আতা থেকে শুনেছি, তার কাছে জনৈক ব্যক্তি নিম্নের আয়াতের অর্থ জানতে চায়–

فَنَجَّيْنَاكَ مِنَ الْغَمِّ

'আপনাকে আমি চিন্তা থেকে মুক্তি দিয়েছি।'[৩]

আবুল আব্বাস বলেন, তোমার জাতির দুশ্চিন্তা থেকে তোমাকে মুক্তি দিয়েছি। লেখক বলেন, এটা আল্লাহর কালামের ওপর মারাত্মক অপবাদ। হজরত মুসা আলাইহিস সালাম সম্পর্কে সে বলে থাকে, তিনি আল্লাহর প্রেমে মত্ত হয়ে গেছেন। আল্লাহর ভালোবাসাকে ফিতনা আখ্যা দিয়ে সে বিরাট অন্যায় করেছে। ইবনে আতার কাছ থেকে জনৈক ব্যক্তি–

---

১ সুরা আ'লা : আয়াত ৬
২ সুরা আ'রাফ : আয়াত ১৬৯
৩ সুরা ত্বহা : আয়াত ৪০

فَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ * فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّةُ نَعِيمٍ

'অতঃপর সে যদি নৈকট্যপ্রাপ্তদের অন্যতম হয়, তবে তার জন্য থাকবে বিশ্রাম, উত্তম জীবনোপকরণ ও সুখময় জান্নাত।'[১]

উক্ত আয়াত সম্পর্কে জানতে চাইলে তিনি জবাবে বলেন, এখানে 'রাওহ্' অর্থ আল্লাহকে দেখা, 'রায়হান' অর্থ তাঁর কথা শোনা। আর 'জান্নাতে নাঈম' ওই স্থান যেখানে আল্লাহ তায়ালাকে কোনো প্রকার পর্দা ব্যতিরেকেই দেখতে পাওয়া যায়। লেখক বলেন, এই মতামত বাস্তবিকপক্ষে তাফসিরের উল্টো।

আবু আবদুর রহমান সালামি কুরআনের তাফসির বিষয়ে সুফিদের বিভিন্ন কথাবার্তা উল্লেখ করে দু'খণ্ডে একত্র করেছেন; যার মধ্যে অধিকাংশই অনর্থক কথাবার্তা, অসার ও অবৈধ। তার নাম রেখেছেন 'হাকায়িকুত্ তাফসির'। সুফিরা তাফসির বিষয়ে এমনও বলে থাকে যে, 'আলহামদু'-কে 'ফাতিহাতুল কিতাব' বলার কারণ হচ্ছে, এগুলো প্রারম্ভিক বিষয়াশয়—যার মাধ্যমে আমরা শুরু করে থাকি। তোমরা এটাকে সম্মান করলে ভালো, অন্যথায় এর পরের সূক্ষ্ম বিষয়গুলো তোমরা আর অনুধাবনের সুযোগ পাবে না। গ্রন্থকার বলেন, সুরাটিকে এভাবে ইঙ্গিতবাহী করা নিন্দনীয়। কেননা ব্যাখ্যাকারবৃন্দের সর্বসম্মতিক্রমে এটা সর্বপ্রথম অবতীর্ণ সুরা নয়। সুফিদের ধারণা—মানুষ যেই 'আমীন' বলে, তার মানে হচ্ছে আমি ইচ্ছে করে তোমার দিকে আসছি। লেখক বলেন, এটাও নিন্দনীয়। কেননা এক্ষেত্রে 'আম্মীন' হওয়ার দরকার ছিল। অথচ এটা তাশদিদের সাথে উচ্চারিত নয়। আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন,

وَإِنْ يَأْتُوكُمْ أُسَارَى

'কাফেররা যদি বন্দি হয়ে তোমার কাছে আসে।'[২]

এ আয়াতাংশ সম্পর্কে আবু উসমান সুফি বলেন, 'উসারা' অর্থ পাপে নিমজ্জিত। ওয়াসেতী বলেন, এর অর্থ হচ্ছে, তারা নিজেদের কর্মকাণ্ড প্রত্যক্ষকরণে নিমগ্ন। জুনাইদ বলেন, এর অর্থ হচ্ছে, জাগতিক বিষয়াদিতে লিপ্ত, আল্লাহ তায়ালা চাইলে তাদেরকে হেদায়াত দিতে পারেন। আমি

---

১ সুরা ওয়াকিয়া : আয়াত ৮৮-৮৯

২ সুরা বাকারা : আয়াত ৮৫

(গ্রন্থকার) বলছি, আয়াতটি তো অস্বীকারকারীর নিন্দার বর্ণনায় অবতীর্ণ হয়েছে। তার অর্থ হচ্ছে, কাফেররা যদি বন্দি হয়ে তোমার কাছে আসে, তাহলে তাদের থেকে ফিদিয়া নাও। অন্যথায় জিহাদের সময় তাদেরকে হত্যা করো। উপরোক্ত অভিমতের আলোক যদি এ আয়াতের ব্যাখ্যা ধরে নেয়া হয়, তবে তো এদের প্রশংসা করা হচ্ছে বলে অনুমিত হয়।

মুহাম্মাদ ইবনে আলী يُحِبُّ التَّوَّابِينَ 'আল্লাহ তাওবাহকারীদের ভালোবাসেন।'[৩] এর ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেন, এর মানে হচ্ছে, আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে ভালোবাসেন; যারা নিজেদের তাওবাহর ওপর তাওবাহ করে। আন নূরী সুফি يَقْبِضُ وَيَبْسُط এর ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেন, নিজের জন্য অভাব ও সচ্ছলতা দান করেন। অন্যত্র আল্লাহ তায়ালার ইরশাদ مَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا 'যে হেরেমে প্রবেশ করে সে নিরাপদ।'[৪] মুহাম্মাদ ইবনে আলী এর ব্যাখ্যায় বলেন, এর মানে হচ্ছে, 'প্রবৃত্তির অনুসরণ ও শয়তানের ধোঁকা থেকে সে নিরাপদ।' অথচ অর্থটি চরম গর্হিত। কেননা আয়াতের শব্দ একটি সংবাদ আর এর অর্থ হচ্ছে নির্দেশক। এর অন্তর্নিহিত অর্থ হচ্ছে, 'যে হেরেম শরিফে প্রবেশ করে, তাকে নিরাপত্তা দাও।' তার দেয়া ব্যাখ্যায় আয়াতের সঠিক মর্ম উদ্ঘাটিত হয় না। কেননা হেরেম শরিফে বহু মানুষ যায় কিন্তু কারো কারো মন শয়তানের ধোঁকা থেকে নিষ্কৃতি পায় না।

আবুল হাসান নুরি সম্পর্কে শুনেছি, মানুষ বলাবলি করত যে, তিনি মুয়াজ্জিনের আযান শুনে কুৎসাপূর্ণ মন্তব্য করে বলতেন, এটা মৃত্যুর বিষ। পক্ষান্তরে কুকুরের চিৎকার শুনে বলতেন لبيك وسعديك। মানুষজন এর কারণ জিজ্ঞেস করলে তিনি বলতেন, মুয়াজ্জিনের ব্যাপারে আমার ভয় হচ্ছে যে, সে অলসতার সাথে আল্লাহকে স্মরণ করছে। সে পারিশ্রমিকের বিনিময়ে আযান দিয়ে থাকে। বেতন না পেলে সে আর আযান দেবে না। সুতরাং আমি তার নিন্দা জানাই। অন্যদিকে কুকুর রিয়াবিহীন আল্লাহর জিকির করে থাকে। যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন,

وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ

---

৩ সুরা বাকারা : আয়াত ২২২

৪ সুরা আলে ইমরান : আয়াত ৯৭

'প্রত্যেক বস্তু আল্লাহর প্রশংসাসূচক তাসবিহ পড়ে।'[১]

গ্রন্থকার বলেন, ভাইয়েরা! আল্লাহ সবাইকে এই ভ্রান্তি থেকে নিরাপদে রাখুন। তার জটিল ফিকাহ ও আশ্চর্য ইজতিহাদের প্রতি চিন্তা করুন। নূরী সম্পর্কে আরেকটি ঘটনা বর্ণিত আছে, তিনি জনৈক ব্যক্তিকে স্বীয় দাড়িতে হাত রাখতে দেখে বললেন, 'আল্লাহর দাড়ি থেকে তোমার হাত সরাও।' এ ঘটনা বাদশার কানে পৌঁছলে বাদশাহ নূরীকে তলব করে তাকে জিজ্ঞেস করেন, কী ব্যাপারে তুমি নাকি কুকুরের চিৎকার শুনে লাব্বাইক বলো আর মুয়াজ্জিনের আযানের সময় কুৎসা ও নিন্দা করো? নূরী বলল, হ্যাঁ। এর কারণ হচ্ছে, আল্লাহ তায়ালা বলেন,

وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ

'প্রত্যেক বস্তু আল্লাহর প্রশংসাসূচক তাসবিহ পড়ে।'[২]

আর মুয়াজ্জিন তো আপাদমস্তক একজন পাপিষ্ঠ ব্যক্তি। পরে বাদশাহ তাকে বললেন, তুমি ওই লোকের দাড়ি সম্পর্কে এ ধরনের মন্তব্য করলে কেন? নূরী জবাবে বলল, এই বান্দা এবং তার দাড়ি, এমন কি তার পুরো স্বত্ত্বা—যা দুনিয়া ও আখিরাতে রয়েছে—তার সবই তো আল্লাহ তায়ালার।

দেখুন! অজ্ঞতা এই শ্রেণিকে কোথায় নিক্ষেপ করেছে!

ভিত্তিহীন দাবি ও উপাধির ব্যাপারে শয়তানের ধোঁকা

গ্রন্থকার বলেন, এ কথা ভালো করে জেনে রাখা উচিত—ইলম হচ্ছে নিজেকে ছোট মনে করা এবং অধিক চুপ থাকার কারণ। পূর্ববর্তী মনীষীদের জীবনীর দিকে তাকালে আমরা এমনটিই দেখতে পাই। তাঁরা সর্বদা ভীতসন্ত্রস্ত থাকতেন এবং বিভিন্ন উপাধি থেকে দূরে অবস্থান করতেন। হজরত আবু বকর রা. বলতেন, আহ! আমি যদি মুমিনের বুকের একটি পশম হতাম! হজরত ওমর রা. পেরেশান অবস্থায় বলতেন, ওমরকে যদি ক্ষমা করা না হয়, তার জন্য দুঃখ হয়। হজরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. বলতেন, ইস্! আমাকে মৃত্যুর পর যদি আর উঠানো না হতো। হজরত আয়েশা রা. বলতেন, আমি যদি পোকা-মাকড় হতাম! সুফিয়ান সাওরি রহ.

---

১ সুরা বনি ইসরাঈল : আয়াত ৪৪

২ সুরা বনি ইসরাঈল : আয়াত ৪৪

মৃত্যুর সময় হাম্মাদকে বলেন, তুমি কি মনে করো—আমার মতো মানুষকে ক্ষমা করে দেয়া হবে?

গ্রন্থকার বলেন, এ সব মহান মনীষীদের মুখ থেকে এমন কথা বের হওয়ার কারণ হচ্ছে, তাঁরা আল্লাহ তায়ালাকে ভালো করে চিনতেন। আর এই চেনার কারণেই তাঁরা সর্বদা ভয়ে ভয়ে থাকতেন। আল্লাহ তায়ালা বলেন,

إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ

'আল্লাহ তায়ালাকে আলেমরাই ভয় করে।'[৩]

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,

أنا أعرفكم بالله وأشدكم له خشية

'আমি আল্লাহ তায়ালাকে তোমাদের চেয়ে বেশি চিনি এবং তোমাদের চেয়ে অধিক ভয় করি।'[৪]

সুফিরা যেহেতু ইলম থেকে দূরে থাকে তাই তারা স্বীয় আমলকে বড় করে দেখতে আরম্ভ করে। কারও কাছ থেকে যদি কারামতসুলভ কোনো আচরণ ধরা পড়ে, তাহলে সে বড় বড় দাবি করে বসে এবং তাকে বিশাল উপাধিতে ভূষিত করা হয়। আবু ইয়াযিদ সম্পর্কে শোনা যায়, সে বলতো, আমার মন চায় এখনই কিয়ামত কায়েম হোক। তাহলে দোযখের দিকে আমার চেহারা ফেরাব। আমাদের মধ্য থেকে একজন তাঁকে জিজ্ঞেস করল, হে আবু ইয়াযিদ! আপনি এমন বলছেন কেন? সে তদুত্তরে বলল, আমি জানি দোযখ আমাকে দেখে শীতল হয়ে যাবে। এতে আমি মানুষের জন্য রহমত হিসেবে আবির্ভূত হব। আবু মুসা দুবাইলী বলেন, আমি আবু ইয়াযিদকে বলতে শুনেছি, তিনি বলতেন, যে দিন কিয়ামত হবে, জান্নাতীরা জান্নাতে আর জাহান্নামিরা জাহান্নামে প্রবেশ করবে, তখন আমি আল্লাহর কাছে নিবেদন করব, হে আল্লাহ! আমাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করুন। লোকজন জিজ্ঞেস করল, এমনটি কেন করবেন? উত্তরে আবু ইয়াযিদ বললেন, যাতে মাখলুক জেনে নেয় যে, দোযখের মধ্যেও আল্লাহ তাঁর অলীদের সাথে দয়া ও মেহেরবানীর আচরণ করেন।

---

৩ সুরা ফাতির : আয়াত ২৮

৪ সহিহ বুখারি : হাদিস নং ২৫৯৩

গ্রন্থকার বলেন, এটা খুবই গর্হিত মন্তব্য। কেননা এর দ্বারা এমন বিষয়কে ছোট মনে করা হচ্ছে, যাকে আল্লাহ তায়ালা 'বড় বিষয়' বলে অভিহিত করেছেন। আল্লাহ তায়ালা জাহান্নামের গুণ বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন,

فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ

'তোমরা ওই আগুনকে ভয় করো যার জ্বালানি হবে মানুষ ও পাথর।'[১]

إِذَا رَأَتْهُمْ مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ سَمِعُوا لَهَا تَغَيُّظًا وَزَفِيرًا

'দূর হতে আগুন যখন তাদেরকে দেখবে তখন তারা তার ক্রুদ্ধ গর্জন ও প্রচণ্ড চিৎকার শুনতে পাবে।'[২] এভাবে অনেক আয়াতে জাহান্নামের ভয়াবহতার কথা এসেছে।

হজরত আবু হোরায়রা রা. হতে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন,

نَارُكُمْ جُزْءٌ مِنْ سَبْعِينَ جُزْءًا مِنْ نَارِ جَهَنَّمَ»، قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنْ كَانَتْ لَكَافِيَةً قَالَ: «فُضِّلَتْ عَلَيْهِنَّ بِتِسْعَةٍ وَسِتِّينَ جُزْءًا كُلُّهُنَّ مِثْلُ حَرِّهَا

'যে আগুন আদমসন্তান প্রজ্বলিত করে, জাহান্নামের আগুন তার চেয়ে সত্তর গুণ তীব্র তাপবাহী হবে। সাহাবারা এ কথা শুনে নিবেদন করলেন, ইয়া রাসুলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! শাস্তির জন্য তো এ আগুনই যথেষ্ট। তিনি বললেন, ওই আগুন এ আগুন থেকে ঊনসত্তর গুণ বেশি তীব্র হবে।'[৩]

শিবলীর মৃত্যুশয্যায় কিছু লোক তার কাছে গিয়ে জানতে চাইল, হে আবু বকর! কেমন আছেন? প্রত্যুত্তরে শিবলী দু'টি পঙক্তি আবৃত্তি করলেন :

ان سلطان حبه * قال لا أقبل الرشا

سلوه فديته * ما لقتلي تحرشا

---

১ সুরা বাকারা : আয়াত ২৪

২ সুরা ফুরকান : আয়াত ১২

৩ সহিহ বুখারি : হাদিস নং ৩২৬৫

'ইশকের রাজা বলেন, আমি তো ঘুষ খাই না। সুতরাং আমি তাঁর কাছে যাবো এবং তাঁকে বলব, তিনি আমাকে গ্রহণ করে নেবেন।' ইবনে আকিল বলেন, শিবলী কর্তৃক বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহ তায়ালার বাণী–

وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى

'আর অচিরেই তোমার রব তোমাকে দান করবেন, ফলে তুমি সন্তুষ্ট হবে।'[৪] আল্লাহর কসম! মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সন্তুষ্ট হবেন না যতক্ষণ পর্যন্ত তাঁর একজন উম্মতও জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত থাকবে। অতঃপর শিবলী বলেন, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বীয় উম্মতের ব্যাপারে সুপারিশ করবেন। এরপর আমি সুপারিশ করব। এভাবে কেউই আর জাহান্নামে থাকবে না। ইবনে আকিল বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে প্রথম দাবিটি ভুল। কেননা তিনি ফাজের ও গুনাহগারদের শাস্তিতে রাজি হবেন না—এই দাবি অনর্থক এবং অজ্ঞতার পরিচায়ক। এটা কী করে সম্ভব? অথচ وقد لعن في الخمر عشرة 'মদ্যপকে তিনি দশবার অভিশাপ দিয়েছেন।'[৫] সুতরাং ফাজেরদের ওপর শাস্তির ব্যাপারে তিনি রাজি থাকবেন না, এটা বাতিল হিসেবে বিবেচ্য। শরয়ি বিধান না জানার কারণে এ-জাতীয় বিচ্যুতির শিকার হয়েছে তারা। অতঃপর তার নিজের ব্যাপারে সুপারিশ করার দাবি করা যে, সে সবার জন্য সুপারিশ করে সবাইকে জাহান্নাম থেকে মুক্ত করে ছাড়বে—এটা তো কুফরি। কেননা মানুষ নিশ্চিতভাবে নিজেকে জান্নাতবাসী মনে করলে সে দোযখের উপযুক্ত হয়ে যায়। অতএব উপরোক্ত ব্যক্তির ব্যাপারে আর কী-ই বা বলা যায়, যে নিজেকে 'মাকামে মাহমূদ' এর চেয়ে অধিক শ্রেষ্ঠ মনে করে? আর সুপারিশের অধিকারী বলে দাবি করে?

সুফিদের আরও কিছু আপত্তিজনক কাজের বিবরণ

ইতোপূর্বে সুফিদের বহু মন্দ কাজের আলোচনা হয়েছে। এ ক্ষেত্রে আরও বিশেষ কিছু আপত্তিজনক ও বিস্ময়কর কাজের আলোকপাত করা হবে।

---

৪ সুরা দোহা : আয়াত ৫

৫ সুনানে আবি দাউদ : হাদিস নং ৩৬৭৪, তিরমিযি : হাদিস নং ১২৯৫

আবু জাফর কুরাইতী সম্পর্কে বর্ণিত আছে, যিনি জুনাইদের ওস্তাদ ছিলেন, তার একবার স্বপ্নদোষ হয়েছিল। পরনে ছিল মোটা চট। শীতের মৌসুমে প্রচণ্ড শীতের রাতে ঠান্ডা পানি দ্বারা গোসল করতে তিনি অস্বীকৃতি জানালেন। চটসহ তিনি পানিতে নেমে গেলেন এবং দীর্ঘক্ষণ ডুবালেন। পানি থেকে ওঠে অঙ্গীকার করলেন যে, যতক্ষণ পর্যন্ত এ চট না শুকায়, ততক্ষণ দেহ থেকে এটা খুলব না। উদ্দেশ্য ছিল নফসকে কষ্ট দেয়া। এক মাস পর্যন্ত এ চট শুকায়নি। তিনি এভাবে ভেজা কাপড় পরে কষ্ট করতে থাকেন। আবু কুরাইতীর এভাবে নিজেকে কষ্টের মুখোমুখি করা অবৈধ ও শরিয়াবিরুদ্ধ কাজ হিসেবে বিবেচ্য ছিল।

আহমদ ইবনে হাওয়ারী এবং আবু সুলাইমানের পরস্পর এ চুক্তি হয়েছিল যে, আবু সুলাইমান যা আদেশ করে, আহমদ তা পালন করবে। একবার আবু সুলাইমান মজলিসে কথাবার্তা বলছিল। এমতাবস্থায় আহমদ এসে বলল, আমি তন্দুর জ্বালিয়েছি। এখন আপনার নির্দেশ কী? আবু সুলাইমান নিশ্চুপ। এভাবে তিনবার জিজ্ঞেস করার পর আবু সুলাইমান বলল, যাও তুমিই তন্দুরে গিয়ে বসে যাও। আহমদ চুক্তি ও ওয়াদামাফিক তন্দুরের ভেতরে গিয়ে বসে গেল। কিছুক্ষণ পর আবু সুলাইমান সঙ্গীদেরকে বলল, চলো তো দেখি আহমদের কী হাল? সে ওয়াদা পূরণ করেছে কি না? আবু সুলাইমান গিয়ে দেখে সত্যিই আহমদ তন্দুরের ভেতর বসে আছে। আবু সুলাইমান আহমদকে টেনে উঠাল। দেখা গেল, তার গায়ে আগুন স্পর্শ করেনি।

গ্রন্থকার আল্লামা ইবনুল জাওযি রহ. বলেন, উক্ত ঘটনা ভিত্তিহীন ও অবাস্তব। যদি বাস্তব বলে ধরে নেয়া হয়, তবে আবু সুলাইমানের এরূপ আদেশ করা এবং আহমদের সে আদেশ মোতাবেক অগ্নিতে প্রবেশ করা সম্পূর্ণ নাজায়েয হয়েছে। হজরত আলী রা. হতে বর্ণিত–

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একবার কোথাও একদল সৈন্য পাঠিয়েছিলেন। জনৈক আনসারি ব্যক্তিকে তাদের আমির নিযুক্ত করেন। পথিমধ্যে কোনো এক বিষয়ে রাগান্বিত হয়ে তিনি সঙ্গীদেরকে বললেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কি তোমাদেরকে আমীরের নির্দেশ মেনে চলার হুকুম দেননি? তাঁরা বলল, হ্যাঁ দিয়েছেন। তখন তিনি তাঁদেরকে বললেন, তোমরা কাঠ সংগ্রহ করো। কাঠ সংগ্রহ করার পর তাতে আগুন প্রজ্বলিত করে তাদেরকে নির্দেশ দিলেন, তোমরা সবাই এ

অগ্নিকুণ্ডে প্রবেশ করো। তারা প্রবেশ করার ইচ্ছে করেছিল। কিন্তু এমতাবস্থায় এক যুবক বলল, তোমরা আগুন অর্থাৎ জাহান্নাম থেকে বাঁচার জন্য কুফর পরিত্যাগ করে ইসলাম গ্রহণ করেছ। এখন আবার সেই আগুনে প্রবেশ করছ? তোমরা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে জিজ্ঞেস করা ব্যতীত এ কাজ কোরো না। তারা সবাই রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে গিয়ে ঘটনা বর্ণনা করলে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শুনে বললেন, তোমরা যদি ওই আগুনে ঢুকতে তবে আর কখনো বের হতে পারতে না। আনুগত্য তো কেবল শরয়ি বিষয়ে হতে হবে।[১] এ হাদিস দ্বারা সহজেই বোঝা যায়, আবু সুলাইমানের নির্দেশ এবং আহমদের সে নির্দেশ পালনে তন্দুরে প্রবেশ বৈধ ছিল না।

হাসান ইবনে আলী দামেগানি বলেন, বোস্তামের এক ব্যক্তি আবু ইয়াযিদের মজলিসে অবস্থান করত। কখনো তার মজলিস ছেড়ে যেত না। একদিন সে আবু ইয়াযিদকে বলল, আমি তিন বছর যাবৎ অনবরত রোযা রাখি, রাত জেগে ইবাদত করি। এককথায় সমুদয় মনোবাসনা পরিত্যাগ করে দিয়েছি। কিন্তু আপনি যা বলেন, আমি তো তা পাচ্ছি না। আবু ইয়াযিদ বলল, তুমি তিন বছর নয়, তিনশ বছরও যদি এভাবে সাধনা করো, তবুও তুমি তার কিঞ্চিৎও পাবে না। সে বলল, কেন? আবু ইয়াযিদ বলল, নফস তোমার মাঝে এবং ওই জিনিসের মাঝে অন্তরায় হয়ে আছে। সে বলল, এর দাওয়া কী দ্বারা দূরীভূত হতে পারে? আবু ইয়াযিদ বলল, দাওয়া আছে বটে, কিন্তু তুমি তা গ্রহণ করবে না। সে বলল, অবশ্যই গ্রহণ করব এবং আপনি যা বলেন আমি নির্দ্বিধায় তা মেনে নেব। আবু ইয়াযিদ বলল, তুমি এখনই ক্ষৌরিকের কাছে গিয়ে মাথা ও দাড়ি মুণ্ডিয়ে ফেলো। তারপর এক লুঙ্গি ও এক চাদর এবং গলায় একটি থলি ঝুলিয়ে তা আখরোট দ্বারা পূর্ণ করো। অতঃপর রাস্তায় নেমে ছেলেদের মাঝে ঘোষণা করো যে, যে-কেউ আমাকে একটি চপেটাঘাত করবে তাকে একটি আখরোট দেয়া হবে। আর তুমি ওইসব স্থানে ঘুরবে, যেখানে তোমাকে সম্মান করা হতো। সে বলল, সুবহানাল্লাহ! আমার মতো ব্যক্তিকে আপনি এ নির্দেশ দিচ্ছেন? এ কাজ আমার পক্ষে মোটেই সম্ভব নয়। আবু ইয়াযিদ বলল, তোমার সুবহানাল্লাহ বলাও শিরক। সে বলল কীভাবে শিরক? আবু ইয়াযিদ বলল, তুমি নফসকে সম্মান করো এবং তাকে ভালোবাসো। সে বলল, আবু ইয়াযিদ! এ কাজ

---

১ সহিহ বুখারি : হাদিস নং ৪৩৪০, ৭২৫৭, সহিহ মুসলিম : হাদিস নং ১৮৪০

তো আমি করতে পারব না। আপনি এর চেয়ে সহজ অন্য কোনো কাজ দিন। আবু ইয়াযিদ বলল, এ কাজ তোমাকে প্রথমে করে নফসকে দমন ও লাঞ্ছিত করতে হবে, এরপর অন্য কাজ। ওই ব্যক্তি আর এই কাজটি করল না।

গ্রন্থকার বলেন, আলহামদুলিল্লাহ আমাদের শরিয়তের এমন বিবেকবহির্ভূত ও গর্হিত কাজের কোনো স্থান নেই। নফসকে সংশোধনের জন্য রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক আনিত বিধান ও পন্থাই যথেষ্ট। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর তরিকায় এসব অবান্তর বিষয় নেই। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,

لَيْسَ لِلْمُؤْمِنِ أَنْ يُذِلَّ نَفْسَهُ

'কোনো মুমিনের জন্য নিজেকে অপদস্থ করা জায়েয নেই।'[১]

হজরত জুন্দুব ইবনে আব্দুল্লাহ রা. বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমাদের পূর্বেকার এক লোক আহত হয়ে সে ব্যথা সহ্য করতে পারেনি। তাই সে একখানা চাকু দিয়ে নিজের হাত নিজেই কেটে ফেলে। এর রক্তক্ষরণে সে মারা যায়। আল্লাহ্ বলেন, আমার বান্দা নিজেকে হত্যা করার ব্যাপারে বড় তাড়াহুড়া করে ফেলেছে। তাই আমি তার জন্য জান্নাত হারাম করে দিলাম।[২] রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

مَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِحَدِيدَةٍ فَحَدِيدَتُهُ فِي يَدِهِ يَتَوَجَّأُ بِهَا فِي بَطْنِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدا فِيهَا أَبَدا. وَمَنْ شَرِبَ سَمّا فَقَتَلَ نَفْسَهُ فَهُوَ يَتَحَسَّاهُ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدا مُخَلَّدا فِيهَا أَبَدا. وَمَنْ تَرَدَّى مِنْ جَبَلٍ فَقَتَلَ نَفْسَهُ فَهُوَ يَتَرَدَّى فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدا مُخَلَّدا فِيهَا أَبَدا

'যে ব্যক্তি ধারালো অস্ত্র দ্বারা নিজেকে হত্যা করে সে উক্ত অস্ত্র দ্বারা দোযখের আগুনে নিজের পেটে আঘাত করতে থাকবে। সে চিরদিন এই জাহান্নামে অবস্থান করবে। যে বিষ পান করে নিজেকে হত্যা করল সে চিরদিন জাহান্নামে অবস্থানকালে হত্যা করতে থাকবে। আর যে নিজেকে

---

১ সহিহুল জামে' : হাদিস নং ৭৭৯৭

২ সহিহ বুখারি : হাদিস নং ৩২৭৬, সহিহ মুসলিম : হাদিস নং: ১১৩

পাহাড় থেকে ফেলে দিয়ে হত্যা করবে সেও চিরদিন জাহান্নামে অবস্থান করবে এবং পাহাড় থেকে নিক্ষিপ্ত হতে থাকবে।'[৩]

ইউনুস ইবনে আবু বকর শিবলী আপন পিতার ঘটনা বর্ণনা করেন, তিনি একবার সারা রাত জেগে ছাদের পাশে নামায পড়েন। ঘুম এলে বলতেন, ওহে চোখ! যদি একটু বন্ধ হবে, তবে তোকে ছাদ থেকে নীচে ফেলে দেব। এভাবে তিনি সারা রাত জেগে নামায পড়লেন। ভোরে আমাকে বললেন, রাতে একটি মোরগ ব্যতীত আর কাউকে আল্লাহর যিকির করতে শুনিনি। গ্রন্থকার আল্লামা ইবনুল জাওযি রহ. বলেন, এ ব্যক্তি নাজায়েয বিষয়ে পতিত হলো। অনিদ্রা থেকে এভাবে নফসকে কষ্ট দেয়া শরিয়ত অনুমোদিত নয়। এটি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর তরিকাবিরোধী কাজ। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন,

وان لعينك عليك حقا وقال إِذَا نَعَسَ أَحَدُكُمْ فَلْيَرْقُدْ

'তোমাদের ওপর আপন চোখেরও হক রয়েছে। সুতরাং যখন তন্দ্রা আসে তখন ঘুমিয়ে তন্দ্রা দূর করে নাও।' একবার রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মসজিদে একটি রশি ঝুলন্তাবস্থায় দেখতে পেয়ে জিজ্ঞেস করলেন, এটা কিসের রশি? বলা হলা, এটা যায়নাবের রশি। যখন নামায পড়তে পড়তে ক্লান্ত হয়ে যান তখন এ রশি ধারণ করেন। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রশিটি খুলে ফেলার নির্দেশ দিয়ে বললেন :

لِيُصَلِّ أَحَدُكُمْ نَشَاطَهُ، فَإِذَا كَسِلَ أَوْ فَتَرَ فَلْيَقْعُدْ

যতক্ষণ মন প্রফুল্ল থাকে ততক্ষণ নামায পড়ো। অতঃপর যখন ক্লান্তি এসে যায় তখন বসে যাও।' এ বিষয়ক আরও হাদিস এ কিতাবের শুরুতে উপস্থাপন করা হয়েছে।

---

৩ সহিহ মসলিম : হাদিস নং ১৫৮

একাদশ অধ্যায়

কারামতসদৃশ বিষয়াবলির ওপর শয়তানের ধোঁকা

আলেমের তুলনায় অজ্ঞ ব্যক্তিদেরকে শয়তান ভালো করে ধোঁকা দেয়ার সুযোগ পায়। মূর্খ ইবাদতকারীদের সামনে কোনো একটি আলো প্রকাশ পেলেই শয়তান তাকে প্ররোচনা দিয়ে বলে, এটা তোমার কারামত বা অলৌকিকতা। কোনো শব্দ শুনলে শয়তান ওই আবেদের মনে এই প্রলোভন দেয় যে, এটা একটা গায়েবী বা অদৃশ্য শব্দ। ইতোপূর্বে আমরা উল্লেখ করে এসেছি, মালেক বিন দিনার বলেন, শয়তান মূর্খ সুফিদেরকে পুতুলের মতো নাচায়। ফলে শয়তানের প্রতারণাকে সে কারামত হিসেবে দেখতে থাকে।

বসরায় একবার জনৈক ব্যক্তি বায়তুল মুকাদ্দাসে গেলে সেখানে ভণ্ড হারেসের সাথে দেখা হয়। হারেস তার বক্তব্যের শুরুতে হামদ ও সানা পড়ে বলল, আমি আল্লাহর পক্ষ থেকে নবী হিসেবে প্রেরিত হয়েছি। বসরার ওই লোক বলল, তোমার কথা তো খুবই ভালো মনে হচ্ছে, তবে একটি বিষয়ে চিন্তা করতে হবে। হারেস বলল, আচ্ছা, চিন্তা করো। বসরার লোকটি এ কথা বলে সেখান থেকে চলে গেল। কিছুদিন পর সে আবার হারেসের কাছে গেলে হারেস আবার তার দাবির পুনরাবৃত্তি করল। বসরি লোকটি বলল, আপনার কথা খুব ভালো। এবার আমার বুঝে এসে গেছে। আমি আপনার ওপর ঈমান আনলাম। হারেস বলল, তুমি আমাকে ছেড়ে কোথাও যাবে না। বসরি হারেসের কাছে থাকতে লাগল এবং ধীরে ধীরে তার সমস্ত তথ্য সংগ্রহ করে ফেলল। বসরি বলল, এখন আমাকে অনুমতি দিন। হারেস বলল, কোথায় যাবে? বসরি বলল, বসরায় গিয়ে মানুষকে আপনার দীনের দাওয়াত দেব। হারেস অনুমতি দিয়ে দিল। সে বসরায় এসে সঙ্গে সঙ্গে খলিফা আবদুল মালেকের কাছে চলে গেল। আবদুল মালেকের তাঁবুর কাছে গিয়ে চিৎকার করে বলতে লাগল, নসিহত! নসিহত! সৈন্যরা জিজ্ঞেস করল, কিসের নসিহত? সে বলল, আমিরুল মুমিনীনের জন্য নসিহত নিয়ে এসেছি।

আবদুল মালেক এ কথা শুনে বলল, তাকে ভেতরে আসতে দাও। সে ভেতরে প্রবেশ করে চিৎকার করে বলতে লাগল, নসিহত! নসিহত! খলিফা জিজ্ঞেস করল, কোথায় তোমার নসিহত? কিসের নসিহত? সে বলল, নির্জনে বলতে হবে। খলিফা মজলিসের অন্যান্য সবাইকে বের করে দিলেন এবং তাকে কাছে আসতে বললেন। সে কাছে এসে বলল, হারেসের সংবাদ নিয়ে এসেছি। আবদুল মালেক সিংহাসনে বসা ছিলেন। হারেসের কথা শুনে রাগে অগ্নিশর্মা হয়ে সিংহাসন থেকে নীচে নেমে এলেন এবং বললেন, সে

কোথায়? সে বলল, আমিরুল মুমিনীন! সে বায়তুল মুকাদ্দাসে আছে। আমি তার সমস্ত তথ্য সংগ্রহ করে নিয়ে এসেছি। সে আবদুল মালেকের কাছে সমুদয় ঘটনা খুলে বলল। খলিফা বললেন, তোমাকে বায়তুল মুকাদ্দাস এবং সেখানকার ক্ষমতা দেয়া হলো। তুমি যা বলো, তা-ই করা হবে। সে বলল, আপনি প্রত্যেক সৈন্যের হাতে একটি করে মোমবাতি দেবেন এবং তাদেরকে বায়তুল মুকাদ্দাসের প্রত্যেক অলি-গলিতে মোতায়েন করবেন। যখন আমি বলব, জ্বালাও, তৎক্ষণাৎ প্রত্যেকেই মোমবাতি জ্বালিয়ে ফেলবে। এ পরামর্শ দিয়ে বসরি ব্যক্তি বায়তুল মুকাদ্দাসে চলে গেল। হারেসের দরজার কাছে দাঁড়িয়ে প্রহরীকে বলল, আল্লাহর নবীর কাছ থেকে আমার জন্য প্রবেশের অনুমতি গ্রহণ করো। প্রহরী বলল, এটা সাক্ষাতের সময় নয়। বসরি বলল, তাকে আমার পরিচয় বলে দাও। প্রহরী গিয়ে আমার পরিচয় দিলে প্রহরীকে দরজা খোলার পরামর্শ দিল। তৎক্ষণাৎ বসরি উচ্চৈঃস্বরে বলল, জ্বালাও। সমস্ত মোমবাতি জ্বলে উঠল। সৈন্যদেরকে নির্দেশ দিল, যে কেউ তোমাদের কাছ দিয়ে যাবে, তাকে গ্রেফতার করবে। এ বলে সে হারেসের কক্ষে গেল। হারেসকে খুঁজে পেল না। হারেসের ভক্তবৃন্দ বলল, আচ্ছা, তোমরা পয়গাম্বরকে হত্যা করতে এসেছ? তাকে তো আসমানে তুলে নেয়া হয়েছে। বসরি তাকে অনুসন্ধান চালিয়ে একটি গর্তের ভেতর পেল। বসরি হাত বাড়িয়ে তাকে গর্ত থেকে টেনে তুলল এবং সৈন্যদেরকে তার হাত বাঁধার নির্দেশ দিল। হাত বেঁধে তাকে খলিফা আবদুল মালেকের কাছে নিয়ে গেলে তিনি তাকে হত্যার নির্দেশ দেন।

কারামতসদৃশ বিষয়ে আক্রান্ত ব্যক্তির অবস্থা

হাসান ইবনে আবি ইমরান বলেন, ফারকাদ সুফি আমাকে বলেছেন, একবার আমার ছয়টি দিরহামের প্রয়োজন হলো। এ জন্য একটু চিন্তাযুক্ত ছিলাম। আমি ফোরাত নদীর তীর দিয়ে যাচ্ছিলাম। পথিমধ্যে হঠাৎ কিছু দিরহাম পড়ে থাকতে দেখে গুনে দেখি ছয়টি দিরহাম। আমি দিরহামগুলো তুলে নিলাম।

এ ব্যক্তি এভাবে রাস্তার ধারে দিরহাম পাওয়ার বিষয়কে নিজের কারামত মনে করেছে। অথচ যদি তার কাছে ফিকহের জ্ঞান থাকত, তবে এ দিরহাম সে গ্রহণ করত না। বা গ্রহণ করলেও এভাবে খরচ করত না। কেননা হারানো বস্তু হস্তগত হলে মাসআলা মতে তার প্রচার ও ঘোষণা দিতে হবে।

ইবরাহিম খোরাসানি বলেন, একদিন আমার অযুর প্রয়োজন হয়। হঠাৎ আমার সামনে একটি হীরার লোটা ও একটি রুপার মিসওয়াক দেখতে পাই। আমি উক্ত মিসওয়াক দ্বারা মিসওয়াক করে এবং লোটার পানি দ্বারা অযু করে ঐগুলো সেখানে রেখে আসি।

এ ঘটনার প্রতিও লক্ষ করলে আমরা দেখতে পাই, ফিকাহ সম্পর্কে জ্ঞান না থাকার কারণে সে রুপার মিসওয়াক ব্যবহার করেছে। অথচ পুরুষের জন্য এ পরিমাণ রুপা ব্যবহার করা বৈধ নয়।

রাবেয়া আদবিয়া সম্পর্কে বর্ণিত আছে, একবার তাকে জিজ্ঞেস করা হলো, আপনি মানুষকে আপনার কাছে আসার অনুমতি দেন না কেন? রাবেয়া বললেন, মানুষের কাছে আমার তেমন কোনো আশা নেই। তাছাড়া মানুষ আমার কাছে আসা-যাওয়া করলে তারা আমার বিষয়ে এমন বিষয় বর্ণনা করবে—যা আমার মাঝে নেই। তাঁকে জিজ্ঞেস করা হলো, মানুষ বলে, আপনার কাছে এমনিতেই খাবার চলে আসে। আগুন ছাড়াই খাবার রান্না হয়ে যায়। জায়নামাযের নীচে আপনি টাকা পান। এগুলো কি ঠিক? জবাবে রাবিয়া বললেন, আমি যদি এগুলো পেতামও তাহলেও তা কখনো গ্রহণ করতাম না। একবার কিছু গরম খাবার দ্বারা ইফতার করতে আমার মন চেয়েছিল। আমার কাছে কিছু ঘি ছিল। মন চেয়েছিল, যদি কিছু পেঁয়াজ হতো তাহলে আরও ভালো হতো। ইতোমধ্যে একটি পাখি এসে তার ঠোঁট থেকে একটি পেঁয়াজ দিয়ে গেল। আমি ভীত ছিলাম, না জানি এটা শয়তানের পক্ষ থেকে। এই আশঙ্কায় আমি ইচ্ছের মোড় ঘুরিয়ে নিলাম।

দ্বাদশ অধ্যায়

সাধারণ মানুষের ওপর শয়তানের চক্রান্ত

বনী আদমকে শয়তান নানাভাবে তার ধোঁকায় ফেলে থাকে। কখনো তাদেরকে আল্লাহর সত্তা ও গুণাবলির ব্যাপারে চিন্তা করতে উদ্বুদ্ধ করে, যার ফলে বিভিন্ন প্রশ্নের উদ্রেক হয়। হাদিসে রয়েছে, হজরত আবু হোরায়রা রা. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন :

لَا يَزَالُونَ يَسْأَلُونَ حَتَّى يُقَالُ: هَذَا اللهُ خَلَقَنَا، فَمَنْ خَلَقَ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ؟ " قَالَ: فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: " فَوَاللهِ، إِنِّي لَجَالِسٌ يَوْمًا إِذْ قَالَ لِي رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْعِرَاقِ: هَذَا اللهُ خَلَقَنَا، فَمَنْ خَلَقَ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ؟ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: فَجَعَلْتُ أُصْبُعَيَّ فِي أُذُنَيَّ، ثُمَّ صِحْتُ، فَقُلْتُ: صَدَقَ اللهُ وَرَسُولُهُ، اللهُ الْوَاحِدُ الصَّمَدُ، لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ

'মানুষ বিভিন্ন প্রশ্ন করবে। এমনকি একপর্যায়ে এ প্রশ্নও করবে যে, আমাদেরকে আল্লাহ তায়ালা সৃষ্টি করেছেন, তাহলে আল্লাহকে কে সৃষ্টি করেছেন? কারও মনে যদি এ ধরনের প্রশ্ন জাগে তবে সে যেন اللهُ الْوَاحِدُ الصَّمَدُ، لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ পড়ে। অতঃপর বাম দিকে তিনবার থুথু দেয় এবং আল্লাহর কাছে বিতাড়িত শয়তান থেকে আশ্রয় চায়।'[১]

অনেক সময় শয়তান সাধারণ ও ইলমবিহীন লোককে তাকদিরের ব্যাপারে সন্দেহযুক্ত করে তোলে। তাকদির সম্পর্কে এ দ্বিধায় পতিত করে যে, ভালো-মন্দ সবকিছু যদি আল্লাহ তায়ালা নির্ধারণ করে রেখে থাকেন, তাহলে আযাব দেবেন কেন? এমনইভাবে জান্নাত-জাহান্নাম যদি তাকদিরে লিপিবদ্ধ হয়ে গিয়ে থাকে, তাহলে আমল করার আর প্রয়োজন কী? এ-জাতীয় বিভিন্ন অবান্তর প্রশ্ন শয়তান সাধারণ মানুষের মনে জাগাতে থাকে। এর মূল কারণ হচ্ছে, অজ্ঞরা আলেমদের থেকে দূরে সরে থাকে। আলেমদের কাছ থেকে এই সংশয়ের সঠিক সমাধান জেনে নিতে পারলে এমন ভয়াবহ পরিণতি আনয়নকারী বিপদের মুখোমুখি হতে হতো না।

---

১ মুসনাদে আহমাদ : ২/৩৮৭।

আলেমদেরকে অবজ্ঞার ব্যাপারে শয়তানের ধোঁকা

সাধারণ মানুষের মধ্যে এমন কিছু লোক আছেন—যারা নিজ বুদ্ধিমতে চলেন। আলেমদের বিরোধিতাকে মোটেই তোয়াক্কা করেন না। আলেমদের ফতোয়া তাদের মনঃপূত না হলে এটাকে খণ্ডাতে আরম্ভ করে দেন। আলেমদের বিভিন্ন দুর্বলতা খুটিয়ে খুটিয়ে দেখতে আরম্ভ করে। ইবনে আকিল বলতেন, আমি এত বছর বেঁচে আছি, যখনই কারও কোনো কাজে হাত দিই, সে বলে, তুমি আমার কাজে বিঘ্ন ঘটালে। আমি যদি বলি, আমি একজন আলেম। সে জবাব দেয়, আল্লাহ তোমার ইলমে বরকত দিন। এটা তোমার কাজ নয়। তুমি এ কাজ করলে বুঝতে। অথচ তার কাজ একটি স্পর্শযোগ্য কাজ। অন্যদিকে আমি যে কাজে মগ্ন, সেটা জ্ঞান-বুদ্ধির সাথে সম্পৃক্ত কাজ। সুতরাং আমি তাকে ফতোয়া দিলে সে তা গ্রহণ করতে প্রস্তুত হয় না।

সাধারণ মানুষকে প্ররোচনা দিয়ে শয়তান ভণ্ড যাহেদ-পীর এবং বৈরাগীদের ব্যাপারে দ্রুত প্রভাবিত করে ফেলে। অনায়াসে এদেরকে তারা বিশ্বাস করে। আলেমদের চেয়ে পীর-দরবেশকে প্রাধান্য দেয়। এই অজ্ঞ সাধারণ মানুষেরা আরও বড় জাহেল ও মূর্খ কোনো ব্যক্তির শরীরে সুফিদের জুব্বা বা আলখেল্লা দেখলে তৎক্ষাণাৎ তাকে অন্ধভাবে বিশ্বাস করে ফেলে। সে মাথা নুইয়ে বিনয় প্রকাশ করলে তার ওপর ভক্তি ও অগাধ শ্রদ্ধা দেখাতে থাকে। অন্যদের বলতে থাকে—এই দেখো, দরবেশ আর আলেমের পার্থক্য। ইনি দুনিয়াত্যাগী আর আলেম দুনিয়াসন্ধানী। ইনি উত্তম খাবার খান না, বিয়ে-শাদী করেন না। অথচ এই ধারণা ও শ্রদ্ধা অমূলক। মুহাম্মদি শরিয়তে এর কোনো ভিত্তি বা মর্যাদা নেই; বরং এটা তো শরিয়তকে অবজ্ঞা প্রদর্শনের নামান্তর। ফলে সে মূর্খতাকে ইলমের ওপর প্রাধান্য দেয়ার প্রয়াস পেয়েছে। আল্লাহর বহু বড় অনুগ্রহ যে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর যুগে এদের আবির্ভাব হয়নি। নচেৎ রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বিয়ে-শাদী, পাক-পবিত্র পানাহার ও মিষ্টান্নের প্রতি আকৃষ্টের অবস্থা দেখলে তাঁর সম্পর্কে মন্দ ধারণা করত।

অধিকাংশ সাধারণ মানুষ উদাস-বাউল ও বাউন্ডুলে-ভবঘুরে ধরনের পীর-দরবেশদের প্রতি বেশি আকৃষ্ট। সাধারণ মানুষ তাদের পছন্দ করে, ভক্তি-শ্রদ্ধা করে। এদের টানে নিজ শহর ছেড়ে চলে যায়। অথচ নিজেকে এমন

ব্যক্তির সোপর্দ করা উচিত—যার মারেফত পরীক্ষিত। আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন,

فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ

'সুতরাং যদি তোমরা তাদের মধ্যে বিবেকের পরিপক্বতা দেখতে পাও, তবে তাদের ধন-সম্পদ তাদেরকে দিয়ে দাও।'[১] আল্লাহ তায়ালা হজরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে মানুষের কাছে পাঠিয়ে অনুগ্রহ করেছেন। কাফেররা খুব ভালো করে তাঁকে চিনত। ইরশাদ হচ্ছে,

لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ

'আল্লাহ তায়ালা ঈমানদারদের ওপর অনুগ্রহ করে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে তাদের মধ্য থেকে প্রেরণ করেছেন।'[২] অন্যত্র ইরশাদ হচ্ছে,

يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ

'এসব লোক তাঁকে এমনভাবে চেনে, যেভাবে তারা নিজ সন্তানদেরকে চিনে থাকে।'[৩]

পাপে সম্পৃক্ততার ব্যাপারে শয়তানের ধোঁকা

অনেক সাধারণ মানুষ মনে করে, আল্লাহ তায়ালা দয়াবান ও অনুগ্রহশীল। তাঁর ক্ষমার হস্ত উদার ও বিশাল। তিনি আমাদেরকে এমনিতেই ক্ষমা করে দেবেন। শয়তানের এই প্ররোচনায় পড়ে অনেক অজ্ঞ লোক নিজের ধ্বংস ডেকে এনেছে।

আবু আমর ইবনে আলা বলেন, ফারাযদাক এক সম্প্রদায়ের পাশে বসা ছিলাম, যারা আল্লাহর যিকির করছিল। তারা আল্লাহর রহমতের বিষয়ে খুবই উদারচিত্তের অধিকারী। মানুষজন তাকে বলল, তুমি ভালো মানুষকে কেন অপবাদ দিচ্ছ? জবাবে সে বলল, আচ্ছা, বলো তো দেখি, তোমার কোনো সন্তান যদি অপরাধ করে, তাহলে কি তাকে তুমি জ্বলন্ত উনুনে নিক্ষেপ করবে? লোকজন বলল, না। সে উত্তর দিল, আল্লাহ তায়ালা

---

১ সুরা নিসা : আয়াত ৬
২ সুরা আলে ইমরান : আয়াত ১৬৪
৩ সুরা আনয়াম : আয়াত ২০

আমাকে আমার মাতা-পিতা থেকে অধিক ভালোবাসেন। তিনি কী করে আমাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করতে পারেন?

গ্রন্থকার বলেন, এই ধারণা একান্তই অজ্ঞতাজনিত। কেননা আল্লাহ তায়ালার দয়া ও অনুগ্রহ অভ্যাসের কোমলতার সাথে সম্পৃক্ত নয়। যদি এমন হতো, তাহলে কোনো পশু-পাখিকে জবাই করা যেত না। অনুরূপভাবে কোনো শিশু মারা যেত না এবং কোনো মানুষ জাহান্নামে যেত না।

আসমায়ী বলেন, আমি আবু নাওয়াসের সাথে মক্কায় অবস্থান করছিলাম। দেখলাম একজন অল্পবয়স্ক বালক হাজরে আসওয়াদে চুমু খাচ্ছে। আবু নাওয়াস আমাকে বললেন, আল্লাহর শপথ! আমি হাজরে আসওয়াদের পাশের অল্পবয়স্ক বালককে চুমু দেয়া ছাড়া এখান থেকে যাব না। আমি বললাম, আল্লাহকে ভয় করুন। এখন তুমি হেরেম এলাকায় অবস্থান করছ, আল্লাহর ঘরের পাশে আছ। সে বলল, আমি অপারগ। এ কথা বলে সে হাজরে আসওয়াদের পাশে গিয়ে বালকের গালে মুখ রেখে চুমু খেল। আমি বললাম, তোমাকে ধিক্কার! আল্লাহর হেরেমের পাশে তুমি এ কাজ করলে! সে বলল, এমন করে বলো না। আমার প্রতিপালক দয়ালু। পরে সে কবিতার দু'টি লাইন আবৃত্তি করল–

وعاشقان التف خداهما * عند استلام الحجر الأسود

فاشتفيا من غير أن يأثما * كأنما كانا على موعد

'প্রিয়তম ও প্রিয়তমার চেহারা হাজরে আসওয়াদ চুমু দেয়ার সময় একত্র হয়ে যায়। প্রিয়তমের উদ্দেশ্য অসৎ হলেও এতে পাপ নেই। যেন উভয়েই এ কাজে অঙ্গীকারবদ্ধ।'

গ্রন্থকার বলেন, এই হীন কর্মকাণ্ডের প্রতি লক্ষ করুন। এই হীন কাজের সময়ও সে আল্লাহর অনুগ্রহ প্রত্যাশা করছে। আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত বৈধতার সীমা রেখা ভেদ করে কঠিন শাস্তির উপযোগিতার কথা সে অকপটে ভুলে গেছে। আবু নাওয়াসের মৃত্যুশয্যায় লোকজন তার কাছে গেলে তাকে তাওবাহ করতে বলে। সে বলল, তোমরা কি আমার ব্যাপারে ভয় করো?

আমাকে হাম্মাদ ইবনে সালামাহ বলেছেন, ইয়াযিদ রাক্কাশী হজরত আনাস রা. থেকে বর্ণনা করেছেন, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন :

لِكُلِّ نَبِيٍّ شفاعةٌ، وَإِنِّي اختبأْتُ شَفَاعَتِي لأَهْلِ الْكَبَائِرِ مِنْ أُمَّتِي يومَ الْقِيَامَةِ

'প্রত্যেক নবীর জন্য একটি সুপারিশের অধিকার থাকবে। আমি আমার উম্মতের জন্য আমার সুপারিশ গোপন রেখেছি।'[১]

এতে আশ্চর্যের কী আছে যে, আমিও তাদের অন্তর্ভুক্ত হব!

গ্রন্থকার আল্লামা ইবনুল জাওযি রহ. বলেন, এই লোক দু'টি দিক দিয়ে ভুল করে বসেছে। প্রথমত তাওবাহর বদলে রহমত কামনা করেছে এবং শাস্তির দিকে দৃষ্টি দেয়নি। দ্বিতীয়ত সে এ কথার দিকে লক্ষ রাখেনি যে, রহমত তারাই প্রত্যাশা করতে পারে যারা তাওবাহ করেছে। যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন :

وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تَابَ

'যে ব্যক্তি তাওবাহ করবে, আমি তাকে ক্ষমা করব।'[২]

অন্যত্র আল্লাহ বলেন :

وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ

'আর আমার রহমত সব বস্তুকে পরিব্যাপ্ত করেছে। সুতরাং আমি তা লিখে দেব তাদের জন্য যারা তাকওয়া অবলম্বন করে।'[৩]

উপরোক্ত ঘটনা নিতান্তই শয়তানের ধোঁকা। সে এভাবেই সাধারণ মানুষকে ধ্বংস করে থাকে।

***

কতেক সাধারণ মানুষ মনে করে, আলেমগণ আল্লাহর আল্লাহর বিধান পরোয়া করেন না। অমুক এমন করেন, তমুক এমন করেন। আমিই সঠিক পথে আছি। শয়তান তাদেরকে প্ররোচনা দিয়ে বলে, আলেম-মূর্খ সবার জন্য শরিয়ত সমান। আলেমরা যখন শরিয়ত পালনে উদাসীনতা দেখায়, সুতরাং মূর্খরা শরিয়ত পালন করবে কেন? সাধারণ অনেক মানুষ মনে করে, আমাদের পাপই-বা কতটুকু! আর আমরা এমন কে? যাকে পাপের কারণে জবাবদিহি করতে হবে! আমাদের পাপে আল্লাহর কোনো ক্ষতি হয় না, তদ্রূপ আমাদের পুণ্যে আল্লাহর কোনো লাভও হয় না। এছাড়া আল্লাহ

---

১ [সহিহ] আলবানি রহ. সংকলিত 'মাজমূয়ায়ে তাবাকাহ' : ৮৩০, ৮৩১, ৮৩২
২ সুরা তাওবাহ : আয়াত ৮২
৩ সুরা আ'রাফ : আয়াত ১৫৬

রাহমানুর রাহীম, দয়াবান ও করুণাময়। তিনি আমাদেরকে ক্ষমা করে দেবেন, আমরা যতবড় পাপ কাজ করি না কেন। অনেকে বলে :

من أنا عند الله حتى إذا * أذنبت لا يغفر لي ذنبي

'তাঁর সামনে আমার কীই-বা হাকিকত ও বাস্তবতা? আমাকে কেন ক্ষমা করা হবে না?'

এমন ধারণা ও চিন্তা-ভাবনা অসার ও অমূলক। চিন্তার স্থূলতা আর বিশ্বাসের বিভ্রান্তির কারণে শয়তান তাদের মনে এমন ভাবনার উদয় করে থাকে। ইবনে আকিল জনৈক ব্যক্তিকে বলতে শুনেছেন, সে বলত, আমি কে? আল্লাহ আমাকে কেন শাস্তি দেবেন? তাকে বলা হলো, তুমি সেই ব্যক্তি, যখন সমুদয় বিশ্বজগৎ ধ্বংস হয়ে যাবে, একমাত্র অবশিষ্ট থাকবে তুমি। তোমাকে উদ্দেশ্য করেই বলা হয়েছে—يا أيها الناس 'হে মানুষ'।

অনেক সাধারণ মানুষ এ ভাবনায় থাকে যে, আগামীতে তাওবাহ করে ভালো হয়ে যাব। অথচ বহু আশাবাদী লোক আশা নিয়েই থাকে এবং এ অবস্থাতেই তার মৃত্যু ঘনিয়ে আসে। পাপে দ্রুততা ও পুণ্যে ধীরতা খুবই অশুভ লক্ষণ। এতে করে অনেক সময় তাওবাহ করার সুযোগ হয় না। তাওবাহ করলেও অনেক সময় তা শুদ্ধ হয় না কিংবা তা কবুল হয় না। তাওবাহ কবুল হলেও পাপের কারণে লজ্জিত থাকতে হয়। সুতরাং পাপের চিন্তা মাথা থেকে সরাতে হবে।

বংশের দোহাই দিয়ে মুক্তির প্রত্যাশা

সাধারণ মানুষের জন্য এটাও একটা শয়তানী ফাঁদ যে, তারা বংশের দোহাই দিয়ে পার পেতে চায়। কেউ বলে, আমি আবু বকরে বংশধর, কেউ বলে, আমি আলীর বংশধর। আরেকজন বলে, আমি অমুক আলেম অমুক যাহেদের উত্তরসূরি। আবার কেউ বলে, আমি অমুক পীরের মুরিদ, অমুক অলি-দরবেশের ভক্ত। তিনি আমার জন্য সুপারিশ করবেন। আমি তাতে পার পেয়ে যাব। কেউ বলে, আমি অমুক বুযুর্গের সুপারিশের অধিক হকদার। আমি অমুক মনীষীর আওলাদ ইত্যাদি।

এ ধারণারও কোনো ভিত্তি নেই। আল্লাহর জন্য ভালোবাসা আর মানুষের জন্য ভালোবাসা এক নয়। আল্লাহর ভালোবাসা আনুগত্যের ওপর

নির্ভরশীল। আমরা দেখতে পাই, আহলে কিতাব তথা ইহুদি-খ্রিষ্টানরা তো হজরত ইয়াকুব আলাইহিস সালাম এর বংশধর। আহলে কিতাবদের পূর্বপুরুষতা তাদের জন্য মঙ্গল বয়ে আনেনি। যদি আনত তাহলে নিশ্চয় তারা আল্লাহর নির্দেশমতে চলত। আল্লাহ তায়ালা বলেন,

وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَى

'আর তারা শুধু তাদের জন্যই সুপারিশ করে যাদের প্রতি তিনি সন্তুষ্ট।'[১] হজরত নুহ আলাইহিস সালাম তাঁর পুত্রকে জাহাজে বসাতে চাইলে আল্লাহ তায়ালা বলেন,

إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ

'হে নুহ! এই ছেলে তোমার পরিবারের কেউ নয়।'[২] হজরত ইবরাহিম আলাইহিস সালাম এর সুপারিশ তাঁর পিতার ব্যাপারে এবং হজরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সুপারিশ তাঁর মাতার ব্যাপারে গৃহীত হয়নি। হাদিসে আছে, 'রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হজরত ফাতেমা রা.-কে উদ্দেশ্য করে বলেন :

لاَ أُغْنِي عَنْكَ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا

'আল্লাহর কাছে আমি তোমার কোনো কাজে আসব না।'[৩]

অনেক লোককে শয়তান প্ররোচনা দিলে তারা মনে করে, আমরা অমুক অলী-বুযুর্গকে ভালোবাসি, তাঁর সাথে সম্পর্ক রাখি। এই ভাবনায় সে পাপের ব্যাপারে বেপরোয়া হয়ে যায়। কেউ আবার বলে, আমি আহলে সুন্নাতের মতানুসারী। তা সত্ত্বেও সে পাপ কাজ থেকে বিরত হয় না। এমন লোকদেরকে বলতে হবে, বিশ্বাসও ফরয আবার গুনাহ থেকে মুক্ত থাকাও ফরয। এখানে একটি আরেকটির পরিপূরক নয়।

ফরযের ওপর নফলকে প্রাধান্য

অধিকাংশ সাধারণ মানুষ নফলের ওপর অধিক ভরসা রাখে এবং ফরযের তোয়াক্কা করে না। যেমন—আযানের পূর্বেই মসজিদে চলে আসে, নফল পড়ে। কিন্তু মুক্তাদী হয়ে ফরয নামায আদায়কালে ইমামের আগে চলে

---

১ সুরা আম্বিয়া : আয়াত ২৮

২ সুরা হূদ : আয়াত ৪৬

৩ সহিহ বুখারি : হাদিস নং ২৭৫৩, ৪৭৭১, সহিহ মুসলিম : হাদিস নং ২০৪

যায়। অনেকে যথাসময়ে ফরযের পাবন্দি করে না, কিন্তু রজবের সাতাশ তারিখের রাতে আগ্রহভরে অংশগ্রহণ করে। অনেকে সেদিন বেশ ইবাদত-বন্দেগি করে এবং কান্নাকাটি করে। অথচ মন্দ ও পাপ কাজে প্রতিযোগিতার সাথে অংশ নিতেও ভোলে না। কেউ তাকে সাবধান করলে বলে, পাপ-পুণ্যের সমন্বয়ে মানুষ, আল্লাহ তো দয়াময় ও ক্ষমাশীল। তিনি ক্ষমা করে দেবেন। অধিকাংশ সাধারণ মানুষ নিজের ইচ্ছে অনুযায়ী ইবাদত করে। ফলে যতটুকু ভালো করে, তার চেয়ে বেশি বিচ্যুতি ঘটে থাকে। আমি জনৈক সাধারণ ব্যক্তিকে দেখেছি, যে কুরআন হিফজ করেছে এবং দুনিয়াত্যাগী হয়েছে। পরে সে নিজেকে মাজযূব বানিয়ে ফেলেছে। অর্থাৎ পুরুষাঙ্গ কর্তন করে ফেলেছে। অথচ এটা চরম গর্হিত পাপ।

* শয়তানের ধোঁকায় আক্রান্ত হয়ে অনেক মানুষ ওয়াজ ও জিকিরের মাহফিলে শরিক হয়ে বেশ প্রভাবিত হয়ে পড়ে। অনেক কান্নাকাটি করে। তারা মনে করে মাহফিলে শরিক হয়ে অনেক বড় কাজ করে ফেলেছি। তাই সে ওয়ায়েজের মুখ থেকে ফযিলতের কথা শুনতে চায়। যখন সে জানতে পারে যে, মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে আমল করা, তখন সে বিমুখ হয়ে যায়। শুনে প্রভাবিত হওয়া আর আমলে পরিণত করার পার্থক্য সে আর নির্ণয় করতে পারে না।

আমি এমন অনেক লোককে দেখেছি, যারা বছরের পর বছর ওয়াজ-মাহফিলে অংশগ্রহণ করে এবং প্রভাবিত হয়ে প্রচুর অশ্রু বিসর্জন দেয় বটে, কিন্তু না সুদ নেয়া থেকে বিরত থাকে, না ব্যবসায় ধোঁকাবাজি ছাড়ে। নামাযের রোকন সম্পর্কে সে বছরের পূর্বে যেমন অজ্ঞ ছিল, বছর শেষে এতগুলো ওয়াজ শুনেও তদ্রূপ অজ্ঞ ও উদাসীন থেকে গেছে। মুসলমানের গীবত, পিতা-মাতার অবাধ্যতার ক্ষেত্রে বছরের পূর্বে যেমন অজ্ঞ ছিল, বছর শেষে এতগুলো ওয়াজ শুনেও তদ্রূপ অজ্ঞ ও উদাসীন থেকে গেছে। পরিবর্তন আসেনি। শয়তান তাদেরকে এমন প্ররোচনা দিতে থাকে যে, এসব মাহফিলে অংশগ্রহণ তোমার পাপের কাফ্ফারা ও প্রায়শ্চিত্ত। অনেককে আবার ধোঁকা হিসেবে বলে, নেককার আলেমদের সাহচর্য তোমার পাপ মোচনের কারণ হবে।

বেশিরভাগ ক্ষেত্রে শয়তান মানুষকে নিজ সত্তার প্রতি বিমুগ্ধদৃষ্টি প্রদানে প্রবৃত্ত করে। তুমি নিজের দিকে তাকিয়ে দেখো, কত কীই-না করেছ। তখন ওই ব্যক্তির (মনস্তাত্ত্বিক) পরিবর্তন ঘটে; ক্রমশ সে অহংকারী হয়, অহমিকা

তাকে আচ্ছন্ন করে। অন্যদের সে তখন অবজ্ঞা করে, সত্য প্রত্যাখ্যান করে এবং ভুল করলে সংশোধনে অস্বীকৃতি জানায়। অন্যদের থেকে শিখতে, ইলমের আলোচনায় বসতে অনীহা প্রদর্শন করে। জনসমক্ষে লজ্জিত হবে, এ ভয়ে গোটা জিন্দেগি সে শেখে না।

ধনীদের ওপর শয়তানের ধোঁকা

ধনীদেরকে শয়তান চারভাবে ধোঁকা দিয়ে থাকে :

১. ধন-সম্পদ, টাকা-পয়সা উপার্জনের ক্ষেত্রে সে কোনোরূপ বাছ-বিচার করে না। অধিকাংশ লেন-দেনে সুদের আশ্রয় নেয়। বৈধ-অবৈধের ব্যাপারটি সে বেমালুম ভুলে যায়। অথচ আল্লাহ তায়ালা বলেন,

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ.

'যারা সুদ খায় তারা দাঁড়াবে ওই ব্যক্তির ন্যায় যাকে শয়তান স্পর্শ দ্বারা পাগল করে দেয়।'[১]

হাদিসে আছে,

الرِّبَا ثَلَاثَةٌ وَسَبْعُونَ بَابًا، أَيْسَرُهَا مِثْلُ أَنْ يَنْكِحَ الرَّجُلُ أُمَّهُ، وَإِنَّ أَرْبَى الرِّبَا عِرْضُ الرَّجُلِ الْمُسْلِمِ

'সুদের গুনাহের ৭৩টি স্তর রয়েছে। যার মধ্যে সবচেয়ে হালকা হলো নিজ মাতাকে বিবাহ করা। সর্বনিম্ন স্তর হলো কোনো মুসলমানের ইজ্জত সম্ভ্রম হরণ করা।'[২] আল্লাহ্ তায়ালা ইরশাদ করেন :

يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ

'আল্লাহ্ সুদকে মিটিয়ে দেন এবং সদকাকে বাড়িয়ে দেন। আর আল্লাহ কোনো অতি কুফরকারী পাপীকে ভালোবাসেন না।'[৩]

---

১ সুরা বাকারা : আয়াত ২৭৫
২ মুসতাদরাকে হাকিম
৩ সুরা বাকারা : আয়াত ২৭৬

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ * فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ

'হে মুমিনগণ, তোমরা আল্লাহ্‌কে ভয় করো এবং সুদের যা অবশিষ্ট আছে, তা পরিত্যাগ করো, যদি তোমরা মুমিন হও। কিন্তু যদি তোমরা তা না করো তাহলে আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের পক্ষ থেকে যুদ্ধের ঘোষণা নাও, আর যদি তোমরা তাওবাহ করো, তবে তোমাদের মূলধন তোমাদেরই থাকবে। তোমরা যুলম করবে না এবং তোমাদের যুলম করা হবে না।'[১]

ইবনে আব্বাস রা. বলেন, এটি শেষ আয়াত যা রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর প্রতি অবতীর্ণ হয়েছিল।[২] ইবনে মাসউদ রা. থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, 'সুদের অর্থ দিয়ে যা-ই বৃদ্ধি করুক না কেন অল্পই কিন্তু তার শেষ পরিণাম।'[৩]

২. কৃপণতা। অনেক ধনী লোক আল্লাহর ক্ষমার প্রত্যাশা করে যাকাতও দেয় না। অনেকে যাকাত না দেয়ার বাহানা সন্ধান করে। কৃপণতা তাদের বাড়তে থাকে। কৃপণের ধ্বংস অনিবার্য। তার সম্পদ কোনো কাজে আসবে না। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ তায়ালার বাণী–

وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى * وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى * فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى * وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى

"পক্ষান্তরে যে কার্পণ্য করে ও নিজেকে স্বয়ংসম্পূর্ণ মনে করে। আর সৎ বিষয়কে মিথ্যাজ্ঞান করে, অচিরেই তার জন্য আমি সুগম করে দেবো (জাহান্নামের) কঠোর পরিণামের পথ। যখন সে ধ্বংস হবে, তখন তার সম্পদ তার কোনোই কাজে আসবে না।"[৪]

হাদিস শরিফে আছে : হজরত জাবের রা. কর্তৃক বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন :

---

১ সুরা বাকারা : আয়াত ২৭৮-২৭৯
২ ফাতহুল বারী : ৪/৩১৪
৩ সুনানে ইবনে মাজাহ্ : হাদিস নং ২২৭৯
৪ সুরা লাইল : আয়াত ৮-১১

اتَّقُوا الظُّلْمَ ؛ فَإِنَّ الظُّلْمَ ظُلُمَاتٌ يَوْمَ القِيَامَةِ . وَاتَّقُوا الشُّحَّ ؛ فَإِنَّ الشُّحَّ أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، حَمَلَهُمْ عَلَى أَنْ سَفَكُوا دِمَاءَهُمْ وَاسْتَحَلُّوا مَحَارِمَهُمْ

'অত্যাচার করা থেকে বাঁচো। কেননা, অত্যাচার কেয়ামতের দিনের অন্ধকার। আর কৃপণতা থেকে দূরে থাকো। কেননা, কৃপণতা তোমাদের পূর্ববর্তীদেরকে ধ্বংস করে দিয়েছে। (এই কৃপণতাই) তাদেরকে প্ররোচিত করেছিল, ফলে তারা নিজেদের রক্তপাত ঘটিয়েছিল এবং তাদের ওপর হারামকৃত বস্তুসমূহকে হালাল করে নিয়েছিল।'[৫]

যাহ্হাক রহ. হজরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. হতে বর্ণনা করেন, টাকশাল থেকে প্রথম যে টাকাটি বের হয়, শয়তান সেটি নিয়ে চুমু দেয়। তার নাক ও চোখে মাখতে থাকে। পরে বলে, তোমার মাধ্যমে আমি আদমসন্তানকে অকৃতজ্ঞ বানাব। তোমার মাধ্যমে আমি তাদেরকে কাফের ও পাপিষ্ঠ বানাব। তোমার মাধ্যমে খুশি হয়ে মানুষ আমার পূজা করে থাকে।

আ'মাশ রহ. শাকীক থেকে বর্ণনা করেন, আবদুল্লাহ বলেন, শয়তান সকল প্রকার ভালো বস্তু দ্বারা মানুষকে ধোঁকা দেয়। সে কিছুটা অভাবগ্রস্ত হলে শয়তান তার ধন-সম্পদ, টাকা-পয়সার ওপর শুয়ে পড়ে এবং সেখান থেকে দান-সদকা দিতে তাকে বাধা দেয়।

৩. অধিক ধন-সম্পদ, টাকা-পয়সার কারণে নিজেকে সে গরিবদের চেয়ে উত্তম মনে করে। অথচ এটা অজ্ঞতা ও মূর্খতা। কেননা শ্রেষ্ঠত্ব এমন বিষয় দ্বারা অর্জিত হয় যা নিজের জন্য জরুরি। অর্থকড়ি সঞ্চয় ও সংরক্ষণে কোনো শ্রেষ্ঠত্ব নেই। জনৈক আরব কবির ভাষায় :

غنى النفس لمن يعقل * خير من غنى المال

وفضل النفس في الأنفس * وليس الفضل في الحال

'বুদ্ধিমানের জন্য ধন-সম্পদ, টাকা-পয়সায় ধনী হওয়ার চেয়ে নফসের ধনী হওয়া অধিক শ্রেষ্ঠ। কেননা মানুষ তার নিজ সত্তা দ্বারা শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করে, বৈষয়িক কারণে নয়।'

৪. ধন-সম্পদ, টাকা-পয়সা ব্যয়ের সময় অপচয় ও অপব্যয় করা। কখনো কখনো প্রয়োজনের চেয়ে বেশি ইমারত তৈরি করে। দেয়াল খুব সুন্দর করে

---

৫ সহিহ মুসলিম : হাদিস নং ২৫৭৮, মুসনাদে আহমাদ : হাদিস নং ১৪০৫২

সাজায়। সৌন্দর্য বৃদ্ধিতে ভাস্কর্য নির্মাণ করে। এতে গর্ব ও অহংকারের পথ সুগম হয়। অনেক সময় খাবার-দাবারে অপচয় করে। অথচ এ সব কর্মকাণ্ড হারাম বা মাকরুহ ও নিন্দনীয়। সকল বিষয়ে তার হাশরের মাঠে মহান আল্লাহর দরবারে হিসেব দিতে হবে। দুনিয়ার মহব্বত মানুষকে গুনাহে লিপ্ত থাকতে বাধ্য করে। তারা দুনিয়া লাভ করার উদ্দেশ্যে হালাল-হারাম ন্যায় অন্যায় কোনো কিছুকে তোয়াক্কা করে না। যেখানেই দুনিয়াবি লাভ দেখে সেখানেই ঝাঁপিয়ে পড়ে। আব্দুল্লাহ ইবনে হারেস ইবনে নওফল রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি একদিন উবাই ইবনে কা'ব রাদিয়াল্লাহু আনহু এর সাথে দাঁড়িয়ে ছিলাম। তখন তিনি আমাকে বললেন,

لَا يَزَالُ النَّاسُ مُخْتَلِفَةً أَعْنَاقُهُمْ فِي طَلَبِ الدُّنْيَا

"মানুষ সব সময় দুনিয়ার অনুসন্ধানে বিভিন্ন ধরনের হয়ে থাকে।"[১]

হজরত মুয়াজ ইবনে জাবাল রা. হতে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন তাকে ইয়ামেনের দিকে পাঠান, তখন তিনি তাকে উপদেশ দিয়ে বলেন,

إِيَّاكَ وَالتَّنَعُّمَ فَإِنَّ عِبَادَ اللهِ لَيْسُوا بِالْمُتَنَعِّمِينَ

"তোমরা ভোগ-বিলাস ও অপচয় করা হতে সতর্ক থাকো। কারণ, মহান আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন এর বান্দারা কখনোই ভোগ-বিলাস ও অপচয় করেন না।"[২]

দুনিয়া হলো একজন মানুষের জন্য আখিরাতের ক্ষেত ও সেতুবন্ধন স্বরূপ। একজন মানুষের শেষ প্রান্তর ও গন্তব্য হলো, আখিরাতের জীবন ও মহান আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন এর সন্তুষ্টি অর্জন। দুনিয়াতে তার যাবতীয় কাজ ও আমল হবে তার আসল গন্তব্য ও শেষ ঠিকানার জন্য। দুনিয়া তার আসল গন্তব্য বা শেষ ঠিকানা নয়। এ কারণেই আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন আমাদের দুনিয়ার প্রতি অধিক মনোযোগী হতে বা ঝুঁকে পড়তে নিষেধ করেন এবং দুনিয়ার মোহে পড়ে আমরা যাতে ধোঁকায় না পড়ি এ জন্য তিনি আমাদের সতর্ক করেন। দুনিয়ার প্রতি অধিক ঝুঁকে পড়াতে নানাবিধ ক্ষতির সম্মুখীন হতে হয়।

---

১ সহিহ মুসলিম : হাদিস নং ২৮৯৫

২ মুসনাদে আহমাদ : হাদিস নং ৬১৬০০

তিরমিযি ও অন্যান্য হাদিসের কিতাবে আনাস বিন মালিক রা. হতে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন :

مَنْ كَانَتِ الآخِرَةُ هُمه، جَعَلَ اللهُ غِنَاهُ فِي قَلْبِهِ، وَجَمَعَ لَه شَمْلَهُ، وَأَتَتْهُ الدُّنيَا وَهِيَ رَاغِمةٌ، وَمَنْ كَانَتِ الدُّنيَا هَمُه، جَعَلَ اللهُ فقْرَه بيَن عَيْنَيهِ، وَفَرَّقَ عَلَيْهِ شَملَهَ، وَلَم يَأْتِهِ منَ الدُّنْيَا إِلا مَا قُدِّرَ لَهُ

"যে ব্যক্তির জীবনে আখিরাত অর্জন করাই তার বড় টার্গেট বা উদ্দেশ্য হয়ে থাকে, আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন তার অন্তরকে অভাবমুক্ত করে দেন। তার জন্য আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন তার সম্পদকে সহজ করে দেন। আর দুনিয়া তার নিকট অপমান অপদস্থ হয়ে আসতে থাকে। আর যে ব্যক্তির জীবনে দুনিয়া অর্জন করাই তার বড় টার্গেট বা উদ্দেশ্য হয়ে থাকে, আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন দরিদ্রতা ও অভাব তার চোখের সামনে তুলে ধরেন এবং তার ওপর বিশৃঙ্খলা চাপিয়ে দেন। সে যতই চেষ্টা করুক না কেন আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তার ভাগ্যে যতটুকু দুনিয়া লিপিবদ্ধ করেছেন, তার বাইরে সে দুনিয়া হাসিল করতে পারবে না।"[৩]

কিছু কিছু ধনী লোক মসজিদ-মাদরাসা ও ব্রিজ-কালভার্ট নির্মাণে ব্যয় করে থাকে। তাদের উদ্দেশ্য থাকে খ্যাতি ও প্রসিদ্ধি অর্জন করা। যাতে তার নাম প্রচার হয়। খ্যাতি বাড়ে। সেই নির্মাণে তার নাম খোদাই করে রাখে। যদি আল্লাহর সন্তুষ্টি উদ্দেশ্য হতো, তাহলে আল্লাহর দেখা-শোনাই তার জন্য যথেষ্ট ছিল। অনেকে রমযান মাসে মসজিদে মোমবাতি পাঠায়। অথচ সারা বছর মসজিদ ছিল অন্ধকারে। কেননা প্রতিদিন অল্প অল্প করে তেল দিলে খ্যাতি বাড়ে না। তাই সে রমযানকে মোক্ষম সময় হিসেবে বেছে নেয়।

অনেক ধনী ব্যক্তি অন্য লোকদেরকে দান-খয়রাত করে থাকে। নিজের পরিবার ও নিকটাত্মীয়ের দিকে ভ্রুক্ষেপ করে না। অথচ উত্তম ছিল নিকটজনদেরকে দান-খয়রাত করা। হাদিসে আছে, হজরত সালমান ইবনে আমের রা. বলেন, আমি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে বলতে শুনেছি :

إِنَّ الصَدَقَةَ عَلَى المِسْكِينِ صَدَقَةٌ، وَعَلَى ذِي الرَحِمِ اثْنَتَانِ؛ صَدَقَةٌ وَصِلَةٌ

---

৩ সুনানে তিরমিযি : হাদিস নং ২৪৬৫

'মিসকীনদেরকে দান করলে একটি দানের সাওয়াব পাওয়া যায়, অন্যদিকে নিকটাত্মীয়কে দান করলে দু'টি সাওয়াব পাওয়া যায়। একটি সদকার সাওয়াব, অন্যটি আত্মীয়তা রক্ষার সাওয়াব।'[১]

অনেক ধনী জানে যে, নিকটাত্মীয়কে দান করা অধিক সাওয়াব। কিন্তু পারস্পরিক শত্রুতার কারণে তাদেরকে দান করে না। নিকটাত্মীয় হওয়া সত্ত্বেও তাদের অভাব-অনটনে সাহায্য-সহযোগিতা করে না। অথচ যদি তাদের সাহায্য-সহযোগিতায় এগিয়ে আসা যায়, তাহলে তিনটি সাওয়াব প্রাপ্ত হতো। ১. সদকার সাওয়াব, ২. আত্মীয়তা রক্ষার সাওয়াব ও ৩. প্রবৃত্তির অনুসরণ না করার সাওয়াব। হাদিসে আছে, হজরত আবু আইয়ুব আনসারি রা. হতে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন :

أَفْضَلُ الصَّدَقَةِ عَلَى ذِي الرَّحِمِ الْكَاشِحِ

'উত্তম সদকা হচ্ছে, যা হিংসা ও শত্রুতা পোষণকারী আত্মীয়দেরকে দান করা হয়।'[২]

অনেকে দান-খয়রাত করে কিন্তু নিজের পরিবার-পরিজনদের ওপর খরচের বেলায় কৃপণতা করে। অথচ হাদিসে আছে, হজরত জাবের ইবনে আবদিল্লাহ রা. হতে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন :

أَفْضَلُ الصَّدَقَةِ مَا كَانَ عَنْ ظَهْرِ غِنًى، وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ

উত্তম সদকা হচ্ছে, যা নিজের সচ্ছলতার পর হোক বা এর পূর্বে তার পরিবারের ওপর খরচ করা হয়।'[৩] অন্য হাদিসে আছে, হজরত আবু হোরায়রা রা. হতে বর্ণিত, একবার রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন :

---

১ সহিহুল জামে' : হাদিস নং ৩৮৫৮

২ সহিহুল জামে' : হাদিস নং ১১১০

৩ সহিহ বুখারি : হাদিস নং ১৪২৭, সহিহ মুসলিম : হাদিস নং ১০৩৪

تَصَدَّقْ بِهِ عَلَى نَفْسِكَ " قَالَ: عِنْدِي دِينَارٌ آخَرُ. قَالَ: " تَصَدَّقْ بِهِ عَلَى زَوْجِكَ " قَالَ: عِنْدِي دِينَارٌ آخَرُ. قَالَ: " تَصَدَّقْ بِهِ عَلَى وَلَدِكَ " قَالَ: عِنْدِي دِينَارٌ آخَرُ. قَالَ: " تَصَدَّقْ بِهِ عَلَى خَادِمِكَ " قَالَ: عِنْدِي دِينَارٌ آخَرُ. قَالَ: " أَنْتَ أَبْصَرُ

'তোমরা সদকা করো। এ কথা শুনে এক ব্যক্তি বলল, ইয়া রাসুলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! আমার কাছে এক দিনার আছে। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, এটা তোমার নিজের জন্য ব্যয় করো। অতঃপর লোকটি বলল, আমার কাছে আরও একটি দিনার আছে। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, এটা তোমার স্ত্রীর জন্য ব্যয় করো। পরে লোকটি বলল, আমার কাছে আরও একটি দিনার আছে। এবার রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, এটা তোমার সন্তানের জন্য ব্যয় করো। আবার লোকটি বলল, আমার কাছে আরও একটি দিনার আছে। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, এটা তোমার খাদেমের জন্য ব্যয় করো। শেষে আবার লোকটি বলল, আমার কাছে আরও একটি দিনার আছে। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, এবার তোমার ইচ্ছা, তুমি চিন্তা-ভাবনা করে খরচ করো।'[৪]

অনেক ধনী ব্যক্তি রিয়া তথা লোক-দেখানোর জন্য হজ করে। এতে তার উদ্দেশ্য থাকে মানুষের প্রশংসা কুড়ানো, খ্যাতি বাড়ানো। অথচ এটা মারাত্মক পাপ। শয়তানের প্রলোভনে প্রলুব্ধ হয়েই অনেক ধনী এমনটি করে থাকেন। শয়তানের প্ররোচনায় প্ররোচিত হয়ে অনেক লোক অসিয়ত করার সময় সীমা অতিক্রম করে থাকে। এ ক্ষেত্রে প্রকৃত ওয়ারিস ও উত্তরাধিকারদেরকে বঞ্চিত করে। তারা মনে করে আমার ধন-সম্পদ আমি যাকে ইচ্ছে দিয়ে যাব। অথচ এ ব্যাপারে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হুঁশিয়ারি বাণী উচ্চারণ করে গেছেন। হাদিসে এসেছে, আবু উমামা রা. হতে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন :

مَنْ خَافَ عِنْدَ الْوَصِيَّةِ قذف في الوباء والوباء

---

৪ [হাসান] মুসনাদে আহমাদ : ২/২৫১, সুনানে আবি দাউদ : হাদিস নং ১৬৯১

'যে ব্যক্তি অসিয়ত করার সময় খেয়ানত করবে, তাকে জাহান্নামের 'ওয়াবা'তে নিক্ষেপ করা হবে।' ওয়াবা জাহান্নামের একটি গর্তের নাম। আ'মাশ রহ. খাইসামা থেকে বর্ণনা করেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন :

إِنَّ الشَّيْطَانَ يَقُولُ: مَا غَلَبَنِي عَلَيْهِ ابْنُ آدَمَ فَلَنْ يَغْلِبَنِي عَلَى ثَلَاثٍ: أَنْ يَأْخُذَ مَالًا مِنْ غَيْرِ حَقِّهِ, أَوْ أَنْ يَمْنَعَهُ مِنْ حَقِّهِ أَوْ أَنْ يَضَعَهُ فِي غَيْرِ حَقِّهِ

'শয়তান বলে থাকে, আমি আদমসন্তানকে কিছুতেই বিজয়ী হতে দিই না। বিজয়ী হওয়া পথে এগোতে থাকলে তাকে তিনটি বিষয়ে প্রলোভন দিয়ে থাকি। যথা—১. না-হক ধন-সম্পদ নেয়া, ২. অপাত্রে ধন-সম্পদ ব্যয় করা ও ৩. হকের মধ্যে বেশ-কম করা।'[১]

দরিদ্রদের ওপর শয়তানের ধোঁকা

দরিদ্ররাও শয়তানের বহুমুখী চক্রান্ত ও বিচিত্র ধোঁকা থেকে রেহাই পায় না। অনেক ধনী তাই নিজের দরিদ্রতার কথা লোকসম্মুখে বলে বেড়ায়, অথচ সে ধনী। এমতাবস্থায় সে যদি অপ্রয়োজনে কারও কাছে দান-অনুদান চায়, তাহলে সে যেন জাহান্নামের অগ্নিপিণ্ড জমা করছে। হাদিসে এসেছে, হজরত আবু হোরায়রা রা. হতে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন :

مَنْ سَأَلَ النَّاسَ أَمْوَالَهُمْ تَكَثُّرًا، فَإِنَّمَا يَسْأَلُ جَمْرًا فَلْيَسْتَقِلَّ أَوْ لِيَسْتَكْثِرْ

'যে ব্যক্তি ধন-সম্পদ বৃদ্ধির জন্য মানুষের নিকট হাত পাতে, সে যেন জাহান্নামের অঙ্গার সন্ধান করছে। চাই তা কম হোক বা বেশি।'[২]

এখন যদি এই লোক মানুষের কাছে কিছু না চায়, কিন্তু তার দরিদ্রতা প্রকাশের কারণে অন্যান্য মানুষ তাকে যাহেদ বা দুনিয়াত্যাগী মনে করে, তাহলে সে রিয়াকার হিসেবে বিবেচিত হবে। আল্লাহর দেয়া নেয়ামতরাজি গোপন করে যদি এ জন্য দরিদ্রতা প্রকাশ করে যে, এর দ্বারা দান-খয়রাত করতে হবে না, তাহলে সে কৃপণতার পাশাপাশি আল্লাহর অকৃতজ্ঞ বান্দা

---

১ হাদিসটির সনদ দু'টি কারণে দুর্বল। প্রথমত আ'মাশ আনআনার কারণে 'মুদাল্লিস', দ্বিতীয়ত খাইসামা হচ্ছেন বিশ্বস্ত একজন তাবেয়ী, সুতরাং তা মুরসাল।

২ সহিহ মুসলিম : হাদিস নং ১০৪১

হিসেবে সাব্যস্ত হবে। কেননা ইতোপূর্বের এক হাদিসে আমরা বর্ণনা করে এসেছি, 'রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছেঁড়া-ফাড়া পোশাক পরিহিত এক লোককে দেখে জিজ্ঞেস করেছিলেন, তোমার কাছে কি ধন-সম্পদ নেই? লোকটি উত্তরে বলেছিল, হ্যাঁ, আছে। তখন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছিলেন, তাহলে আল্লাহর নেয়ামত প্রকাশ থাকা চাই।'[৩]

দরিদ্রদের ওপর শয়তানের আরেকটি চক্রান্ত হচ্ছে, তারা নিজেদেরকে ধনীদের চেয়ে উত্তম মনে করে। তারা মনে করে, ধনীরা যেসবের আকাঙ্ক্ষী, এরা তার আকাঙ্ক্ষী নয়। অথচ এই ধারণাটি ভুল। কেননা কোনো বস্তু বা বিষয়ের থাকা না-থাকা মঙ্গল ও সার্থকতার মাপকাঠি নয়।

অনেক সময় শয়তান মানুষকে দরিদ্রতার ভয় দেখায়। এ ব্যাপারে আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন,

الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ

'শয়তান তোমাদেরকে দারিদ্র্যের ভয় দেখায় এবং কার্পণ্যের নির্দেশ দেয়।'[৪]

শয়তান লোকদেরকে বলে, এ চাকরিটা ছেড়ে দিলে আরেকটা চাকরি কোথায় পাবে? তুমি তো নিতান্ত দরিদ্র হয়ে যাবে। তখন লোকেরা দারিদ্র্যের ভয় করে এবং হারামে লিপ্ত হয়। আমরা সুদ গ্রহীতাকে দারিদ্র-শঙ্কায় শঙ্কিত হতে দেখি। সে বলে, কীভাবে বাঁচব? মানুষ তো সচ্ছল হয়ে গেল। আর আমি আজও নিঃস্ব!

কখনও শয়তান বাতিলকে ইসলামের দায়ীদের সামনে সজ্জিত করে উপস্থাপন করে। তখন সে যুক্তির আশ্রয় নিয়ে হারামকে হালাল করে। 'দাওয়াতের স্বার্থেই তো মিথ্যা বলা' এ যুক্তিতে সে দাওয়াতকর্মীকে মিথ্যায় লিপ্ত করে। 'দাওয়াতের স্বার্থই এ বিষয়ের দাবি করে'—এ ব্যাখ্যা করে শয়তান বাতিলকে এমনভাবে শোভিত করে, যেন মনে হয় সেটাই প্রকৃত হক।

কখনও মুসলিম-সমাজে আমরা এক মুসলিম কর্তৃক অপর মুসলিমকে, এক দাওয়াতকর্মী কর্তৃক অপর দাওয়াতকর্মীকে, এক আলেম কর্তৃক আরেকজন

---

৩ সুনানে আবি দাউদ : হাদিস নং ৪০৬৩

৪ সুরা বাকারাহ : আয়াত ২৬৮

আলেমকে কোণঠাসা করতে দেখি, অবমূল্যায়ন করতে দেখি। একজন অন্যজনকে কোণঠাসা করছে, দোষচর্চা করছে। একজন কাফের, ফাসিক, ফাজিরের সাথে যত-না মন্দ আচরণ করা উচিত, তার চেয়ে অধিক মন্দ আচরণ করে তারা একে অপরের সাথে। এসবই শয়তানের চক্রান্ত।

নারীদের ওপর শয়তানের ধোঁকা

নারীদের ওপর শয়তান অধিক মাত্রায় ধোঁকা দিয়ে থাকে। আমি কেবল নারীদের উদ্দেশ্যে স্বতন্ত্র গ্রন্থ রচনা করেছি। যাতে তাদের সম্পর্কে সমুদয় বিষয় উল্লেখ রয়েছে। এখানে কিঞ্চিৎ আলোকপাত করব। নারীদের ওপর শয়তানের ধোঁকার একটি হচ্ছে, তারা ঋতুস্রাব শেষ হওয়ার পরও দেরি করে আসরের সময় গোসল করে এবং শুধু আসরের নামায থেকে পবিত্রতার হিসাব করে সে ওয়াক্ত থেকে নামায পড়া শুরু করে। তারা জানে না—যোহরের নামাযও তাদের ওপর ফরয ছিল। অনেক ঋতুবতী মহিলা দু'তিন দিন যাবৎ গোসল করেন না এবং কাপড় ধোয়া হয়নি বলে ওজর পেশ করে থাকেন। অনেকে জানাবাত তথা ফরয গোসলে বিলম্ব করেন, শৈথিল্য প্রদর্শন করেন। এছাড়া অনেক মহিলা গোসলখানায় যাবার সময় ভালো করে কাপড় পড়ে যান না। তারা মনে করেন, ঘরে তো আমরা কেবল ক'জন মহিলাই থাকি, পুরো শরীর আবৃত করার কী আছে? ঘরের সবাই তো আমার নিজের লোক।

এ সকল বিষয় হারাম। বিনা কারণে গোসলে বিলম্ব করা জায়েয নেই। এমনইভাবে এক নারী জন্য অন্য নারীর নাভি থেকে হাঁটু পর্যন্ত অঙ্গ দেখা অবৈধ, সে মা হোক বা মেয়ে। হ্যাঁ, যদি মেয়ে ছোট হয় তবে অসুবিধা নেই। কিন্তু তার বয়স সাত হলে, তখন তার থেকে পর্দা করা উচিত।

অনেক মহিলা আছেন—যারা দাঁড়ানোর সামর্থ্য রাখা সত্ত্বেও বসে নামায আদায় করেন। এমতাবস্থায় নামায বাতিল বলে গণ্য হবে। অনেক নারী নামাযে শৈথিল্য প্রদর্শন করতে গিয়ে বলেন, আজ কাপড়ে বাচ্চা পেশাব করে দিয়েছে। অথচ কোথাও বেড়াতে যাওয়ার কথা থাকলে দ্রুত কাপড় পরিবর্তন করেন। নামাযের বেলায়ই এই অবহেলা। কোনো কোনো মা-বোন নামাযের ওয়াজিব তথা আবশ্যিক বিষয়াবলি সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞ থেকে যান, এক্ষেত্রে তারা কারও কাছ থেকে শিখতে চান না। কারও আবার

নামাযের সময় কাপড় খুলে যায়, শরীর দেখা যায়। অথচ এতে নামায টুটে যায়। এগুলোকে তারা তেমন আপত্তিজনক মনে করেন না।

অনেক মহিলা গর্ভপাতকে সহজ মনে করেন। তারা এটা ভাবেন না যে, একটি জমাট আত্মাকে নষ্ট করা একজন মুসলমানকে খুন করার সমতুল্য। এতে যে কাফ্ফারা আবশ্যক হয়, সে ব্যাপারেও তারা গ্রাহ্য করেন না।

বিশেষ জ্ঞাতব্য : স্বামীর অকৃতজ্ঞতা একটি স্বাভাবিক বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। অথচ হাদিসে আছে, আবু উমামা রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন :

ثَلاثَةٌ لا تُجَاوِزُ صَلاتُهُمْ آذَانَهُمُ الْعَبْدُ الآبِقُ حَتَّى يَرْجِعَ وَامْرَأَةٌ بَاتَتْ وَزَوْجُهَا عَلَيْهَا سَاخِطٌ وَإِمَامُ قَوْمٍ وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ

"তিন ব্যক্তির নামায তাদের কানের ওপরে ওঠে না (অর্থাৎ কবুল হয় না) যথা—১. পলাতক ক্রীতদাস, যে নিজের মালিকের নিকট থেকে পলায়ন করেছে। যতক্ষণ সে ফিরে না আসবে তার নামায কবুল হবে না। ২. সেই নারী, যে স্বামীকে রাগান্বিত রেখে রাত কাটায়। ৩. সেই ইমাম, লোকেরা যার ইমামতি পছন্দ করে না।"[১]

মু'আয ইবনে জাবাল রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন :

لا تُؤْذِي امْرَأَةٌ زَوْجَهَا فِي الدُّنْيَا إِلا قَالَتْ زَوْجَتُهُ مِنَ الْحُورِ الْعِينِ لا تُؤْذِيهِ قَاتَلَكِ اللَّهُ فَإِنَّمَا هُوَ عِنْدَكَ دَخِيلٌ يُوشِكُ أَنْ يُفَارِقَكِ إِلَيْنَا

"কোনো নারী যখন দুনিয়াতে তার স্বামীকে কষ্ট দেয়, তখন জান্নাতে তার হুরেঈন স্ত্রী বলতে থাকেন, আল্লাহ্ তোমাকে ধ্বংস করুন! ওকে কষ্ট দিও না। উনি তো তোমার কাছে কয়েক দিনের মেহমান। অচিরেই তোমাকে ছেড়ে আমাদের কাছে (জান্নাতে) আগমন করবেন।"[২]

উপরোক্ত হাদিসগুলোতে স্বামীকে অসন্তুষ্ট করতে কঠোরভাবে নিষেধ করা হয়েছে। এজন্য যে, নেককার স্বামী দুনিয়ার স্ত্রীর কাছে কিছুদিনের জন্য অতিথিস্বরূপ। তার অসন্তুষ্টিতে আল্লাহ্ অসন্তুষ্ট।

---

১ সুনানে তিরমিযি : হাদিস নং ৩২৮

২ তিরমিযি : হাদিস নং ১০৯৪; ইবনু মাজাহ্ : হাদিস নং ২০০৪

স্ত্রীর ওপর স্বামীর যে সকল অধিকার রয়েছে, তন্মধ্যে বিছানার অধিকার অন্যতম। মূলত এটি স্বামী-স্ত্রী উভয়েরই মিলিত অধিকার। এ জন্য স্বামী যখন যৌন ইচ্ছা পূরণ করতে আগ্রহী হয়, স্ত্রীর জন্য তখন বাধা দেয়া বৈধ নয়। হ্যাঁ, কঠিন ব্যাধিতে নিপতিত হলে সে ব্যাপারটি আলাদা।

অনেক সময় স্বামী-স্ত্রীর মাঝে এ ব্যাপারে বেশ মতানৈক্য দেখা দেয়। ঝগড়া-বিবাদেরও উপক্রম হয়। স্বামী বেচারা শান্তি ও তৃপ্তির আশায় ভিন্ন পন্থা অবলম্বন করে। অন্যত্র চলে যায়। বিছানার অধিকার পাওয়ার আগ পর্যন্ত স্ত্রীকে দূরে রাখে। এমন সময় স্বামী চায়, স্ত্রী তাকে আগের মতো ভালোবাসুক। সে উভয়ের মিলনের প্রত্যাশা করে। এদিকে স্ত্রীও মনে মনে সেটাই চায়। কিন্তু শয়তান এ ক্ষেত্রে বাগড়া বসায়। সে স্ত্রীর মনে ওয়াসওয়াসা দেয়—তোমার স্বামী রাগ করেছে। মান করেছে। তুমি কেন তার ডাকে সাড়া দেবে? তোমারও তো একটি ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্য আছে। শয়তানের এই আশকারা পেয়ে স্ত্রী মুখ ফুলিয়ে রাখে। এ ক্ষেত্রে অনেক সময় পরিস্থিতি ভিন্ন দিকে যেতে বাধ্য হয়। সংসারে টানাপোড়েন দেখা দেয়। পাশাপাশি প্রতিনিয়ত ফেরেশতাদের লা'নত তো আছেই!

একজন নারী স্ত্রী হিসেবে স্বামীর যাবতীয় অভ্যন্তরীণ প্রয়োজন পূরণ করবে, তার গৃহের দেখাশোনা, সন্তানদের লালন-পালন ও সংসারের পরিপাটিতে নিজেকে ব্যস্ত রাখবে। সেই স্ত্রী স্বামীর হৃদয়-বাগের ফুল হিসেবে তাকে খোশবু দেবে। ভালোবাসার বন্ধনে তাঁকে সঁপে দেবে নিজের দেহ-মন। ফলে ভরে উঠবে তাদের দাম্পত্য জীবন স্বর্গীয় সুখের অমৃত সুধায়। দাম্পত্য জীবনের সুন্দর এই সম্পর্কের কথা মহান স্রষ্টা আল্লাহ তাআলা পবিত্র কোরআনে উল্লেখ করে ইরশাদ করেন,

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

"আর তাঁর নিদর্শনসমূহের মধ্যে একটি এই যে, তিনি তোমাদের জন্যে তোমাদের মধ্য হতে স্ত্রীগণকে সৃষ্টি করেছেন। যাতে করে তোমরা তাদের নিকটে শান্তি লাভ করো। আর তোমাদের উভয়ের মাঝে সৃষ্টি করেছেন ভালোবাসা ও সহানুভূতি। এতে রয়েছে নিদর্শন সেই লোকদের জন্য যারা চিন্তা করে থাকে।"[১]

---

১ সুরা রূম : আয়াত ২১

কিন্তু তারপরও কোন নারী যদি নিজের সৌন্দর্যের অহংকারে, বাপ-দাদা ও ধন-সম্পদের অহমিকায় স্বামীর সাথে অসদাচরণ করে, আঙ্গুলের দোলায় তাকে চালাতে চায়, এমনকি স্বামীকে শারীরিক অধিকার থেকে বাধা দেয় ও বঞ্চিত রাখে—এ নারী সৃষ্টিকুলের মধ্যে নিকৃষ্ট ও অভিশপ্ত। যেমনটি হাদিসে সুস্পষ্ট ভাষায় বর্ণিত হয়েছে। আবু হুরায়রা রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ فَأَبَتْ فَبَاتَ غَضْبَانَ عَلَيْهَا لَعَنَتْهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ

"কোনো ব্যক্তি যদি স্ত্রীকে বিছানায় আহ্বান করে, কিন্তু স্ত্রী তার আহ্বান প্রত্যাখ্যান করে, অতঃপর স্বামী রাগান্বিত অবস্থায় রাত কাটায়, তবে প্রভাত হওয়া পর্যন্ত ফেরেশতাগণ সে স্ত্রীকে অভিশাপ দেয়।"[২]

উক্ত হাদিসের সমর্থনে ত্বলক বিন আলী রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত হয়েছে। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

إِذَا الرَّجُلُ دَعَا زَوْجَتَهُ لِحَاجَتِهِ فَلْتَأْتِهِ وَإِنْ كَانَتْ عَلَى التَّنُّورِ

"স্বামী যদি প্রয়োজন পূরণের (সহবাসের) জন্য স্ত্রীকে আহ্বান করে, তবে সে যেন তাৎক্ষণিক তার ডাকে সাড়া দেয়; যদিও সে চুলার কাছে বসে থাকে না কেন।"[৩]

অন্য এক বর্ণনায় বলা হয়েছে, আবু হুরায়রা রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مَا مِنْ رَجُلٍ يَدْعُو امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهَا فَتَأْبَى عَلَيْهِ إِلا كَانَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ سَاخِطًا عَلَيْهَا حَتَّى يَرْضَى عَنْهَا

"শপথ সেই সত্তার যার হাতে আমার প্রাণ, কোনো ব্যক্তি যদি স্ত্রীকে বিছানায় (সহবাসের জন্য) আহ্বান করে আর সে তা প্রত্যাখ্যান করে, তবে আকাশের অধিপতি আল্লাহ্ তাআলা ততক্ষণ পর্যন্ত তার ওপর অসন্তুষ্ট থাকবেন যে পর্যন্ত স্বামী তার ওপর সন্তুষ্ট না হয়।"[৪]

---

২ সহিহ্ বোখারী : হাদিস নং ২৯৯৮; সহিহ্ মুসলিম : হাদিস নং ২৫৯৪

৩ তিরমিযি : হাদিস নং ১০৮০

৪ সহিহ্ মুসলিম : ২৫৯৫

স্বামী তার প্রয়োজনে স্ত্রীকে ডাকলে স্ত্রী যদি অস্বীকার করে কিংবা অসুস্থ সেজে বসে, আল্লাহ্‌র কাছে এটা কঠিন অপরাধ হিসেবে সাব্যস্ত হয়। আদর্শ স্ত্রীরা তো ঝগড়া-বিবাদের কথা ভুলে যায়। সে আপন প্রতিপালকের কাছে সাওয়াব ও নেকি অর্জনের উদ্দেশ্যে দ্বিতীয়বার স্বামীর অনুগত ও আদেশ মান্যকারী হয়ে যায়। ইবনে আবি হামযাহ্ রহ. বলেন, এ কথা সহজেই অনুমানযোগ্য যে, বিছানার অধিকার বলতে এখানে সহবাসের কথা বোঝানো হয়েছে। অন্য হাদিসের মাধ্যমেও এর প্রমাণ মিলে।[১]

হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আমর রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, আল্লাহ তাআলা এমন মহিলাদের প্রতি দয়ার দৃষ্টি দেন না, যারা স্বামীর প্রতি অকৃতজ্ঞ। অথচ সে স্বামীর মুখোপেক্ষী।'[২]

জানা গেল, আদর্শ স্ত্রী তারা—যারা স্বামীর অবদানকে কৃতজ্ঞচিত্তে দেখে। তার কারণেই সে আপন সম্ভ্রম শালীনতা বজায় রাখতে পেরেছে এবং তার কারণেই সন্তানের মতো নিয়ামতপ্রাপ্ত হয়ে মা হওয়ার সৌভাগ্য নসীব হয়েছে।

হে আমার মুসলিম বোনেরা! এ ব্যাপারে ইবনুল কারইয়াহ্ রহ. বলেন, মুসলিম স্ত্রীরা শালীন, সুন্দর, কোমল ও অনুগত হয়ে থাকেন। তার স্বামী যদি তার কাছে কোনো কিছু আমানত হিসেবে গচ্ছিত রাখে, তাকে আমানতদার হিসেবে পায়। যদি অভাব-অনটনে পতিত হয়, তবে কানা'আত তথা অল্পেতুষ্ট থাকে। বাইরে কোথাও গেলে সে তার রক্ষণাবেক্ষণকারী হয়। স্বীয় স্বামীকে সর্বদা খুশি ও উৎফুল্ল রাখে। তার পার্শ্ববর্তীরা নিরাপদে থাকে। চাকর-বাকরেরা নিরাপদ থাকে। তার সন্তান-সন্ততিরা পরিষ্কার-পরিছন্ন হয়। তার ধৈর্যশক্তি তার অজ্ঞতাকে ঢেকে রাখে। তার ধর্ম তার জ্ঞানে পরিপক্বতা আনে। তখন সে ওই ফুলের ন্যায় হতে পারে, যাকে ছেঁড়া হতে মানুষ দূরে থাকে। সে ওই হীরার মতো হয়, যা দিয়ে কিছু কাটা হয়নি। সে সুসময়ে শোকর আদায় করে। দুঃসময়ে ধৈর্যধারণ করে। আল্লাহ্ তাআলা যাকে এমন স্ত্রী দান করেন, সে জগতের সব কল্যাণ প্রাপ্ত হয়।[৩]

---

১ ফাতহুল বারী : ৯/২৯৪

২ সুনানে নাসায়ী : ২৪৯, মুসতাদরাকে হাকিম : ২/১৯০

৩ আলমুহাসিন ওয়াল আযদাদ : ১৪৩

প্রকৃত আদর্শ স্ত্রীরা স্বামীর প্রতি কৃতজ্ঞ থাকে। স্বামীর সব কাজ সে খুশিমনে পালন করে। কখনো বিরক্তিভাব প্রকাশ করে না। আদর্শ স্ত্রীরা স্বামীর বিপদ ও দুর্দশায় পাশে থেকে সাহস জোগায়। কথা-কাজে তার প্রতি অনুগত থেকে কৃতজ্ঞতা জানাতে ভোলে না।

আনাস বিন মালেক রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও বলেন, "কোন ধরনের রমণী জান্নাতী, আমি কি তোমাদেরকে বলে দেব না? তাঁরা বললেন, হ্যাঁ হে আল্লাহ্‌র রাসুল! তিনি বললেন, তোমাদের জান্নাতী রমণীগণ হচ্ছে, স্বামীর প্রতি প্রেম নিবেদনকারিণী এবং অধিক সন্তান প্রসবকারিণী। তার আনুগত্যের প্রকাশ হচ্ছে, সে রাগন্বিতা হলে বা তার সাথে খারাপ আচরণ করা হলে বা স্বামী তার প্রতি রাগন্বিত হলে, স্বামীর কাছে গিয়ে বলে, এই আমার হাত আপনার হাতে সঁপে দিলাম, আপনি সন্তুষ্ট না হওয়া পর্যন্ত আমি চোখের পলক ফেলব না। অর্থাৎ আমি কোনো আরাম নেব না কোনো আনন্দ বিনোদন করব না যতক্ষণ আপনি আমার প্রতি খুশি না হন।"[৪]

উচ্চাশা পোষণে সবার প্রতি শয়তানের ধোঁকা

গ্রন্থকার বলেন, অধিকাংশ ইহুদি-খ্রিষ্টান মনে মনে ইসলামের সত্যতা ও অপরিহার্যতা স্বীকার করে। কিন্তু শয়তান সারাক্ষণ তাদের প্ররোচনা দিয়ে বলে, এত দ্রুত সিদ্ধান্ত নিও না। ভেবেচিন্তে সিদ্ধান্ত নাও। এভাবে শয়তান তাকে দোদুল্যমান রাখে। আর এভাবে কাফের অবস্থাতেই সে মারা যায়। অনুরূপভাবে পাপীদেরকেও শয়তান তার প্ররোচনা দিয়ে টলাতে থাকে। শৈথিল্য প্রদর্শনে ইন্ধন জোগাতে থাকে। পাপের কাজ আরও অধিক পরিমাণে করার জন্য প্রলোভন দিতে থাকে। জনৈক কবি খুব সুন্দর বলেছেন,

'তুমি ইচ্ছেমতো পাপ কাজ দ্রুত করে নাও, আগামী বছর তাওবাহ করার আশা রাখো।' আর এমনই করে সে তাওবাহ ছাড়া ইহজগৎ থেকে পরপারে পাড়ি দেয়। অনেক সময় ফকিহগণ পুনরায় তার দরস দেখে নিতে চান, কিন্তু শয়তান ইন্ধন দিয়ে বলে, আর সামান্য আরাম করে নিন। অনেক ইবাদতকারী রাতে নামায পড়ার জন্য উঠতে চায়, শয়তান তাকে 'আরো

---

৪ তবরানী, সিলসিলা সহিহা : হাদিস নং ২৮৭

অনেক সময় পড়ে আছে' বলে ধোঁকা দিতে থাকে। এভাবে উত্তম কাজে সব শ্রেণির লোককে শয়তান বিভিন্ন টালবাহানায়, অদ্ভুত কূটচাল আর বিচিত্র ফন্দিতে সময় ক্ষেপণ করতে বাধ্য করে। উচ্চাশা পোষণে প্ররোচনা দেয়। সুতরাং বুদ্ধিমানদের উচিত—আমলের কাজ দ্রুত করে নেয়া। সময়ের কাজ যথাসময়ে আদায় করা। আগামীর জন্য কোনো আমল রেখে না দেয়া। উচ্চাশা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়া। কেননা সময়ের নিয়ন্ত্রণ মানুষের হাতে নয়। সে ইচ্ছে করলেই ভবিষ্যতের আশাকৃত কাজ করতে পারে না। এটা নিতান্তই শয়তানের একটি চাল ও ফাঁদ। এ জন্যই হাদিসে এসেছে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন :

صَلِّ صَلَاةَ مُوَدِّعٍ

'যখন তোমরা নামায পড়বে, মনে করবে এটা তোমার শেষ নামায।'

জনৈক বুযুর্গ বলেছেন, আমি তোমার 'অতিসত্বর' শব্দযুক্ত কথার ব্যাপারে ভয় করি। কেননা এটা শয়তানের অন্যতম সৈনিক। দ্রুত কাজ সম্পাদন এবং উচ্চাশা পোষণকারী—উভয়ের উদাহরণ হচ্ছে এমন, দু'জন দীর্ঘ সফরে গাড়িতে উঠল। মাঝপথে বিরতিতে উভয়ে এক স্থানে গাড়িটি কিছুক্ষণের জন্য দাঁড়ায়। দ্রুত কাজ সম্পাদনকারী গাড়ি থেকে নেমে তার বাকি সফরের পাথেয়গুলো প্রয়োজনমাফিক খরিদ করার কাজে নেমে গেল। আর উচ্চাশা পোষণকারী ভাবল, একটু জিরিয়ে নিই। আরও বহু সময় আছে, পরে পাথেয় খরিদ করে নেব। এমন করে একসময় গাড়িটি ছাড়ার উদ্দেশ্যে হর্ন বাজালে উচ্চাশা পোষণকারীর টনক নড়ে। সে হায় হায় শব্দে আফসোস করতে থাকে। বাকি পথের পাথেয়ের ব্যাপারে হা-হুতাশ করতে থাকে। আর দ্রুত কাজ সম্পাদনকারী নির্বিঘ্নে শঙ্কামুক্ত থেকে গাড়িতে ওঠে বাকি পথের জন্য দুশ্চিন্তামুক্ত থাকে।

تم والحمد لله أولا وآخرا

আমাদের প্রকাশিত গ্রন্থাবলী

১. মনীষিদের কাছে সময়ের মূল্য
লেখক : আব্দুল ফাত্তাহ আবু গুদ্দাহ
অনুবাদ : কাজী আবুল কালাম সিদ্দীক
মূল্য : ২০০ টাকা মাত্র

২. ভালোবাসার উল্টোপিঠ
লেখক : আমাল বিনতে আবদিল্লাহ
অনুবাদ : ছানা উল্লাহ সিরাজী
মূল্য : ৮০ টাকা মাত্র

৩. ইকফারুল মুলহিদীন (ঈমান ও কুফরের সংঘাত)
লেখক : আল্লামা আনওয়ার শাহ কাশ্মিরী
অনুবাদ : মুফতি নাজমুল হুদা মিরপুরী
মূল্য : ২২০ টাকা মাত্র

৪. জাস্ট ফাইভ মিনিটস
লেখক : হিবা দাব্বাগ
অনুবাদ : জোজন আরিফ
মূল্য : ২৫০ টাকা মাত্র

৫. আসহাবে কাহাফ
লেখক : কাজী আবুল কালাম সিদ্দীক
মূল্য : ১২০ টাকা মাত্র

৬. পড়ালেখার কলা কৌশল
অনুবাদ ও সংকলন : কাজী আবুল কালাম সিদ্দীক
মূল্য : ১৩০ টাকা মাত্র

৭. পুত্রের প্রতি পিতার পত্র ও উপদেশ
লেখক : কাজী আবুল কালাম সিদ্দীক
মূল্য : ১২০ টাকা মাত্র

৮. আমালিয়াতে কাশ্মিরী
লেখক : আল্লামা আনওয়ার শাহ কাশ্মিরী
অনুবাদ : ছানা উল্লাহ সিরাজী
মূল্য : ১০০ টাকা মাত্র

৯. ভার্সিটির ক্যান্টিনে
লেখক : শায়খ মুহাম্মদ বিন আব্দুর রহমান আরিফী
অনুবাদ : ছানা উল্লাহ সিরাজী
মূল্য : ৮০ টাকা মাত্র

১০. ফিরে এসো ক্ষমার পথে
লেখক : শায়খ মুহাম্মদ বিন আব্দুর রহমান আরিফী
অনুবাদ : জহির উদ্দীন বাবর
মূল্য : ৮০ টাকা মাত্র

১১. হে যুবক
লেখক : শায়খ সালমান বিন ফাহাদ আল আওদা
অনুবাদ : কাজী আবুল কালাম সিদ্দীক
মূল্য : ৮০ টাকা মাত্র

১২. ছোটদের প্রতি উপদেশ
লেখক : শায়খ আযিম হাসেলপুরী
অনুবাদ : মাওলানা শোয়াইব আহমদ
মূল্য : ৫০ টাকা মাত্র

১৩. খাদিজা রাযি.-এর সোনালী সংসার
লেখক : শায়খ আব্দুল মালেক মুজাহিদ
অনুবাদ : ছানা উল্লাহ সিরাজী
মূল্য : ১২০ টাকা মাত্র

১৪. নবী নন্দিনী সাইয়িদা ফাতিমা রাযি.
লেখক : কাজী আবুল কালাম সিদ্দীক
মূল্য : ১০০ টাকা মাত্র

১৫. উম্মুল মুমিনীন উম্মে সালামা রাযি.
লেখক : কাজী আবুল কালাম সিদ্দীক
মূল্য : ৮০ টাকা মাত্র

১৬. শুহাদায়ে কারবালা হোসাইনী আদর্শ
লেখক : মুফতি মুহাম্মদ শফি
অনুবাদ : মাওলানা মাকসুদ আহমদ
মূল্য : ৮০ টাকা মাত্র

১৭. কবীরা গুনাহ
লেখক : আল্লামা শামসুদ্দিন যাহাবী
অনুবাদ : মাওলানা জাহিদুল ইসলাম
মূল্য : ৯০ টাকা মাত্র

১৮. পৃথিবী আমার আসল ঠিকানা নয়
লেখক : কাজী আবুল কালাম সিদ্দীক
মূল্য : ১৮০ টাকা মাত্র

১৯. নারী : নানা ধর্মে কল্পনা ও বাস্তবতা
লেখক : ড. শরীফ আব্দুল আযীম
অনুবাদ : কাজী আবুল কালাম সিদ্দীক
মূল্য : ৮০ টাকা মাত্র

২০. রমজানুল মুবারক
লেখক : মাওলানা ইলিয়াস গুম্মান
অনুবাদ : মাওলানা মাকসুদ আহমদ
মূল্য : ১০০ টাকা মাত্র

২১. তারাকিবে আমছিলায়ে নাহবেমীর
লেখক : মাওলনা আব্দুর রহমান মুহাম্মদ হানিফ
মূল্য : ৬০ টাকা মাত্র

২২. গান : কালের মরণব্যধি
লেখক : শায়খ মুহাম্মদ বিন আব্দুর রহমান আরিফী
অনুবাদ : মাওলানা আলী হোসাইন
মূল্য : ৮০ টাকা মাত্র

২৩. অহংকার
লেখক : কাজী আবুল কালাম সিদ্দীক
মূল্য : ৮০ টাকা মাত্র

২৪. হে আমার ছেলে
লেখক : শায়খ আলী তানতাভী
অনুবাদ : কাজী আবুল কালাম সিদ্দীক
মূল্য : ৩০ টাকা মাত্র

২৫. হে আমার মেয়ে
লেখক : শায়খ আলী তানতাভী
অনুবাদ : কাজী আবুল কালাম সিদ্দীক
মূল্য : ৩০ টাকা মাত্র

২৬. যুবকদের উপর রহম করুন
লেখক : শায়খ আলী তানতাভী
অনুবাদ : কাজী আবুল কালাম সিদ্দীক
মূল্য : ২৫ টাকা মাত্র

২৭. ইউথস প্রবলেমস
লেখক : শায়খ মুহাম্মদ বিন সালিহ আল উসাইমিন
অনুবাদ : কাজী আবুল কালাম সিদ্দীক
মূল্য : ৫০ টাকা মাত্র

২৮. শুধু তোমারই জন্য
লেখক : আয়েশা খান
অনুবাদ : মাওলানা মাকসুদ আহমদ
মূল্য : ৮০ টাকা মাত্র

৩০. শয়তানের জবানবন্দী
লেখক : সালিম রউফ
অনুবাদ : মাওলানা জাহিদুল ইসলাম রাহমানী
মূল্য : ৮০ টাকা মাত্র

পরিবেশিত ও প্রকাশিতব্য গ্রন্থাবলী

৩১. আত তিব্বুন নববী (প্রকাশিতব্য)
লেখক : আল্লামা ইবনুল কাইয়ুম আল জাওযিয়্যাহ
অনুবাদ : মুফতি আবু সাআদ
মূল্য : টাকা মাত্র

৩২. হিসনে হাসিন (প্রকাশিতব্য)
লেখক : ইমাম মুহাম্মদ আল জাযায়েরী
অনুবাদ : মুফতি আবু সাআদ
মূল্য : ২০ টাকা মাত্র

৩৩. তাওবার গল্প (কিতাবুত তাওয়াবিন) (প্রকাশিতব্য)
লেখক : আল্লামা ইবনু কুদামা রহ.
অনুবাদ : মাওলানা মাকসুদ আহমদ
মূল্য : ২৯০ টাকা মাত্র

৩৪. নাঈমা (পরিবেশিত)
লেখক : আবু ইয়াহইয়া
অনুবাদ : মাকসুদ আহমদ
মূল্য : ১৬০ টাকা মাত্র

৩৫. জীবন যেখানে শুরু (পরিবেশিত)
লেখক : আবু ইয়াহইয়া
অনুবাদ : ছানা উল্লাহ সিরাজী
মূল্য : ১৬০ টাকা মাত্র



DARUL ARQAM



শয়তান আমাদের আদি শত্রু। চির শত্রু। মহা শত্রু। তার এ শত্রুতা মানবজাতির আদি পিতা থেকে নিয়ে সৃষ্টির শেষ মানুষটি পর্যন্ত দীর্ঘ। তার অভিনব ধোঁকা আর বিচিত্র কূটচাল জলে-স্থলে-অন্তরীক্ষে, শূণ্যে-মহাশূণ্যে– তথা পৃথিবীর সর্বত্র সকলের জন্য বিস্তৃত। তার প্রলোভন ও প্রতারণা থেকে বাঁচতে পারে না আলেম-জাহেল, শিক্ষিত-অশিক্ষিত, ধনী-দরিদ্র, নারী-পুরুষ– কেউই। সর্বত্র সবার জন্য সে পুতে রেখেছে অকল্পনীয়-অবর্ণনীয় পাপের বীজ। পৃথিবীব্যাপী সে বিছিয়ে রেখেছে অজস্র মোহজাল। পেতে রেখেছে অসংখ্য কুটিল ফাঁদ। সূক্ষ্ম-স্থূল সকল প্রকার ফন্দিতে শয়তান অদ্বিতীয়।

শয়তানকে কুরআন মাজিদে ইবলিসও বলা হয়েছে। তাতে ইবলিস শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে ১১ বার। শয়তানের এ নামেই আলোচ্য গ্রন্থ 'তালবিসে ইবলিস' নামকরণ করা হয়েছে। মহান আল্লাহ মানুষকে কুমন্ত্রণা দেয়ার জন্যে শয়তানকে সুযোগ ও অবকাশ দিয়েছেন বটে; কিন্তু শয়তানের প্রতারণা ও বিভ্রান্তি থেকে আত্মরক্ষার জন্যে মানুষকে শয়তানি প্রতারণার যাবতীয় কুটকৌশল জানিয়ে দিয়েছেন এবং বাঁচার উপায় বলে দিয়েছেন। শয়তানি প্রতারণার কূটকৌশলসমূহ যেমন কুরআনে বর্ণিত হয়েছে, তেমনি রসূলুল্লাহ সা. কুরআন উপস্থাপনের সাথে সাথে কুরআনের ব্যাখ্যা হিসেবে নিজের বাণীতেও সেগুলো জানিয়ে দিয়ে গেছেন। আলোচ্য 'তালবিসে ইবলিস' গ্রন্থটিতে সে বিষয়গুলো অত্যন্ত নিপুনভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী আল্লামা শায়খ ইবনুল জাওযী রহ.।

দারুল আরকাম
ইসলামী টাওয়ার (দোকান নং-১০), গ্রাউন্ড ফ্লোর
বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০। ০১৯৭৭ ৬৪৮১৮৫